প্রথম : ইয়েনান থেকে শ্রীকাকুলাম
দ্বিতীয় : জতুগৃহের জ্বালা
তৃতীয় : রক্তাক্ত একুশে
চতুর্থ : জরুরী অবস্থা

বরুণ সেন

পাহাড়ের পর পাহাড়। অসংখ্য গিরি চূড়া একের পর এক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত, স্তব্ধ, ধ্যান গম্ভীর মূর্তি। ঘন জঙ্গল, ঝোপ ঝাড়, আঁকা-বাঁকা বন্ধুর পথ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কোনদিন বুঝি মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি এখানে। প্রবেশ করেনি বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলো। সেই আদিম যুগ থেকে বুঝি পরিত্যক্ত শ্রীকাকুলাম।

অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম!

পরিত্যক্ত, সভ্যতার আলোকহীন শ্রীকাকুলাম আজ শুধু অন্ধ্রের নয়, শ্রীকাকুলাম আজ সারা ভারতের। শ্রীকাকুলামের অন্ধকারময় পশ্চাদপদ পাহাড়ী গ্রামগুলি আজ আলোর বর্তিকার মত জ্বলছে। শ্রীকাকুলাম আজ 'ভারতের ইয়েনান'-এর রূপ নিয়েছে।

শ্রীকাকুলামের প্রতিটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে। দুঃশাসনের, অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছে কড়ায় গণ্ডায়। অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরছে তারা শক্ত হাতে। ক্ষমা নেই। মনুষ্যত্বের অবমাননাকারীদের ক্ষমা করবে না তারা।

এ লড়াই সুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে। বারবার লড়াই করেছে তারা। জেলে গেছে। ভোগ করে এসেছে সাজা। কিন্তু যা তাদের কাম্য, তা তারা পায় নি। ভুল পথে ছুটে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আজ সঠিক পথের সন্ধানে দীপ্ত উজ্জ্বল। তারা বুঝেছে, মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে কিছু হয় না—দাবী আদায় করে নিতে হয়।

যারা ছিল সব থেকে অনগ্রসর, শ্রীকাকুলামের গিরিজনেরা, জেগে উঠেছে। সারা দেশের মানুষ, গরীব সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রদূত।

ছোট ছোট নীচু চালের ঘর। দিনের বেলাতেও আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা চলে সমানে। মানুষগুলি লুকোচুরির ধার ধারে না। সরল সত্যকে স্বীকার করতে নেই এতটুকু কুণ্ঠা। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে নেই লজ্জা, সঙ্কোচ। আছে অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ।

অন্যায়ের সুরু আজ নয়। দুনিয়ার সভ্য জাতির অন্যতম প্রতিনিধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দল অন্ধ্র, উড়িষ্যার এই আদিবাসীদের এলাকায় জমি বেচা-কেনা বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করে, এই পাহাড়ী এলাকাগুলিতে এক বিশেষ অফিসারের শাসনাধীন করে, নাম দিয়েছিল এজেন্সী এলাকা। উদ্দেশ্য, অধিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ। ফলে, একদিন সমতলের ভূস্বামীর দল হয়েছে জমির মালিক। সমতলের ভূস্বামীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু আদিবাসীও হয়েছে জমিদার। পাহাড়ী মানুষগুলি হয়েছে ভূমিদাস। বাড়ীর চাকর, পেট ভাতার কিষাণ, ব্যবসায়ী মহাজনদের কাছে বাধ্য হয়ে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করতে হয় হলুদ তেঁতুল আর আদা।

পেটে ভাত জোটেনা তাদের. প্রধান খাদ্য আমের আঁটির ভেতরের শাঁস শুকিয়ে গুঁড়ো করে লেই বানিয়ে খাওয়া। আজও স্বাধীন ভারতের মানুষগুলিকে আজও এই খাদ্য খেয়ে দিন যাপন করতে হয়।

অত্যাচার আর অবিচার। দিনের পর দিন বহু নালিশ ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভ জমেছে অন্তরে। সুরু করেছে অধিকার রক্ষার লড়াই। প্রতিবাদের পথে প্রতিকার চেয়েছে তারা। জেলে গিয়ে সাজা খেটেছে। পেয়েছে এইটুকুই, আইনের সাজা।

দিন এসেছে। সুচনা হয়েছে নতুন দিনের। নতুন যুগ। সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে মানুষ।

শ্রীকাকুলামের মানুষ।

ডেবরা, গোপীবল্লভপুর, মজঃফরপুর, দক্ষিণ মুঙ্গের, বহড়াগোড়ার মানুষ।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের স্পর্শ আজ নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বহারা প্রতিটি মানুষের অন্তরে। দিন এসেছে, দিন বদলের পালা।

শংকরের তাই মনে হল। মিথ্যা নয়, এতটুকু অসচ্ছতা নেই, সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত।

চেয়ারম্যানের কথাটা মনে হল। তিনি বলেন, 'জনগণকে চেন, জনগণকে বোঝ, জনগণকে গুরু মানো। কারণ, তুমি নও, জনগণই প্রকৃত বীর, জনগণই বিশ্ব-ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি।

১৯৫৮তে নকশালবাড়িতে যখন প্রথম সুরু হল অধিকার রক্ষার লড়াই, চমকে উঠেছিল সে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল তার সমস্ত অন্তরাত্মা। বিশ্বাস করতে পারেনি। দীন দরিদ্র—শিক্ষা দীক্ষা হীন অশিক্ষিত মানুষগুলির নতুন সংগ্রামে সায় দিয়ে উঠতে পারেনি তার মন। তীর ধনুকের লড়াইকে সে ভেবেছিল নেহাৎই দস্যুতা। অবিশ্বাস—দরিদ্র কৃষকের দল মুক্তিযুদ্ধের বোঝে কী? দু চারটে জমিদার, জোতদার আর দালালকে শেষ করলেই কী শ্রেণী সংগ্রাম হয়? শ্রেণী সংগ্রামের পথ কী জমিদার-জোতদার, দালাল আর বদমাস মহাজনের হত্যায়?

বিপ্লবের পথ তো প্রতিবাদে, মিছিলে, পোষ্টারে। দিনের পর দিন কত পোষ্টারই তো লিখেছে। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।'

শুনেছে বড় বড় নেতাদের কত জ্বালাময়ী ভাষণ। কত কথা বলেছেন তাঁরা। জানিয়েছেন কত শত কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। মুখোশ খুলে দিয়েছেন ধনীদের। বলেছেন, সংগ্রাম চলছে, চলবে।

শুনেছে সে। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বিনিদ্র চোখে ভেবেছে। ছটফট্ করেছে।

সাতষট্টির বাঁচার লড়াইয়ে জিতেছে তারা। বাংলা দেশে তৈরী হয়েছে বিপ্লবী সরকার। জনসাধারণের প্রতিনিধিরা মহাকরণে গেছেন। মন্ত্রী হয়েছেন। বাংলা দেশের ভাগ্য ফিরে গেছে।

অসাধু ব্যবসায়ীর দল আরো অসাধুতার পথ বেছে নিয়েছে। জোতদার, জমিদার, দালাল শ্রেণী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মোচ্ছব লেগেছে তাদের। জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিদের মৃদু তিরস্কার তাদের কিছু করতে পারেনি। কারণ, তারা বুঝে গেছে, কাগুজে বাঘ ভয় দেখায়, কামড়ায় না। কারণ, গায়ে যে তার ধর্মের নামাবলী, মন্ত্রীত্ব। ময়দানের বক্তৃতা কী মন্ত্রীর কণ্ঠে শোভা পায় ?

শংকর দেখেছে। দিনের পর দিন। জীবনের অনেকগুলি দিন তো দেখতে দেখতেই কেটে গেল। পোষ্টার লিখে লিখে হাতের লেখা ভাল হল। বাহবা পেল।

পার্টিতে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। ধরতে গেলে বাষট্টি সালের পর যখন পার্টি ভেঙ্গে দুভাগ হয়েছিল তার কিছুদিন পর থেকেই। সব কথা না জানলেও বুঝতে পারছিল ক্রমশঃ। দীর্ঘ কুড়ি বছরের সংসদীয় পথ কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী গুণগুলিকে সংশোধনবাদ শয়তানের মত একটু একটু করে গিলে খেয়েছে। বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের তল্পীবাহক হয়েছে। যে কংগ্রেস ভারতবর্ষে স্বাধীনতা এনেছে বলে দাবী করে, আবার ভোটের সময় দ্বারে দ্বারে ফেরে, তাদের পথই অনুসরণ করেছে। বিপ্লবের কথা শুধু সভায়, শোভাযাত্রায় আর পোষ্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

সেও পোষ্টার লিখেছে। দশটা পাঁচটা অফিস করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেছে, পার্টি অফিসে আড্ডা দিয়েছে। শোভাষাত্রার লোক যোগাড় করেছে। ছুটির দিনে চাঁদা তুলেছে। বার দুই জেলেও গেছে। আর কিছু করেনি। কারণ, তার বেশি কিছু করার ছিলনা। কিছু করবে এমন কিছুও ছিলনা।

এই সব করতে করতেই একদিন চাকরী গেল। আটাশ বছরের জীবনে আট বছরের চাকরীটা এক কথায় চলে গেল। বেসরকারী চাকরীর মেয়াদ একদিনেই ফুরিয়ে গেল। অপরাধ—জেল খাটা কর্মীকে

কোম্পানী কাজ দেবে না আর। ইউনিয়নও তার চাকরী যাওয়াটা মেনে নিল। কারণ, ইউনিয়ন তার পার্টির ইউনিয়ন নয়।

বাবা শুনে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা করগে। যতদিন পারবো, ছুটি করে খেয়ে যেও সময় মত।

দাদারা বললেন, ঘাবড়াসনে! অর্থাৎ ভয় পাসনে। না, ভয় সে পায়নি। কারণ, ভয় কি জিনিস জানে না সে। চাকরী গিয়ে একদিক দিয়ে ভালই হল। দিন রাতের সব সময়টা দিতে পারল পার্টির কাজে।

কিন্তু বেশি দিন নয়। শুধু পোষ্টার লেখা, চাঁদা তোলা, শোভাযাত্রার লোক জোগাড় করে শংকর বেশিদিন সন্তুষ্ট রাখতে পারল না নিজেকে। আর এই অসন্তুষ্ট মনটা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই দেখা হয়ে দেখা তাঁর সঙ্গে।

হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ শংকর?

—ভাল। আপনি?

—এখনও কলকাতাতে ভাল ভাবেই আছি।

—সেকি! আশ্চর্য হয়েছিল সে। জিজ্ঞাসা করেছিল আপনি কি এখন কলকাতায় থাকেন না?

—প্রায় ছ'বছর হল উত্তর বাংলায় আছি।

—তবে যে ওরা বলে······। কথাটা শেষ করেনি সে, হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল।

তিনি তেমনি হাসিমুখে বলেছিলেন, আমি নিজেই ছ বছর হল এখান থেকে দূরে সরে গেছি।

কথাটা আর চেপে রাখতে পারে নি সে। বলেছিল, আপনি বেইমানী করেছিলেন বলে, আপনাকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?

কথাটা শুনে এক মুহূর্ত নীরব থেকেছিলেন তিনি। রাগ করেন

নি। একটু পরেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হাসিটুকু। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমাদের হয়তো বলে থাকবেন। তবে যা সত্য, তা সত্যই।

—আপনি উত্তর বাংলায় কেন গেছেন? জানতে চেয়েছিল সে।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কাজ করতে। সেবাধর্ম নিয়েছি আমি।

—সন্ন্যাসী হয়েছেন?

—দেখে কি মনে হচ্ছে আমায়? সকৌতুকে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

দেখেছিল সে। প্রায় দুটি বছর পরে দেখেছিল মানুষটিকে। সাধারণ মানুষটি। তেমনি অতি সাধারণ বেশভূষা। এতটুকু বাহুল্য নেই। নেই আড়ম্বর, অথচ ইচ্ছা করলে……

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সন্ন্যাসী বলে মনে হচ্ছে?

—না। আপনি তেমনি আছেন। এতটুকু পরিবর্তন হয়নি আপনার।

—কিন্তু আমি যদি বলি আমার পরিবর্তন হয়েছে?

—কেমন করে বুঝবো? স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে।

—সত্যিই তো। হেসে বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সত্যি শংকর, তুমি ঠিকই বলেছ, বাইরে যদি কিছু পরিবর্তন না দেখ তাহলে বুঝবে কেমন করে। কিন্তু এ পরিবর্তন তো শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়। পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল মনে। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে এতদিন যে ভুল করে গেছি তার জন্যে অনুতাপ জেগেছিল। ভুল পথ পরিত্যাগ করে দু বছর আগে ছুটে গিয়েছিলাম তাই। আমি যদি কমিউনিষ্ট হই, দুনিয়ার মেহনতী মানুষের একজন বলে যদি নিজেকে ভাবতে শিখি তাহলে মিথ্যা বাবু কমিউনিষ্ট হয়ে সভায় শোভাযাত্রায় নিজের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করে কোন কাজ হবে না। যেতে হবে গ্রামে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক, যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হচ্ছে,

তাদের মাঝে। শোষণ থেকে, শাসন থেকে, দারিদ্র আর ক্ষুধা থেকে মুক্তি আনতে পারে একমাত্র তারাই। সশস্ত্র কৃষকই আজ বিপ্লব সফল করতে পারে। জানো শংকর, 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।' সে পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনারা যুদ্ধ করবেন ?

—নিশ্চয়ই করবো। শ্রেণী শত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রতিরোধ আমাদের করতেই হবে। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে আমাদের। নকশালবাড়ির কৃষকরা সংগ্রাম সুরু করে দিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে মৃদুকণ্ঠে বলেছিসেন, শংকর, ইতিহাসে যুদ্ধ দুই ভাগে বিভক্ত, একটি ন্যায়যুদ্ধ আর একটি অন্যায় যুদ্ধ। যে সব যুদ্ধ প্রগতিশীল সে সবই ন্যায় যুদ্ধ, আর যেসব যুদ্ধ প্রগতিতে বাধা দেয়, সে সবই অন্যায় যুদ্ধ। প্রগতিকে ব্যহত করে যে সব অন্যায় যুদ্ধ, আমরা কমিউনিষ্টরা সে সবে বিরোধিতা করি. কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করিনা। আমরা কমিউনিষ্টরা শুধু যে ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না তাই নয়, বরং সে সব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করে থাকি। আমরা নকশালবাড়ির কৃষকদের ন্যায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। জনযুদ্ধের পথ ছাড়া জনগণের কাছে আর অন্য কোন পথ নেই।

—ফলাফল ?

প্রশ্নটা শুনে আবার হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, যেখানে সংগ্রাম সেখানেই আত্মত্যাগ, মৃত্যু সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা। এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি। তাই বিপ্লবকে সফল করতে হলে বিপ্লবী কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে, ত্যাগ করতে হবে সম্পত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য, ত্যাগ করতে হবে পুরানো অভ্যাস এবং ত্যাগ করতে হবে আকাঙ্খা, ত্যাগ করতে হবে মৃত্যুভয় এবং সহজ পথ চলার চিন্তা, তবেই আমরা বিপ্লবীদের

শ্রমসাধ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে পারব। তবেই আমরা জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব মহত্তর ত্যাগে, যার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধ্বংস হবে এবং বিপ্লব সফল হবে। আবার একটু চুপ করেছিলেন তিনি। কি যেন চিন্তা করেছিলেন। কথা বলেন নি।

শংকর চুপ করে থাকতে পারে নি, তাঁকে ডেকেছিল।

গর্জে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠটা। বলেছিলেন, জান শংকর, এতদিন আমরা মানুষকে ঠকিয়েছি। ধোঁকা দিয়েছি। নিরন্ন সর্বহারা ভারতে কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি হয়ে আমরা তাদের সঙ্গে বেইমানী করেছি। আমরা বলেছি, দুনিয়ার মজদুর এক হও। কিন্তু মজদুরের সঙ্গে একাত্মা হতে পারি নি। আমরা সভা করেছি, শোভাযাত্রা করেছি। শোষিত সর্বহারা মানুষের দল আমাদের সেই সভায় গেছে। আমরা দামী পোষাকে, দামী মোটর চড়ে সেই সভার শোভাবর্দ্ধন করেছি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছি, আমরা এক, কিন্তু একাত্ম হতে পেরেছি কি? পারিনি। পারা সম্ভব নয়। কারণ কি জানো, আমরা আগে বাবু, তারপর কমিউনিষ্ট।

তাঁর কথাগুলো শুনছিল শংকর। ভাল লাগছিল। কৌতুহল জাগছিল মনে। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি এখন কি করেন?

—কাজ করি।

—কিন্তু আপনি তো……।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আগে করতাম না। কারণ, কাজ করার প্রয়োজন তখন অনুভব করিনি। তখন মিটিংয়ে ভাষণ দিতাম, তোমাদের কাছে জ্ঞানী-গুণী সাজতাম। কিন্তু আজ আমাকে কাজ করতে হয়। আমার ক্ষুধার অন্ন আমাকেই উপার্জন করে নিতে হয়।

—কেমন করে?

—আমি এখন ডাক্তারী করি। গরীব চাষী, খেটে খাওয়া চা বাগানের কুলিদের আমি ডাক্তার। আমি তাদের রোগে ওষুধ দিই, সেবা করি রোগীর, তারা কখনো আমাকে দুটি খেতে দেয়, কখনো সামান্য পয়সা। কেউ কিছুই দিতে পারে না, কারণ কিছু দেওয়ার সামর্থ অনেকেরই নেই। পেটের ভাত জোটে না, রোগের ওষুধ জোটাবে কেমন করে!

—কিন্তু আপনার কাজ ?

—এই তো আমার কাজ। আচ্ছন্ন-চেতনা মানুষগুলিকে জাগিয়ে তোলবার দায়িত্বভার আমার ওপর। আমরা অনেকেই আছি। দরিদ্র নিরন্ন মানুষের সেবা করি নানাভাবে। জোতদার যখন তার জমির ধান জোর করে কেটে নিয়ে যায়, তখন সে কাঁদে আর কপালে করাঘাত করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস তার হয় না, যদিও শক্তি তার আছে। আমরা তাদের দুর্বলতার কান্না মুছে ফেলতে বলি। অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বলি।

—এ পথে বিপ্লব সফল হবে ?

—নিশ্চই হবে। হচ্ছেও। নকশালবাড়ির কৃষকরা জেগে উঠেছে। দীর্ঘদিনের অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের প্রতিশোধ নিচ্ছে। আপন অধিকার বোধ ফিরে পেয়েছে তারা। তারা বুঝেছে, অধিকার তাদেরও আছে। তাই অন্যায়কারীদের শাস্তিবিধান করছে নিজের হাতে। কিন্তু প্রথমে তারা এপথে নামেনি, নামতে চায়নি। তারা সুদিনের আশায় বুক বেঁধেছিল। সুবিচার প্রত্যাশা করেছিল। ভেবেছিল, তাদের নিজেদের সরকার নিশ্চই সুবিচার করবে। অনেকদিনের অন্যায় অত্যাচার শেষ হবে। মিথ্যা, ভুল। কিছুই হল না। কিছুই পেল না তারা। মরুদ্যানের স্বপ্ন তাদের মিথ্যা হয়ে গেল। অত্যাচারী শোষক জোতদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। বাধা দিয়ে রোধ করা গেল না তাদের গতি। কারণ, এযে অধিকার রক্ষার লড়াই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এযে ন্যায় যুদ্ধ!

—আপনি এসময় কলকাতায় এসেছেন কেন ?

—টাকার জন্যে।

—টাকা ?

—হ্যাঁ। আমার সম্পত্তির ভাগের মূল্যটুকু নিয়ে যেতে এসেছি।

—কেন ?

—টাকার আজ ভীষণ প্রয়োজন। আমার সম্পত্তির কোন মূল্য নেই আজ আমার কাছে। কারণ, সম্পত্তি ভোগ করতে আমি কোনদিনই আসবো না।

—কোনদিন আসবেন না ?

—না। স্পষ্ট অথচ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

অনেকক্ষণ চুপ করেছিল সে। মানুষটাকে দেখেছিল। চিনতে কষ্ট হচ্ছিল তার।

এক সময় তিনি বলেছিলেন, চলি শংকর।

—আপনি কবে ফিরবেন ?

—কেন ?

—যদি দেখা করি।

—হয়তো দু একদিন দেরি হবে।

ঠিকানা দিয়েছিলেন। চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সেখানে স্থির-ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে। তারপর জনারণ্যে মিশে গিয়েছিল এক সময়।

পরদিন তখনো ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। তাঁর দিয়ে যাওয়া ঠিকানার দরোজায় কড়া নেড়েছিল শংকর। দরোজা খুলে তাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি ?

—আমি আপনার কাছেই এলাম।

—কেন ?

—আমি আপনার সঙ্গে যাব।

তিনি যেন তার কথাটা বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি ?

—যেখানে নিয়ে যাবেন।

—কিন্তু আমার তো থাকবার কোন আস্তানা নেই। কখনো চাষীর দাওয়ায় গাছতলায়, সমিতির ঘরে, যখন যেখানে পারি রাত কাটাই। তুমি পারবে কেন ?

—নিশ্চই পারবো। কথাটার ওপর জোর দিয়েছিল সে।

—পারবে না শংকর। চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে তোমার। বিছানায় ঘুমোও। মাটিতে শুলে অসুখ করবে। তাছাড়া খাবে কি ?

—কাজ করলে খেতে পাবো না ?

—কাজটা তুমি পাচ্ছ কোথায় ?

—কেন, কোন চাষীর বাড়ি ?

—চাষীর বাড়ি। মৃদু একটু ম্লান হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। বলেছিলেন, গ্রাম তুমি দেখেছ, চাষীর বাড়ির গোলাভরা ধানও দেখে থাকবে, কিন্তু প্রকৃত চাষী যারা তাদের বাড়ি তুমি দেখনি। তা যদি দেখতে তাহলে এমন কথা উচ্চারণ করতে পারতে না, তোমার কষ্ট হত। প্রকৃত চাষী তারা, যারা জমি চাষ করে ফসল ফলায়, রোদে জলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে কাটে দিন। তাদের ঘরের চাল ছাওয়ার জন্যে খড় জোটে না, কাজের শেষে ঘরে ফিরে জোটেনা পেট ভরা ক্ষুধার অন্ন। যাদের নিজেদের অন্ন জোটে না, তারা তোমাকে দেবে কোথা থেকে ? জোতদারের দল ওৎ পেতে বসে থাকে। চাষীর রক্তে বোনা ধান পাকামাত্র কেটে নিয়ে খামারে তোলে। শত অনুনয় বিনয় কান্না কাটিতেও কোন ফল হয় না। জোর করতে পারে না। পরের বছর বলতে পারে না, চাষ করবো না। কারণ জোতদারের

সিন্দুকে পোরা আছে বাস্তুভিটের দলিলটাও। শুধু ওখানে নয়, বাংলা দেশে, সমস্ত ভারতবর্ষের এই এক চিত্র।

—তাহলে আমি কি করবো? জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল তার কণ্ঠে।

—কি করবে? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—ভুল পথে তো আর চলতে পারি না।

—কিসের ভুল?

—আমার চিন্তার, বিশ্বাসের।

—মুখের কথা, না উপলব্ধি?

—আমি উপলব্ধি করেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, ভুল পথে আর নয়।

—মাত্র একদিনে?

—যা সত্য তা দিন ঘণ্টা মাসের হিসাবে হয় না। অন্ধত্ব দূর হয়েছে আমার। শেষ মোহটুকু ত্যাগ করতে পেরেছি আমি।

—এযে আধ্যাত্মিকতা।

—ঠাট্টা করছেন?

—না, জানতে চাইছি।

—ভুল বোঝানো হয়েছিল, শেখানো হয়েছিল, ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই মনে হচ্ছিল, ভুল করছি, ভুল পথে চলছি। ভুলে ভরিয়ে ফেলেছি জীবনটাকে, অপব্যবহার করেছি শক্তির, আত্মবিশ্বাস শিথিল হচ্ছিল। পড়েছিলাম তাঁর কথা, একজন যুবক বিপ্লবী কিনা, তা বিচার করতে কিরূপ মানদণ্ড ব্যবহার করা উচিৎ। কেমন করে পৃথক করা যায়? কেবল একটা মাত্র মানদণ্ড আছে, তা হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কিনা এবং বাস্তবে তা করছে কিনা। যদি সে এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে সে একজন বিপ্লবী, অন্যথায় অবিপ্লবী অথবা প্রতিবিপ্লবী।

যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে আজই সে বিপ্লবী ; কিন্তু আগামীকাল যদি সে তাদের সঙ্গে না মেশে অথবা সাধারণ জনগণকে অত্যাচার করে, তাহলে সে হবে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী। কথাগুলো বিশ্বাস করিনি। কিন্তু দিন দিন অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবীতে পরিণত হচ্ছিলাম। কেউ আমার বা আমাদের দলের সম্বন্ধে কিছু বলুক এটা চাইছিলাম না। সমালোচনা, রাগে অন্ধ করে তুলছিল। অত্যাচার করতে ইচ্ছা করছিল।

—কেন ?

—আমরা ভাল, আমরা ঠিক। সাধারণকে মূল্য দিতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

—তুমি ?

—আমি তো নিশ্চই। আরো কারো কারো কথা জানি। অথচ আপনাদের তিনি বারবার বলেন. 'জনগণকে চেন, জনগণকে বোঝ, জনগণকে গুরু মানো।'

—তিনি সত্য কথাই বলেন। আর এ সত্য যে কত বড় মহাসত্যের রূপ নিয়েছে তা আমাদের দেশের মানুষের দিকে তাকালে তুমিও বুঝতে পারবে। আমাদের দেশের জনগণ বলতে আমার মনে হয়, মেহনতী মানুষ। কারণ, ভারতের জনগণের বিরাট অংশ এরাই। মার্কস বলেছেন, সমাজের মেহনতী মানুষ অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীই তাদের নিরলস শ্রমের দ্বারা সমাজে নানারকমের পার্থিব সম্পদ সৃষ্টি করে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। রাজা মহারাজা নয়, মেহনতী মানুষই ইতিহাসের প্রকৃত শ্রষ্টা। অথচ এরাই মার খাচ্ছে দিনের পর দিন। কারণ, অধিকার রক্ষার যা কিছু সবই ধনীর স্বার্থে। ধনী গরীবের বিভেদের প্রাচীর দূর করার মহান দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও আজ ধনীর স্বার্থেই যত্নবান।

শংকর বলেছিল, সেইজন্যই আমি নতুন পথে যাত্রা সুরু করতে চাই। যদি মরতে বলেন, তাহলেও আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

—কিন্তু আমাদের লড়াই তো মরার জন্যে নয়, আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই। আমাদের ভালভাবে বাঁচার পথে যারা বাধা সৃষ্টি করছে, অন্যায়ভাবে যারা আমাদের অধিকার হরণ করে রেখেছে, সেই শ্রেণী শত্রুদের ধ্বংস করতে চাই, তাতে যদি মৃত্যু আসে সে তো মৃত্যু নয়, তার নাম বাঁচা। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মৃত্যুই তো গর্বের। মৃত্যুই তো তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

—আমি কী করবো ?

—কী করবে ?

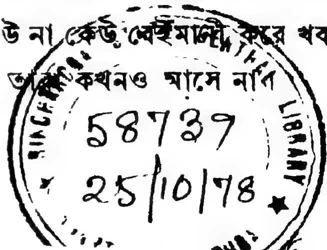
—আমাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছিল সে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি, তারপর বলেছিলেন, বেশ, যাবে।

সমস্ত গ্রামটা তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে। নীচু চালের ছোট ছোট ঘরগুলো একের পর এক ভস্মীভূত হচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখার স্পর্শ পেয়ে। চারিদিকে ধোঁয়া আর কাঠ পোড়া গন্ধে বাতাস ভারি। দূরের পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিদায়ী সূর্যের রক্তিমাভা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে শ্রীকাকুলামের আকাশে। বাদাম ক্ষেতের ঝোপে ঝোপে। বৃক্ষ শ্রেণীর ডালে ডালে।

অন্ধ্র রাজ্যে পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী দুপুরের একটু আগেই আট দশটা ঘরের সমষ্টি গ্রামটির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সংখ্যা শতাধিক। হাতে গুলিভরা উদ্যত রাইফেল। তারা নাকি খবর পেয়েছে গ্রামটার ঘরে ঘরে গেরিলারা আশ্রয় নিয়েছে।

খবর তারা ঠিকই পেয়েছিল। কেউ না কেউ বেইমানী করে খবর দিয়েছিল তাদের। নাহলে এমনভাবে তারা কখনও আসে নাকি


58737
25/10/78

গ্রামের মানুষগুলির তখনও খাওয়া দাওয়া হয় নি। তাদের খাওয়া হল না। গ্রামের এক থুত্থুরে বুড়ি হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল। বলল, পালাও তাড়াতাড়ি।

চেন্না জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—পুলিশ আসছে, পুলিশ।

খাওয়া আর হল না। ছুটে গিয়ে ঢুকতে হল জঙ্গলে। পথ করে নিয়ে পাহাড়ের একটা ফাটলের পাশে আশ্রয় নিল কজনে। সেখানে থেকেই দেখতে পেল কুকুরগুলো ঘিরে ফেলল গ্রামটা। প্রথমে লাথি মেরে ফেলে দিল মুখের খাবার। তারপরই নির্বিচারে সুরু হল মারপিট, সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পেল না। বীরের দল বীরদর্পে ঘর দোর ভেঙে তছনছ করে যাওয়ার সময় আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

অত্যাচারীর জ্বালানো অগ্নিশিখার দিকে ওরা চেয়ে রইল নির্নিমেষ। কণ্ঠে ভাষা নেই, চোখে আগুন।

একজনের কণ্ঠ শোনা গেল, এর শোধ আমরা নেবই।

চেন্নার মুখের দিকে তাকাল শংকর। ওর দৃষ্টি অগ্নিশিখার দিকে নিবদ্ধ। ও চেয়ে আছে। ও দেখছে কেমন করে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ওর আশৈশবের গ্রামখানি। যেখানে জন্মেছে, বড় হয়ে উঠেছে।

চেন্নার চোখেও কি আগুন? প্রতিজ্ঞা? ও ওকি প্রতিশোধ নিতে চায়?

দেখতে চাইল শংকর। ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, কমরেড।

চেন্না ফিরল। বলল, বল।

একটু ইতস্তত: করল শংকর। বলল, কি ভাবছিলে?

—দেখছিলাম।

—কি?

প্রশ্নটা শুনে হাসল ও। বলল, অত্যাচারীর দম্ভের প্রকাশ।

শাসক-শ্রেণীর শোষণ যন্ত্র কেমন নির্বিচারে স্তব্ধ করে দিতে চায় মানুষের জীবনযাত্রা, এটি তারই নিদর্শন। ওরা আমাদের আঘাতের পর আঘাত হেনে বিপ্লবকে শেষ করে দিতে চায়। কিন্তু ওরা জানে না যে, আরো বড় আঘাতের জন্য আমরা প্রস্তুত। কারণ আমরা জানি, বিপ্লব সফল করার পথে আরো বড় বাধা আমাদের সামনে আসবে। আঘাতও আমাদের সহ্য করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন, আত্ম বলিদানে নির্ভর হোন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করুন, বিজয় অর্জন করুন। তাঁর কথাকে সত্য বলে জেনেছি। গ্রহণ করেছি তাঁর পথ নির্দেশ। কিন্তু···

—কমরেড!

—আমি ভাবছি, আমাদের গ্রামে আসবার সংবাদ পুলিশের কাছে পৌঁছে দিল কে। পুলিশ নিজেরাই আমাদের সন্ধান পেয়েছে, এ সত্য হতে পারে না। নিশ্চই কেউ না কেউ বেইমানী করেছে। বেইমানটাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, অন্যায়ের শাস্তি কি ভীষণ। আর

—কমরেড!

—হ্যাঁ কমরেড। আমাদের চলার পথে যে বাধা সৃষ্টি করবে তাকে আমরা কিছুতেই ক্ষমা করবো না। সে যদি আমার অতি প্রিয়জন হয়, তবুও নয়। কারণ, শত্রুকে ক্ষমা করতে নেই।

কথা কটা শেষ করে দূরে আগুনের দিকে চেয়ে রইলো চেন্না রাও। তরুণ যুবক। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী জন্মেছে শ্রীকাকুলামের পাহাড়ী গ্রামটিতে। ভূমিহীন কৃষকের ঘরের সন্তান। বাবা পরের জমিতে জন মজুর খাটতেন। কিন্তু ছেলেকে অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। উপসী থেকে লেখাপড়ার খরচ চালিয়েছেন। স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে সে। দিনে পড়া, রাতে কুলীর কাজ করেছে চেন্না। পড়াশুনার খরচ চালিয়েছে কষ্টে। বিশাখা পত্তনম-এর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে

একদিন। কিন্তু গ্রামকে ভুলতে পারেনি। ফিরে এসেছিল গ্রামে।

আজই সকালে পাহাড়ী পথে চড়াই উৎরাই পার হতে হতে বলেছিল চেন্না, আমার গ্রামে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি কমরেড! দেখবে কি সুন্দর আমাদের গ্রাম। কত ভাল লাগবে তোমার। পড়াশুনার জন্য অনেকদিক আমাকে শহরে থাকতে হয়েছে কিন্তু তোমাকে সত্যি বলছি, একটি দিনের জন্যেও আমি আমার গ্রামকে ভুলতে পারিনি।

ভুলতে পারেন নি আর একজন। ফিরে এসেছিলেন গ্রামে। পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি।

ভারতের বুকে যখন মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার বিজয় বৈজয়ন্তী নকশালবাড়িতে সগৌরবে উড়েছে, তখন তার আলোড়নের মধ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শ্রীকাকুলাম জেলার সমুদ্রতটে, সোমপেটা তালুকের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—বড্ড পড়ু।

দরিদ্র কৃষকের ঘরের ছেলে। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে ফিরে এসেছিলেন গ্রামে। আপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ভাল চাকরীর মোহ ত্যাগ করে সর্বক্ষণের পেশাদার বিপ্লবী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন বড্ড পড়ুতে।

সি. পি. এম এর বর্ধমান প্লেনামের পর অন্ধ্রের বিপ্লবী কমরেডরা সি. পি. এম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন, আলাদা অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হল, কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য হিসাবে এই প্রাদেশিক নেতৃত্বের একভাগ দখল করে বসলো নাগী রেড্ডী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা।

কমরেড পি. কে (পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি), কমরেড সি. তেজেশ্বর রাও

প্রভৃতি শ্রীকাকুলামের কমরেডরা সুরু থেকেই নাগী রেড্ডীদের পছন্দ করেননি, শুধু ওপর ওপর সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং প্রথম থেকেই নিজেদের জেলায় সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের লোক নিয়ে জেলা সংগঠন করেছেন, নীচের তলায় সংগঠনগুলি গড়তে লেগেছেন।

সুরু হল রাজনৈতিক প্রচার। জোয়ার এল বড্ড পড় গ্রামে। নতুন কথা শুনলো মানুষ।

শুনলো নকশালবাড়ির কথা, চীনা বিপ্লবের অসাধারণ ইতিহাস।

একটি গ্রাম। একটি মানুষের কথা। যিনি আপোষহীন সংগ্রাম করে একটা জাতিকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়েছেন। শোষিত নিপীড়িত জনগণের জীবনে এনে দিয়েছেন মুক্তি। মানুষের অধিকারে অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে। অত্যাচারী শাসকের শোষণ যন্ত্রকে চীনের জনগণ কেমন করে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল, শুনেছে সে কথা।

শহর নয়, গ্রাম। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবই পারে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে। শহরের পথে মিছিলে শ্লোগানে নয়, শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত ক্ষেত্র গ্রাম। গ্রাম থেকে শহর।

আমাদের বেঁচে থাকা অথবা মরে যাওয়া সব কিছুই জনগণের জন্যই। বাঁচি অথবা মরি—বিপ্লব সফল করাই শেষ লক্ষ্য জীবনে বিপ্লব অপেক্ষা মহত্তর কিছুই থাকতে পারে না। আসুন, বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলি। আসুন, গণফৌজ গড়ে তুলি। চেয়ারম্যান মাও আমাদের বলেছেন, 'জনগণের সৈন্যদল ছাড়া জনগণের কিছুই থাকে না।'

গরীব চাষী, কিশোর, যুবকরা নিজেদের উদ্যোগে গড়ে তুললেন এক সংগঠন। নামকরণ করলেন ত্যাগী সঙ্ঘম—আত্মত্যাগীদের সঙ্ঘ। উদ্দেশ্য, বিপ্লবের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারবে এমন কর্মী গড়ে তোলা।

নিরাশ হতে হল না। প্রায় প্রতিটি গরীব চাষীর বাড়ি থেকে

একজন না একজন সব ছেড়ে এগিয়ে এল। এল মাঝারী কৃষকের বাড়ি থেকেও।

নাগী রেড্ডীর দল যেন এতটা আশা করে নি। তারা ভাবতে পারে নি, পি. কে-দের আহ্বানে মানুষ এভাবে সাড়া দেবে, ঘর ছাড়বে। কৃষক আন্দোলন সার্থক করতে ছুটে আসবে বুকের রক্ত দিতে।

ওরা চেয়েছিল, জমি পাওয়ার ও উচ্ছেদ বন্ধের আন্দোলনের অর্থনৈতিক জ্ঞান আগে দিয়ে, সংগঠন গড়ে তবে তাকে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি বোঝালে সে তো বুঝবেই না আর এ না করে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি দিলে নাকি হবে হঠকারিতা।

এদের সম্বন্ধে চেয়ারম্যান বলেছেন, "জনসাধারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে খুবই বিরাট সমাজতান্ত্রিক সক্রিয়তা। বিপ্লবী যুগেও যাঁরা শুধু পুরানো গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করে চলতে সক্ষম, তাঁরা এই সক্রিয়তাকে একেবারেই দেখতে পান না। তাঁরা অন্ধ, তাঁদের সামনে সব কিছু অন্ধকার। এমন কি, কখনো কখনো তাঁরা এতদূর যান যে, ভুল নির্ভুল তালগোল পাকিয়ে দিনকে রাত করে বসেন।"

তালগোল পাকিয়ে বসল নাগী রেড্ডীর দল। জনগণের এই সক্রিয়তাকে অগ্রাহ্য করতে চাইলো। ওরা বলতে লাগলো, এপথ নয়, এ পথ ভুল পথ।

ওরা চাইলো, গণ আন্দোলন মিছিলে, পোষ্টারে, সভাসমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের সময় এখনো আসেনি।

ওরা একদিন লিখলো, "এই পরিস্থিতিতে কিছুলোক নিজেরা কতক গুলি গ্রুপ তৈরী করে এবং গণ আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে জমিদারদের ও অন্যান্য শোষকদের আক্রমণ করছে। আমরা জানিয়ে দিতে চাই, গণ বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ধরণের আক্রমণ চালিয়ে সামন্তবাদ ধ্বংস করা যায় না এবং গণ বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। একমাত্র গণ বিপ্লবী

জন সমাবেশ, বিপ্লবী সংগঠন এবং গণ সশস্ত্র সংগ্রাম মারফৎই বর্তমান বড় জমিদার, বড় বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করা যায়। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা—সবই আমাদের এই সত্যই শিক্ষা দেয়। সমস্ত বিপ্লবীদের নিষ্ঠাভরে এই পথই অনুসরণ করতে হবে। এই দিক থেকে দেখলে বলতে হয়, এই সব গ্রুপের দ্বারা এই ধরণের আক্রমণগুলি মার্কসবাদ—লেনিনবাদ—মাও চিন্তাধারার বিরোধী।"

একথা বলার আগে যে ঘটনা ঘটেছিল তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে গেলে কিছুই নয়।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাস।

বড্ড পডু এবং আরো কয়েকটি গ্রাম থেকে কিছু কমরেড একটি রাজনৈতিক প্রচার মিছিল নিয়ে গরুড়ভদ্রা গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুধু পুরুষ নয়, এগিয়ে এলেন মেয়েরাও। এলেন পি, কে-র স্ত্রী কমরেড নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি।

স্থির হল, মেয়েরা থাকবেন মিছিলের পুরোভাগে। তাঁরাই হলেন প্রধানা।

শান্তিপূর্ণ ভাবে এগিয়ে চলল মিছিল। হাজির হল গরুড়ভদ্রা গ্রামের সীমান্তে।

জমিদার গুণ্ডার দল নিয়ে আগে থেকেই তৈরি ছিল। মিছিলকে বাধা দিল ওরা। বলল, মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

—কেন? জানতে চাইলেন ওঁরা।

ওরা বলল, আমাদের গ্রামে মিছিল প্রবেশ করতে আমরা দেব না।

—কিন্তু কেন প্রবেশ করতে দেবেন না তা তো বলবেন? শান্তভাবে জানতে চাইলেন ওঁরা।

—মালিকের হুকুম। তাঁর এলাকায় তিনি মিছিল ঢুকতে দেবেন না।

—কেন?

—তাঁর ইচ্ছা।

—এ তাঁর অন্যায় ইচ্ছা। গ্রামের তিনি জমিদার হতে পারেন কিন্তু নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

—তোমরা ফিরে যাবে কিনা?

—আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য তো আসিনি। কোন ভয় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। গুণ্ডাদের অশ্লীল কথাবার্তায় ওঁরা ছিলেন ধীর, স্থির শান্ত। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ওরা। অন্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো মিছিলের ওপর। সুরু হল মারধোর। কারো মাথা ফাটলো, কারো বা হাত পা। মেয়েরাও রেহাই পেলেন না। কমরেড নির্মলাকে অপমান করল পশুর দল।

গরুড়ভদ্রার মাটিতে ঝরে পড়লো মিছিলের মানুষগুলির রক্ত। তবু এগিয়ে চললেন ওঁরা। একে অন্যকে তুলে নিলেনা, কিন্তু রুদ্ধ হল না চলার গতি।

গতব্য স্থলে পৌঁছে দাঁড়ালেন ওঁরা। আহতদের শুশ্রূষায় মন দিলেন।

ততক্ষণে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সংবাদ। যে মানুষটি কোনদিন ওঁদের দিকে ফিরে চাননি, সংবাদ শুনে তিনিও ছুটে এলেন। এ অন্যায় - অত্যাচার। এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই।

পাঁচ সাতখানা গ্রামের মানুষ ছুটে এল। খুঁজে ফিরলো জমিদার আর ভাড়া করা পশুগুলোকে।

কিন্তু কোথায় তারা? তারা তখন পালিয়ে গেছে। থানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে শান্তি রক্ষকদের কাছে।

ওরাও ফিরে গেল। কেটে নিয়ে গেল জমিদারের ফসল। যে ফসল ন্যায্য অধিকারীদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল জমিদার।

নালিশ করল জমিদার। ওয়ারেণ্ট বেরুলো প্রায় সমস্ত কমরেডদের নামে। শান্তির দূত পুলিশের দল নিরীহ জমিদারকে বাঁচাবার জন্তে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত খুঁজে ফিরতে লাগলো ওঁদের।

ওঁরা সমতল ছাড়লেন। ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে আশ্রয় নিলেন পাহাড়ে জঙ্গলে। শ্রীকাকুলামের পর্বতে গেরিলা স্কোয়াড গঠনের প্রাথমিক ভিত্ তৈরী হল ওয়ারেণ্ট-বেরুনো কমরেডদের নিয়ে।

নতুন পথে যাত্রা সুরুর শপথ নিলেন ওঁরা। নাগী রেড্ডীদের সঙ্গে ছিঁড়ে ফেললেন সমস্ত সম্পর্ক।

ওরা কিন্তু তখনও চীৎকার করে চলেছে, সর্বনাশ হল। ভুল হল। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই আর থাকলো না।

এ মাও-বিরোধী, চে গুয়েভারার লাইন। গেরিলা লড়াইয়ের সময় এখনও আসেনি। আগে জানো, শেখো, তারপর যা কিছু করার ভেবে চিন্তে করো।

অথচ দুনিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে মার্কস থেকে সুরু করে চেয়ারম্যান পর্যন্ত প্রত্যেক মার্কসবাদী শিক্ষাগুরু তাদের জীবনে একটিমাত্র ঘটনা থেকে সার্বজনীন সত্যের সাধারণ সূত্রীকরণ করেছেন। মার্কসের জীবনে প্যারী কমিউন, লেনিনের জীবনে ১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী পাদ্রী গ্যাপনের ঘটনা, চেয়ারম্যানের জীবনে হুনানের কৃষক আন্দোলন—এঁদের সকলের জীবনেই একরম দৃষ্টান্ত আছে।

কিন্তু ওরা তা মানতে চায় না। আগে কর, তারপর শেখো অর্থাৎ করে শেখো বা করতে করতে শেখো। কিছু না করলে যে কিছু শেখা যায় না, ওরা তা মানতে চায় না। ওরা চায়, শিখে করতে। কিন্তু কোন্ পথে? সে সত্য জানলেও ওরা স্বীকার করতে চায় না। যা সত্য, অবশ্যম্ভাবী, তা ওরা মানতে ভয় পায়।

কারণ, সত্যকে স্বীকার করতে যে সাহস এবং বিশ্বাসের প্রয়োজন,

সে সাহস এবং বিশ্বাস ওদের নেই। মানুষকে ওরা অবিশ্বাস করে। আমিত্বের অহংকারটুকু বড় উগ্র ওদের জীবনে।

কিন্তু ওরা ?

ওরা সকলের, সমস্ত মানুষের।

শ্রীকাকুলামের বিপ্লবী কবি অমর শহীদ কমরেড সুব্বা রাও পাণিগ্রাহী বললেন :

যারা খেটে খায় আমরা তাদেরই
আমরা কমিউনিষ্ট,
আমাদের মত মানো বা না মানো
আমরা রবো সেই 'ইষ্ট'।
আমরা কমিউনিষ্ট.........

ন্যায়ের পতাকা তুলেছি আমরা
অন্যায়েরই যম,
বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে লক্ষ্যে
চলেছি জোর কদম।
আমরা কমিউনিষ্ট... ....

মোদের ঝাণ্ডা লালে লাল খুনে
মেহনতী জনতার
দু'চোখে স্বপ্ন শত শহীদের
চলেছি দুনিবার।
আমরা কমিউনিষ্ট .....

আমাদের ভাবে আমরা ভাবুক
তোমাদের ভাব মানি না
ঘুষ খেয়ে মোরা নোয়াইনা মাথা

নিজেরে ঠকাতে জানি না,
আমরা কমিউনিষ্ট.........

জনতারে নিয়ে চলেছি এগিয়ে
লক্ষ্য করিব জয়,
সমাজেরে মোরা ভাঙিয়া গড়িব
নির্মম নির্ভয়।
আমরা কমিউনিষ্ট.........

হাত দিয়ে, বলো, সূর্যের আলো
রুধিতে পারে কি কেউ ?
আমাদের ধ'রে ঠেকানো কী যায়
জন জোয়ারের ঢেউ ?
আমরা কমিউনিষ্ট.........

তোমাদের মত আমরা টাকায়
বাজারে করিনা বেসাতি,
নির্ভীক মোরা, পীড়নের ভয়ে
হবনা শোধনবাদী।
আমরা কমিউনিষ্ট.........

থাকব না মোরা নিজেদের জিলা
নিজেদের জাতি নিয়ে
সারা দুনিয়ার মজদুর মোরা
বাঁধিব ঐক্য দিয়ে।
আমরা কমিউনিষ্ট......

এর পরই কমরেড কৃষ্ণমূর্তি গেলেন উত্তর বাংলায়। দেখলেন নকশালবাড়ি। যে নকশালবাড়ির লাল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। সর্বহারা শ্রেণী খুঁজে পেয়েছে পথ। মুছে দিয়েছে শুধুমাত্র একটি রাজ্যের সীমারেখা।

দেখা করলেন শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদারের সঙ্গে।

বললেন, আমি শুধু আপনাকে দেখতে আসিনি কমরেড। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে শ্রীকাকুলামের মানুষ। আপনি আমাদের পথ নির্দেশ করুন।

পি, কে-র কথা শুনে কমরেড উজ্জ্বল দুই চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে ছিলেন মুখের দিকে। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, পথ নির্দেশ তো তিনিই দিয়েছেন—"একশ বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্থ চীন জাতির সবচেয়ে সেরা ছেলেমেয়েরা, একজন পড়ে যাবার পর অন্যজন ফাটলে পা বাড়িয়ে দিয়ে লড়াই করে গেছেন,—জীবন বলি দিয়েছেন সেই সত্যের সন্ধানে, যা দেশ এবং জনগণকে মুক্ত করতে পারে। এই ইতিহাস আমাদের কণ্ঠে গান এনে দেয়, চোখে জল আনে।

"যেখানে অত্যাচার সেখানেই আত্মত্যাগ, মৃত্যু সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা। তাই বিপ্লব সফল করতে হলে বিপ্লবী কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে, স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে নামের আকাঙ্খা, ত্যাগ করতে হবে মৃত্যু ভয়।

"চিনতে হবে, কে শ্রেণীশত্রু, কে নয়। ভুল করে যেন নিজের মিত্রকে শত্রু না ভাবি। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণ ভুল করবেন। কিন্তু সেই ভুলকে ভুল বলেই গ্রহণ করতে হবে আমাদের। তাঁদের ভুলের জন্যে তাঁদের প্রতি আমরা যেন অবিচার করে না বসি, শাস্তি দিতে উদ্যত না হই। কারণ, আমাদের শত্রু এবং দেশের শত্রু সাধারণ মানুষ নন। শত্রু শোষক শ্রেণী। এ যুদ্ধ আমাদের জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিজয়ই হল দেশের জনগণের

মহান ভবিষ্যতের আধার। অত্যাচার, উৎপীড়ন আর শোষণ পাহাড় প্রমাণ হয়ে আছে। অত্যাচার, উৎপীড়ন আর শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করার মহান এবং পবিত্র দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। হাজার হাজার বীর বিপ্লবীর বুকের রক্ত আমাদের ঢেলে দিতে হবে। দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রকৃত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ।"

একদিন আমরা মনে করতাম, শত্রু আমাদের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। ইংরেজকে দেশছাড়া করতে পারলেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে যারা দিনাতিপাত করে, সমাজের সর্বহারা শ্রেণী সুদিনের মুখ দেখতে পাবে। পাবে ক্ষুধায় আহার, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ।

শত্রু আমাদের ইংরেজ নয়—শত্রু ইংরেজের শাসন পদ্ধতি; এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রামই হল স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আজ দেশের শত্রু, জাতির শত্রু ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সে শাসন পদ্ধতির এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। কায়েমী স্বার্থ আজ জাঁকিয়ে বসেছে। যাঁরা একদিন বুলেটের কথা বলতেন, আজ তাঁরা ব্যালটের পথ ধরেছেন। গণ আন্দোলন, নির্বাচন লড়াইয়ে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

শ্রেণীশত্রু কারা ?

ধনী জমিদার, জোতদার, দালাল, দেশের ধনীক সমাজ। শুধু এরাই না, এদের যারা সাহায্য করে, হাত মিলিয়ে চলতে চায়, তারা নয় কেন ?

সর্বহারা শ্রেণীর অধিকার হরণ করে যারা দিনের পর দিন অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত করছে, শুধু তারা ?

না,—যারা আন্দোলনের নামে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে তারাও।

তাঁর অমর বাণী হচ্ছে :

তিক্ত আত্মত্যাগ সাহসী সঙ্কল্প আনে,
যা নতুন আকাশে সূর্য ও চন্দ্রকে উদিত করার
সাহস দেয়।

দিনের পর দিন আত্মত্যাগে, সঙ্কল্পে অটল সর্বহারা শ্রেণী। হয় মৃত্যু অথবা মুক্তি।

এখনো আমরা প্রস্তুত হতে পারি নি।…ট্রেনিং না নিয়ে লড়াই করা সঠিক নয়।…এখনো লড়াই সুরুর সময় হয় নি।

সমানে সাবধান করতে লাগলো নাগী রেড্ডীর দল। বলল, যুদ্ধ জিনিসটা ছেলেখেলা নয়। প্রয়োজন ট্রেনিংয়ের। যুদ্ধ শিখে তবেই যুদ্ধ করতে হয়।

না,…যুদ্ধ করেই যুদ্ধ শিখতে হয়। ট্রেনিংয়ের চাঁদমারি নয়, শত্রুর বুকই হল বন্দুকের নিশানা অভ্যাসের চাঁদমারি।

অবশেষে ওরা সত্য কথাটা প্রকাশ করলো। বলল, জঙ্গী আন্দোলনের প্রয়োজন কী? সরকারী অত্যাচার কিছুটা শিথিল হয়েছে। সুতরাং আইনসঙ্গত ভাবেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিৎ। জনগণের কাছে মজুরীর হার বৃদ্ধি, শ্রমিকদের সমস্যা এবং খাদ্য সমস্যা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পথে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সংগঠিত করে আন্দোলন।

পুলিশের অত্যাচার কিছুটা কমলেও বন্ধ হয়নি। সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, যাকেই তাদের সন্দেহ হচ্ছে নাকালের একশেষ করছে। তল্লাসীর নামে তছনছ করে দিচ্ছে সাজানো সংসার।

কিন্তু ওরা বলল, যাদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে, সেই জমিদার জোতদারদের দু চারজনকে শাস্তি

দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু পুলিশের গায়ে হাত তোলা সমীচিন হবে না, কেন না পরিণতি তাহলে অত্যন্ত সাংঘাতিক হবে।

ভয়! শুধু ভয় নয়, তোষণ নীতি। জনযুদ্ধের পথকে নানা ভাবে ভিন্নমুখি করতে চাইলো ওরা।

কমরেড চারু মজুমদার বললেন, গেরিলা দল গঠন করে এখনি সংগ্রাম সুরু করুন।

বেকায়দায় পড়ে অনেক মিথ্যা ভাষণের পর নাগী বেড্ডীর দল বলল, জমিদার শ্রেণীকে নির্মূল করাই উচিৎ।

জনযুদ্ধের নামোল্লেখ ওরা করল না। কারণ, বিপ্লবকে ওরা ভয় পায়। ওরা সুখে শান্তিতে থেকে সর্বহারার গণবিপ্লবের স্বপ্ন দেখে শুধু। সস্তা হাত তালির ভক্ত ওরা।

ওরা বাবু কমিউনিষ্ট।

১৯৬০ সালের ২৫শে নভেম্বর। ওয়ারেন্ট-বেরুনো কমরেডদের নিয়ে গঠিত গেরিলা বাহিনী একের পর এক অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন। শ্রেণী শত্রুর বুকের রক্তে মুছে দিতে লাগলেন বহু দিনের অন্যায়, পাপ আর শোষণের ইতিহাস। অন্ধকার রাত্রিশেষে উঠলো দিনের সূর্য। লালে লাল হয়ে গেল সমস্ত শ্রীকাকুলাম।

ওঁরা মুক্ত কণ্ঠে গাইলেন :

"উঠে দাঁড়াও হে বীর আদিবাসী,
জাগিয়ে তোল তোমার পেশী বহুল শরীর,
ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়
শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে।"

সেই দুরন্ত আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারল না মানুষ। তারা

চিনে নিল কে শত্রু, কে মিত্র। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে জঙ্গী কৃষকদের দল এগিয়ে এল। বলল, আমরা আমাদের বাঁচার লড়াইয়ে লড়তে চাই। আমরা মুক্তি চাই, চাই আলো। নতুন দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলে যেতে চাই আমরা।

আমরা সংগ্রাম করবো বাঁচবো অথবা মরবো এ আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে। আমরা শপথ নিলাম।

শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মেয়েরাও এগিয়ে এল। যোগ দিল গেরিলা দলে। যে হাতে তারা সংসারের কাজ করেছে, স্বামী সন্তানের সেবা করেছে, সে হাতে তুলে নিল অস্ত্র।

প্রথম পাহাড় এলাকায়, তারপর সমতলেও ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধ। যেখানে অত্যাচার, সেখানেই প্রতিরোধ। শ্রেণী শত্রুর বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠতে লাগল মাটি। গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মানুষ। তাদের জন্য অত্যাচার সহ্য করল।

১৯ শে মে ১৯৬০ সাল। ইছাপুরম তালুকের বুড়িবাংকা গ্রামে গেরিলা আক্রমণ হল। শুধু বুড়িবাংকার মানুষ নয়, খামার বাড়ির চাকররা পর্যন্ত যোগ দিল এ লড়াইয়ে।

জমিদারের পোষা গুণ্ডার দল শত চেষ্টাতেও বাঁচাতে পারল না। নিহত হল দুজন জমিদার। জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল জনতা।

বুড়িবাংকার ঘটনার পর শ্রেণী শত্রুর দল মরিয়া হয়ে উঠল। তারা বুঝতে পারল দিন ফুরিয়ে আসছে তাদের। বহুদিনের অন্যায় আর পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হবে।

তাই মরার আগে মরণ কামড় দিতে চাইল তারা। জুটে গেল এক দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক। তার প্রয়োজন টাকা। অনেক-অনেক টাকা। টাকার বিনিময়ে সব কিছু করতে সে প্রস্তুত।

শ্রেণীশত্রুর দল অকাতরে ব্যয় করতে লাগলো অর্থ। বাঁচতে

গেলে অর্থের মায়া করলে চলে না। অর্থের বিনিময়ে দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক নিয়মিত পৌঁছে দিতে লাগলো খবরাখবর।

তারপর ?

২৭শে মে ১৯৬০ সাল। রক্তের অক্ষরে লেখা আছে একটি দিন। একটি দিনের ইতিহাস।

প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সমস্ত শ্রীকাকুলাম। সারা ভারতের নিপীড়িত জনতা। শহীদ কমরেডদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। ক্ষমা নেই। মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবই। অত্যাচারীর দল দেশের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

২৭শে মে কমরেড পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি আর ওঁর ক'জন সাথী শ্রুঙ্গারাপুনর সিংহলু, জুম্মা গোপাল রাও, তামাড়া চিন্না বাবু, রামচন্দ্র প্রধানো, বায়িনা পাল্লে, পাপা রাউ আর নিরঞ্জন রাও সোমপেটা (কাঞ্চিলী) ষ্টেশনে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র পুলিশের দল রাইফেল উঁচু করে ওঁদের ঘিরে ফেলল।

ওঁরা নিরস্ত্র, তবু ভয় পেলেন না। বুঝলেন, বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। মাথা উঁচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সকলে।

ওঁদের সকলকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধলো পুলিশ। হুকুম দিল, চল।

কিশোর নিরঞ্জন সকৌতুকে জানতে চাইল, কোথায় স্যার ?

—যমের বাড়ি। খিঁচিয়ে উঠল পুলিশ অফিসার।

রামচন্দ্র ঠাট্টা করল, কমরেড, স্যার আমাদের ওঁর শ্বশুর বাড়ি নিয়ে চলেছে।

—এই, চোপ্। ধমকে উঠল পুলিশ অফিসার। চাপড় মারল গালে।

রামচন্দ্র গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, স্যার আপনার হাতটি বড় কোমল। ইচ্ছা করছে অন্য গালটা এগিয়ে দিই।

শ্রুঙ্গারাপুনর সিংহলু মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, কমরেড, এসময় কৌতুক করতে ভাল লাগছে তোমাদের?

হেসেছিল দুজনে। তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, এমন আনন্দের সময় কৌতুক করবো না তো কখন করবো বলতে পারেন কমরেড।

—কিন্তু…।

—কমরেড আমরা জানি, যখন আমরা জন্মলাভ করি তখন নিশ্চয়ই আমাদের মরতেও হবে। তিনি বলেছেন, মানুষের জীবনে মৃত্যু একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। সেইজন্য জীবনকে জনগণের সেবায় অর্পণ কর—জনগণের শত্রুদের সেবায় নয়। জনগণের সেবার জন্য যে মৃত্যু সে মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী। আর জনগণের সেবায়—বিমুখ জনগণের শত্রুর সেবায় যে মৃত্যু, তা পাখীর পালকের চেয়েও হাল্কা।

কমরেড সিংহলু তেমনি মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, আমাকে তোমরা ভুল বুঝনা কমরেড। মৃত্যুর জন্য তোমাদের মত আমিও এতটুকু বিচলিত নই। এই মহান সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দেওয়া তো গর্বের। শুধু আফশোষ থেকে গেল, যে ঘৃণিত পুলিশের দল আমাদের হত্যা করবে বলে নিয়ে চলেছে, তাদের একটাকেও শেষ করতে পারলাম না।

তামাভ চিন্নাবাবুর কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, এ আফশোষ আপনার থাকবে না কমরেড, জনগণ নিশ্চই এর প্রতিশোধ নেবে। গুণগুণিয়ে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ :

তরবারির আঘাত যতই লাগুক,
খুনের নদী যতই বহুক,
উঁচিয়ে-ধরা বন্দুক
কিছুতেই নীচে রাখব না।

তাতাজী মুকুল কথার প্রধান গায়ক, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গান গেয়ে উঠেছিলেন। এতটুকু কাঁপেনি কণ্ঠ, তাল কাটেনি। যাঁর সঙ্গীত নৃত্য-অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস প্রচারিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ জনগণকে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁর শেষ গান, শেষ কণ্ঠধ্বনি শুনলো রাতের আকাশ, অসংখ্য তারকারাজি, নিস্তব্ধ বনানী! আর···

পুলিশ অফিসার ধমকে উঠল, এই গান থামাও।

সিংহলু বললেন, আমরা থামতে জানিনা। আপনি গান করুন কমরেড। আপনার গান শুনেছে অন্ধ্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ, চাষের কাজের ফাঁকে শুনেছি আমিও। সেদিন হাতে কাজ ছিল, তাই মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে গান শুনতে পারিনি। আজ শুনবো

সকলে সমস্বরে বলল, আমরাও শুনবো।

কমরেড চিন্নাবাবু গান ধরলেন :

বিপ্লবের শিখা দাউ দাউ করে
জ্বলছে,
চিং কাং পাহাড়ের পথ আরও
চওড়া, আরও বিস্তৃত হয়ে
উঠছে;
বিপ্লবের তরণী পাল তুলে
দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে,
চিং কাং পাহাড় থেকে সারা
দুনিয়ায়,
জয় থেকে আরও বড় জয়ের দিকে।

সামনেই জলগুর-কোটা গ্রাম

পুলিশের দল দাঁড়াল। ওঁরাও দাঁড়ালেন।

কমরেড কৃষ্ণমূর্তির সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশ অফিসার। বলল, তোমাদের এখানে কেন নিয়ে আসা হল জানো?

ধীর স্থির শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বললেন, জানি।

—জানো ?

—জানি বৈকি। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন তিনি, তোমরা হয়তো ভেবেছ আমাদের হত্যা করে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবে। তা যদি ভেবে থাক, তাহলে বলছি, ভুল ভেবেছ তোমরা। আমি বলছি, আমাদের হত্যা করে তোমরা বিপ্লবের গতিরোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষে যে সশস্ত্র বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে তাকে ধ্বংস করতে পারে, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই।

হেসে উঠল পুলিশ অফিসার। বলল, দেখা যাবে।

উদ্যত রাইফেলের সামনে বুক পেতে দাঁড়ালেন ওঁরা।

পুলিশ অফিসার বলল, তোমাদের মধ্যে কেউ বাঁচতে চাও না ?

ওঁরা বললেন, জাতস্য মরণম্ ধ্রুবম্'।

ভোরের আলো ফুটেছে। জলন্তর-কোটার গাছের পাতায় পাতায় নতুন দিনে আলো। ওঁদের নির্ভিক বলিষ্ঠ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল :

'কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ'।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

'আমার ভারতবর্ষে বিপ্লব এগিয়ে যাবে'।

'লালঝাণ্ডা জিন্দাবাদ'।

'বহুদিন--বহুদিন বেঁচে থাকুন আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড মাও।'

শ্লোগান ধ্বনিতে জেগে উঠল জলন্তর-কোটার মানুষ। তারপর অসংখ্য গুলির শব্দ। আগুন ধোঁয়া-বারুদের গন্ধ। ওঁদের দেহগুলি এক এক করে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে

শ্রীকাকুলামের বিপ্লবী আকাশ বাতাস জেগে উঠল সেইক্ষণে।

হত্যার প্রতিশোধ হত্যায়।

গ্রামের ঘরগুলো তখনও জ্বলছে। আগুন কিছুটা ম্লান। ওরা দাঁড়িয়ে আছে কজন। দেখছে। উত্তাপ নিচ্ছে আপন আপন বুকে।

সন্ধ্যা নেমেছে। অন্ধকারটা আরো গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও কারো মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না।

চেন্না রাও-এর কণ্ঠ শোনা গেল, কমরেড।

শংকর ওর দিকে ফিরল। বলল, বল।

—আমাদের একবার গ্রামে যেতে হবে। কুণ্ঠিতভাবে বলল ও।

—চল।

চেন্না রাও-এর কণ্ঠ তেমনি কুণ্ঠিত। বলল, জানি এখন আমাদের ওখানে যাওয়া না যাওয়া দুই-ই সমান। তবু যাওয়া কর্তব্য। গ্রামবাসীকে সাহায্য করার একটা দায়িত্ব আছে আমাদের। সে দায়িত্বটুকু আমাদের পালন করতেই হবে।

—আমিও যাব। বলল শংকর।

—নিশ্চই যাবে। আবার কুণ্ঠিত হল তার কণ্ঠ। বলল, কিন্তু কমরেড এই মুহূর্তে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ···

বাধা দিয়ে শংকর বলল, আমি কি কোন কাজে আসতে পারি না?

নিশ্চই পার। কিন্তু কদিনে তুমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছ। তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

—আমার তো মনে হয়···

—তোমার কথাকে অমান্য করতে পারি না। কিন্তু তুমি আমাদের অতিথি। তাছাড়া এ স্থান এখনও তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

শয়তানের দল রাত্রে বেরুতে সাহস করে না সত্য কিন্তু আজ কোথাও না কোথাও অপেক্ষা যে না করছে একথা বলা যায় না। তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। একজন এখানে থাকবে। আমরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি।

—তোমরা যখন আমাকে সঙ্গে নেবে না, তখন আমি একলাই থাকতে পারবো।

—কিন্তু—

—মিথ্যা আমার কাছে কারো থাকবার প্রয়োজন নেই। বরং গেলে গ্রামবাসীদের কোন না কোন সাহায্যে লাগতে পারবেন।

—বেশ

শংকরের যুক্তিটাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিল চেন্না রাও। অন্ধকার পাহাড়ী পথে একে একে নীচের দিক নেমে গেল সবাই।

নীচের গ্রামটার দিকে চাইলো সে। গ্রামের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু আগুন। অঙ্গার।

নিজের দিকে চাইল সে।

বাংলা নয়, অন্ধ্র শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একাকী। মাথার ওপর মুক্ত আকাশ। অসংখ্য তারকা মণ্ডলী। কিন্তু নিজেকে তার একাকী বলে মনে হল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, বিপদসঙ্কুল পর্বতের ওপব রাত্রির ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেও একাকী বলে মনে হল না। মনে হল শ্রীকাকুলামের পার্বত্য শ্রেণী তো তার পাশে রয়েছে। সে তো একা নয়।

সে আজ আর আলাদা একজন নয়। যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত সর্বহারা মানুষের একজন। সে নিজের নয়, সকলের। সে মানুষের।

এই সত্য উপলব্ধি করে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে অনেক পরে।

ভুল ভেঙেছে তার। মিথ্যার খোলস ছিঁড়ে ফেলেছে।
জেগে উঠেছে!

১৯৬৭ সাল। নাম শংকর নাথ চৌধুরী। চির বেকার নয়, চাকরী যাওয়া একটা বেকার যুবক। চাকরী গিয়েছিল রাজনীতি করার অপরাধে। জেলখাটা আসামীকে মাড়োয়াড়ী কোম্পানী চাকরী থেকে বরখাস্ত করেছিল। ইউনিয়ন ছিল কিন্তু অন্য পার্টির কর্মীর চাকরী যাওয়ায় কিছু এসে যায়নি তাদের। যদিও সে ইউনিয়নের মেম্বার ছিল। কিন্তু পার্টিবাজি বড় ভয়ঙ্কর!

তবু অনেক চেষ্টা করেছে সে, যাকে পেয়েছে ধরেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কী আপনাদের কেউ নই?

শুনেছে, কে বলল, তুমি আমাদের কেউ নও? নিশ্চই তুমি আমাদের একজন।

—তাহলে আমার যে এভাবে চাকরী গেল, এর জন্যে আপনারা কিছু করলেন না কেন?

—কেন, আমরা তো প্রতিবাদ করেছি। ইউনিয়নের তরফ থেকে মালিক পক্ষকে জানিয়ে দিয়েছি এমন অন্যায় আমরা বরদাস্ত করবো না।

—ব্যাস? এতেই আপনাদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল?

—আর কি করতে পারি বল?

—আর কি কিছু করার নেই?

তার তীক্ষ্ণ প্রশ্নের সামনে পড়ে একটু ইতস্তত: করেছিলেন ইউনিয়নের সম্পাদক। দামী সিগারেট টানতে টানতে গম্ভীর ভাবে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চিন্তা করেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন, পথ

অবশ্য একটা আছে। কিন্তু তাতে প্রতিকার কতটুকু সম্ভব হবে জানি না। হয়তো অন্য কিছু হয়ে যেতে পারে।

—অন্য কিছু ?

—হ্যাঁ। বলেছিলেন, এভাবে তোমার চাকরী যাওয়াটা যে অন্যায়, আমি কেন, তোমার সহকর্মীরাও তা স্বীকার করে। আর অন্যায়ের প্রতিকারের একমাত্র পথ ধর্মঘট। আমরা তোমার জন্যে ধর্মঘট করতে পারি। তুমি যদি বল তাহলে না হয় আমরা তাই করবো।

আশ্চর্য হয়েছিল সে। শুধু ইউনিয়নের সম্পাদক নন, একজন নামী শ্রমিক নেতা রূপেও তিনি পরিচিত। তাঁর মুখে অমন অশোভন কথা শুনে, তার মনে হয়েছিল সে কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে। তবু বলেছিল, আমি বললে আপনারা ধর্মঘটের পথে নামবেন ?

—নামতে হয়। বলেছিলেন তিনি। কারণ, এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, তোমাব চাকরীটা যাতে থাকে তার জন্যে সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। তোমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করার পক্ষে মালিকের যুক্তিও কম নেই। প্রথমত, তুমি বিনা নোটিশে ছমাস কামাই করেছো। যদিও ডাক্তারী সার্টিফিকেটের জোরে ছমাস কেন, এক বছর কামাই করা কর্মীর কাজ আমরা ইতিপূর্বে আদায় করেছি। কিন্তু তুমি যে জেলখাটা আসামী।

—আমি আসামা। যেন আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

মৃদু হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, না-না, সত্যি তুমি তা নও। তুমি রাজনৈতিক বন্দী। আমি জানি, তুমি রাজনৈতিক কারণে ধৃত হয়েছিল। কিন্তু মালিক বলছে, তুমি আসামী। আসামী না হলে কি কারো জেল হয় ?

—চমৎকার! বিদ্রূপ করে উঠেছিল সে।

তিনি যেন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। বুঝিয়ে ছিলেন, আমি মালিকের

এই আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদ করেছিলাম। তাকে বুঝিয়েছিলাম, আসামী আর রাজনৈতিক বন্দী এক নয়। অনেক তফাৎ দুজনের মধ্যে। চোর ডাকাতকেই আসামী বলা হয়।

—তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন আপনার কথা?

—বুঝলেন বৈকি। আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি।

কিন্তু আমার চাকরীটা আদায় করতে পারলেন না।

—না, হতাশভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি। রাজপুতের গোঁ আমি কিছুতেই পাল্টাতে পারলাম না। ওরা দেখছি একবার যা গোঁ ধরে, পাল্টানো যায় না। রাজপুতরা·· ······

বাধা দিয়েছিল সে। বলেছিল, মাড়োয়াড়ী নয়, বলুন ধনীর স্বেচ্ছাচার। আর এই স্বেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় মাথা গলিয়ে দিচ্ছেন আপনারা। মুখে বলছেন, শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হও। আর তার সঙ্গে চালাচ্ছেন ধনীক তোষণ নীতি। বলবেন, তোমার জন্যে আমাদের ধর্মঘট করতে হবে। একটা লোকের জন্যে অনেকগুলো লোকের পেটকে মারতে হয়। সেটা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। আমিও জানি, সেটা করা উচিৎ নয়। একজনের জন্যে শতজনের ক্ষতি করা ঠিক হবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই, এ কি মালিকের অন্যায়, না আপনাদের কারসাজি?

চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, হোয়াট ডু ইউ মিন?

—আস্তে, চিৎকার করলে শুধু নিজের গলাটাই ভাঙবে, লাভ কিছু হবে না। আমি জানি, এর মূল কোথায়, কি চান আপনারা। শোষিত সর্বহারাদের কথা মুখে বলেন আর সেই সঙ্গে ধনতন্ত্রকে প্রশ্রয় দেন। কারণ সামন্ততন্ত্রের উত্তরাধিকারী আপনারা। কখানা মার্কসবাদের বই পড়ে কমিউনিষ্ট হয়েছেন। লিডারী করছেন। ইউনিয়নের নেতা সেজে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মালিক পক্ষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। যাদের নেতা সেজেছেন তারা মরলো কী বাঁচলো, তাতে আপনাদের এতটুকু যায় আসে না। আপনারা শুধু দেখেন, শ্রমিক

ক্ষেপিয়ে আপনাদের পজিশন বজায় রাখা টাটা-বিড়লাদের গায়ে আঁচটুকু যেন না লাগে।

আবার তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, তুমি আমাকে অপমান করছো।

—অপমান নয়, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আপনাদের এই ধোঁকাবাজির দিন একদিন না একদিন নিশ্চয়ই শেষ হবে সর্বহারা শোষিত মানুষ একদিন না একদিন তাদের প্রকৃত নেতাকে চিনতে পারবে। সেদিন তারা আপনাদের মত মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে না।

– সেদিন কোনদিনই আসবে না।

—নিশ্চয়ই আসবে। রাতের অন্ধকার দিনের সূর্যের পথরোধ করতে পারে না। সূর্য তার নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকই পূবের আকাশে রক্তচ্ছটায় উদিত হয় প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ একদিন নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার জবাব চাইবে সেদিন। কী জবাব সেদিন তাদের দেবেন?

—অশিক্ষিতের দল প্রশ্নের ভাষা খুঁজে পেলে তো।

সত্যি কথাই বলেছেন গণ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন সেই পথ থেকে আপনারা তাদের কৌশলে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। মানুষের জাগরণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছেন। কারণ, শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধত্ব ঘোচায়। সেই শিক্ষার কোন ব্যবস্থা না করে আপনারা অন্ধ করে রাখতে চান মানুষকে। কারণ, আপনাদের প্রতি তাদের অন্ধত্ব বজায় থাকবে। তারা বিচার করবে না ভাল মন্দ বুঝবে না শুধু ফল ভোগ করবে। আপনারা বলবেন, ত্যাগ স্বীকার না করলে কিছু হয় না। ত্যাগের মহত্ব, মিথ্যার ছলনায় বোঝাবেন তাদের। কিন্তু কতদিন? কতদিন এই ধোঁকাবাজি চলবে আপনাদের? কতদিন তারা শুধু আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে আপনাদের গালভরা কথাকে বিশ্বাস করবে? গলায় ফুলের

মালা পরিয়ে দিয়ে হাততালি দেবে? মরবে। বাঁচার জন্য লড়াই করবে না?

চুপ করেছিল সে। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন। অপমানে রাঙা চোখ দুটো দিয়ে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার দল তো বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে। আমরা না হয় সুবিধাবাদী, কিন্তু তোমরা?

—আমরা?

—তোমরা সর্বহারাদের জন্য কি দায়িত্ব পালন করছো? কেমন শিক্ষার ব্যবস্থা করছো? কোন্ পথে জাগাচ্ছো তাদের?

উত্তর দিতে পারেনি সে। চুপ করেছিল। যাদের সে সমালোচনা করল তাদের চেয়ে তারাও তো কিছু মাত্র ভিন্ন নয়। নামটিতে আলাদা হয়েছে কিন্তু কিছু করেছে কি?

সেই সভা, শোভাযাত্রা আর কথার ফুলঝুরি।

আলাদা কোথায়?

কোন্ নীতিতে?

একদিন কথায় কথায় জানতে চেয়েছিল শংকর, আমি এখানে কি কাজ করবো?

—মাষ্টারী করবে তুমি, বলেছিলেন তিনি।

—মাষ্টারী? অবাক হয়েছিল শংকর।

—হ্যাঁ মাষ্টারী। পড়াবে ওদের, কিন্তু মাষ্টারের মত নয়, বন্ধুর মত। ওরা যেন একবারও মনে না করে, ভাবে, তুমি ওদের কেউ নয়। আপনজন হতে হবে। সৎ শিক্ষা দেবে। ওদের মনের সংস্কার দূর করতে হবে। ওরা যেন সঙ্কুচিত না হয়, লজ্জা না পায়। মনে না করে, শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু……

—চল, ওধারটায় ঘুরে আসি।

এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। তাঁর ঋজু দেহের দৃঢ় পদক্ষেপ। তরাইয়ের পথের ধুলায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল তাঁর পা দুখানি। মেঠো পথে, বনের ধারে ধারে চলতে চলতে যখনই যার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, কুশল বিনিময় করছিলেন। সংসার, ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজনের খোঁজ নিয়েছিলেন। যেন কত আপনার জন তিনি সকলের। এ যেন তাঁর আপন দেশ, জন্মস্থান। কদিন বাইরে থেকে ঘরে ফিরে এসেছেন।

তার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমাদের মাষ্টার।

—ম্যাষ্টার কি হবে গো? অবাক প্রশ্ন।

—পড়াশুনা হবে।

—কেনে, ইস্কুল তো রয়েছে বটে।

—সে তো তোমাদের ছেলেদের, এবার তোমাদের ইস্কুল হবে।

—আমাদের! বিস্মিত হয়েছিল কেউ কেউ। হেসেছিল কেউ। বলেছিল, ছেলেদের মত আমরাও পড়বো?

—কেন পড়বে না?

—ওই অতটুকু ম্যাষ্টারের কাছে?

– হ্যাঁ।

—না ডাক্তারবাবু, অতটুকু ম্যাষ্টারের কাছে পড়তে আমরা পারবো না।

—কেন গো?

উত্তর দেয়নি মানুষটি। বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। হো হো করে হেসে উঠেছিলেন।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল মানুষটি, এ ডাক্তারবাবু হাসছো কেনে?

—আরে হাসবো না ? লেখা পড়ার কি বয়েস আছে কোন ? যে মাষ্টার এনেছি, এ আমার থেকে অনেক বেশি জানে। আমাকে শিখিয়ে দিতে পারে।

—বটে ?

—দেখো। আমার কথা সত্যি কিনা।

—বেশ, বেশ। খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল মানুষটি।

সে বলেছিল, এ আপনি কি বলছেন ওদের ?

তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, এটুকু না বললে ওরা বিশ্বাস করবে কেন ?

—আপনার প্রতি ওদের বিশ্বাসকে এমনভাবে কাজে লাগাচ্ছেন ?

—প্রমাণ তোমাকেও দিতে হবে। তোমাকেও যাতে ওরা বিশ্বাস করে নিতে পারে তেমন কাজ করতে হবে বৈকি।

—পারবো আমি ?

—কেন পারবে না। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো, দেখবে কাজ যত কঠিন হোক না কেন, উত্তীর্ণ হতে তোমার দ্বিধা জাগবে না মনে। আত্মবিশ্বাস হল মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে মানুষ নিজেকে বিশ্বাস করে না, তার দ্বারা কখনো কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব নয়।

—কিন্তু আমি কি এই কাজের জন্যেই এখানে এসেছি ?

—তবে কি কাজের জন্যে এসেছে ?

—আমি তো···। কথাটা শেষ করে নি সে। বলতে পারে নি।

তিনি একটু চুপ করেছিলেন। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, জানি এ প্রশ্ন তুমি তুলবে। এ প্রশ্নটা জাগাও স্বাভাবিক। কিন্তু একটা কথা তুমি জেনে রাখ শংকর, আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় কিছু করার উপায় নেই। অবশ্য এটা যে করতেই হবে, তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তোমার যদি ভাল না লাগে, মন না চায়, তুমি নাও করতে পারো। আবার তুমি যে নিজের ইচ্ছামত কিছু করবে, তারও উপায় নেই। তোমার পথ তুমি বেছে নিতে পার,

তুমি সরে যেতে পারো। জোরও করবো না, ধরেও রাখবো না। কারণ, আমরা যা করি প্রয়োজন বোধে করি, কর্তব্য বোধে করি। সর্বহারার বন্ধু যে আমরা, কথায় নয়, কাজের মধ্যে পালন করি। সমিতি আমাদের যে কাজের দায়িত্বভার দেয় আমরা তা করি।

—আমাকে কি···

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, গ্রামে গ্রামে আমরা নাইট স্কুল খুলেছি। শিক্ষার দ্বার যাদের কাছে চিররুদ্ধ ছিল, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টায় সে দ্বার আমরা খুলে দিতে চাইছি। হাতিঘিষার এই গ্রামটায় স্কুল খোলার পরিকল্পনা আমরা কমাস আগে গ্রহণ করেছি। শিক্ষকের অভাব অবশ্য নেই আমাদের। কিন্তু কলকাতা থেকে তোমার নাম লিখে পাঠাতে, সমিতি অনুমোদন করেছে। তাছাড়া তুমি আমার কাছে থাকবে।

—কিন্তু লড়াইতো সুরু হয়েছে।

—তাতে কি হয়েছে। লড়াই সুরু হয়েছে বলে সব কিছু কি বন্ধ থাকবে? ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টিও যে আমাদের কাম্য। তাছাড়া নকশালবাড়ির চাষীদের এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম, এতে সামিল আমরা হলেও অগ্রণী ভূমিকা আমাদের নয়। আমরা ওদের পাশে আছি। আমরা ওদের সাহায্য করবো, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ওদের জায়গা দখল কোনদিনই করবো না।

—কেন?

—বহুদিনের অন্যায় শাসন, অত্যাচার, অভাব, অপমানের মর্ম-বেদনার জ্বালা বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ওদের রক্তে। ওরা বুঝতে পেরেছে, এমনিভাবে দিনের পর দিন মার খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। ওরা জেগে উঠেছে। আত্মনির্ভরতা লাভ করেছে। শিকল ভাঙার শপথ নিয়েছে ওরা। মহান চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে যাবে। জয়ী হবে। সেই জয়যাত্রার পথে বাধা হয়ে

আমরা দাঁড়াবো না। আমরা ওদের সাহায্য করবো। প্রয়োজন হলে জীবন দেব।

—কিন্তু শুধু কি গ্রামের জোতদার জমিদার শেষ হলেই বিপ্লব সফল হবে? সুদিন ফিরে আসবে?

—না, তা আসবে না শুধু গ্রাম নয়, শহর। কারখানার মালিক, পুঁজিপতি ধনী একে একে সকলকেই খতম করতে হবে। গোটা রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে গড়তে হবে নতুন করে। শুধু কৃষক নয়, কৃষক শ্রমিক মিলিত চেষ্টায় সফল হবে সে সংগ্রাম।

—কিন্তু এ সংগ্রাম তো গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে?

—আজ আছে, একদিন থাকবে না। একদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে নগরে বন্দরে বিপ্লবের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে। শোষক শ্রেণীর চিতাশয্যা নিশ্চয়ই রচিত হবে।

—কবে? কতদিনে সেদিন আসবে?

—সেদিনের আজ আর খুব বেশি দেরি নেই। পথের সন্ধান আজ স্পষ্ট। পরিক্রমা সুরু হয়ে গেছে। শ্রেণী শত্রুর তপ্ত রক্তে মুছে যাচ্ছে বহুদিনের অন্যায় পাপ আর গ্লানি। মানুষ জাগছে। যারা জাগেনি, তাদের জাগিয়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছি আমরা। পিছিয়ে থাকলে চলবে না, কাজ করতে হবে আমাদের।

কাজ করেছেন তিনি। দিনে রাতে সর্বক্ষণ। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গেছেন। বিপদে সাহায্য করেছেন। বন্ধুর কাজ করেছেন।

হাতে ছোট ওষুধের বাক্স। সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর। শীর্ণ মানুষটি আধ ময়লা একটি হাফসার্ট গায়ে, খালি পায়ে, গ্রামের পথে পথে, ঘরে ঘরে ঘুরেছেন। সকলের খোঁজ খবর নিয়েছেন। দুদণ্ড বসে

সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন। বিদায় নিয়ে আবার এগিয়ে গেছেন পথে।

কোনদিন সঙ্গে থেকেছে সে। শহরের বিলাসিতা ত্যাগ করে মানুষের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে তাকেও অনেক পুরানো অভ্যাস ছাড়তে হয়েছে। পুরাতন চটিজোড়া ছিঁড়ে যেতে সারায় নি আর।

খালিপায়ে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমার চটি কি হল শংকর?

—ছিঁড়ে গেছে।

—হাটতলায় গেলেই মুচি পেতে, সারিয়ে নাওনি কেন?

—সারাবার অবস্থায় আর নেই।

—ঠিক আছে, আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাটবারে একজোড়া কিনে নিও।

—আচ্ছা।

টাকা দিয়েছেন তিনি। চটি কেনবার জন্যে হাটতলাতেও গেছে সে। চটি পচ্ছন্দ করে দাম করেছে। কিন্তু চটি না কিনেই ফিরে এসেছে। দাম কমিয়ে দোকানদারের ডাকাডাকিতেও কান দেয় নি।

পরদিন খালি পা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হল শংকর, কাল চটি কেননি?

—না।

—চটি পছন্দ হয়নি তো এখনকার?

—পছন্দ হয়েছিল।

—তাহলে দাম বেশি চেয়েছিল? ঠিক আছে সামনের হাটে টাকা বেশি করে নিয়ে যেও।

—টাকার আমার প্রয়োজন নেই আর। কথাটা বলে তাঁর দেওয়া টাকাটা বার করে দিয়েছিল সে।

অবাক হয়েছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চটি কিনবে না তুমি?

— না।

—কেন ?

একটু চুপ করেছিল সে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, প্রয়োজন অনুভব করছি না আর।

—শুধু পায়ে হাঁটতে যে কষ্ট হবে তোমার।

—আপনার হয় না ?

মৃদু হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আগে খুব কষ্ট হত, এখন আর হয় না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

—আমারও অভ্যাস হয়ে যাবে। তাছাড়া যাদের সঙ্গে ওঠাবসা, চলা ফেরা, তাদের কাছে নিজেকে বেমানন করে রাখতে চাই না।

—শুধু এই জন্যে ?

—না।

—তবে ?

তাঁর প্রশ্নটার সহসা কোন উত্তর দিতে পারে নি সে। একটু চুপ করেছিল। তারপর বলেছিল, ব্যবধানের প্রচারটুকু সরিয়ে ফেলাই তো উচিৎ।

—শুধু পোষাকে আশাকে আর বাহ্যিকতায় ?

—তা কেন ?

—তাই শংকর। এমনিই ঘটছে। শ্রমিক-কৃষক দরদী সাজছি কিন্তু মনে দরদের চিহ্ন মাত্র নেই বিপ্লব চাইছি কিন্তু আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ হোক এমন কিছু চাইছি না। সাচ্চা কমিউনিষ্ট সাজছি কিন্তু ভোগ বিলাসকে আঁকড়ে ধরছি সেই সঙ্গে। সকলে খেলে, সকলকে খাইয়ে আমি খাব, কিন্তু নিজে ভালমন্দ খেয়ে বুভুক্ষু মানুষের কথা বলছি বলছি, যারা আমাদের রুটি মেরে রেখেছে, তাদের আমরা কোনমতে ক্ষমা করবো না। কেড়ে খেতে হবে। সেই সঙ্গে মনে মনে বলছি, আমারটা বাদ দিয়ে। তুমি কোন্ দলে শংকর ?

—এতে দল আছে নাকি ?

—আছে বৈকি। ছিল এবং আছে। যেমন, কিছু কিছু লোক কয়েকখানা মার্কসবাদী পুস্তক পড়েছেন তো নিজেদের পণ্ডিত ঠাওরান। কিন্তু তাঁরা যা পড়েছেন তা তাঁদের মাথায় ঢোকেনি এবং মগজের মধ্যে শেকড় গেড়ে বসেনি, তাই তাঁরা তা ব্যবহার করতে জানেন না, তাঁদের শ্রেণীবোধ তেমনি পুরাতনই থেকে যায়। আরও কিছু সংখ্যক ভয়ানক অহংকারী এবং কয়েকটি কেতাবী বুলিতে শিক্ষিত হয়ে নিজেদেরকে সবজান্তা মনে করেন, লেজ ফুলিয়ে আকাশে তুলে ধরেন। কিন্তু ঝড় ওঠা মাত্রই, তাঁদের অবস্থান শ্রমিক ও অধিকাংশ শ্রমজীবি কৃষকদের চেয়ে অনেক ভিন্ন হয়ে যায়। পূর্ববর্তীরা দ্বিধাগ্রস্ত, আর পরবর্তীরা অবিচলিত, পূর্ববর্তীরা অস্পষ্ট, আর পরবর্তীরা স্পষ্ট। তুমি কোন্ দলের শংকর ?

সে নীরব ছিল। কথা বলতে পারেনি।

তিনিও একটু নীরব ছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, শংকর, মার্কসবাদ শিক্ষা করতে গেলে, শুধু মাত্র পুস্তক থেকেই নয়, বরং প্রধানত শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিক-কৃষক-সাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়েই তাকে সত্যি সত্যি আয়ত্ত করা সম্ভব। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা যদি কয়েকটি মার্কসবাদী বই পড়েন এবং শ্রমিক-কৃষক সাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে ও নিজেদের কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কিছুটা জানতে পারেন, তাহলে আমরা সবাই অর্জন করবো একটা অভিন্ন ভাষা, শুধুমাত্র দেশপ্রেমের ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা নয়, বরং সম্ভবত কমিউনিষ্ট বিশ্ব দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন ভাষাও। এমনি করলে আমাদের সকলের কাজ নিশ্চিতরূপে আরও অনেক বেশি ভাল হবে।

চুপ করেছিলেন তিনি। শংকর নীরব ছিল।

এক সময় তিনি তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, শংকর!

—বলুন।

—তুমি কিছু মনে কোর না।

—আপনি তো ঠিক কথাই বলেছেন।

—তবু…

—সত্যিই আজ সখের কমিউনিষ্টে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। যে কোন কারণে স্বার্থহানি ঘটলেই কমিউনিষ্ট হচ্ছে। সুবিধাবাদের ভিত্ তৈরী করতে চাইছে তারা। আর সেই জন্যেই তো পালিয়ে এসেছি। সকলের একজন হয়ে বাঁচতে চাই। সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই। আমি স্বপ্ন দেখি মুক্তির—আলোর—অধিকারের।

কি চাচা, সকালবেলা গালে হাত দিয়ে বসে কেন? কথা বলতে বলতে উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, সঙ্গে শংকর।

নূরুদ্দীন বসতে বলেছিল।

তিনি বলেছিলেন, গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছিলে?

—নাতিটার বড় অসুখ।

—ডাক্তার এনেছিলে?

—ডাক্তার যে দেখাবো পয়সা কোথায় বাবু? পেটের ভাত জোটে না তো ডাক্তারের পয়সা থাকবে কোথা থেকে? ঘর দুখানা তিন সন ছাওয়াতে পারিনি।

—তোমার নাতিকে একবার দেখবো?

—আসেন।

ছেলেটাকে দেখেছিলেন তিনি। বছর সাত আট বয়েস। রোগা শীর্ণ চেহারা। মুখের মধ্যে শুধু চোখ দুটিই উজ্জ্বল।

রোগের কথা জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল, পেটের যন্ত্রণা। আগে

মাঝে মধ্যে হত দু একদিন হয়ে যন্ত্রণাটা ভাল হয়ে যেত। সদর হাসপাতালে কবার নিয়েও গিয়েছিল। ডাক্তারবাবুরা দেখে ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন বাইরে থেকে কিনে নিতে। ওষুধ কেনা সাধ্যে কুলায়নি। ছেলেটাও ভুগছে সেই থেকে। এবার দিন চারেক আগে থেকে সুরু হয়েছে। দিনে রাতে সব সময় যন্ত্রণা ভোগ করছে।

ভালভাবে পরীক্ষা করেছিলেন তিনি। বুঝতে পেরেছিলেন যা-তা খাওয়ার জন্যেই এই অসুখ। ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, ওষুধ দিলাম, যন্ত্রণা কমে যাবে কাল কেমন থাকে দেখে ওষুধ দিয়ে যাব।

নূরুদ্দীন বাইরে এসে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেচিল, পোলাটা বাঁচবে তো বাবু?

—না বাঁচার কি আছে। অসুখ এমন কিছুই নয়।

—একটু ভাল করে দেখবেন বাবু বাপ মরা ছেলে। মনে হয়, ও থাকবেনা বুঝি।

হেসে অভয় দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি তোমার নাতিকে ঠিক সারিয়ে তুলবো। আজ চলি।

কৃতজ্ঞতায় হাতদুটো জোড় করেছিল নূরুদ্দীন।

পরদিন আবার গিয়েছিলেন। অনেক ভাল ছেলেটা। যন্ত্রণা অনেক কমে গেছে। বলেছিলেন, নাঃ তোমার নাতি তো ভাল হয়ে গেছে দেখছি চাচা?

—হ্যাঁ বাবু। আপনার দয়ায় এ যাত্রায় বেঁচে গেল।

—দয়া নয় চাচা, এ কর্তব্য। তোমার সময় অসময়ে আমি, আমার সময় অসময়ে তুমি। তবে একটা কথা তোমাদের বলছি, খাওয়া দাওয়ার দিকে একটু নজর দিও। এখন রুটি-টুটি কিছুদিন দিওনা। দুবেলা ঝোল ভাত দেবে।

নূরুদ্দীন একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, এক বেলাই অনেক দিন ভাত জোটে না বাবু, দুবেলা দোব কোথা থেকে?

—কেন এবার চাষ করনি ?

—চাষ করবো না কেন। চাষ করেছি, আল্লা দোয়াও করেছেন কিন্তু ফসল এবার পাইনি বললেই চলে।

—কেন ?

—ছ সনের বকেয়া দেনা সব মেটাতে হয়েছে। বাবুদের হাতে পায়ে ধরে এক বছরেরটা এবার মাপ করতে বলেছিলুম। শুনলেন না। সব ফসল তুলে নিয়ে গেলেন।

—দিলে কেন ?

—কার জিনিষ ধরে রাখবো বাবু, জমিতো তেনাদের। জোর করলে সামনের সনে যদি জমি না দেন ?

তিনি চুপ করেছিলেন

নূরুদ্দীন বলেছিল, সামনের বছর চাষ করেও যে ঠিকমত ভাগ পাবো তারও কোন ঠিক নেই। আগের ধার শোধ হয়েছে কিন্তু সুদতো এখনও বাকী।

—তোমার নিজের জমি ছিলনা ?

—আমার নিজের জমিতেই তো আমি চাষ করি। বাবুদের কাছে বন্ধক আছে। হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে নূরুদ্দীন জিজ্ঞাসা করেছিল, হ্যাঁ বাবু, এখন একটা কথা শুনতে পাচ্ছি—কথাটা সত্যি ?

—কি কথা চাচা ?

—যার জমি সে নাকি ফেরৎ পাবে ? সরকার আমাদের জমি আমাদের ফেরৎ দেবে ?

—কি জানি চাচা, আমি ওসব খবর-টবর কিছু রাখি না। তবে শুনেছিলুম বটে।

—আর সব বেনামী জমি নাকি উদ্ধার করে চাষীদের হাতে তুলে দেবে সরকার। অন্য সব জায়গাতে জমি দখল সুরুও নাকি হয়ে গেছে ?

—না চাচা, আমি ওসব খবর রাখি না।

—ছেলের অসুখে তিনশো টাকায় বাবুরা চার বিঘে জমি বন্ধক রাখল। কাগজে টিপ ছাপ নিয়ে বললেন, তোর জমি তোরই রইলো, চাষবাস তুই-ই করবি। তা বাবু প্রায় বছর পাঁচেক হল। একবার ছাড়াবার কথা বাবুদের বলেছিলুম কিন্তু তেনারা এমন ধমকে উঠেছিলেন যে জমিটা ছাড়াবার নাম মুখে আনিনা। দেখি এবার যদি কিছু হয়। নতুন মন্ত্রীরা যদি কিছু করেন।

—দেখো। কথাটা বলে উঠেছিলেন তিনি।

এগিয়ে দেওয়ার জন্য সঙ্গে এসেছিল নূরুদ্দীন। ডেকেছিল, বাবু।

তিনি বলেছিলেন, আমি আবার কাল এসে তোমার নাতিকে দেখে যাব।

—নিশ্চয়ই আসবেন বাবু কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছিলুম।

—কি কথা চাচা?

কুণ্ঠিতভাবে নূরুদ্দীন বলেছিল, কিছু মনে করবেন না বাবু, কথাটা আপনারাই বলেন, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। বাবু, আজকের এনারা সেই রাবণ হয়ে উঠবেন না তো?

—কেন চাচা?

—সারাটা জীবন তো মার খেতে খেতেই কেটে গেল। এনারা আবার নতুন করে মারবেন নাতো? বুড়ো বয়সে নতুন করে মার খাওয়ার বড় ভয় বাবু।

অন্ধকার রাত্রি। আকাশে তারাগুলো ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকীরা জ্বলছে

আর নিভছে নির্জন নিস্তব্ধ গিরিচূড়ায় রাত্রির বিচিত্র বর্ণময় সঙ্গীত ক্রমশঃ উত্তাল হয়ে উঠছে। হঠাৎ থেকে থেকে কর্কশ চীৎকার। পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। আবার সব কিছু চুপচাপ। নীথর নিস্পন্দ। প্রাণীময় জগতে প্রাণের অস্তিত্বহীনতা।

সচকিত হয়ে উঠল শংকর। একটু যেন কেঁপে উঠল বুকের মধ্যেটা। ভয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করল সে। না, ভয় পায় নি।

রাত্রি কত হবে। চেন্না রাও-রা অনেকক্ষণ হল নীচে গেছে। ওরা ফিরে আসছে না কেন? ওদের কাজ কি শেষ হয়নি এখনও? কি করছে ওরা? কোন বিপদ হল কি?

নীচে গ্রামটার দিকে তাকাল। কোথায় গ্রাম। অন্ধকারে সব কিছু একাকার হয়ে গেছে? কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্নমাত্র নেই। যে আগুন জ্বালিয়ে গিয়েছিল অত্যাচারীর দল, সে আগুন কখন নিভে গেছে জানতে পারে নি সে।

আগুন নিভে গেছে? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল সে। সত্যই কি আগুন নিভে গেছে? কখন নিভল? কে নেভালো সে আগুন? কে?

না, নেভেনি। আগুন নিভবে না। প্রজ্জ্বলিত আলোর লেলিহান শিখায় যতক্ষণ পর্যন্ত না পুড়ে শেষ হচ্ছে অত্যাচারীর দম্ভ অহঙ্কার, যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বহারার দল ফিরে পাচ্ছে আপন অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত নিভবে না বুকের আগুন। জল নয়, এ আগুন নেভাতে প্রয়োজন শ্রেণীশত্রুর বুকের রক্ত।

চারিদিকে শুধু লোভ লালসা আব হিংসার ছড়াছড়ি। অধিকার হরণের চক্রান্ত। মানুষের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেওয়াব পৈশাচিকতা। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ গেছে কিন্তু তার দালালরা অধিকার করেছে রাষ্ট্রযন্ত্র। তারা আপন স্বার্থের জন্যে দেশভাগ করেছে। মুখে ত্যাগের মন্ত্র আওড়াচ্ছে, মানুষকে বলছে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে। বলছে, আমরা গরীব, গরীবের দেশ আমাদের। ত্যাগের জন্য তৈরী হও।

অথচ নিজেরা ভাল খানা-পিনা করছে, দামী মোটরে চড়ছে, বিলাস বাহুল্যের এতটুকু ঘাটতি নেই। তাদের উৎসাহে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, গরীব আরো গরীব। অথচ মুখে সমাজতন্ত্রের কথা। বড় বড় বুলিতে ভুলিয়ে রাখতে চায় মানুষকে।

দোহারের দল প্রস্তুত : তালে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত তারা। মুখে বিপ্লবের কথা। নিজেদের সাচ্চা কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দেয়। বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ভাঙতে চায়না তারা, অধিকার করতে চায় শুধু। কারণ, নতুন করে কিছু গড়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সহাবস্থান নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাদের। তারা বলে তোমরা খাচ্ছ খাও, আমাদের নিরাশ কোর না। আমরা কমিউনিষ্ট হলেও সুখ স্বাচ্ছন্দ বিলাসীতা কামনা করি। বাড়ি গাড়ি সম্পদের স্বপ্ন দেখি। সকলের কথা ভাববার আগে নিজের কথাটা চিন্তা করে নিই।

একটু আলোর রেখা। চিন্তাজাল ছিন্ন হয় তার। দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে সে।

আঁকাবাঁকা পথে কে যেন ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে।

ওরা কি কাজ শেষ করে ফিরে আসছে? ভাবল সে।

অপেক্ষা করে রইলো। একটু পরে আলোটা তার কাছে এসে স্থির হল। স্তব্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চাইল সে। প্রশ্ন করলো মনে মনে, কে এ?

পটে আঁকা দ্রাবিড়ি চেহারা, টানা টানা গভীর কালো চোখ, টিকলো নাক, ভরা যৌবনা একটি কৃষক মেয়ে তার সামনে। হাতে ছোট্ট একটি ঝোলা।

কথা বলতে পারল না শংকর। মুগ্ধ বিস্ময়ে রাতের নির্জন পর্বতের মত চেয়ে রইল তার দিকে।

মেয়েটির মধ্যে একটু দ্বিধার ভাব দেখা দিল। একটু সঙ্কোচ। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, আপনার খাবার নিয়ে এসেছি, খেয়ে নিন।

—কে আপনি?

—আমি কৃষ্ণাম্মা।

কথাটা বলে হাতের আলোটা রেখে অসঙ্কোচে তার পাশে বসে পড়লো কৃষ্ণাম্মা।

শংকর চেয়ে চেয়ে দেখল। কৃষ্ণাম্মা তার ঝোলা থেকে খাদ্যবস্তু বার করলো। মাছের ঝোল আর ভাত। গরম, তখনও ধোঁয়া উঠছে। জলের জায়গা এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনার জন্যে খাবার এনেছি, হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নিন আপনি।

—কমরেডরা কোথায়?

—পোড়া ভিটের ওপর নতুন করে ঘর বাঁধছেন তাঁরা।

—এই রাত্রে? আশ্চর্য হল সে।

হাসল কৃষ্ণাম্মা। বলল, রাত্রি দিন দুই-ই সমান আমাদের কাছে। তাছাড়া দিনের বেলা শয়তানের জন্যে সময় কোথায়?

অবাক দৃষ্টিতে কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চেয়ে রইলো শংকর।

—কিন্তু আপনাদের গ্রামে তো পুলিশ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অথচ……। কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

হাসল কৃষ্ণাম্মা। সহজ স্বাভাবিক হাসি। বলল, ওতো নিত্য দিনের ঘটনা। আজ আগুন দিয়েছে, অন্যদিন সকালে এসেই গ্রাম শুদ্ধ সকলকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে মাঠের মাঝখানে। সুরু করবে লাঠি পেটা।

—প্রতিদিন?

—ধরতে গেলে প্রতিদিনই। আমাদের একরকম গা সওয়া হয়ে গেছে। কথাটা বলেই আবার হাসল কৃষ্ণাম্মা। তাড়া দিল, সকাল থেকে আপনি অভুক্ত আছেন, খেয়ে নিন।

—আপনারা খেয়েছেন?

—খাবার সময় আমরা পেলাম কোথায়?

—অথচ…

—আপনি যে আমাদের অতিথি।

—চমৎকার আপনাদের অতিথি সেবার নমুনা। একদিকে যখন ঘরগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছিল অন্যদিকে তখন নিশ্চয়ই আপনারা অতিথির জন্য রান্না করছিলেন?

এবার আর তার কথা শুনে হাসল না কৃষ্ণাম্মা। বলল, নিজেরা খাই অথবা অতিথিকে কিছু খেতে দিই এমন কিছু ওরা রেখে যায়নি। শয়তানের দল সব কিছুই আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে।

—তাহলে?

—পাশের গ্রাম থেকে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে। এসেছে সকলে ঘর বেঁধে দিতে। কিন্তু আর কথা বলবেন না আপনি। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন।

তবু সে বলল, অভুক্ত শুধু আমি একা নই। কমরেডদের খাওয়া হয়নি সমস্ত দিন। খাওয়া হয়নি আপনাদেরও। সকলে যখন সমস্ত দিন অভুক্ত রয়েছেন তখন আমি একা খাই কেমন করে?

—খেতে পারেন না?

—একদিন পারতাম, কিন্তু আজ কষ্ট হয়। যখন দেখি নিরন্ন মানুষের দল একমুষ্ঠি অন্নের জন্যে হাহাকার করছে, তখন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়।

—কেন?

—অন্যায় শোষণে ক্ষুধার অন্ন থেকে যারা বঞ্চিত, সেই অন্যায়-কারীদের আমিও একজন।

—একথা কেন মনে হয়?

—মনে হয় এইজন্যে, বঞ্চিত নয়, বঞ্চনাকারীদের মধ্যে একদিন আমিও ছিলাম। আমি আমার নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছি, আমার খাদ্য কোনদিন একজন অনাহারীকে ভাগ দিই নি। দেওয়ার কথা আমার মনেও হয়নি।

কিন্তু আজতো পারেন না?

—সত্যিই আজ আর পারি না। তবু অতীতের অপরাধের কথা ভুলতে পারি না। ভিখারী ভিক্ষা চাইলে বিরক্ত হয়েছি, ভেবেছি সমাজের জঞ্জাল ; সহানুভূতির সঙ্গে একবারও চিন্তা করিনি, কেন ভিক্ষারী হয়েছে। ভেবে দেখিনি, দিন দিন ভিখারীর সংখ্যা এভাবে বাড়ছে কি করে ? এরা জন্ম ভিখারী, না সব হারিয়ে ভিখারী হয়েছে ? আজকের ভিখারী সমাজের একটা বড় অংশ গ্রামের মানুষ। ছোট চাষী, ভূমিহীন কৃষক, মজুর। দুর্ভিক্ষ, অজন্মার সুযোগ নিয়েছে জমিদার, জোতদার আর মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর দল। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাহায্য করেছে এদের। সহজ, সরল, সাধারণ মানুষকে নামিয়েছে পথে।

চুপ করল শংকর। দূরের অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিল।

১লা মে ১৯৪৮ সাল। চীনা জনগণের কাছে নবজীবনের স্পন্দন নিয়ে এল প্রভাতের তরুণ তপণ। রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তে পর্বতে কন্দরে। মূক মুখে জাগল ভাষা, ভগ্ন বুকে জাগল আশা শক্তি চাই, সম্পদ চাই সমগ্র জাতির জন্য, চাই শান্তি, চাই স্বাধীনতা, সাম্য।

এগিয়ে চলল মুক্তিফৌজের দল। জয়ের পর জয়। আঘাতের পর আঘাত হেনে ধ্বংস করলো শত্রুদের। ২৩শে এপ্রিল ১৯৪৯ সালে নানকিং জয় করল তারা।

তিনি লিখতেন :

> চু পাহাড়ের চারিদিকে ঝড় উঠেছে,
> তার চূড়াটাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না।
> বড় বড় বাঘ আর ড্রাগনগুলো
> আরও অনেক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আগের থেকে।
> তুফান উঠেছে নদীতে
> তবু সেই তুফান আর ঝড় ভেঙে লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক
> এগিয়ে চলেছে ওই পাহাড়ের চূড়াটির দিকে।

সমস্ত পৃথিবীটাই কাঁপছে,
কারণ সবকিছুই গতিশীল, পরিবর্তনশীল
স্বর্গের দেবতাদের সত্যিকারের জীবন থাকলে তারাও বুড়ো
হ'ত।
পৃথিবীর সব কিছুই কাঁপছে, টলছে, নড়ছে, পাশ ফিরছে।
শুধু আমাদের অকম্পিত অন্তরে অটল সঙ্কল্পগুলো
স্থির হয়ে বসে আছে।
আর আমরা সেই সব সঙ্কল্পগুলোকে নিয়ে
শত্রুদের পিছনে ছুটছি আর ছুটছি।

আমরাও ছুটবো ততদিন, যতদিন একজন শত্রুও বেঁচে থাকবে। যতদিন পৃথিবীতে শ্রেণী আর শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে ততদিন শেষ হবে না বিদ্রোহ আর বিপ্লব। যতদিন বিরোধ বৈষম্য থাকবে সমাজে তত-দিনই আমরা সংগ্রাম করে যাব অক্লান্ত ভাবে।

--কমরেড! কৃষ্ণাম্মার ডাকে সংবিত ফিরে পেল শংকর। তার দিকে ফিরে চাইল।

মৃদুকণ্ঠে অনুরোধ জানাল সে, আপনি খেয়ে নিন কমরেড।

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে যেন কি ছিল, এবার আর তার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারল না শংকর। কথা বলল না। হাত ধুয়ে ভাতের থালাটা টেনে নিল। গ্রাস তুলল মুখে।

আহাররত শংকরের মুখের দিকে চাইল কৃষ্ণাম্মা। ওকে দেখল। মাথা নীচু করে একের পর একটা গ্রাস তুলছে ও। কৃষ্ণাম্মা দেখেছে। সারাদিন সে নিজেও অভুক্ত। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে কিছু খাবে ভেবেছিল। ও যখন অন্য কথা ভাবছিল, তখন একটু বিরক্ত যে হয়নি তা নয়। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সব বিরক্তি ধুয়ে মুছে গেছে। যেন তার কোন অতি প্রিয়জনকে সামনে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে সে। তৃপ্তিতে ভরে উঠছে মনটা।

ঘর-বাঁধা নারীমনের চিরন্তন কামনা। নারীর স্থান গৃহকোণে,

যেখানে স্নেহ, শান্তি, ভালবাসায় ভরা। নারী চায় স্বামী, সন্তান, সংসার। চায় হাসি-কান্না, সুখে-দুঃখে ভরা জীবন। জীবনকে মধুময় করে তোলার জন্যেই তো নারী জন্ম।

কিন্তু তা ওরা হতে দিল না। ওই অত্যাচারী জহ্লাদের দল। ভারতের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছিল, শান্তি চেয়েছিল, কামনা করেছিল সফল জীবন।

ওরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিশাপ এনে দিল জাতির জীবনে। মিথ্যার বেসাতিতে ভোলাতে চাইল মানুষকে। পঙ্গু সাজাল ভারত জননীকে।

ধনিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছে আজ রাষ্ট্রযন্ত্র। ধনিক শ্রেণীর ইচ্ছানুসারে আজকের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এবং বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালকরা অধিকাংশ ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত।

অন্যায়, শোষণ আর অবিচার। আইন আছে, কিন্তু সে আইন ধনীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে। গরীবের জন্যে কিছু নেই। গরীব চিরদিন মার খেয়েছে। মার খাচ্ছে।

কিন্তু আর নয়। গরীব নিরন্ন মানুষের দল অনেক মার খেয়েছে। সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে তাদের। তারা জেগে উঠেছে। জাগিয়ে তুলেছে আসমুদ্র হিমাচলকে।

শুধু পুরুষ নয়, নারীও। ঘর ছেড়ে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তারাও। বলছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরাও আঘাত হানবো। যে হাতে একদিন আত্মীয়-স্বজনের সেবা করেছি, বরমাল্য তুলে দিয়েছি, পালন করেছি সংসার আর শিশুকে, সে হাতে অস্ত্র তুলে ধরে শত্রুর বুক লক্ষ্য করে আঘাত হানবো। লক্ষ্যে শেষ করবো শ্রেণী শত্রু শয়তানদের।

আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই। এভাবে তিলে তিলে ক্ষয় নির্মূল হতে চাই না। আমরা মুক্তি চাই

জেলা সদর জেলে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করল তাঁকে, তোমাকে কি করা হবে জান তুমি ?

নীরব রইলেন তিনি। পুলিশ অফিসারের মুখের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত।

—তুমি বুঝতে পারছো না বিপদের গুরুত্ব। তোমার কি হতে পারে·····

—যা হয়েছে তারপরও কিছু আছে নাকি ? যেন ব্যঙ্গ করে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

তাঁর ব্যাঙ্গোক্তিতে পুলিশ অফিসার থতমত খেয়েছিল। কি বলবে ভেবে পায়নি।

—বিলম্ব প্রয়োজন কি, বাকীটুকু সুরু করুন। ঝলসে উঠেছিল তাঁর কণ্ঠ।

কমরেড সম্পূর্ণা। কমরেড তেজেশ্বর রাও এর সুযোগ্যা পত্নী।

তিনটি সন্তানের জননী। সংসারের বধূ। কিন্তু বাড়ি ঘর পুত্রদের মায়া ছিন্ন করে সক্রিয় বিপ্লবী হিসাবে যোগ দিলেন এজেন্সী এলাকার কেন্দ্রীয় গেরিলা স্কোয়াডে। কিন্তু জুন মাসে (১৯৬৯) পুলিশের হাতে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। জেরা করা হল।

—তেজেশ্বর রাও কোথায় ?

—জানি না।

—বলবে না ?

—জানি না।

—বলবে না ?

—জানি না।

একটি প্রশ্ন, উত্তর একটিই, জানিনা। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পুলিশের

দল। বর্বরতার চরম সীমায় নেমে গেল তারা। অত্যাচারের পর অত্যাচার। পশুর দল অমানুষিক অত্যাচার চালাল তাঁর ওপর। জ্ঞান হারালেন তিনি।

জ্ঞান হবার পর আবার প্রশ্ন হল, এখনও বল, তেজেশ্বর রাও কোথায়?

—জানি না। ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন তিনি

—আমরা জানি সে কোথায়।

—তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন?

- তুই বলবি কিনা?

—না।

—বলবি না?

—না।

সমানে চলল মার-ধোর আর অমানুষিক অত্যাচার। বার বার জ্ঞান হারালেন তিনি। কিন্তু স্বীকার করলেন না তেজেশ্বর রাও কোথায়।

পুলিশ বলল, এর জন্যে তোকে মরতে হবে।

উত্তর দিলেন, তোমরাও মরবে।

পুলিশ জেলার সদর জেলে পাঠিয়ে দিল তাঁকে।

পুলিশ অফিসার বলল, গুলি করে মারা হবে তোমাকে।

হাসলেন তিনি। বললেন, মিথ্যা কটা গুলি খরচ না করে মারার কাজটা তোমরাই শেষ কর না কেন?

—হোয়াট? চীৎকার করে উঠেছিল পুলিস অফিসার।

তেমনি হাসলেন তিনি। বললেন, জানোয়ারের অধম তোমরা, বেশ ভালভাবেই ও কাজটা শেষ করতে পারবে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই তাঁকে মেরে ফেললে চলবে না। পুলিশ যে অনেক আশা নিয়ে তাঁকে জীবন্ত ধরেছে। কারণ, তেজেশ্বর রাওকে যে তাদের চাই। তেজেশ্বর রাও যে তাদের শান্তি, নিদ্রার

ব্যাঘাত কারীদের অন্যতম একজন। তেজেশ্বর রাও-এর মূল্য যে অনেক।

এগিয়ে এলেন গোয়েন্দা অফিসারের দল। মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, কেমন আছেন কমরেড সম্পূর্ণা ?

—কেমন দেখছেন ;

—সত্যি আমি দুঃখিত। এর জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

—আপনার পরিচয় ?

—আপনার বন্ধু বলার যোগ্যতা আমার নেই কিন্তু আমাকে আপনার একজন শুভার্থী বলে জানবেন।

—আমি সত্যিই ভাল আছি।

—কিন্তু···

হেসেছিলেন কমরেড সম্পূর্ণা। বলেছিলেন, আপনার দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু এ আপনি কী করছেন বলুন তো ?

—অন্যায় কিছু করেছি কি ?

—না না, আমি সেকথা বলছিনা, মুখে হাসি ফুটিয়েছিল গোয়েন্দা। আপনি অন্যায় করছেন এমন কথা বলার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু আমি বলছিলাম ··

—চুপ করলেন কেন ? বেশ তো বলছিলেন।

—দেখুন, আমি আপনার মঙ্গল চাই। এখন আপনি···

—নিজের অমঙ্গল নিশ্চয়ই চাইবো না !

—নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দার দুই চোখ। উৎসাহে বলেছিল, আপনি বুদ্ধিমতী, আপনার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আচ্ছা সম্পূর্ণা দেবী, আপনার বাবা মা আছেন ?

—আপনারা জানেন না ?

—না, মানে, আমি বলছিলাম…

—আমার বাবা মা, শ্বশুর শাশুড়ী সকলেই আছেন।

—তাহলে তাঁদের ছেড়ে আপনি এ পথে কেন?

—কেন বলুন তো?

—আপনার স্বামী নিশ্চয়ই…।

—আপনি ঠিক বলেছেন, উনিই আমাকে এপথে এনেছেন।

—আপনার স্বামী আপনাকে বললেন বলেই আপনি এপথে চলে এলেন?

—না এসে কী করি বলুন উনি আমার প্রতিটি কথা শোনেন, আর আমি ওঁর একটা অনুরোধ রাখবো না?

আবার লাফিয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা অফিসার অধীর কণ্ঠে বলেছিল, আপনার স্বামী আপনার কথা শোনেন?

হেসেছিলেন সম্পূর্ণা। প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি আপনার স্ত্রীর কথা শোনেন না?

তাঁর সেকথার কোন উত্তর দেয়নি গোয়েন্দা অফিসার। জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি জানেন আপনার স্বামী এখন কোথায়?

মনে মনে হেসেছিলেন সম্পূর্ণা। বলেছিলেন, দেখুন, এখন এই মুহূর্তে আমার স্বামী কোথায় বা কি করছেন আপনাদের এখানে থেকে আমার পক্ষে জানা কেমন করে সম্ভব আপনিই বলুন?

—তা সত্য। স্বীকার করল গোয়েন্দা অফিসার। সামান্য এক নারী কিন্তু কি অসাধারণ বুদ্ধিমতী বলল, কিন্তু আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়।

—আমাকে তো আপনারা গুলি করে মারবেন?

—মনে করুন যদি মারা না হয়?

—যদি না মারেন?

হ্যাঁ। আগ্রহী হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা অফিসার। বলল,

দেখুন আপনার ছেলে মেয়ে আছে, শ্বশুর শাশুড়ী, বাবা মা আছেন, আপনি এসব ঝামেলায় কেন ?

—কাকে আপনারা ঝামেলা বলছেন, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল কমরেড সম্পূর্ণার কণ্ঠস্বর দিনের পর দিন যারা সব দিক দিয়ে বঞ্চিত, অবহেলিত অত্যাচারিত তাদের এই জাগরণ, বাঁচার জন্য সংগ্রামকে বলছেন ঝামেলা ?

—বলছি বৈকি! আদিবাসীদের এ লড়াই ঝামেলা ছাড়া আর কি হতে পারে? যে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্যে আপনারা লড়াই সুরু করেছিলেন তাদের তো সুযোগ সুবিধা কিছু কিছু দেওয়া হচ্ছে।

সুযোগ সুবিধা!

অন্ধ্রের কংগ্রেসী সরকার যেন দয়া করছে। কিন্তু কে চায় দয়ার দান? কিসের দয়া? মানুষকে যারা ভিখারী করে সম্পদের পাহাড় জমিয়েছে, দিনের আহার, রাতের নিদ্রা কেড়ে নিয়ে সর্বহারা করেছে, দয়া করা, অধিকার কোথায় তাদের?

যে সি. পি. এম নিজেদের প্রকৃত কমিউনিষ্ট বলে প্রচার করে, মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখে, যারা বলে বাংলা দেশের মানুষ আমাদের চায়, কংগ্রেসকে শেষ করে আমরা এনেছি বাংলাদেশের মানুষের জীবনে মুক্তির আলো; বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটিয়েছে আমাদেরই নেতৃত্ব — সেই তারা, অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছে পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে বলেছে, গিরিজনদের জমি দিয়ে দাও, কৃষকদের যতটা পারো সুবিধা দাও, না হলে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ওরা বিষধর সাপ নয়, ওরা সাপুড়ে, গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

নাগী রেড্ডীর দল বলল, গিরিজন এলাকায় যা হচ্ছে, তা চলতে পারে, কারণ গিরিজনদের বিশেষ অবস্থা, কিন্তু সমতল এলাকায় অসম্ভব। এখানে কেবল তালগাছের মালিক হবে তারা (তেলেগুতে

তালকে তাড়ি বলে) ব্যাপারী কৃষক, পতিত জমি দিয়ে দাও বলে দাবী কর, আর কেবল লাঠি ফাটি নিয়ে ছোট—ছোট দল গড়ে যাও ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন পড়ে তার জন্য। তবে দেশব্যাপী বা সমতল ভূমিতে আক্রমণাত্মক আন্দোলন করা কখনোই চলবে না।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের ঢেউ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, নব চেতনায় জাগ্রত মানুষ যাতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে না পড়ে তার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল ওরা। গণ জাগরণকে ব্যহত করার চেষ্টা করেছিল। দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে নানারূপ জঘন্য পন্থা অবলম্বন করতেও ওদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি।

দেশের শত্রু, জাতির শত্রু কংগ্রেস। কংগ্রেসীরা বুর্জোয়া। অথচ সত্যকারের বিপ্লবের সুরুতেই ওরা ওদের মুখোস ছিঁড়ে স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলল। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। গেল-গেল, সব গেল।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল চীনে। প্রতিক্রিয়াশীল চিয়াং আর তাঁর কুয়োমিণ্টাং সরকারের বিরুদ্ধে যখন একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হতে লাগল মুক্তিফৌজ, ততই ভয় পেতে লাগল সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। সক্রিয় হয়ে উঠল দালালের দল। তারা নানাভাবে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল বিপ্লবীদের মধ্যে। চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে লাগল তারা।

এইসব শ্রেণীশত্রু দালাল, চক্রান্তকারীদের সম্পর্কে সাবধান করে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে মাও এক ঘোষণায় হুঁশিয়ার করে দিলেন বিপ্লবীদের। বললেন, কোন দিকে তাকাবে না, কোন কথা শুনবে না। শেষ পর্যন্ত বিপ্লব চালিয়ে নিয়ে যাও। কারণ, এ বিপ্লব শুধু চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে নয়, এ বিপ্লব বিশ্বের সকল প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে। বিপ্লব শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে না। থামলে চলবে না।

থামেনি লাল ফৌজ। দিনের পর দিন এগিয়ে গিয়েছিল তারা। জয় থেকে আরো বড় জয়ের দিকে।

অন্ধ্রের বিপ্লবী কমরেডরাও থামেনি। এ বিপ্লব তো আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, এ যে জনযুদ্ধ। সমস্ত মানুষের মুক্তি সংগ্রাম। এ সংগ্রামে জয়ী হতেই হবে।

পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নারী। নারী পুরুষের মিলিত আঘাতে শ্রেণী শত্রুর দল শেষ হয়ে যাচ্ছে একে একে। একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এর জন্যে হয়তো অনেক কষ্ট, নির্যাতন, অত্যাচার সহ্য করতে হবে। মৃত্যু ঘটাও কিছু অসম্ভব নয় কিন্তু গভীর সর্বহারা অনুভূতি নিয়ে এবং জনগণকে প্রাণ মন দিয়ে সেবা করার মনোভাব নিয়ে এগুলে, সমষ্টিগত স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিলে এবং যা কিছু করা জনগণের স্বার্থেই করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুলে অত্যাচার এবং মৃত্যু কষ্টের নয়, আনন্দের। চেয়ারম্যান বলেছেন, দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত কর্ম তৎপরতার মতই বিপ্লব সর্বদা আঁকা বাঁকা পথ ধরে চলে এবং কখনই তা সরল পথে চলে না।

বলেছেন, জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব ইতিহাস সৃষ্টির চালক —শক্তি।

সর্বহারা নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণের মধ্যে নারীরও স্থান, নারীও পুরুষের সমান অধিকারে অধিকারিনী।

মার্কস বলেছেন, আধুনিক যন্ত্র শিল্পের ক্রিয়ায় মজুরদের মধ্যে সকল পারিবারিক বন্ধন যত বেশি মাত্রায় ছিন্ন হতে থাকে, তাদের ছেলেমেয়েরা যত বেশি করে সামান্য কেনা বেচার বস্তু ও পরিশ্রমের হাতিয়ারে পরিণত হতে থাকে, ততই পরিবার ও শিক্ষা বিষয়ে বাপ-মার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পবিত্র সম্বন্ধ বিষয়ে বুর্জোয়াদের বাগাড়ম্বর ঘৃণ্য হয়ে ওঠে।

সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী সমস্বরে চিৎকার করে বলে—কিন্তু তোমরা কমিউনিষ্টরা যে মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করে ফেলতে চাও।

কিন্তু বুর্জোয়ারা নিজের স্ত্রীকে নিতান্ত উৎপাদনের হাতিয়ার

হিসাবেই দেখে থাকে। তাই যখন সে শোনে যে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলি সমবেতভাবে ব্যবহার করার কথা উঠেছে, তখন স্বভাবতই মেয়েদের ভাগ্যেও তেমনি সকলের ভোগ্য হতে হবে, এছাড়া আর কোন সিদ্ধান্তে সে আসতে পারেনা।

ঘুণাক্ষরেও তার মনে সন্দেহ জাগেনা যে আসল লক্ষ্য হল, উৎপাদনের হাতিয়ার মাত্র হয়ে থাকার দশা থেকে মেয়েদের মুক্তিসাধন

তাছাড়া, মেয়েদের উপর এই সাধারণ অধিকারটা কমিউনিষ্টরা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, এই ভান করে আমাদের বুর্জোয়ারা যে এত ধর্মক্রোধ দেখায় তার চেয়ে হাস্যস্পদ আর কিছু নেই। মেয়েদের সাধারণ সম্পত্তি করার প্রয়োজন কমিউনিষ্টদের নেই; প্রায় স্মরণাতীত কাল থেকে সে প্রথার প্রচলন আছে।

সামান্য বেশ্যার কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই হল, মজুরদের স্ত্রী-কন্যা হাতে পেয়েও আমাদের বুর্জোয়ারা সন্তুষ্ট নয়, পরস্পরের স্ত্রীকে ফুঁসলে আনাতেই তাদের আনন্দ

বুর্জোয়াদের সাথে আজ বাদ সাধছে শ্রমিক শ্রেণী নির্বিবাদে যে যথেচ্ছাচার তারা চালিয়ে এসেছে তার মূলে আঘাত লাগছে বারবার। তাদের বহুদিনের সাধের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

ভারতের মাটিতে আজ যে দিন বদলের পালা।

গোয়েন্দা অফিসার বলল, যাদের জন্য এবং যে জন্য আপনাদের আন্দোলন তারা তো তা পাচ্ছে, আর কেন?

কমরেড সম্পূর্ণা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি কি শেষ হয়ে গেছে?

—হয়নি ?

- না। সুরু হয়েছে মাত্র। বিপ্লবের দীর্ঘ পথের এখনও অনেক বাকী।

—তা থাক। হাসল গোয়েন্দা অফিসার। নিজের ভুল স্বীকার করে আপনি ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ী সন্তানদের কাছে ফিরে যান। স্বামীকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথে নিয়ে আসুন।

—পথেই তো বেরিয়েছি। বিপ্লবের পথে।

অসীম ধৈর্য্য নিয়ে হাসল গোয়েন্দা অফিসার. এ সমস্ত মিথ্যা ঝামেলা।

ঝামেলা ?

—নিশ্চয়ই। কি প্রয়োজন ছিল এসব ঝামেলার মধ্যে যাবার ?

- চেয়েছিলাম তো ঝামেলায় না যেতে।

—তাহলে গেলেন কেন ?

—কেন গেলাম জানেন ? ক্রোধে ক্ষোভে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল কমরেড সম্পূর্ণার সমস্ত মুখ। বলেছিলেন. যখন দেখলাম, না খাওয়ার, আমার সন্তানকে মানুষ করতে না পারার সমস্যার সমাধান জড়িয়ে রয়েছে কৃষক শ্রেণীর সমস্যার সমাধানের সাথে। সেই সমাধানের পথ চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা নির্দেশিত পথ। সেই পথই তো ধরেছি. আমার আর কোটি কোটি দরিদ্র মেহনতী মানুষের সন্তানের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য !

কৃষ্ণাম্মার মায়ের দিকে চেয়ে আছে শংকর। তাকে দেখছে। অবাক হচ্ছে। ভেবে পাচ্ছে না, অনেকক্ষণ ও দূরের অন্ধকার পর্বতশ্রেণীর দিকে চেয়ে আছে কেন! অন্ধকারের মধ্যেও চোখ দুটি

অমন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কেন! কি ভাবছে ও? কার কথা চিন্তা করছে।

বার কয়েক কথা বলার চেষ্টা করলো সে। ওকে ডাকতে চাইল। কিন্তু পারল না। ওর ধ্যান ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হল না তার।

হঠাৎই এক সময় কৃষ্ণাম্মা সচকিত হল। ফিরে চাইল তার দিকে। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, একি কখন খাওয়া হয়ে গেল আপনার?

—অনেকক্ষণ।

—অনেকক্ষণ?

—হ্যাঁ। হাসল শংকর। বলল, আপনাকে দেখছিলাম, ধ্যান ভাঙাতে ইচ্ছা করেনি।

কৃষ্ণাম্মাও হাসল। বলল, ধ্যান নয়, একজনের কথা একটু আগেই মনে পড়েছিল। আমি তাঁর কথাই চিন্তা করছিলাম। আর নিজের অযোগ্যতাকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। আমি কিছু করতে পারলাম না।

—কি পারলেন না?

—যে কাজের ভার আমার ওপর তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি আরো কিছু করতে চাই।

—করেন না কেন?

—তেমন নির্দেশ যে আমার ওপর নেই। আমাদের যার ওপর যে দায়িত্ব, তাই পালন করতে হয়। পশুগুলো রাইফেল বাগিয়ে সকাল বিকাল হানা দেয় গ্রামে, ইচ্ছামত পীড়ন করে। নোংরা কথাবার্তা বলে। ইচ্ছা হয় শেষ করে দিই। যে হাতে পীড়ন করছে সে হাত ভেঙে দিই। যে মুখে অশ্লীল কথা বলছে, সে মুখখানা গুঁড়িয়ে দিই। ইচ্ছা করলে পারি তা, কিন্তু পারি না, কারণ তেমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

—যদি পেতেন তেমন নির্দেশ।

সামান্য আলোতে কঠিন দেখিয়েছিল কৃষ্ণাম্মার সুন্দর মুখখানা।

তীব্র ঘৃণা ঝরে পড়েছিল কণ্ঠে, পশুগুলোকে নিশ্চয়ই শেষ করে দিতাম।

—তাহলে গ্রামের মানুষকে যে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হত।

—বাধা তো এখানেই। সেই জন্যেই তো পারি না। হঠাৎ নীরব হল কৃষ্ণাম্মা। দুরন্ত ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বলল, কিন্তু তাতেই কি রেহাই পাওয়া যাচ্ছে? পশুর দল কি অত্যাচার কিছু কম করছে?

—না। বরং দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলেছে। অহিংসার পূজারী অন্ধ্রের কংগ্রেসী সরকার, যারা শতমুখে প্রচার করে—অহিংসা পরমধর্ম। অহিংসা দিয়েই দেশ থেকে বিদায় করেছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে। অনশন করে একদিন কাঁপিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। হিংসার পথে নয়, হিংসায় হিংসা বাড়ে। সত্য অহিংসা।

সেই সত্যাশ্রয়ী অহিংসার মানসপুত্ররা শ্রীকাকুলামের প্রত্যেকটি গ্রামের এক মাইল, কোথাও আধ মাইলের মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের এক একটি ক্যাম্প বসিয়েছে। হাতে তুলে দিয়েছে হিংসাকে রোধ করার জন্য অহিংসার পুষ্পধনু, রাইফেল। নেকড়ের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা গ্রামের ওপর। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউ রেহাই পাচ্ছে না তাদের কাছ থেকে। মেয়েদের ওপরে বলাৎকার চলেছে সমানে। পশুক্ষুধা মেটাতে গর্ভবতী হয়েছে নারী। যে, কদিন পরে মা হবে, সেও বাদ পড়ছে না।

না-না, এ হতে পারে না। এ সত্য নয়, মিথ্যা, অপপ্রচার। অহিংসা মন্ত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা। দুষ্টবুদ্ধি কমিউনিষ্টদের শয়তানি।

কিন্তু টেক্কালি তালুকের একটি গ্রামে পুলিশের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন। মানুষ তখন যে যার কাজে ব্যস্ত। সাবধান হবার

সুযোগ পেল না। ওদের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে যে বনে আশ্রয় নেবে তেমন অবসর মিলল না। ওরা বেড়াজালে আবদ্ধ করে সমস্ত গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে।

সুরু হল মারপিট। শিশু বৃদ্ধ কেউ রেহাই পেল না। কিন্তু কেন তাদের ওপর এই পীড়ন কেউ জানল না। কি তাদের অপরাধ তাও বলল না। কারো হাত পা ভেঙে দিল, কারো মাথা ফাটল। সন্তানকে মারছে দেখে ছুটে এল মা। শয়তানের দল লাথি মেরে ছিটকে ফেলে দিল মাকে।

তারপর? ওরা চলে গেল?

না গেল না। শুধু মারধোর করার জন্যে তো ওরা আসেনি। ওদের উদ্দেশ্য যে অন্য। উপোসী পশুর দল গ্রামটির ওপর হামলা করে তাদের পশুক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্যে গ্রামের মানুষকে মেরেছে, শুধু তাদের কাজে যদি বাধা দেয় এই আশঙ্কায়।

ওদের অত্যাচারে আহত মানুষগুলো যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছে, ওরা তখন ওদের পশুত্বের চিহ্ন এঁকে দিল কটি নারীর ওপর। যে কৃষক বধূ একখানি কচি মুখের স্বপ্ন দেখছিল, পরম স্নেহে মমতায় লালন করছিল গর্ভস্থ ভবিষ্যৎকে, ওদের পৈশাচিকতায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল একসময়

অহিংসার পূজারীদের শান্তিরক্ষকের দল উৎসবের শেষে ফিরে গেল এক সময়। আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল একটি শান্ত স্নিগ্ধ গ্রামের শান্তিপ্রিয় কিছু মানুষের মনে।

নকশালবাড়ির লাল আগুনের স্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল শ্রীকাকুলামের মানুষের হৃদয়। শপথ নিয়েছিল। জেগে উঠেছিল কিছু মানুষ। যারা জাগেনি তাদেরও জাগিয়ে তুলল ওদের অত্যাচার।

—কমরেড।

শংকরের ডাকে তার দিকে তাকাল কৃষ্ণাম্মা।

—এ তো অত্যাচার নয়, জাগরণ। অত্যাচার যত তীব্র হবে

মানুষের মনের ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ দূরে হবে ততই। চেয়ারম্যান বলেছেন, যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ। একদিন ভারতবর্ষ জুড়ে ঐক্য স্থাপিত হবে। সর্বহারা মানুষের দল টিপে ধরবে অত্যাচারীর টুঁটি। আজকের এ অন্যায়ের ক্ষমা সেদিন ওরা পাবে না। ওদের জবাবদিহির কিছু থাকবে না সেদিন।

—কবে? কতদিন এমন অত্যাচার সহ্য করতে হবে?

—দিন তো এসেছে, কমরেড।

—তাহলে কেন আমাকে অত্যাচার দেখেও নীরব থাকতে হয়? কেন আঘাত হানতে পারি না? কেন?

কৃষ্ণাম্মার অধৈর্যতায় হেসে ফেলল শংকর। বলল, আপনি বড় ছেলেমানুষ কমরেড বড় চঞ্চল। চেয়ারম্যান কিন্তু অন্য কথা বলেছেন।

- আমি জানি।

– তাহলে আপনি ও কথা বলছেন কেন?

—শয়তানদের অমানুষিক অত্যাচার যে অসহ্য লাগে।

—তবু আপনাকে তা সহ্য করতে হবে। কারণ, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন কোন কাজ আপনি নিশ্চয়ই করতে পারেন না।

— না।

আবার হেসে ফেলল শংকর। বলল, সত্যিই আপনি ছেলেমানুষ কমরেড। উতলা হলে তো চলবে না, আরো বড় আঘাতের জন্য সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে রক্ষা করে তবেই নিজের কথা ভাববেন। কারণ, আমাদের মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকা সবই জনগণের জন্য।

কথা বলল না কৃষ্ণাম্মা। বাসনগুলো একে একে তুলে গুছিয়ে নিতে লাগল।

শংকর চাইলো আকাশের দিকে। তেমনি অন্ধকার আকাশ।

এতোটুকু আলোর চিহ্ন মাত্র নেই। মনে পড়লো চেয়ারম্যানের সেই কবিতাটা। তিনি লিখেছিলেন :

আজও আমার সব কিছু মনে আছে
মনে আছে আমার বত্রিশ বছর আগের এই গাঁয়ের কথা।
অত্যাচারী জমিদার জোতদাররা তাদের কালো হাত তুলে
নির্মমভাবে চাবুক মারত যে সব চাষীদের পিঠে
আজ সেইসব চাষীদের ঘরে ঘরে লাল পতাকা উড়ছে।
বহুলোকের আত্মত্যাগের ফলেই
জয়ী হয়েছে আজ আমাদের ইচ্ছা।

—কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার ডাকে তার দিকে চাইল শংকর। ও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কথা বলল না সে। নীরবে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

—আপনি তো আগামীকাল সকালেই চলে যাচ্ছেন? মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ও।

—কমরেডরা ফিরে এলেই জানতে পারবো।

—ক্ষণিক আগের যে দুর্বলতাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছি তার জন্যে কিছু মনে করবেন না। আমি এখনও অজ্ঞ থেকে গেছি। কিন্তু আমি জানি, এ দুর্বলতাটুকু নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠতে পারবো। বিদায়!

—আপনার আলোটা নিয়ে যান।

—ওটা আপনার কাজেই রেখে যেতে বলেছেন কমরেডরা।

পাহাড়ী পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল কৃষ্ণাম্মা। ক্ষণিক পরে তাকে আর দেখা গেল না। শংকর দাঁড়িয়ে রইলো।

মার্কস বলেছেন, আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা (গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কর্তা) আর কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে ; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির ধ্বংস প্রাপ্তিতে।

ভূতপূর্ব ঐতিহাসিক যুগগুলিতে প্রায় সবত্র আমরা দেখি, সমাজে বিভিন্ন বর্গের একটা জটিল বিন্যাস, সামাজিক পদমর্যাদার নানাবিধ ধাপ। প্রাচীন রোমে ছিল প্যাট্রিশিয়ান, যোদ্ধা (knights), প্লিবিয়ান, এবং ক্রীতদাসেরা ; মধ্য যুগে ছিল সামন্ত প্রভু, অনু-সামন্ত (vassals), গিল্ড্ কর্তা, কারিগর, শিক্ষানবিশ কারিগর এবং ভূমিদাস, এইসব শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে আবার আভ্যন্তরীণ স্তরভেদ।

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার মধ্যে শ্রেণী বিরোধ শেষ হয়ে যায়নি। এ সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণী, অত্যাচারের নতুন অবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নতুন ধরণ।

আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কিন্তু এই একটা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে ; শ্রেণী-বিরোধ এতে সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটি বিশাল শত্রু শিবিরে ভাগ হয়ে পড়েছে, ভাগ হচ্ছে পরস্পরের সম্মুখীন দুই বিরাট শ্রেণীতে - বুর্জোয়া (আধুনিক পুঁজিপতি-শ্রেণী, সামাজিক উৎপাদনের মালিক এবং মজুরি-শ্রমের নিয়োগ কর্তা) এবং প্রলেতারিয়েত (মজুরি শ্রমিকেরা, উৎপাদনের উপায় নিজেদের

হাতে না থাকার দরুন যারা বেঁচে থাকার জন্য স্বীয় শ্রম-শক্তি বেচতে বাধ্য হয়)।

বলেছেন বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেইখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতি-শোভন সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। যে সব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ উর্ধ্বতনদের কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন, নবিকার 'নগদ টাকার' বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাব নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্ম-উন্মাদনার স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ ও কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যক্তি-মূল্যকে এরা পরিণত করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা এনে খাড়া করল ওই একটিমাত্র নির্বিচার স্বাধীনতা—অবাধ বাণিজ্য। এক কথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রমে যে শোষণ এতদিন ঢাকা ছিল, তার বদলে এরা এনেছে নগ্ন নির্লজ্জ সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।

মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের মহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী—সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরী-ভোগী শ্রমজীবি রূপে।

বুর্জোয়া শ্রেণী পরিবার প্রথা থেকে তার ভাবালু ঘোমটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, পারিবারিক সম্বন্ধকে পরিণত করেছে একটা নিছক আর্থিক সম্পর্কে।

বলেছেন, সাধারণভাবে মালিকানার উচ্ছেদ নয়, বুর্জোয়া মালিকানার উচ্ছেদই কমিউনিষ্টের বৈশিষ্ট্য সূচক দিক। কিন্তু শ্রেণী-বিরোধের উপর, অল্প লোকের দ্বারা বহুজনের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন এবং উৎপন্ন দখলী ব্যবস্থার চূড়ান্ত ও পূর্ণতম প্রকাশ হল আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত মালিকানা।

এই অর্থে কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে : ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ।

বলেছেন, আমরা ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান চাই শুনে আপনারা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। অথচ আপনাদের বর্তমান সমাজে জনগণের শতকরা নব্বইজনের ব্যক্তিগত মালিকানা তো ইতিমধ্যেই লোপ পেয়েছে ; অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে সম্পত্তির একমাত্র কারণ হল ঐ দশভাগের নয়ভাগ লোকের হাতে কিছুই না থাকা। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ দাঁড়ায় এই যে, সম্পত্তি অধিকারের এমন একটি রূপ আমরা তুলে দিতে চাই যা বজায় রাখার অনিবার্য সর্ত হল সমাজের বিপুল সংখ্যাধিক্য লোকের সম্পত্তি না থাকা।

এক কথায়, আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের অভিযোগ এই যে, আপনাদের সম্পত্তির উচ্ছেদ আমরা চাই। ঠিক কথা, আমাদের সংকল্প ঠিক তাই-ই।

বলেছেন, আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণাবোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল, সমস্ত প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফৎ। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করার জন্য আছে সারা জগৎ।

এই মহৎ উদ্দেশ্যেই ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্যারিস কমিউন ছিল মহান, যুগান্তকারী বিপ্লব। পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার জন্য সর্বহারার যে প্রচেষ্টা, তারই

প্রথম পৃথিবীব্যাপী গুরুত্বসম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মহড়া ছিল এই প্যারিস কমিউন।

কিন্তু প্যারিস কমিউনের লক্ষ্য অপূর্ণ থেকে গেল। ভার্সাই হতে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে 'কমিউন' যখন পরাজয়ের মুখে, তখন মার্কস বলেছিলেন :

"কমিউন যদি বিনষ্ট হয়,—সংগ্রাম স্থগিত হইবে মাত্র। কমিউনের তত্ত্বগুলি চিরন্তন অবিনাশী; শ্রমিকশ্রেণী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ তত্ত্বগুলি দেখা দিবে বরাংবার।"

এখন, কমিউনের সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন নীতি কি ?

মার্কসের বক্তব্য অনুসারে তা হল, "পূর্বে তৈয়ারী রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধুমাত্র হাতে তুলিয়া লইয়াই শ্রমিকশ্রেণী উহা নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে না। অর্থাৎ কিনা, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করিবার জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে বৈপ্লবিক উপায় প্রয়োগ করিয়া বুর্জোয়াদের সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক যন্ত্র বিধ্বস্ত করিতে হইবে এবং বুর্জোয়া একনায়কত্বের স্থলে সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপন করিতে হইবে।"

প্যারিস কমিউনের অপূর্ণ লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত ছেচল্লিশ বছর পরে, লেনিনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মহান অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) মধ্যে জয়যুক্ত হল। লেনিনের পতাকাতলে অক্টোবর বিপ্লবের পতাকাতলে, আরম্ভ হল পৃথিবী জোড়া এক নতুন বিপ্লব,—সর্বহারার বিপ্লব সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করল।

সাম্রাজ্যবাদী শয়তানেরা এই সম্ভাবনাকে মুছে ফেলার জন্য কম চেষ্টা করেনি। তারা রুশ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নবজাত সোবিয়েত রাষ্ট্রটিকে গলা টিপে মারার চেষ্টা করেছিল, চালিয়েছিল সশস্ত্র আক্রমণ। কিন্তু বীর রুশ শ্রমিকশ্রেণী দেশের মধ্যস্থ প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিলেন। পৃথিবীর প্রথম মহান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে সংহত করে তুলেছিলেন।

লেনিনের আহ্বান [illegible] সাম্রাজ্যবাদী

যুগের ঐতিহাসিক অবস্থায় সর্বহারার বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্ব সম্বন্ধে লেনিন কতকগুলি অবিসংবাদিত সত্য উদ্ঘাটন করেছিলেন। লেনিন দেখিয়েছিলেন যে, ক্ষুদ্র সংখ্যক পুঁজিতন্ত্রী শাসকের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবানেরা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণকে শোষণ করে; কেবল তাই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে তারা উৎপীড়ন ও লুণ্ঠন চালায়, প্রায় সমস্ত দেশকে তারা নিজেদের উপনিবেশ ও অধীন রাজ্যে পরিণত করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হল, সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির অনুবৃত্তি। সাম্রাজ্যবাদীদের লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হবার নয়। আন্তর্জাতিক বাজার, কাঁচামালের উৎস ও অর্থলগ্নী করার ক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের যে লালসা তা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হবার নয়। এই লালসার জন্য এবং পৃথিবীকে নতুন করে ভাগাভাগি করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বযুদ্ধ বাধায়। এই পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিতন্ত্রের অস্তিত্ব যতকাল থাকবে, ততকাল যুদ্ধের উৎসগুলির সম্ভাবনাও বজায় থাকবে। যুদ্ধের উৎস কি তা বোঝাবার কাজে এবং শান্তির জন্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে জনগণকে পরিচালিত করতে হবে সর্বহারা শ্রেণীকেই।

তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে "সাম্রাজ্যবাদ হইল একচেটিয়া, পরগাছা স্বরূপ, বা ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতকল্প পুঁজিতন্ত্র, ইহা হইল পুঁজিতন্ত্র বিকাশের চূড়ান্তপর্ব, অতএব ইহা সর্বহারা বিপ্লবের পূর্বাহ্ন। সর্বহারার মুক্তি আসিতে পারে একমাত্র বিপ্লবের পথে, উহা নিশ্চয়ই সংস্কারবাদের পথে আসিতে পারে না। উপনিবেশগুলির ও পরাধীন দেশগুলির জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পুঁজিতন্ত্র দেশগুলির সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের মৈত্রী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের মৈত্রীটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে ঐ মৈত্রী; অতএব ঐ মৈত্রী যে সমগ্র পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবসান ঘটাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী।"

সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগের ঐতিহাসিক অবস্থায় লেনিন মার্কসবাদকে এক নতুন পর্য্যায়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও মানুষকে পথ দেখিয়েছিলেন—যে পথে অগ্রসর হলে তারা সত্যই পুঁজিতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী, দাসত্ব ও দারিদ্র ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে।

মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় আমাদের এ যুগটা হল সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগ, সমাজতন্ত্র ও কমিউ-নিজমের বিজয়ের যুগ; বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সহাবস্থানের যুগ নয়।

কবিতা লিখেছেন লেনিন, জীবনের প্রথম এবং শেষ কবিতা। এই কবিতার জন্ম ১৯০৭ সালে ফিনল্যাণ্ডের বাল্টিক নদী তীরস্থ সেই ভিস্তা গ্রামের এক পর্ণ কুটিরে। তখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন ওখানে। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়, তাঁর লেখা একটি কবিতায়। লিখেছেন :

সে এক ঝড়ো বছর। ঝঞ্ঝা ছেয়ে ফেলল
সারা দেশ। ছিন্ন ভিন্ন হল মেঘ,
ঝড় ভেঙ্গে পড়ল আমাদের উপর, তারপর শিলাবর্ষণ
আর বজ্রপাত।
ক্ষতগুলি হাঁ হয়ে রইল ক্ষেতে আর গ্রামে
আঘাতের পর আঘাতে।
ঝলকাতে লাগল বিদ্যুৎ, হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠল
সেই ঝলকানি
উত্তাপ জ্বলতে লাগল নির্মম, দমবন্ধ হয়ে এল বুকের।
আর আগুনের আভা আলোকিত ক'রে তুলল
নক্ষত্রহীন রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার।

সারা সৃষ্টি, সমস্ত মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে গেল
এক থমথমে উদ্বেগে পীড়িত হতে থাকল সমস্ত হৃদয়

বুকগুলি যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করতে লাগল
চেপে বন্ধ হয়ে গেল শুকনো সব মুখ।
রক্তাক্ত ঝড়ে হাজার হাজার শহীদ হারাল প্রাণ
কিন্তু বৃথাই দুঃখ সয়নি তারা, বৃথাই পরেনি কাঁটার মুকুট।
মিথ্যা আর অন্ধকারের রাজ্যে ভণ্ডদাসদের মধ্যে
তারা পথ চ'লে গেল ভবিষ্যতের মশালের মতো।

আগুনের ফলকে, অনির্বাণ এক ফলকে
তারা এঁকে দিয়ে গেছে আমাদের সামনে আত্মোৎসর্গের পথ
জীবনের সনদে, তারা ঘৃণার শীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে
দাসত্বের জোয়ালের উপর, শৃঙ্খলের লজ্জার উপর।

মে মাসের সকালের মত এক রক্তিম প্রত্যূষ
উঠল পাণ্ডুর বিষণ্ণ আকাশে
ঝকমকে সূর্য তার রশ্মির তলোয়ারে
ফেড়ে ফেলল মেঘ, ছিঁড়ে গেল কুয়াশার শবাচ্ছাদন—
পৃথিবীর সমুদ্র গহ্বরে বাতিঘরের দীপ্তির মতো,
প্রকৃতির বেদীমূলে কোনো অজানা হাতে চিরকালের
জন্যে জ্বালানো হোমাগ্নির মতো
নিদ্রিত মানুষকে আকর্ষণ করল সে আলোকের দিকে।
উদ্দীপ্ত রক্ত থেকে জন্ম নিল রাঙা গোলাপ,
লাল লাল ফুল, ফুটে উঠল তারা,
বিস্মৃত কবরগুলোর উপর
তারা পরাল গৌরব-মুকুট।
মুক্তি রথের পিছনে
লাল নিশান উড়িয়ে
নদীর মত প্রবাহিত হল জনতা
যেমন ক'রে জেগে ওঠে জলস্রোত।
লাল পতাকা স্পন্দিত হল শোভাযাত্রার উপর,

মুক্তির পবিত্র স্তোত্র উঠল আকাশে,
জনগণ গান গাইতে লাগল প্রেমের অশ্রু ফেলে,
শোক যাত্রার গান তাদের শহীদদের স্মরণে।
জনগণ আনন্দে উচ্ছল,
তাদের হৃদয় ছাপিয়ে গেল আশায় আর স্বপ্নে
সবাই বিশ্বাস করল আগত মুক্তিতে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ থেকে কিশোর পর্যন্ত সবাই।

অন্ধকারের শক্তিরা ছায়ায় গুঁড়ি মেরে ছিল,
ধুলোর মধ্যে বুকে হেঁটে ফোঁস ফোঁস করছিল;
ওৎ পেতে ছিল তারা।
হঠাৎ তারা তাদের দাঁত আর ছুরি বসিয়ে দিল
বীরেদের পিঠে আর পায়ে।
জনগণের শত্রুরা নোংরা মুখ দিয়ে
পান ক'রে নিল উষ্ণ নির্মল রক্ত,
মুক্তির নিষ্কলুষ বন্ধুরা তখন
কঠিন পথ ভ্রমণে অবসন্ন,
যখন তন্দ্রাতুর আর নিরস্ত্র তখন হঠাৎ আক্রান্ত হল তারা।

আলোর দিন অদৃশ্য হল,
সীমাহীন অভিশপ্ত একসার কালো দিন জুড়ল তার জায়গা।
মুক্তির আলো আর সূর্য গেল নিভে,
অন্ধকারে উদ্যত হয়ে রইল এক সর্পদৃষ্টি।
জঘন্য হত্যাকাণ্ড, সাম্প্রদায়িক পীড়ন, কুৎসার উৎক্ষেপ
ঘোষিত হচ্ছে দেশপ্রেম ব'লে
কালো ভূতের দল উৎসব করছে
এক বল্গাহীন অশ্রদ্ধায়,
যারা প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে
যারা বিনা কারণে বিনা দয়ায়

বিশ্বাসঘাতী আঘাতে নিহত হয়েছে
তাদের—সেই সব জ্ঞাত অজ্ঞাত শিকারের রক্তে ওরা লিপ্ত।

.

ছিন্ন পদদলিত মুক্তির ফুল
আজ বিনিষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে একেবারে,
কালোরা আলোর পৃথিবীর সন্ত্রাস দেখে উল্লসিত,
কিন্তু ঐ ফুলের ফল জন্মদাত্রী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।
মায়ের জঠরে আশ্চর্য সেই কণিকা
দৃষ্টির অন্তরালে গভীর রহস্যে নিজেকে জীইয়ে রেখেছে,
মাটি তাকে পুষ্ট করবে, সে উত্তাপ পাবে মাটির ভিতরে,
তারপর আবার নতুন এক জীবনে জন্মাবে সে।
নতুন মুক্তির উন্মুখ বীজ বহন করবে সে,
ভেঙে ফেলবে বরফের আস্তরণ,
বেড়ে উঠবে, বিরাট মহীরুহ হয়ে জগৎকে আলোকিত
করে তুলবে তার লাল পত্র বিস্তারে,
সারা জগৎকে, আর জড়ো করবে তার ছায়ার তলে সমস্ত
জাতির জনগণকে।

অস্ত্র ধরো, ভাইরা! সুখের দিন কাছে।
সাহসে বুক বাঁধো! ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধে এগিয়ে চলো!
তোমাদের মনকে জাগাও! হীন ভীরু ভয়কে তাড়িয়ে
দাও তোমাদের হৃদয় থেকে!
দৃঢ় করো ব্যূহ! স্বৈরাচারীদের আর প্রভুদের বিরুদ্ধে
সকলে একসঙ্গে দাঁড়াও!
বিজয় ভাগ্য তোমাদের সবল শ্রমিক-বাহুর মধ্যে!
সাহসে বুক বাঁধো! এই দুর্গতির দিন শিগগিরই দূর হবে!
ওঠো তোমরা সবাই মিলে মুক্তি-পীড়কদের বিরুদ্ধে!
বসন্ত আসবে····· আসছে সে······এসে গেছে সে।

আমাদের বহু আকাঙ্খিত অপূর্ব সুন্দর সেই লাল মুক্তি
এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে !

স্বৈরশাসন, জাতীয়তাবাদ, গোঁড়ামি,
অকাট্য ভাবে প্রমাণ করেছে তাদের গুণরাজি ;
তাদের নামে ওরা আমাদের মেরেছে, মেরেছে, মেরেছে !
ওরা কৃষককে আঘাত করেছে তার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত,
ওরা ভেঙে দিয়েছে দাঁত,
ওরা শৃঙ্খলিত মানুষকে কবর দিয়েছে বন্দীশালায়,
ওরা লুট করেছে, ওরা খুন করেছে·········
আমাদের মঙ্গলের জন্যে, আইন অনুসারে,
জারের গৌরবের জন্যে, সাম্রাজ্যের সম্মানের জন্যে !

হে সৈন্যরা, একগ্লাস ভদ্‌কার মধ্যে
ডুবিয়ে দাও তোমাদের অনুশোচনা !
হে বীরবৃন্দ, চালাও গুলি শিশু আর নারীর উপর !
তোমাদের ভাইয়েদের হত্যা করো যত বেশী পারো,
যাতে তোমাদের ধর্মবাপ খুশি হতে পারেন !
আর যদি তোমার আপন বাপ গুলি খেয়ে পড়ে
তবে ডুবে যাক সে তার নিজের রক্তে,
কেন—এর হাতে ঝরানো রক্তে !
জারের মদ খেয়ে পশু বনে
তোমার আপন মাকে খুন করো বিনা দয়ায় !
তোমার জহ্লাদদের নিয়ে,
হে স্বৈরাচারী, চালাও তোমার রক্তাক্ত ভোজের উৎসব,
হে রক্ত শোষক, তোমার লুব্ধ কুকুরদের লাগিয়ে
কুরে কুরে খাও জনগণের মাংস !
হে স্বৈরাচারী, আগুন বুনে দাও।

আমাদের রক্ত পান করো, রাক্ষস!
মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি জাগো।
ওড়ো তুমি, লাল নিশান!
আর তোমরা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করো, সাজা দাও,
শেষবারের মতো আমাদের পীড়ন করো!
শাস্তি পাওয়ার সময় নিকটে,
বিচার আসছে। জেনে রাখো!

মুক্তির জন্যে
আমরা যাব মৃত্যুর মুখে, মৃত্যুর মুখে,
আমরা ছিনিয়ে নেব ক্ষমতা আর মুক্তি
পৃথিবী হবে জনগণের!
অসফল সংগ্রামে
প্রাণ হারাবে অসংখ্য লোক!
তা সত্ত্বেও চলো আমরা এগিয়ে চলি
বহু-বাঞ্ছিত মুক্তির দিকে!
হে শ্রমিক! এগিয়ে চলো!
তোমার সৈন্যবাহিনী চলেছে যুদ্ধে
স্বাধীন শ্রমের জন্যে।
তাদের দৃষ্টি জ্বলছে ভয়াল।
আকাশ পর্যন্ত বাজিয়ে তোলো
শ্রমের মৃত্যুঞ্জয়ী ঘণ্টা!
আঘাত করো, হাতুড়ি, আঘাত করো অবিরাম!
অন্ন! অন্ন! অন্ন!
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো, কৃষকেরা
জমি ছাড়া তোমরা বাঁচতে পারো না।
প্রভুরা কি তোমাদের পিষ্ট করবে এখনও,
তারা কি তোমাদের পীড়ন করবে এখনও অনেক কাল?
এগিয়ো চলো, এগিয়ে চলো ছাত্ররা!
তোমাদের অনেক ধ্বংস হবে সংগ্রামে।

লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবে
যুদ্ধে নিহতদের শবাধার !
এগিয়ো চলো, এগিয়ে চলো, ক্ষুধিতেরা !
এগিয়ে চলো, নিপীড়িতেরা !
এগিয়ে চলো অপমানিতেরা,
মুক্ত জীবনের দিকে !
উপর ওয়ালা জন্তুদের জোয়াল
আমাদের লজ্জা !
চলো, ইঁদুর গুলোকে তাড়াই তাদের গর্ত থেকে ।
চলো যুদ্ধে, হে সর্বহারা !
নিপাত যাক দুঃখ-দুর্দশা !
নিপাত যাক জার আর তার সিংহাসন !
নক্ষত্রখচিত মুক্তির প্রত্যুষ ঐ দেখো
ঝকমক করে তার দীপ্তি ।
সুখ আর সত্যের রশ্মি
জনগণের চোখের সামনে ফুটে ওঠে ।
মুক্তির সূর্য মেঘ ভেদ করে আলোকিত করবে আমাদের ।
জারের দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্যে
"দূর হও, ভাগো তোমরা"
বলবে পাগলাঘণ্টির জোরালো স্বর
মুক্তিকে আবাহন করে ।
নিপীড়ন, ওখরানা,
চাবুক, ফাঁসি কাঠ, নিপাত যাক !
মুক্ত মানুষের সংগ্রাম, তুমি আগল ভেঙে বেরোও !
অত্যাচারীরা ধ্বংস হোক তোমাদের !
একা নির্মূল করি
স্বৈরাচারের শক্তিকে ।
মুক্তির জন্যে মৃত্যু হল সম্মান,
শৃঙ্খলিত জীবন ধারণ হল লজ্জা ।

এসো ভেঙে ফেলি দাসত্ব,
গোলামির লজ্জা।
হে মুক্তি, আমাদের দাও
পৃথিবী আর স্বাধীনতা।

২৮শে মে, '৮৭১ সালে প্যারী কমিউনকে রক্তের গঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী নায়করা দর্পভরে ঘোষণা করেছিল যে, সমাজতন্ত্রকে তারা চিরদিনের মত খতম করে দিয়েছে। কিন্তু কমিউনের মূল তত্ত্বের বিনাশ নেই, তা অবিনশ্বর, প্রমাণ করলেন লেনিন। সর্বহারার স্বাধীনতা এল রাশিয়ায়। মার্কস ও লেনিনের পথ অনুসরণ করে মুক্তি এল চীনে, বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে। আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতা।

নকশালবাড়ির সংগ্রাম তো স্বাধীনতার-ই সংগ্রাম। মুক্তি যুদ্ধ। কিন্তু, কেন এই সংগ্রাম? আমরা কি পরাধীন? তাহলে?

চিন্তা করেছে শংকর। দিনের পর দিন। মানুষের দুঃখ, দুর্দশা তাকে ব্যথিত, চঞ্চল করেছে। পথ খুঁজেছে সে, মুক্তির পথ। তার নিজের, সকলের। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নির্যাতিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছে। অন্যায় শোষণ আর উৎপীড়নের অবসান চেয়েছে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও,' এর স্বপ্ন দেখেছে। একটি নির্মল, উজ্জ্বল স্বপ্ন।

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল। মুক্ত হল ভারতবর্ষ। সাম্রাজ্যবাদী

ইংরেজের বুটের নিষ্পেষণ থেকে বেরিয়ে এল ভারতবর্ষের মানুষ। স্বাধীন মানুষ। আশা, স্বপ্ন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় সার্থক মানুষ। কারণ মানুষ জেনেছে, মানুষকে বোঝান হয়েছিল, যত নষ্টের মূলে ইংরেজ। ইংরেজকে যদি দেশ থেকে তাড়ানো যায়, তাহলে ভারতবর্ষে সুখের দিন ফিরে আসবে। দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটবে। মানুষ দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবে, ভবিষ্যতের বংশধরেরা অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে থাকবে না আর। শুধু ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই হল। ইংরেজ চলে গেলেই বাঁচার অধিকার ফিরে পাবে মানুষ।

কংগ্রেস বুঝিয়েছে মানুষকে। কংগ্রেস স্বপ্ন দেখিয়েছে মানুষকে। কংগ্রেস ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঘর থেকে টেনে বার করে এনেছে মানুষকে।

মানুষ শুনেছে কংগ্রেসের কথা। সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশকে, জাতিকে, দুঃখ দুর্দশার অভিশাপ মুক্ত করতে চেয়েছে। জেলে গেছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে, প্রাণ দিয়েছে গুলিতে বুক পেতে দিয়ে। শুধু দেশ নয়, জাতির মুক্তিও কাম্য ছিল মানুষের, অমর বীর শহীদদের।

কিন্তু যাঁরা শহীদ হলেন তাঁরা অমর হতে পারলেন না। মানুষ ভুলে গেল তাঁদের কথা, ভুলে যেতে বাধ্য হল মানুষ। অকৃতজ্ঞ মানুষ। শুধু বই-এর পাতার মধ্যে বেঁচে রইলেন তাঁরা, সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দল। যাঁরা মানবমুক্তির জন্য হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। যাঁরা ফাঁসীর দড়ি গলায় পরে বলেছিলেন, বন্দেমাতরম্। শুধু প্রস্তর মূর্তি হয়ে রইলেন তাঁরা।

আবার অনেক শহীদ হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অন্ধকারে। মানুষ তাঁদের কথা জানে না। তাঁদের নামও শোনেনি কোনদিন। অনামী, অখ্যাত সেই সব বীরের দল মানবমুক্তির জন্যেই জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

অকৃতজ্ঞ মানুষের দল মুক্তিকামী সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেদের কথা হেলায় ভুলে গেল। যাঁরা বিদেশী শাসকদের নাগপাশ থেকে দেশকে, জাতিকে মুক্ত করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জীবন দিয়ে গেলেন, তাঁদের কথা মনে রাখার দায়িত্ব অনুভব করল না মানুষ।

কিন্তু কেন? কেন মানুষ অকৃতজ্ঞ হল? কেন ভুলে গেল অমর শহীদ সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী বীরেদের কথা? কেন? কেন? কেন?

মানুষ কি চেয়েছিল? দেশের মুক্তি? স্বাধীনতা? আমরা বুক ফুলিয়ে বলবো, আমরা স্বাধীন-মুক্ত, পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ছিঁড়ে ফেলেছি। বিদেশী শাসকদের সাধ্য হয়নি আমাদের শৃঙ্খলিত করে রাখার।

আমরা কখনো আধপেটা খাবো, কখনো খাওয়া জুটবে না। আমাদের আশ্রয় থাকবে না। রোগে, বিনা চিকিৎসায় মরবো। সন্তানরা পাবে না শিক্ষা। ঘরের ইজ্জত লুটাবে পথের ধূলায়। তবু বলবো, আমরা পরাধীন নেই, স্বাধীন। স্বাধীনতা আমাদের গর্বের, অহঙ্কারের। আমরা স্বাধীন।

মুক্ত ভারতবর্ষের মুক্ত মানুষ!

বিদেশী শাসকদের পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করে রক্তের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি। আমরা শপথ নিয়েছি স্বপ্নময় ভারতবর্ষ গড়ে তোলার।

আমরা নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষের দল, অবিচার অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের দল, বেঁচে থাকবার অধিকার হারা মানুষের দল। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলব, আমরা স্বাধীন।

কংগ্রেস আমাদের এ স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। কংগ্রেসের পতাকাতলে ভারত-মুক্তির আন্দোলন সফলতালাভ করেছে। সার্থক হয়েছে সংগ্রাম। মুক্ত হয়েছে ভারতের জনগণ। ভারত-মুক্তির দাবীদারের অধিকারী একমাত্র কংগ্রেস।

আর কিছু দেয় নি ? শুধু স্বাধীনতা। কংগ্রেস আর কিছু করেনি ?

করেছে বৈকি, নিশ্চয়ই করেছে। যে কাজ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অসাধ্য ছিল, সেই কাজ কংগ্রেস হাসতে হাসতে বিনা আয়াসে সমাধা করেছে। খদ্দরধারী সুচী ও শুভ্রতার প্রতীক কংগ্রেসীরা মানুষের জীবনকে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পেটের জন্যে নারীর পবিত্রতা হরণ করে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য করিয়েছে।

আমরা উন্নত হচ্ছি. আমরা সভ্যতার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করতে ক্রমশঃ এগিয়ে চলছি, যন্ত্রশিল্পে স্বয়ং-নির্ভর হচ্ছে ভারতবর্ষ, আর পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে দারস্থ হচ্ছি বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারে।

কংগ্রেসের দৌলতে মানুষ কি পেয়েছে আর কি পায়নি তার হিসাব দেওয়া শক্ত। অভাব অনটন, অশিক্ষা অনাহার, বেকারত্ব—কি পায়নি মানুষ ? যা মানুষের অকাম্য ছিল [illegible] পাওয়া হয়েছে।

দেশটা কি তাহলে রসাতলে গেছে ? মানুষ কি কিছুই পায়নি ?

নিশ্চয়ই পেয়েছে। গরীব হয়েছে আরো গরীব, ধনী আরো ধনী। সহরে একের পর এক সৌধ উঠেছে, গ্রামের পর্ণ কুটীরে নেমেছে ভাঙন

অথচ কংগ্রেস একদিন মানুষকে শুনিয়েছিল নতুন কথা। মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রামের শপথ নিয়েছিল তারা। বলেছিল, দেশ থেকে অশিক্ষা আর অনাহার দূর করা হবে। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ হবে একজাতি, একপ্রাণ। ধনী দরিদ্রের বিভেদ নয়, জাতি ধর্মের ভেদও থাকবে না।

যে হরিজনদের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর দরদের শেষ ছিল না, যাদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, সেই হরিজনরা আজও সমাজে পরিত্যক্ত। বর্ণহিন্দুর অত্যাচারে তেমনি পিষ্ট। তাদের ভুলের ক্ষমা নেই। সমান ঘৃণা, অবজ্ঞা ও অবহেলা তারা সহে যাচ্ছে। তাদের পিটিয়েও যদি মারা হয়, গান্ধী শিষ্যের দল নীরব থাকে।

নীরব থাকে না শুধু ধনীর স্বার্থহানীর ব্যাঘাত ঘটলে। শান্তি-রক্ষকের দলকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। নিরস্ত্র মানুষের বুকের রক্তে ভিজে যায় মাটি। মানুষের অপরাধ, তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। প্রতিকার চেয়েছিল তাদের দাবীর মাধ্যমে।

কিসের প্রতিবাদ? কোন্ অধিকারে? ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের প্রতিবাদের অধিকার কোথায়? স্বাধীন দেশ। ধনী দরিদ্র সব সমান। এখানে প্রতিবাদ, প্রতিকার বে আইনী।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে না। ধনী যদি তাদের বুকের রক্তের বিনিময়ে আরো ধনী হয়, সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। মুনাফাখোরের দল যদি খাদ্যে ভেজাল দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়--তাই তাদের খেতে হবে। নিজের উপায়ে যদি সংসারের অভাব না মেটে, তাহলে স্ত্রী-কন্যাকে দেহ ব্যবসায়ে নামাতে হবে। কৃষকের জমির ধান যদি জোতদার, জমিদার নিজের খামারে তোলে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। কারণ, ধান কেটে তুলে দিয়ে চাষীর পরিশ্রমটুকু জোতদার জমিদার দয়া করে বাঁচিয়ে দেয়। শ্রমিক যদি তার পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য না পায়, তবুও তাকে চুপ করে থাকতে হবে। অফিসের কেরাণী যদি গিয়ে শোনে, তার মাড়োয়াড়ী প্রভু রাতারাতি শান্তি রক্ষকদের সহায়তায় অফিস তুলে নিয়ে গেছে, তাহলে তাকে নীরবে বাড়ী ফিরে আসতে হবে। সংসারের অনেকগুলি প্রাণীকে উপবাসী রেখে যে ছাত্র কলেজের শিক্ষা শেষ করল, সে যদি সারা জীবনে চাকরী না পায়, তবুও অভিযোগ করা চলবে না। শিক্ষাদানের বিনিময়ে শিক্ষকের যদি পেট না ভরে, তিনি সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কারণ, বিপক্ষ রাজনীতি বড় ভয়ঙ্কর! সর্বোপরি যারা বেকার হচ্ছেন তাঁরা কোনরকম আন্দোলনের ধারে কাছে যাবেন না! ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই হবে তাঁদের পক্ষে শ্রেয়।

কিন্তু ভিক্ষা দেবে কে ?

যাঁরা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বাস করেন, নামী হোটেলে দামী খানা খান, দামী মোটরে চড়েন, ক্লাবে পার্টিতে গিয়ে দামী মদ খেয়ে সুন্দরী বান্ধবীর বক্ষলগ্ন হয়ে জাজসঙ্গীত সহযোগে বিদেশী নাচ নাচেন, তাঁরা ? না—যারা রাতের অন্ধকারে দিনের হিসাব করে, মানুষের রক্তশোষনের চক্রান্ত করে—তারা ?

কারা ভিক্ষা দেবে ? কাদের দয়ার ওপর নির্ভর করে মানুষ বেঁচে থাকবে ? তারা কারা ?

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের আড়ম্বর-পূর্ণ প্রদর্শনী। লক্ষ কোটি বুভুক্ষু মানুষের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একটি জিজ্ঞাসা অন্তরের অন্তঃস্থলে গুমরে ওঠে, সত্যই কি আমরা স্বাধীন ?

না, আমরা স্বাধীন নই। কে বলল আমরা স্বাধীন ? যারা বলে আমরা স্বাধীন, হয় তারা মিথ্যা বলে, নিজেকে প্রবোধ দেয় অথবা ব্যঙ্গোক্তি করে।

আমরা স্বাধীন নই, ক্রীতদাস। আমরা স্বাধীন ক্রীতদাস। দেশটা স্বাধীন হয়েছে কিন্তু মুক্ত হইনি আমরা। ধনিক শ্রেণী আর খদ্দরধারী দালালের দল স্বাধীনতার মদ খাইয়ে আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। আমাদের পরিয়েছে সোনার শৃঙ্খল। বঞ্চনার শৃঙ্খল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসী শয়তানের দল শুধু নিজেদের পুষ্ট করেছে। দেশ, জাতি তাদের কাছে কিছু নয়, কেউ নয়।

তা যদি হবে তাহলে কি করে ওরা, অভাবক্লিষ্ট অনাহারী মানুষদের কাছে দামী সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসে বলে, 'এখনও আমাদের অনেক

ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দেশ যতদিন না সর্ব বিষয়ে স্বয়ং নির্ভর হচ্ছে ততদিন আমাদের অভাব আর দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমার দেশের মানুষ সব কিছু হাসিমুখে বরণ করবেন। আমাদের ব্রত উদ্‌যাপনে সহায় হবেন।

তারপর তিনি নামী হোটেলে গিয়ে ওঠেন। খাবার টেবিল সাজানো হয়। খানা পিনা চলে! দুখানা শুকনো রুটি নয়, মুরগী মসল্লম, কাবাব, কারী, বিরিয়ানী। হরেকরকম মশলাদার রান্না। কোনটা চাখেন তিনি, কোনটায় হাতও দেন না।

খদ্দরধারী দোহারের দল একশোবার হাত কচলে বলেন, ম্যাডাম, আজ যা বক্তিমেটা আপনি ঝেড়েছেন না, শুনে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল।

দেবী হাসিমুখে দোহারের দিকে তাকান। জিজ্ঞাসা করেন, ভাল লেগেছে তোমার?

—ভাল কি ঠাকুরুণ! মাইরী বলছি, আমার বেশ একটু গর্ব ছিল, আমি একজন ভাল বক্তা। অন্ততঃ আপনার থেকে। কিন্তু আপনার গুণের কাছে আমি শিশু। ইচ্ছে হয় আপনার নাতি হয়ে কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে বাওয়া-বাওয়া করি। মাইরি বলছি আমি······

থামিয়ে দিয়ে দেবী বলেন, ধরতে পারেনি তাহলে?

হা-হা করে হেসে ওঠে দোহার। ভুঁড়ি নাচে, নাচে হাতের অমৃত পাত্র, নাচে ক'বছরে লালিত মেদ। হাসে আর হাসে। অন্যান্য দোহাররাও হাসিতে যোগ দেয়। সমস্ত ভোজ সভায় হাসির হর্‌রা ওঠে। হাসি হাসি আর হাসি। দুঃখ নয়, আনন্দ। হাসি জীবনী শক্তি।

দেবী অসন্তুষ্টা হন। হাতের অমৃতপাত্র অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এত হাসির কি ঘটলো? হোয়াট মেক্‌স্ য়্যু লাফ?

[illegible] দেবী রুষ্টা হয়েছেন। রোষ বহ্নি ছুটতে সুরু হলে রক্ষা নেই।

—এতো হাসি কেন? চিৎকার করে ওঠেন তিনি।

—হাসি পাচ্ছে বলে, ম্যাডাম। নিরীহ, ভালমানুষী উত্তর দোহারের।

—দেশের লোক দুবেলা খেতে পাচ্ছে না, পরতে পারছে না, আর আপনারা শোর-গরু খাচ্ছেন, আবার হাসছেন? দেশের এই দুর্দিনে হাসতে আপনাদের লজ্জা করে না?

—সত্যিই করে ম্যাডাম। দেশের মানুষের দুর্গতির চিত্র যখন একের পর এক আপনি তুলে ধরছিলেন, তখন সে দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আমি ডায়াসের পাশে গিয়ে ক'ঢোঁক সুধা পান করে হার্টটাকে ষ্ট্রং করে এসে তবে আপনার লেকচারটা সবটুকু শুনেছি। ম্যাডাম, আমি যদি দুঃখের কথা শুনে সহ্য করতে না পারি, তাহলে যারা প্রকৃত দুঃখের সঙ্গে লড়াই করছে, তারা সহ্য করবে কেমন করে? আমি নিজে ধরতে পারিনি আপনার ছিঁচকাঁদুনী, ওরা ধরবে কেমন করে? এত দুঃখ, তবু আপনার 'ওই ধরতে পারেনি তো'-তেই কাত হলুম। সত্যি ম্যাডাম, আপনি বড় সোজা আর সরল। ধরতে পারলেই বা। ধরতে পারল তো বয়ে গেল।

—না-না, তবু.........

—একটু পান করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

চূর্ণ বিচূর্ণ পাত্রের পরিবর্তে নতুন পাত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় তাঁর হাতে। রঙিন পানীয়।

তিনি চুপ।

দোহার এবার গোঁফের আড়ালে হাসে। চুপি চুপি বলে, আপনার অনারে খোদ প্যারী থেকে পারচেজ করা ম্যাডাম।

একি সত্যি না নিন্দুকের নিন্দা প্রচার। না, সেই নীতি—যা রটে তার কিছুটা বটে।

শংকর ভেবেছে। দিনের পর দিন।

শংকর ভেবেছে। বহু বিনিদ্র রাত্রি।

শংকর পাগল হয়ে থেকেছে। দিন রাত্রি সব সময়।

শংকর পাগল ভিন্ন আর কিছু নয়। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি তার পাগলামি। মানুষ মুক্ত হবে, এক হবে, সমান অধিকারে অধিকারী হবে, মৈত্রীর বাঁধনে বাঁধা পড়বে—এ পাগলামি ছাড়া আর কি হতে পারে?

সে এই স্বপ্নই দেখেছে। মার্কস এঙ্গেলসের রচনা পাঠ করেছে। নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণের মুক্তি পথের সন্ধান পেয়েছে, পুঁজির মধ্যে দেখেছে সত্যের প্রকাশ। চরম সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য।

আর সেই সত্যের নিষ্ঠুর পরিণতিতে শিউরে উঠছে।

লাগাতার ধর্মঘট। শ্রমিক তার ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্যে ধর্মঘটের পথে এগিয়ে গেছে। যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ অন্য পথ নেই। দাবী আদায়ের একমাত্র পথ।

কিন্তু এই ধর্মঘটের পথ ব্যবহৃত হয়েছে, শ্রমিকের নয়, মালিকের স্বার্থে। লাভবান হয়েছে মালিক পক্ষ। জয়ী হয়েছে শ্রমিক, কিন্তু লাভের অঙ্ক মোটা হয়েছে মালিকের।

আপোষে নিষ্পত্তি হয়েছে বিরোধ। কিন্তু তার আগে জল গড়িয়ে গেছে বহুদূর। শ্রমিক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। খেতে না পেয়ে কোথাও বউ পালিয়ে গেছে কারো সঙ্গে, পালিয়েছে মেয়ে, পুত্র কন্যা মরেছে অনাহারে, সংসার ভেঙে গেছে। শ্রমিকের সংসার। যে সংসারের ছোট্ট গণ্ডিটার মধ্যে সেও জীবনের কোন ছোট্ট

স্বপ্ন দেখেছিল। প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের শেষে ঘরে ফিরে একটু সুখ শান্তি কামনা করতো।

সেই ভাঙা সংসারের শ্রমিক দীর্ঘদিনের যুদ্ধ শেষে জয়ী হল। মালিক মেনে নিয়েছে দাবী। আবার বিকট শব্দ করে যন্ত্র দানব জেগে উঠবে। শোষণ করবে শ্রমিকের রক্ত। উৎপন্ন ফসলে ভরে উঠবে মালিকের ঘর।

শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে পাবে অর্থ। সেই অর্থে সে নিজে বাঁচবে, রক্ষা করবে সংসার। দীর্ঘদিনের অনাহারী অর্দ্ধাহারী মানুষ গুলোর মুখে হাসি ফুটবে। শ্রমিকের তৃপ্তি, আনন্দ। শ্রমিক জয়ী হয়েছে। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের সফলতা এসেছে।

মার্কস বলেছেন, মজুরি-শ্রমের গড়পড়তা দাম হল নিম্নতম মজুরি অর্থাৎ মেহনতী হিসাবে মেহনতীর মাত্র অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার জন্য যা একান্ত আবশ্যক, গ্রাসাচ্ছাদনের সেইটুকু উপকরণ। সুতরাং মজুরি শ্রমিক শ্রম করে যেটুকু ভাগ পায় তাতে কেবল কোনক্রমে এই অস্তিত্বটুকু চালিয়ে যাওয়া ও পুনরুৎপাদন করা চলে। শ্রমোৎপন্নের উপর এই ব্যক্তিগত দখলী, যা কেবল মানুষের প্রাণরক্ষা ও নতুন মানুষের জন্ম দানের কাজে লাগে এবং অপরের পরিশ্রমের উপর কর্তৃত্ব চালাবার মতো কোনো উদ্বৃত্ত যার থাকে না, তেমন ব্যক্তিগত দখলীর উচ্ছেদ একেবারেই আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল উচ্ছেদ চাই দখলীর এই শোচনীয় প্রকৃতিটার, যার ফলে শ্রমিক বাঁচে শুধু পুঁজি বাড়ানোর জন্য, তাকে বাঁচতে হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির যতটা প্রয়োজন ঠিক ততখানি পর্যন্ত।

শাসক শ্রেনীর স্বার্থসিদ্ধির পথকে সুগম করে তোলে নেতার দল। শ্রমিককে ধর্মঘটের পথে নামায় মালিককে সাহায্য করার জন্যে। লাভবান হয় মালিক পক্ষ।

ধর্মঘটে শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি হয় পাঁচটাকা। মালিক দিতে রাজী ছিল চারটাকা। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পরে বিবেচনা করা

হবে। দাবী ছিল পনেরো টাকা। ধর্মঘটকালীন সময়ের দীর্ঘ ছ মাসে একটি পয়সাও পায়না। তবু শ্রমিক জয়ী হয়েছে। দীর্ঘদিনের অভুক্ত শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটেছে।

পূজার আগে কাপড়ের মিলে ধর্মঘট হল। দীর্ঘদিন বাদানুবাদের পর নেতারা স্থির সিদ্ধান্তে এলেন ধর্মঘট ভিন্ন দাবী আদায় করা সম্ভব নয়।

সভা হল। শ্রমিকের দল লাল পতাকা উড়িয়ে শ্লোগান দিল, ইন্‌কিলাব—জিন্দাবাদ।

নেতার দল মাইক আঁকড়ে ধরে থুতু ছিটিয়ে ভাষণ দিলেন। মার্কস এঙ্গেলসের শ্রাদ্ধ করে বুর্জোয়া শয়তানী খতম করার আহ্বান জানালেন সভাতে। শ্রমিকের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাইসব, আমরা মরবো তবু দুঃশাসনের কাছে মাথা নীচু করবো না। এ আমাদের বাঁচার লড়াই।

তারপর শ্রমিক দরদী সাচ্চা কমিউনিষ্ট নেতা দামী মোটরে অন্য একটি সভার পথে রওনা দিলেন। মোটরটি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তি। সম্পত্তির মধ্যে যা কিছু, সবই তাঁর পিতার। এসবের কিছুরই অধিকারী তিনি নন। বাড়িতে যে আহার্য্য সামগ্রী তিনি গ্রহণ করেন তাও তাঁর পিতার সম্পত্তির আয় থেকে প্রস্তুত। নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই।

তিনি কমিউনিষ্ট। তিনি সর্বহারাদের একজন। তিনি চান বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করতে। স্বপ্ন দেখেন সর্বহারাদের দুনিয়ার!

কাপড় মিলের ধর্মঘট মাস চারেক পরে মিটে গেল। শ্রমিক দরদী নেতাই মালিক পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে মিটিয়ে দিলেন

বিরোধ। মালিক বারো টাকা করে বেতন বাড়িয়ে দিতে রাজী হল। দিতে চেয়েছিল দশ টাকা। দাবী ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। জয়ী হল শ্রমিক আন্দোলন।

কিন্তু শ্রমিকদের কারো কারো কণ্ঠে অভিযোগ শোনা গেল, ধর্মঘটের ফলে লাভবান হল মালিক। পূজার মরশুমে তিন বছর আগের জমা মাল বিক্রী করতে পারল মালিক। যা তাকে একদিন কম দামে বাজারে ছাড়তে হত। এ ধর্মঘট শ্রমিকের নয়, মালিকের স্বার্থে। শয়তান মালিক পক্ষ গোডাউন ক্লিয়ার করে নিল।

আরো অভিযোগ শোনা গেল, নেতারা মালিক পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মালিককে সাহায্য করেছে। বিনিময়ে···

শংকর নিজে শুনেছে। শ্রমিকদের আলোচনা তার কানে এসেছে। কারণ, ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাকে। শ্রমিকদের মনোবল যাতে অটুট থাকে তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে সে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছে। অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। দেখেছে দুর্দশা আর হাহাকারের ছবি। দেখেছে মৃত্যু; যন্ত্রণা। কাতর আর্তনাদ। অনাহারী, ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না। মানুষ পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে।

মালিক পক্ষের দালালদের বিরুদ্ধে রুখে উঠেছে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে শ্রমিক ভাঙানো বন্ধ করেছে। যুদ্ধ করেছে মালিকের পাঠানো গুণ্ডাদের সঙ্গে।

এতো করেও পরিণতিটা তার দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে হয়েছিল। পার্টির একজন পরিচিত নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এ জয় কাদের বলতে পারেন?

তিনি তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, কেন আমাদের, আমরা জয়ী হয়েছি। মালিক পক্ষ আমাদের দাবী মেনে নিয়েছে।

—তাই কী ?

—কেন নয় ?

—শ্রমিকদের দাবী তো মেটেনি। যে জন্যে এত দুঃখ-কষ্ট, অনাহার সহ্য করলো তার কিছুই তো ওরা পেল না।

—কেন, বারো টাকা করে মাইনে তো বাড়ল ?

—মালিক পক্ষ তো দশ টাকা দিতে রাজি ছিল।

—কিন্তু যে দুটাকা আমরা বাড়াতে পেরেছি তাই কম কি ওদের কাছে।

—কমের কথা আমি বলছি না। শান্তকণ্ঠে শংকর বলেছিল, দুটো টাকা যে ওদের কাছে অনেক, আমি জানি সে কথা। কারণ, কটা মাস যে আমি ওদের দেখেছি, জেনেছি।

—তাহলে ?

—কিন্তু যে চার মাস ওরা অনাহার, দুঃখ, মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করল এই চার মাসে যতটা জীবনীশক্তি ওদের নিঃশেষ হল তার বিনিময়ে কি পেল ওরা ? আপোষে নিষ্পত্তি হল সংগ্রাম। মালিক পক্ষ দয়া করে দশের উপর দুই বাড়িয়ে দিল। এতো জয় নয়, পরাজয়। এ যুদ্ধের কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমার অন্ততঃ মনে হয় না।

—তাহলে তুমি বলতে চাইছো আমরা ভুল করেছি ?

—ভুল নয়, আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমরা আগে থেকে মালিক পক্ষকে সতর্ক করে দিয়েছি। আমরা হাত মিলিয়েছি তাদের সঙ্গে।

—হাত মিলিয়েছি। কি বলছো তুমি শংকর ? আমার মনে হয় তুমি বোধ হয় স্বাভাবিক নও। তুমি কি বলছো,একটু চিন্তা করে বল।

—আমরা মালিকের কাছে ঘুষ খেয়েছি।

—ঘুষ খেয়েছি !

—মালিক বেশ কয়েক হাজার টাকা আমাদের দিয়েছে।

—কে বললে তোমাকে এ কথা ?

—আমি জানি। শ্রমিকদের অনেকেই এ কথা বলছে।

—কারা কারা একথা বলছে তাদের তুমি চেন নিশ্চয়ই। তাদের নামগুলো তুমি আমাকে দিতে পার?

—পারি, কিন্তু দেব না। গরীব মানুষগুলো সত্যি কথা বলায় তাদের ওপর হামলা হোক, এ আমি চাই না।

—তা বলে তাদের যা ইচ্ছা তারা তাই বলবে। আমাদের পার্টির নামে অপপ্রচার চালাবে, আমরা শুনবো, দেখবো অথচ প্রতিকার করবো না, এও তো হতে পারে না।

—অতএব তাদের মারধোর করতে হবে, ঝলসে উঠেছিল শংকরের কণ্ঠ। কিন্তু তাদের কাছে প্রমাণ করতে পারবো না, তারা যা বলছে তা সত্যি নয়।

—কোম্পানী আমাদের পার্টি ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছে।

—কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়. সত্যই আমরা তাহলে ঘুষ খেয়েছি! কয়েক হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়েছি।

—একে তুমি ঘুষ বলছো কেন শংকর?

—বলছি এই কারণে, যে বুর্জোয়া শ্রেণীকে আমরা ঘৃণা করি, বুর্জোয়া শাসনের অবসান চাই, সেই বুর্জোয়াদের সাহায্যে পূর্ণ করে তুলি পার্টি তহবিল। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখেছেন কি, কাদের রক্ত জল করা অর্থ তারা আমাদের দিল? শুধুমাত্র অর্থের জন্যে কাদের সঙ্গে বেইমানী করলাম আমরা?

—বেইমানী আমরা করিনি শংকর। পার্টি চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। আমরা অর্থ চাই। শ্রমিকদের এতো অর্থ নেই যা দিয়ে তারা প্রয়োজন মেটাতে পারে। সেই জন্যেই বুর্জোয়াদের অর্থও আমাদের নিতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জেনো, দিন যখন আসবে অর্থ সাহায্য করেছে বলে বুর্জোয়ারা নিষ্কৃতি পাবে না। আমরা তাদের খতম করবই।

—কিন্তু তাকি সম্ভব হবে ?

—কেন হবে না ?

—হবে না এই জন্যে, আমাদের মনগুলো পাষাণে গড়া নয়—রক্ত মাংসের। বুর্জোয়াদের সাহায্য নিয়ে আমরা তাদের কাজকে সমর্থন জানাচ্ছি, তাদের গোলাম হয়েছি। আজ আমাদের যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের মনে বাসা বাঁধছে সন্দেহ। আমরা মুখে সর্বহারার কথা বলছি কিন্তু সর্বহারাদের একজন হতে পারছি না। আমরা তাদের মত দুঃখ বরণ করছি না, ত্যাগ স্বীকারের এতটুকু আগ্রহ নেই। সুখ স্বাচ্ছন্দকে পরিহার করায় ভয়—কিন্তু আমরা কমিউনিষ্ট. সর্বহারাদের নেতা। অন্যের অন্নে লালিত হচ্ছি, সুখ স্বাচ্ছন্দ গ্রহণ করছি। আমরা বুর্জোয়া নই কিন্তু বুর্জোয়াদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমাদের তফাৎটা কোথায় ?

—তুমি কার কথা বলছো ?

—বলছি অনেকের কথাই। আমার নিজের কথাও। কারণ, আমাদের সংসার স্বাচ্ছন্দের সংসার। অভাবের এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই। দাদাদের বন্ধুর অনেকেই ধনী। বিরাট পুঁজিপতির সন্তান কজন। তাদের আদর্শে আমার দাদারা নিজেদের পরিচালিত করে। বুর্জোয়া ভাবধারা গ্রহণ করেছে তারা। আমার দাদারা তা নয় কিন্তু তাদের অনুগামী হতে চায়, সাধ্যমত চেষ্টা করে। তাহলে দাদারা কী ? শুধু পুঁজিপতিরাই বুর্জোয়া ? বুর্জোয়া জীবনযাত্রা যারা অনুকরণ করে তারা নয় কেন ?

—নয় এই জন্যে তোমার দাদাদের বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত করা চলে না বলে।

—কিন্তু তাদের দালাল বলা চলে তো ?

—তোমার থিওরী অনুযায়ী ?

—যদি বলি, হ্যাঁ।

তিনি হেসে বলেছিলেন, আমার আপত্তি নেই।

—তাহলে যাঁরা বিলাস বাহুল্য বর্জন না করেও সর্বহারাদের একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখেন তাঁরা তাহলে কী ?

শংকরের প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নি।

আরো জানতে চেয়েছিল শংকর। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, আপনারা কি সত্য সত্যই সমস্যার সমাধান চান ?

—কে বললে চাইনা ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—আমি জানতে চাইছি। বলেছিল সে।

—সত্যি কথাটা ?

—আমি সত্য উত্তরই আপনার কাছে আশা করি।

—তার আগে আমার জানা প্রয়োজন তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কি না ?

—একটু নীরব থেকে সে বলেছিল, আমার তরফ থেকে বিশ্বাস ভঙ্গ করার কোন আশঙ্কা নেই আপনার।

—সত্যি কথাটা তুমি শুনবেই ?

—আমার ইচ্ছা।

—সমস্যার সমাধান নিশ্চই চাই শংকর। তবে···

—তবে কি ?

—তোমার কি মনে হয় ? শংকরের তীক্ষ্ণ প্রশ্নটায় একটু নীরবে চিন্তা করে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

শংকরও একটু নীরব ছিল। এক সময় বলেছিল, ভারতীয় নেতার দল সমস্যার সমাধান চান না।

—তোমার কথা ?

—প্রমাণের অভাব কোথায় ?

—শংকর।

—দেখে শুনে তাই মনে হয়। মনে হয়···। চুপ করেছিল সে।

তিনিও নীরব ছিলেন।

একজনের কাছে প্রশ্ন করে উত্তর না পেলেও অন্য জনের কাছে পেল শংকর। কথায় নয়, কাজে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করেছিল, পেয়েছি—পেয়েছি, আমি পথ পেয়েছি!

জীবনে চলার পথ। মুক্তির পথ। বিপ্লবের পথ, ত্যাগে। দুঃখ দারিদ্র তুচ্ছ, মৃত্যু নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত বিপ্লবী, সর্বহারাদের একজন হতে হলে নিজেকেও সর্বহারা শ্রেণীর একজন করে গড়ে তুলতে হবে। তা নয়, বিলাস বাহুল্যের মাঝে থেকে শুধুমাত্র মুখের কথায় বিপ্লবের তুবড়ি ছোটালে চলবে না। নিজেকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, মনে প্রাণে একজন হতে হবে সকলের। সর্বহারার দুঃখ বেদনা অনুভব করতে হবে জীবনের মাধ্যমে। কথায় নয়।

চটি পরা একদিন ছেড়েছে শংকর। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া জামাগুলি দিয়ে দিয়েছে তাদের, যাদের কিছু নেই। যাদের দিয়েছে তারা প্রথমে নিতে চায়নি। জোর করে দিয়েছে সে। বলেছে, এ দয়ার দান নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে বলেই দিচ্ছি। তোমরা নাও, আমাকে ভারমুক্ত কর।

তিনি হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কি সন্ন্যাসী হতে চাও শংকর?

— আমি সাধু হতে চাই।

—এতদিন কি অসাধু ছিলে?

—তা নয়, এতদিন আমি নিজের জন্যে ভাবতাম, চিন্তা করতাম। নিজের সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতাম। অন্যের প্রয়োজনের কথাটুকু চিন্তা না করে সুযোগ পেলেই আমি আমার নিজের প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নিতাম ভাল করে।

—এখন যে তুমি নিজের প্রয়োজনটুকু মেটাবে না এমন কথা তো বলিনি আমি।

—আপনার কিছু বলার অপেক্ষা করে আমি তো কিছু করি নি।

—তাহলে কি বাহবা কুড়োবার জন্যে বা অল্পদিনে জনপ্রিয় হয়ে ওঠো, এই আশায় এমন কাজ করছো ?

তাঁর কথা শুনে আঘাত পেয়েছিল শংকর। সে ভাবতে পারেনি, এতদিন দেখবার পরও তিনি তার সম্বন্ধে এমন কথা বলবেন। কথা বলেনি সে। নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল।

তিনিও একটু নীরব ছিলেন। ডেকেছিলেন, শংকর।

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

—তুমি কি আমার কথায় রাগ করলে ? মৃদুকণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—রাগ করবো কেন ?

—রাগ করাটাই তো স্বাভাবিক। তুমি যা নও, তোমাকে যদি তাই বলা হয়, তাহলে রাগ করার অধিকার নিশ্চয়ই তোমার আছে।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, সত্যিই আমি রাগ করিনি। কারণ আমি জানি, বিশ্বাস করি, আপনি যা বলেছেন তা নিশ্চয়ই আমার ভালর জন্যেই বলেছেন।

কথাটা শুনে নীরবে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। আচ্ছা, তুমি হঠাৎ চটি পরা ছেড়ে দিলে কেন ?

শংকর হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, আপনি চটি পরা ছেড়েছিলেন কেন ?

—আমি ? কথাটা শুনে একটু চিন্তা করেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন, কথাটা শুনলে হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সত্য। সহরে জন্মেছি আমি, সহর জীবনে অভ্যস্থ। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে গেলে, কবার সখের গ্রাম যাত্রা। বন্ধুর বাড়ি যাওয়া বা পিকনিক করা। তারপর একদিন গ্রামে এসে পড়লুম। গ্রামের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রথম প্রথম অসুবিধে হয়েছিল

বেশ কিছুটা। তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়। গ্রামের অসমতল, আঁকা বাঁকা পথে চটি পরে যে সময়ে আমি যতটা পথ অতিক্রম করি, একজন গ্রামের মানুষ আমার চেয়ে অনেক অল্প সময়ে চলে যায়। গন্তব্য স্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে কখনো মাঠের মধ্য দিয়ে, কখনো বা জলা পার হয়ে যেতে হয়। দেখে দেখে আমিও একদিন খালি পায়ে পথে নামলাম। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হল। তারপর দেখি, বাঃ বেশতো, খালি পায়ে হাঁটতে মজা তো কম নয়। তাছাড়া···

বাধা দিয়ে শংকর বলেছিল, আমি কিন্তু এদিকটা ভাবিনি।

হেসেছিলেন তিনি। পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, অন্য দিকটাও সত্য শংকর। কিন্তু যা করবে বিচার বিবেচনা করে তবে করবে। হঠাৎ ঝোঁকের বশে কিছু করতে যেওনা, তাহলে একদিন নিজের কাছে ঠকবার ভয় থাকবে। তুমি যে ত্যাগ স্বীকার করছো, কিসের জন্যে করছো? কার জন্যে করছো? সকলের একজন হতে হবে শংকর। আমিত্বটুকু ত্যাগ করতে হবে। আমি আলাদা নই, সকলের একজন। আর সকলের একজনের এই সংখ্যা তো বড় কম নয়, গোটা ভারতবর্ষের শতকরা পঁচানব্বই বা তার থেকে বেশির একজন। ভারতবর্ষের জনগণ সকলে সমান অধিকারী। ভারতবর্ষের নাগরিকদের সমান ভোটাধিকার। কিন্তু সংবিধান রচয়িতারা পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন পুরো মাত্রায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের শতকরা চার থেকে পাঁচ জন মানুষের স্বার্থরক্ষা হয়েছে। এই জন্যেই জমিদার জোতদারের দল চাষীকে বঞ্চিত করে, মালিক-শ্রেণী শ্রমিকদের ঠকিয়ে সম্পদ বাড়ায়, চোরাকারবারীর দল অসৎ পথে মুনাফা লোটে। আইন আছে, আইন রক্ষকের দল আছে, আছে সবই। ঠুঁটো জগন্নাথের মত নামে মাত্র আছে শুধু। কিন্তু কাজের কাজে কিছু নেই। নেই এইজন্যে,

তাতে স্বার্থহানী ঘটবে ওই পাঁচজনের। অথচ তুমি নিজে কিছু করতে পার না। কিছু করতে গেলেই আইন, শান্তিরক্ষকের দল তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।

—তাহলে কি এইভাবেই চলবে?

—না, চলবে না, চলতে পারে না। চলতে দেওয়া উচিৎ নয়। কংগ্রেসকে তার কায়েমী স্বার্থের গদি থেকে হটিয়ে দিয়ে যখন যুক্তফ্রন্ট শাসন ক্ষমতা দখল করল তখন আমাদের মনে হয়েছিল, কংগ্রেস রচিত ভূমি-সংক্রান্ত যে আইন বলবৎ রয়েছে, তা অন্ততঃ পাঁচজনের দল মানবে, মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু এখন দেখছি তা হবেনা, হতে পারেনা। কারণ যাঁরা এসেছেন, যে পথে এসেছেন, সে পথে অন্যায়কে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। একমাত্র কারণ, আইন। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে যে আইন সে আইনকে আইন সম্মতভাবেই মানতে তাঁরা বাধ্য। কারণ, মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণের সময় বুর্জোয়া আইনকে মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁরা।

—তাহলে?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আইন মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই আইন। আইনের চোখে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের কোন প্রভেদ নেই। আইনের বিভিন্ন ধারায় সে কথা বলা হয়েছে বারবার। কিন্তু আইন রক্ষকের দলই যেখানে আইন ভঙ্গকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে, সেখানে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব কেমন করে? সম্ভব নয়। তার একমাত্র কারণ, বুর্জোয়া আইন, রাষ্ট্র, বুর্জোয়াদেরই স্বার্থরক্ষা করে চলে। সেখানে তুমি আমি মরলাম কি বাঁচলাম তাতে তাদের কিছু এসে যায় না। তারা নিজেরা বাঁচতে চায়, স্বার্থরক্ষা করে চলে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। যুগ যুগ ধরে যে কায়েমী স্বার্থ

মানুষের বুকের ওপর পাষাণের মত চেপে বসে আছে, সেই পাষাণটাকে আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে চাই। চাই সব কিছু অন্যায় অসহ্য আর পাপের মূল উৎপাটন করতে। আর একমাত্র তা সম্ভব বিপ্লবের পথে। বিপ্লব ছাড়া সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। সামন্তবাদ, পুঁজিবাদকে খতম করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

—তা কি ইলেকসনের মাধ্যমে সম্ভব নয়?

—আপোষ নীতির মধ্যে বিপ্লব সফল হতে পারে না। আমরা যখন সকলে একসঙ্গে ছিলাম তখন বলতাম জাতী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব ভিন্ন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তা সেদিন যেমন আমরা বিশ্বাস করতাম, আজ যারা আছেন তাঁরাও বিশ্বাস করেন। সকলকে, সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে তাঁরা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বিপ্লব সফল করতে চান। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিপ্লব সমাধা করতে কতদিন লাগবে, কতদিনে বিপ্লবের উপযোগী হয়ে উঠবে মানুষ, তা তাঁরা জানেন না। আমরা আলাদা হলাম মতের মিল না হওয়ায়। বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না, বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হবে। কিন্তু একদিন সবিস্ময়ে দেখলাম বিপ্লবের পথ থেকে সরে যাচ্ছে আমাদের দলের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ। প্রতিক্রিয়াশীল বলছি এইজন্যে, মন্ত্রী হলে লাভ অনেক, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায়। আখেরে গুছিয়ে নিতেও কষ্ট পেতে হয় না। বলেন, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব। কিন্তু বিপ্লব কি? মানুষ। অসংখ্য নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষ। মানুষই তো বিপ্লব। মানুষের জন্যই বিপ্লব। অমানুষদের হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার নামই বিপ্লব।

শংকর, আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। সর্বহারার অধিকার রক্ষার লড়াই আমাদের। মার্কসের নীতিকে আমরা গ্রহণ করেছি।

লেনিনের পথ আমাদের পথ। মাও সে তুঙ চিন্তাধারার রূপ দিচ্ছি আমরা। কমিউনিষ্টদের মূল নীতিতে লেখা আছে, 'প্রত্যেকে যতক্ষণ না রুটি পাচ্ছে ততক্ষণে কেউ কেক পাবে না।' কিন্তু কি দেখছি? সাচ্চা কমিউনিষ্ট কিন্তু এতটুকু ত্যাগ স্বীকারে রাজি নন। এ যেন সেই আমার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে বা আমার কয়েক শো বিঘে জমি আছে; কিন্তু বাড়ি গাড়ি আমার বাবা আমার স্ত্রীকে দিয়ে যান অথবা আমাদের কয়েক শো বিঘে জমি আছে বলে যে অভিযোগ তা যদি আমাকে বঞ্চিত করে আমার বাবা আমার পুত্রকে দান পত্রের দলিল করে দেন তা কি আমার হল? সত্যই তো, তাকি হয়? হতে পারে, না হয়েছে কোথাও?

আমরা আজ সকলের শত্রু—ওরা পরস্পরের শত্রু। দুদল একই পথে চলেছে কিন্তু মুখে বলছে অন্য কথা। চৌদ্দ পার্টির বিপ্লবী সরকার আজ আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে পুলিশের দলকে। পুলিশের দল আজ আমাদের খুঁজে ফিরছে সমস্ত তরাই অঞ্চলে। ঘরে ঘরে সন্ধান করে ফিরছে। কানুবাবুর মাথার মূল্যও হয়তো ঘোষিত হয়েছে। সেই সঙ্গে জঙ্গল এবং আরো অনেকের। যেন কানুবাবু আর কজনকে খতম করে দিতে পারলেই নকশালবাড়ির এই আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে—তীর ধনুকের ক্ষ্যাপামী বন্ধ হবে। কিন্তু কেন এ আন্দোলন, কিসের আন্দোলন. ওঁরা বুঝলেও স্বীকার করেন না। বিপ্লবী সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, মানুষের নিরাপত্তার। মন্ত্রীমশাই নকশালবাড়ির হাটতলায় ঠাণ্ডা গলায় বড় বড় কথা বলে গিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সরকারের পক্ষ থেকে। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির কতটুকু রক্ষা করেছিলেন তিনি এবং তাঁর সরকার? কিছুই করেন নি তাঁরা। করা সম্ভবও নয় তাঁদের পক্ষে। কারণ, বুর্জোয়া আইনের কঠিন নাগপাশের বাঁধনে যে তাঁদের হাত পা বাঁধা। সাধ করে তাঁরা সে বাঁধন মেনে নিয়েছেন। স্বপ্ন দেখেছেন আরো বেশি ক্ষমতা দখলের। রাজ্য নয়, কেন্দ্রে দখল নেবেন তাঁরা।

সরকার গড়বেন। তার আগে যদি জমিদার জোতদারদের স্বার্থ রক্ষায় মানুষের জাগরণকে দলিত করতে হয়, করবেন। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়, দেবেন। সংশোধন করে নেবেন ভবিষ্যতে। যে ভবিষ্যৎ ভবিতব্যের গর্ভে।

অনেকক্ষণ কথা বলার পর চুপ করেছিলেন তিনি।

শংকরও নীরব ছিল অনেকক্ষণ। তারপর বলেছিল, আমি কি করবো ?

—কি করবে ? প্রশ্নটা তাকেই করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি তো কাজ করছো শংকর। এমনি ভাবেই কাজ করতে হবে তোমাকে।

—কিন্তু……

—আবার সেই কিন্তু। মৃদু ধমক দিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমি বুঝি, এ কাজে তুমি সন্তুষ্ট নও। তুমি চাও লড়াই করতে। সেদিন যখন আসবে নিশ্চয়ই তুমি যাবে। কিন্তু এখন নয়। কারণ কি জানো, যুদ্ধ শুধুমাত্র রণক্ষেত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। একদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া ছিল গর্বের। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেওয়ার মধ্যে মহত্ব ছিল। কিন্তু আজ যে ঘরে বাইরে যুদ্ধ। প্রতিটি পদক্ষেপে আজ আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। 'নিরক্ষর মানুষ অন্ধ, তার প্রতিপদে চোরাগর্ত আর দুঃখ-দুর্বিপাক।' আমরা বুদ্ধিজবীর দল এই অন্ধত্ব দূর করার মহান দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে দেব মানুষকে। যুদ্ধ করবে কৃষক-শ্রমিক। আমরা তাদের সহযোগী হব কিন্তু কখনো এগিয়ে গিয়ে তাদের স্থান দখল করে নেবার চেষ্টা করবে না।

নকশালবাড়ির বীর কৃষক-শ্রমিক যুদ্ধ করেছে। শ্রেণী শত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়ে বিপ্লবের পথে এ'গিয়ে গেছে তারা। এসেছে মৃত্যু, আঘাত। তবু তারা টলেনি। মাথা নত করেনি। পালায়নি ভীরু কাপুরুষের মত।

এ তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এ লড়াই তাদের বাঁচার লড়াই।

লড়াই করেছে তারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশবাহিনীর সঙ্গে। মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে। তারা বুঝিয়ে দিয়েছে বীরের মৃত্যু নেই। বীর কখনো মরে না। মরে কাপুরুষের দল।

শুধু পুরুস নয়, এগিয়ে এসেছে মেয়েরাও। মিছিল বার করেছে তারা। প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সশস্ত্র পুলিশের দল বাধা দিয়েছে। মিছিলকারিণীদের এগিয়ে যেতে দেবে না তারা।

পুলিশের হাতে রাইফেল কিন্তু ওদের বুকে আগুন। নির্ভয়ে এগিয়ে গেছে মেয়েদের দল, ধ্বনি দিয়েছে, নকশালবাড়ির জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব—জিন্দাবাদ।

এ বিপ্লব চলবে।

চলবে-চলবে-চলবে।

এগিয়ে চলেছে মেয়েরা। নির্ভীক, দৃঢ় পদক্ষেপ। তাদের চলার পথে মৃত্যুভয় তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারাও এগিয়ে যাবে, আগে, আরো আগে।

হঠাৎ পুলিশের হাতে গর্জে উঠল রাইফেল। শান্তিপূর্ণ মিছিল-কারিনীদের ওপর একদিন পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মেয়েদের গুলি করতে লজ্জাবোধ করেছিল, সেইজন্যে কয়েক শো কুষ্ঠীকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা। ছত্রভঙ্গ করেছিল মিছিল। তারা

বুঝেছিল, ভারত-নারীর মন কর্তব্যে অটল। মৃত্যুকে আজ তারা ভয় পায় না।

স্বাধীন ভারতবর্ষের শান্তি রক্ষকদের দল বিনা দ্বিধায় গুলি চালাল নারী মিছিলের উপর। হয়তো ওরা ভেবেছিল দু-একজন মরলেই পালিয়ে যাবে সবাই।

কিন্তু কেউ পালাল না। গুলির আঘাতে যারা পড়ে গেল তাদের দিকে শুধু একবার চেয়েই এগিয়ে গেল কয়েক শো মেয়ের মিছিলটি। মৃত্যু দেখেও ওরা বিচলিত হল না; ভ্রূক্ষেপ করল না। ওরা সম্পূর্ণ নির্বিকার। ধ্বনি দিল, নকশালবাড়ির জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব —জিন্দাবাদ।

এ বিপ্লব···চলবে-চলবে-চলবে।

বিচলিত হল ওরা। ওই পশুর দল। মৃত্যু বিচলিত করল ওদের। ওরা ভয় পেল। ভেবে পেল না এবার কি করবে।

গুলির শব্দে প্রথমে মানুষ পালিয়েছিল। একে একে ফিরে এল সকলে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য।

পুলিশ পরাস্ত হয়েছে। পশুশক্তি পরাজিত। ওরা ফিরে এল এবার। যারা মিছিলে যোগ দেয়নি তারাও এল এবার। সঙ্গে নিয়ে এল তীর ধনুক।

রাইফেল উঁচিয়ে মৃতদেহ করডন করতে চাইল পুলিশের দল। ওরাও উঁচিয়ে ধরলো তীর ধনুক। এবার শুধু আঘাত সহ্য করা নয়, ওরাও আঘাত হানতে প্রস্তুত। থাকনা পুলিশের হাতে গুলিভরা রাইফেল।

সাহসী হল না পুলিশের দল। শ্রমিক কৃষক রমণীদের মৃতদেহগুলি ওরা তুলে নিয়ে গেল। চিতাশয্যায় শুইয়ে আগুন দিল।

নকশালবাড়ির বীর শ্রমিক-কৃষক পুরুষ রমণীর চিতার আগুনে রক্তবর্ণ ধারণ করল আকাশ। সেই আগুনের লেলিহান শিক্ষা

ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। আসমুদ্র হিমাচল রক্তের আলপনায় রাঙা হয়ে উঠল।

শপথ নিল মানুষ নতুন পথের। সে পথ মুক্তি যুদ্ধের।

স্বপ্ন দেখছিল শংকর। একটুখানি লাল অগুনের শিখা। আগুন নয়, যেন রক্ত শিখা। টকটকে গাঢ় তার রঙ। ছোট্ট, কাঁপা কাঁপা একটু অগ্নিশিখা। শংকর স্পষ্ট দেখল, সেই ছোট্ট অগ্নি শিখাটুকু মাটি থেকে একটু একটু করে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে—আরো ওপরে। মেঘের স্তর ভেদ করে আকাশের স্পর্শ পেতে চাইল যেন সেই অগ্নিশিখা। কিন্তু বাধা দিল মেঘের দল। হিংস্র গর্জনে গর্জে উঠল তারা। ঝড় তুললো, বজ্র হানলো। নিভিয়ে দিতে চাইলো অগ্নিশিখাটাকে। অক্টোপাশের মত গ্রাস করতে চাইলো। কালো মেঘের আস্তরণে মুছে গেল অগ্নিশিখা। নিভে গেল, শেষ হয়ে গেল। আকাশের সীমানায় পৌছানো সম্ভব হল না তার পক্ষে।

অন্ধকার, বিষাদ। অগ্নিশিখার লক্ষ্যে পৌছানোর যাত্রা শেষ হল না। ব্যর্থতার হাহাকারে ভরে গেল শংকরের মনটা। নিজের দিকে ফিরে চাইলো সে। একাকী দাঁড়িয়ে আছে। শূন্য—ধূ ধূ প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বালি-বালি আর বালি। বালুকাময় শূন্য মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিঃসঙ্গ প্রাণ। একটা মানুষ।

আবার চাইলো সে আকাশের দিকে। দেখতে চাইলো সেই অগ্নি শিখাটুকু। যা দেখে প্রাণে উত্তাপ অনুভব করেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। অগ্নিশিখার লক্ষ্যে পৌছানোর স্বপ্নও যে তার মনের-প্রাণের অন্তরের

স্বপ্ন। সেও যে অমনি স্বপ্ন দেখছিল। আলোর স্বপ্ন—সত্যের স্বপ্ন।

স্বপ্ন মিথ্যা, আলো নিভে গেছে। রাহু যেমন তার করাল মুখোব্যাদন করে, সবকিছু গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসে, তেমনি সেই ছোট্ট অগ্নি শিখাটুকুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বজ্র বিদ্যুৎ অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অশুভ শক্তিরা একজোট হয়ে নিভিয়ে দিয়েছে আলো। গ্রাস করেছে প্রাণের অগ্নিশিখা।

বিশাল রুক্ষ মরু প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রাণ। ব্যর্থতার হাহাকার ভরা মন নিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বুকের গভীরে গুমরে উঠছে দুরন্ত একটা যন্ত্রণার পিণ্ড। প্রাণটা ছটফট করছে। মাথা কুটছে। মুক্তির পথ খুঁজছে। মুক্তি-আলো-আগুন।

নেই. নেই, নেই। আছে আছে, আছে, নেই! নেই, আছে। কোথায়? কোথায়-কোথায়? প্রাণে। রক্তে, অস্থিতে, মজ্জায়। মুক্তি-আলো, অন্ধকার অসহ্য। আমি আলো চাই, দূর করতে চাই অন্ধকার, নিশ্চিহ্ন করতে চাই অশুভ শক্তিকে, পাপ-অন্যায়। ন্যায়, সত্য, মুক্তি। কোন্‌পথ? সত্য পথ। সে পথের সন্ধান? কোন্‌ পথে—কোন্‌ পথে?

আমি নিভতে দেব না আগুন। আলোর যাত্রা পথের অশুভ শক্তির সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো। আমি ছিনিয়ে আনবো মুক্তি। মানুষের মনকে আমি কলুষ মুক্ত করবো। প্রতিটি গৃহকে স্বপ্ন সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুলবো।

মুক্তি-মুক্তি, আলো, আগুনের স্পর্শে উজ্জীবিত হোক প্রাণ, মন, আত্মা।

মুক্তি চাই, আমি সকলের মুক্তি কামনা করি, মানুষের মুক্তি, আমার মুক্তি

আমি পশু শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবো।

আমি যুদ্ধ করবো।

কাদের পদশব্দ এগিয়ে আসছে। কাছে, আরো কাছে। ডাকছে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। তাকে জাগিয়ে তুলতে চাইছে।

—কমরেড, কমরেড।

ওই-ওই আবার ডাকছে তারা। শত সহস্র কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে। বন্ধু বলে কাছে টানতে চাইছে। জাগো, জাগো। কমরেড জাগো, বন্ধু জেগে ওঠো তুমি। অশুভ নিদ্রা থেকে উঠে আমাদের কাছে এসো।

—কমরেড।

ডাকছে, তারা ডাকছে। লক্ষ কণ্ঠের ডাক। আহ্বান। মুক্তির পথে চলার আহ্বান। দুর্গম দুরূহ পথের যাত্রা। তুমি এসো, বন্ধু তুমি এসো।

আমি কি ঘুমিয়ে আছি? না না, আমি তো জেগেছিলাম। আমার প্রাণটাকে উত্তাপে ভরিয়ে রেখেছিলাম। মুক্ত-উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠে ছিলাম সেই গান। ডাক দিয়ে বলেছিলাম,

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী কৃতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজি সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আস্বাদ
সনাতন জীর্ণ কু'আচার
চূর্ণ করি মিলি জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।
শেষ যুদ্ধ শুরু আজ কমরেড

এসো মোরা মিলি একসাথ
গাও ইণ্টারন্যাশানালে।
মিলাবে মানব জাত।

শত সহস্র লক্ষ কণ্ঠে আমি এ গান গেয়েছি। আমার এ গান শুনে সাড়া দিয়েছে মানুষ। নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠেছে। নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছে। হাতে হাত রেখেছে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। এগিয়ে গেছে দীপ্ত পদক্ষেপে।

অত্যচারীর দল ভয় পেয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বার বার সাবধান করেছে। বলেছে, সাবধান। এগিও না তোমরা, থাম।

বলেছি,

কথা ব'লোনা তোমরা। ফাঁসি দাও,
গলা কাটো, গুলি করো, তোমাদের ঘোড়ার
খুরে দলে দাও।
তোমাদের অপকীর্তির পুরস্কার পাবে তোমরা পদক
আর ক্রুশ···

শুধু মনে রেখো, এক বীরের মৃত্যু হাজার হাজার বীরের জন্ম দেয়।

সেই হাজার হাজার লক্ষ কোটি বীরের মৃত্যু ঘটানো তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেদিন আর নেই, যেদিন তোমাদের অত্যাচারের চাবুক মানুষের পিঠে পড়তো। তোমাদের সে আঘাত নীরবে সহ্য করতো মানুষ। নত মস্তকে পালন করতো তোমাদের প্রতিটি আদেশ। অত্যাচারিত মানুষের বুকের রক্তের বিনিময়ে তোমাদের ঘরে জমে উঠতো সম্পদের পাহাড়।

আজ আর সেদিন নেই। দিন বদলের পালায় মানুষ জেগেছে। মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করেছে, চিনেছে। যেখানে অত্যাচার সেখানেই প্রতিরোধ।

কিন্তু, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম কেন? কেন-কেন-কেন?

—কমরেড!

জেগে উঠল শংকর। চোখ মেলে চাইল। পূর্ব দিগন্তে আলোর ইসারা। রাতের অন্ধকার দূর হচ্ছে। সূর্য ওঠার লগ্ন সমাগত।

—কমরেড! মৃদুকণ্ঠে ডাকল চেন্না রাও।

চেন্না রাওয়ের মুখের দিকে তাকাল শংকর। ওর সঙ্গীদের দিকেও। অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন ফিরলে তোমরা?

—ফিরেছি একটু আগে। কবার ডাকলাম। সাড়া পেলাম না।

—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম কমরেড।

—স্বপ্ন!

—হ্যাঁ কমরেড। একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, তোমরা আমাকে ডাকছো, জাগাতে চাইছো। আমি জেগে উঠতে, সাড়া দিতে চাইছিলাম, কিন্তু পারছিলাম না। আমার যেন কি হয়েছিল। আমি হাহাকার করছিলাম।

সঙ্গী একজন বলল, আপনি ভয় পেয়েছেন!

—না কমরেড, ভয় আমি পাইনি। আমার নিজের জন্যে ভয় আমি পাইনি। কিন্তু আমি ভয় পেয়েছি। আমার মনে আজ শঙ্কা জেগেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টির জন্য কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। লক্ষ্যে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে। আমরা যে পথে এগিয়ে যেতে চাই তারা তা চাইছে না।

—একথা বলছো কেন? জিজ্ঞাসা করল চেন্না রাও।

—আমি যে দেখলাম কমরেড। দেখতে পেলাম বন্ধুর ছদ্মবেশে কিছু শত্রুর মুখ। তাদের লোভ লালসা মাখা কুটিল চাহনি। তারা

সখের বিপ্লবী সেজে এগিয়ে চলেছে ভিন্ন পথে। প্রতিটি বিপ্লবীকে হতে হবে ধীর স্থির, প্রতিজ্ঞায় অটল। বৈজ্ঞানীক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দমন করতে হবে চাঞ্চল্য। হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। বিচার বিবেচনাহীন কাজ আমাদের জন্য নয়। কারণ, আমরা যে বিপ্লবী, চাটুকার নই।

—কমরেড!

—চেয়ারম্যান বলেছেন, বিপ্লব হচ্ছে জনগণের উৎসব। এই উৎসব আমাদের সুচীশুদ্ধ ভাবে সমাধা করতে হবে। উৎসব কলুষিত হোক, আমরা চাইবো না। আমরা ক্ষমা করবো না তাদের, যারা আমাদের শত্রু, জনগণের শত্রু। কিন্তু জনগণের ক্ষতি হোক এমন কাজ আমরা নিশ্চয়ই করবো না। তা যদি করি, তাহলে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হবে। আমরা জানি, জনগণ আমাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। তারা অনেকেই হয়তো ভাবছে, আমরাও বুঝি সার্কাস পার্টির একটি। মাইক মুখে লাগিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে পথে পথে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছি, আমরা শ্রেষ্ঠ। আমাদের তাঁবুতে লক্ষ দর্শকের আসন সংরক্ষিত করা যায়। আমরা মানুষকে আনন্দ দিতে পারি, আমাদের আছে বাঘ সিংহ জলহস্তী। আছে ক্লাউন। শুধুমাত্র ক্লাউনই আপনাদের চিত্ত বিনোদনে সমর্থক। আমাদের সার্কাসে ক্লাউনই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। ক্লাউনই সব। ক্লাউনের রঙ্গ রসিকতা মানুষকে আনন্দ দেয় সত্যি কিন্তু ক্লাউনের জীবনও তো মানুষের জীবন। ক্লাউনও যে আমাদের একজন। আমরা জনগণের একজন করে নিয়েছি ক্লাউনকে। তাই জনগণকে বিশ্বাস করা আমাদের কর্তব্য। জনগণের দুঃখ, ক্ষতি অথবা বেদনাদায়ক কিছু করা আমাদের পক্ষে উচিৎ নয় বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের পথ বিপ্লবের, শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নয়। কারণ, মানুষের দুঃখ দুর্দশা অবসানের জন্যেই এ লড়াই। এ লড়াই আমাদের জিততে হবে। শত্রুর কুৎসার জবাব দিতে

হবে, [কুৎসা রটনার পথ বন্ধ করে। কারণ, এযে আমাদের বাঁচার লড়াই।

চুপ করল শংকর। চেন্না রাও ডাকল, কমরেড।

—বল।

—একথা তুমি বলছো কেন?

—বলছি অনেক দুঃখে কমরেড। বলছি, আশঙ্কার কারণে। আমাদের সাবধান হতে হবে। বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া, সন্ত্রাস সৃষ্টিতে নয়। আমাদের পরিচয়—অন্যায়ের শত্রু, ন্যায়ের রক্ষক। আমরা চাই জনগণের মুক্তি। আমরা অভিনেতা নই, বিপ্লবী। আমাদের পথ, বিপ্লবের পথ। শ্রেণী শত্রুর ধ্বংস চাই আমরা।

আবার নীরব হল শংকর। চেন্না রাও আর তার সঙ্গীরা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বুঝতে পারল না, এমন কথা ও কেন বলছে। একি ওর স্বপ্নের কথা?

তাই চেন্না রাও মৃদুকণ্ঠে ডাকল, কমরেড।

শংকর তার মুখের দিকে চাইল। বলল, কী?

—তুমি স্বপ্ন দেখেছো?

—স্বপ্ন। ম্লান একটু হাসল শংকর। বলল, এমন কেন দেখলাম বলতো?

—কি দেখলে?

—দেখলাম ছোট্ট একটু অগ্নিশিখা, লাল টকটকে তার রঙ। মানুষের খুনে রাঙা সেই অগ্নিশিখা মাটির স্পর্শ ত্যাগ করে ওপরে উঠতে লাগল। দূরে, আরো দূরে। মেঘের স্তর ভেদ করে আকাশের স্পর্শ পেতে চাইল। কিন্তু বাধা দিল মেঘের দল। ক্রুদ্ধ গর্জনে গর্জে উঠল, ঝাঁপিয়ে পড়লো ঝড়। বজ্র বিদ্যুৎ একসঙ্গে ছোট্ট অগ্নিশিখাটুকু নিভিয়ে দিতে চাইলো। অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেই লাল আগুন রাঙা আলো। শূন্য রিক্ত বালুকাময় মরুভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—একাকী।

—তারপর ?

—তোমরা ডাকলে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু আমার বুক মুচড়ে ওঠা হাহাকারটা এখনও কাঁপছে।

—কেন ?

—কি জানি। আমি বুঝতে পারছিনা। কেন এমন হল মনে পড়েছে না। আমি জানি, বিপ্লব জনগণের উৎসব হলেও সাধারণ উৎসব নয়। আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের পথে বন্ধুবেশী শত্রুর দল বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে। উৎসবকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইছে তারা। জনগণ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। বৃহত্তর জীবনাদর্শকে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ সংঘাতের মধ্যে জড়িত করতে চাইছে তারা। প্রতি বিপ্লবীর রূপ নিচ্ছে তাদের কাজ।

—কে বললে ?

—কেউ বলেনি, আমার মনে হচ্ছে। হয়তো এ আমার মনের দুর্বলতা। হয়তো এ আমার পূর্ব জীবনের অবশিষ্টাংশ। যা আমি এখনও দূর করে উঠতে পারিনি। বিপ্লবের পথকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। এখনো পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আমার যায়নি।

শংকরের মুখের দিকে চাইল চেন্না রাও। ওকে দেখল। মনে পড়ল আর একজনের কথা।

ভাস্কর রাও। সুদূর গুণ্টুর জেলার আঠাশ বছরের যুবক ডাঃ ভাস্কর রাও।

ডাঃ ভাস্কর রাও বলেছিলেন, সত্যি, পেটি বুর্জোয়া কিছু কিছু কমরেডদের দুর্বলতা দেখলে ভারি লজ্জাবোধ হয়। মনে হয় আমিও তো পেটি বুর্জোয়া—শেষে ওরকম করে বসবো না তো ?

সম্পন্ন ঘরের ছেলে ভাস্কর রাও। ছাত্র জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলনে। সুখ-সম্পদ-অর্থ যশের স্বপ্ন। বড় হবেন। অনেক

অনেক বড়। বাড়ি করবেন, গাড়ি কিনবেন। সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী। সন্তান, ভরা সংসার। দুঃখের এতটুকু ছায়া থাকবে না। হাসি-আনন্দ উৎসবে ভরা থাকবে গৃহ।

ডাক্তারী পড়া সুরু করেছিলেন ভাস্কর রাও। পাশ করে বেরুলেন একদিন। হলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। চেম্বার সাজিয়ে সুরু করলেন প্র্যাকটিস। রুগীর অভাব হল না। একটি দুটি করে রুগী এল। আসতে লাগল অর্থ। যুবক ডাক্তারের চেম্বার ভরে রইলো সব সময়।

ডাক্তার চোখ পরীক্ষা করেন। প্রেসক্রিপশন লিখে দেন। হাত বাড়ান ফি-র টাকার জন্যে। করকরে নোট পকেটে পোরেন। দয়া মায়া মমতার স্থান নেই ব্যবসায়। ডাক্তারী নয়, তিনি তো ডাক্তারীর ব্যবসাই করছেন।

—অন্ধ নাচার বাবা, একটা পয়সা দাও।

অন্ধ কিশোর ভিক্ষা চাইছে। ডাক্তার দেখেন তাকে। জিজ্ঞসা করেন, হ্যাঁরে, তুই সত্যিই অন্ধ তো?

ভিখারী কিশোর বলে, হ্যাঁ বাবা, সত্যিই আমি এখন আর চোখে দেখতে পাই না।

কিশোরের কথাটা মনে লাগে ডাক্তারের। কৌতুহলি হয়ে ওঠে মন। কিশোর তাহলে জন্মান্ধ নয়, একদিন দেখতে পেত। আলো ছিল জীবনে।

জিজ্ঞাসা করেন, আগে চোখে দেখতে পেতিস তুই?

—কেন পাব না? মাঠে ঘাটে কতদিন ছুটে খেলা করে বেড়িয়েছি, সাঁতার কেটেছি নদীতে, গাছে চড়েছি পাখীর ছানা চুরি করার জন্যে। আপনার মতই দেখতে পেতাম আমি।

আমার মত দেখতে পেত? নিজের মনেই কথাটি বার কয়েক উচ্চারণ করেছিলেন ডাক্তার। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহলে তোর চোখ নষ্ট হল কি করে?

—বাবা খাওয়াতে পারেনি। না খেতে পেয়ে চোখ ছুটো নষ্ট হয়ে গেছে।

—কে বললে তোকে একথা ?

—সদর হাসপাতালের ডাক্তার। আমার নাকি না খেতে পেয়ে চোখ নষ্ট হয়েছে। তখন একটু একটু দেখতে পেতুম। বাবাকে ডাক্তার বলেছিলেন, ছেলেকে একটু ভাল খাইয়ো। বাবা বলেছিল, এমনিই খাওয়া জোটে না অর্দ্ধেক দিন, ভাল কেমন করে খাওয়াবো ডাক্তার বাবু ? ডাক্তার বলেছিলেন, তাহলে তোমার ছেলের চোখ সারবে না। ওষুধের সঙ্গে পথ্যও দিতে হবে। পরের জমিতে কিষাণ, খাওয়া দেবে কেমন করে বাবা। আমার চোখ ছুটো নষ্ট হয়ে গেল।

—তোর বাবা আছে ?

—না, বাবাকে মেরে ফেলেছে জমিদারের দারোয়ানরা।

—মেরে ফেলেছে ? চমকে উঠেছিলেন ডাক্তার।

—হ্যাঁ, বাবা জমিদারের জমি থেকে ক'আঁটি ধান চুরি করে ছল। দেখতে পেয়ে জমিদারের দারোয়ানরা লাঠি পেটা করে হাত পা বেঁধে টানতে টানতে জমিদার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাতেই বাবা মরে গেল। পোড়াবার খরচ ছিল না, দয়া করে জমিদার মশাই বাবার দেহটা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

ডাক্তারের মনটা পাষাণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবতে পারছিলেন না, কিশোরের কথা কি সত্য ? এও কি সম্ভব ? একটা মানুষ ক'আঁটি ধান চুরি করার জন্যে মেরে ফেলা হল তাকে কিন্তু চুরি করল কেন সে ? ক'আঁটি ধান এমন কিছু মূল্যবান নয়। নিশ্চই সে নিরুপায় হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়েছিল। চুরি করে নিশ্চয়ই সে অন্যায় করেছে। অন্যায়ের শাস্তি তার পাওয়া উচিৎ। তার জন্যে আইন আছে, আদালত আছে, আছেন বিচারকের দল। তাঁরা আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। অপরাধীর শাস্তি দেন কিন্তু যারা আইনকে পদদলিত করে মানুষকে শাস্তি দেওয়ার ভার নিজেদের হাতে

তুলে নিয়েছে অর্থের জোরে, তাদের বিচার কে করবে? কোন্ মহামান্য আদালতের কাঠগড়ায় তাদের বিচার হবে?

হয় না, হবে না, হতে পারে না। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে যে আইন সেখানে ধনীর বিচার হয় না। ধনী শত সহস্র জঘন্য অপরাধে অপরাধী হয়েও নিষ্কৃতি পায়। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেললেও আইন তাদের ধরে না। অর্থের কাছে আইন অচল। ধনীর অন্যায়ের শাস্তি বিধান করা মহামান্য আদালতের নেই।

দেখেছেন তিনি। দিনের পর দিন। যে মানুষটা খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার অপরাধে ধরা পড়লো, হত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হল, শিশুর খাদ্য, রোগীর ঔষধ জালের জন্যে জেলে গেল, তাদের কেউ কদিন পরে নির্দোষী প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে এল, কেউ ক'বছর জেল খেটে এসে আবার পুরোদমে সুরু করল ভেজাল ঔষধের কারবার। সব কিছুর মূলে অর্থ। অর্থের জোরে অসম্ভব সম্ভব হয়।

অনাহার, পুষ্টির অভাব যে কিশোরের অন্ধত্বের একমাত্র কারণ, যে কিশোরের পিতা পুত্রের ক্ষুধার অন্ন জোটাতে গিয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়, ধরা পড়ে জীবন দিতে হয় ধনীর পোষা গুণ্ডার হাতে, সে সমাজ কি মানুষের সমাজ? ধনীর লালসার ক্ষুধায় শত সহস্র মানুষের মনুষ্যত্ব পীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। বাঁচার অধিকার হরণ করে পরিণত করেছে ক্রীতদাসে। ধনীর ক্রীতদাস। অর্থের ক্রীতদাস।

সমাজ ধনীক শ্রেণীর। সমস্ত অধিকার ধনীক শ্রেণীর করতলগত। তারাই সব। তারাই শ্রেষ্ঠ। তারাই সমাজ এবং রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক। যে মজুরের বুকের রক্তে গড়ে ওঠে ধনীর সৌধ, তাতে তার কোন অধিকার নেই।

চিন্তা করেছেন ডাক্তার। জ্ঞান চক্ষু উন্মোচিত হয়েছে যেন তাঁর। নিজের দিকে ফিরে চেয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, এইকি একমাত্র সত্য?

পথে নেমেছেন ডাক্তার। মানুষকে দেখেছেন। অসংখ্য মানুষ।

নিরন্ন, নিপীড়িত, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষের দল। ধনীর চক্রান্তে জীবনে পদে পদে অধিকার হারাতে বাধ্য হয় যারা।

অথচ তারাও মানুষ। তারাও স্বপ্ন দেখেছিল, ভবিষ্যৎ কামনা করেছিল। স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখে দুটি ক্ষুধার অন্ন, পরনের বস্ত্র, একটু সুখ চেয়েছিল। কিন্তু পায়নি, পেতে দেওয়া হয়না তাদের; পেটের ক্ষুধা যদি নিবৃত্তি হয় তবে অধিকারের প্রশ্ন তুলবে তারা, এই আশঙ্কায়। কারণ, মানুষের ঘরে যদি খাদ্য থাকে, চিন্তা করার সময় পাবে তখন। কিন্তু ক্ষুধার অন্ন জোটাতে যদি সব সময় ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে সুযোগ তাদের থাকবে না। অতএব পেট মেরে রাখতে হবে তাদের, যাতে অন্যদিকে মন দিতে না পারে।

মুখে আহার তুলতে গিয়ে থেমে গেছে ডাক্তারের হাত। সুস্বাদু খাদ্য নামিয়ে রেখেছেন।

বিস্মিতা স্ত্রী প্রশ্ন করেছেন, কি হল?

কথা বলতে পারেননি ডাক্তার। কী বলবেন? নীরবে বসে থেকেছেন।

স্বামীর কাছে এসে গায়ে হাত দিয়েছেন স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করছেন, শরীর খারাপ?

—নাতো।

—তাহলে?

— কি জানি, আমার যেন কেমন হল।

—কি হল?

স্ত্রীর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি ডাক্তার। কেমন করে বলবেন, কেন তিনি খেতে পারলেন না। দেশের মানুষ যখন অর্দ্ধাহারে, অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়, সামান্য খাদ্য বস্তুতে ক্ষুধা মেটায়, তখন তিনি কি করে সুস্বাদু আহার্য্য গ্রহণ করবেন? ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে সাধারণ খাদ্যবস্তু আহার করতে তিনি কি পারেন না?

সন্তানদের দিকে তাকিয়েছেন। আপন সন্তান তাঁর। সুন্দর

স্বাস্থ্য। এদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চেষ্টার তাঁর অন্ত নেই। পিতার কর্তব্য পালন করেছেন তিনি। অকাতরে ব্যয় করেছেন অর্থ। কারণ ওরাই যে ভবিষ্যৎ।

চাষীর পর্ণ কুটিরে, শ্রমিকের বস্তি ঘরের অন্ধকারে তখন হয়তো তাদের ভবিষ্যৎরা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে অথবা এক টুকরো খাবার কেড়ে খাচ্ছে।

কেন এই বঞ্চনা? সুষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার এই কি পরিচয়? এই কি আমরা সকলেই সমান? ন্যায় নীতি, সাম্যের যথার্থ রূপ?

যে সমাজের দিক থেকে একদিন মুখ ঘুরিয়েছিলেন তিনি, যাদের দিকে চাইবার প্রয়োজন অনুভব করেননি কোনদিন, তাদের দেখেছিলেন তিনি। দেখতে পেয়েছিলেন চরম দুর্দশা আর অত্যাচার। গ্রামের চাষী যে মাটিতে সোনা ফলায় সেই মাটির অধিকারহারা সে। অধিকার নেই তার পরিশ্রমের ফসলে। কারণ, সে জোতদার জমিদারের কেনা গোলাম। ছলে বলে কৌশলে ধনী জোতদার তাকে গোলাম বনতে বাধ্য করেছে। নিরুপায় চাষী বাধ্য হয়েছে দাসখত লিখে দিতে। নাহলে বাঁচতে পারবে না সে। বিরুদ্ধ শক্তি যে প্রবল। আইন তার সহায়। আইনের আশ্রয় নিয়ে অধিকারচ্যুত করে। জমির অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় চাষী।

অন্যায়, অত্যাচার। কিন্তু এই অন্যায়ই ন্যায়। গোলামের অধিকার কোথায়, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার? শক্তি কোথায় প্রবলের সঙ্গে যুদ্ধ করার?

না-না, শক্তি আছে। ঐক্যের মাঝে সে শক্তি নিহিত আছে। দশের শক্তি মিলে রুখে দাঁড়াতে হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। টুঁটি কামড়ে ধরতে হবে শত্রুদের।

সংবাদপত্র পাঠ করেন ডাক্তার। বুর্জোয়া আর প্রতিক্রিয়াশীলদের সংবাদপত্র। চাষীদের এই অধিকার রক্ষার সংগ্রাম

সেখানে ডাকাতি বলে চিহ্নিত। ডাকাতির পথ ধরেছে মুক্তিকামী সৈনিকের দল।

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন ডাক্তার। বিচার করেন। কারা ডাকাত? যারা অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তারা? না, যারা মানুষের অধিকার হরণ করে পশু জীবনযাপনে বাধ্য করাচ্ছে, তারা?

উত্তর পেতে দেরী হয় না তাঁর। দেখতে পেয়েছেন মুক্তি পথের সন্ধান।

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন ডাক্তার। কদিন আগে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছেন। স্ত্রীকে ভর্তি করে স্বাচ্ছন্দের সমস্ত ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি। কাজের চাপে কদিন আসতে পারেননি। শুনেছেন এবার কষ্ট পাচ্ছেন।

কবিনে ঢুকে স্ত্রীকে দেখলেন ডাক্তার। আসন্ন প্রসব বেদনায় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠেছে মুখে চোখে। সেই কষ্টের মধ্যেই স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন তিনি। কি যেন দেখতে পেলেন। ওঠবার সামর্থ নেই, শুয়ে শুয়ে ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে তোমার?

ডাক্তার সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ?

সেই কষ্টের মধ্যেই হাসি ফুটল তাঁর মুখে। বললেন, ভাল।

বেডের পাশে রাখা টুলটায় বসলেন ডাক্তার। হাত রাখলেন মাথায়। জিজ্ঞাসা করলেন, খুব কষ্ট হচ্ছে?

আবার হাসি ফুটলো মুখে। একটু যেন লজ্জা পেলেন। শুয়ে শুয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না-না।

স্ত্রীকে দেখলেন ডাক্তার। আসন্ন মাতৃত্বের মহিমায় উজ্জ্বল মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। একসময় বক্ষ ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর।

দুর্বল হাতে স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরলেন স্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে আমাকে বলবে না?

হাসলেন ডাক্তার। ম্লান বিষণ্ণ হাসি। বললেন, বলার মতো কিছু হয়নি।

—তবে?

—একটা কথা ভাবছিলাম। যে আসবে তার জন্যে কত ব্যস্ততা, আয়োজন আমাদের। অথচ···

—কি?

—আমাদের সামর্থ আছে। যে প্রাণ আমাদের কাছে আসছে তাকে গ্রহণ করার জন্যে আমরা উন্মুখ। সে যাতে ভাল থাকে, এতটুকু কষ্ট না পায়, তা দেখা এবং করা আমাদের কর্তব্য। প্রসব বেদনায় আজ কদিন কষ্ট পাচ্ছ তুমি, তবু তোমার মুখে হাসি। আচ্ছা তোমার মত এই হাসি সব মায়ের মুখেই ফুটে ওঠে?

ডাক্তার কেন যে এমন কথা বলছেন বুঝতে পারলেন না স্ত্রী। তবু বললেন, আমি কখনো ভেবে দেখিনি কিন্তু আমার মনে হয় সব মায়ের মনই সমান।

—আমারও তাই মনে হয়। স্ত্রীর কথা সমর্থন করেছিলেন ডাক্তার। আমিও এই কথাই ভেবেছি। মাতৃত্ব নির্মল, পবিত্র, সুন্দর। সন্তান যে তার অন্তরের জিনিস। মাতৃজঠরে আলোর দিন গোণা অনাগত ভবিষ্যৎ যে তার নাড়ি ছেঁড়া ধন। কিন্তু···

—কি? ব্যাকুল ভাবে জানতে চেয়েছিলেন স্ত্রী। হেসেছিলেন ডাক্তার। উত্তর দেননি।

ঘর ছেড়েছিলেন ডাক্তার। আগের দিন জন্ম হয়েছে তাঁর চতুর্থ সন্তানের। স্ত্রী অথবা সন্তানকে দেখতে পাননি। স্ত্রীও জানতে পারেন নি, স্বামী তাঁর ঘর ছেড়েছেন।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস। শীতের বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে

দিচ্ছে। একবস্ত্রে গৃহত্যাগী ডাক্তার এসে দেখা করলেন কমরেড পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে। বললেন, আমি এসেছি।

—কেন? জানতে চাইলেন কমরেড কৃষ্ণমূর্তি।

—আপনারা কেন এসেছেন?

—আমরা?

—হ্যাঁ। হেসেছিলেন ডাক্তার। একসঙ্গে মিলতে এসেছি আমি। এসেছি···

—ভীষণ কষ্টের জীবন।

—জীবন তো কষ্টের নয়।

কিন্তু অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে।

—সেই কথাই বলুন। হেসেছিলেন ডাক্তার। বলেছিলেন, মাপ করবেন আমাকে। আপনার সঙ্গে তর্ক আমার শোভা পায়না। আমি ডাক্তার।

দুহাতে ডাক্তারকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন কমরেড কৃষ্ণমূর্তি। বলেছিলেন, লজ্জা দেবেন না আমাকে। প্রত্যেকের কাছেই আমাদের কিছু না কিছু শেখবার আছে। কিন্তু আপনি হঠাৎ স্ত্রী পুত্র, পেশা ছেড়ে চলে এলেন কেন? আপনি আপনার গ্রামে থেকেই তো মানুষের উপকার করতে পারতেন?

গম্ভীর হয়েছিলেন ডাক্তার। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন তা হয়তো পারতাম, গরীবের সেবা করার সুযোগ হয়তো পেতাম কিন্তু অন্যায় অত্যাচার তো আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হত না?

—কিন্তু এ যে কঠিন পথ। এ পথে পদে পদে মৃত্যু-ভয়। ধরা পড়লে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে।

কথা বলেননি ডাক্তার। মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠেছিল তাঁর ওষ্ঠ প্রান্তে।

অত্যাচর করেছে পুলিশের দল। পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার

মুখ বুজে সহ্য করেছে কৃষক কমরেডরা। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে স্পষ্ট বলেছে, জানি, কিন্তু বলবো না।

বিপ্লবের ঘাঁটি, বিপ্লবী কমরেডদের ঠিকানা তারা শত অত্যাচারেও প্রকাশ করেনি। বলেছে, যত খুশি তোমরা অত্যাচার করো। মরবো, কিন্তু বলবো না। কেন বলবো? আমরা তো কেউ নিজের জন্যে লড়ছি না, লড়াই জনগণের জন্য।

কিন্তু শিক্ষিত পেটি বুর্জোয়া কমরেড জেল জীবনে পাল্টে গেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধেনি তার। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গোয়েন্দা সঙ্গে নিয়ে এসে মিথ্যা চিঠি পাঠিয়েছে। ধরিয়ে দিতে চেয়েছে দলের কমরেডদের।

সেই জন্যেই সাবধানতা অবলম্বন। প্রতিটি পদক্ষেপে হিসাব। সুবিধাবাদীদের চেনা যে বড় শক্ত।

সে পরিচয় একদিন পেয়েছেন ডাক্তার ভাস্কর রাও। লজ্জিত হয়েছেন। বলেছেন, সত্যি পেটি বুর্জোয়াদের চেনা বড় শক্ত।

অথচ পেটি বুর্জোয়া সমাজ থেকে যাঁরা এসেছেন তাদের সংখ্যা বড় অল্প নয়। এসেছেন ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ডাক্তার; এসেছেন শ্রমিক কৃষক, লেখক, অভিনেতা, গায়ক।

এসেছিলেন কমরেড সত্যনারায়ণ। গিরিজনদের অবিসম্বাদী নেতা তিনি। সমাজের প্রলোভন ত্যাগ করে শিক্ষকরূপে এসেছিলেন গিরিজন এলাকায়। ১৯৬ সালে এক আদিবাসী মহিলাকে বিয়ে করে থেকে গেছেন। পিছনে ফিরে তাকান নি আ হিসাব করতে বসেন নি, কি ছিল তার; কি ফেলে এসেছেন।

কমরেড সত্যনারায়ণ আজ রূপকথার রাজপুত্র। তাঁকে নিয়ে কাহিনীর শেষ নেই। পুলিশ আর শ্রেণী শত্রুর দল তাঁর নামে রঙ চড়িয়ে প্রচার করেছে বহু গল্প।

কিন্তু আসল মানুষটি বলেন, সকলে যা পারে, আমি তা পারি না। অন্য কমরেডরা যে সাহস দেখাচ্ছেন, আমার বোধহয় সে

সাহস নেই। আপনারা আমার সমালোচনা করুন, শিখিয়ে দিন। আমি শিখতে চাই। অনেক শেখার আছে আমার।

কোন আত্মম্ভরিতা নেই, নেই নেতৃত্ব সুলভ দম্ভ। আমি যেহেতু নেতা, সেই হেতু আমি সব বুঝি। আমার জ্ঞানের সীমা পরিসীমা নেই। আমিই সব। আমি যা বলবো তাই সত্য! কারণ, আমি সব কিছু বুঝি বলেই তো নেতা!

কিন্তু চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির উর্দ্ধতন নেতা থেকে সুরু করে সাধারণ কমরেডটি পর্যন্ত এমন বিনয়ী, দেখলে মনে হয় এ যেন স্কুলে শেখা বিনয়। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি বলেন, 'এটা হচ্ছে পার্টির কাজের একটি পদ্ধতি।'

সবার আগে বিনয়ী হতে হবে। সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শেখার আছে। শিক্ষক নই, আমরা সবাই ছাত্র।

[illegible] পামডা গণপতি। আগে অঞ্চল পঞ্চায়েতের, স্কুলের, কো-অপারেটিভের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সব ছেড়ে এসে হয়েছিলেন পেশাদার বিপ্লবী একটি পরিচয়--কমরেড।

বিপ্লবের পতাকাতলে এক হয়েছেন সকলে। ছেঁড়া জুতার মত দূরে ফেলে দিয়েছেন পূর্ব-পরিচয়। কি ছিলেন তার হিসাব করতে বসেন নি কেউ। নতুন দিনের স্বপ্ন দেখছেন সকলে। এক শ্রেণী-হীন সুষ্ঠ সমাজের। যেখানে মানুষের একমাত্র পরিচয়, মানুষ!

আকাশে সূর্য উঠছে। নতুন দিনের সূর্য, রাতের অন্ধকার, দুঃস্বপ্ন পার হয়ে এগিয়ে এসেছে প্রভাতের আকাশে।

চেন্না রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে শংকর ডাকলো, কমরেড।

চেন্না রাও তার দিকে চাইল। মৃদু হাসিমুখে বলল, বল।

—আমাকে ক্ষমা করো কমরেড।

আবার হাসল চেন্না রাও। বলল, এ দুর্বলতাটুকু স্বাভাবিক কমরেড। এই দুর্বলতাটুকু আমাদের সকলের মনেই ছিল একদিন। অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মনকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সুবিধাবাদী নীতিবাগিশের দল আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করছিল। আমরা মিছিল বার করেছি। চিৎকার করে বলেছি, আমাদের দাবী মানতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো চলবে না—চলবে না। পাশের লোক শুনে টিট্‌কারী দিয়েছে, তোমাদের চীৎকারে দাম আরো বেড়ে গেল। কার্যক্ষেত্রে দেখেছি সত্যই ভাই। বুঝেছি, চীৎকার করে দাবী আদায় করা যায় না। তবু চীৎকার করে গেছি আমরা। শাসকশ্রেণী বুঝে গেছে, আমরা শুধু চিৎকার করতেই ওস্তাদ। কারণ, সুবিধাবাদের দ্বারা মহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। সুবিধাবাদের নীতিতে কিছু সংখ্যক লোক লাভবান হতে পারে, জনগণের দুর্দশা ঘোচে না।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণাম্মা। এগিয়ে এসে বলল, এবার আমাদের যাত্রা করা উচিৎ।

কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে তাকাল শংকর। জিজ্ঞাসা করল, আপনিও যাবেন ?

হাসল কৃষ্ণাম্মা। বলল, যাবার অনুমতি আমি পেয়েছি এতদিনে।

ওরা এগিয়ে চলেছে কজন। সকলের আগে কমরেড চেন্না রাও আর তার তিনজন সঙ্গী। শংকর চলেছে তার পিছনে। সবার শেষে কৃষ্ণাম্মা। চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথে হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে শংকরের। সকালের সূর্যটা বেশ তেতে উঠেছে ততোক্ষণে। কাঁধের ঝোলাটা মনে হচ্ছে বেশ ভারী।

কৃষ্ণাম্মা যেন বুঝতে পারল সে কথা। পাশে এসে বলল, আপনার ঝোলাটা বরং আমাকে দিন কমরেড।

শংকর বলল, না থাক।

কৃষ্ণাম্মা আর কথা বলল না। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। ওর চলায় বনহরিণীর ছন্দ। শংকর দেখল, ওদের সকলেরই স্বচ্ছন্দ গতি। সকলের কাছেই কিছু না কিছু বোঝা। গ্রামের মানুষের উপহার। ওরা নিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে। যেখানে চলেছে সে।

শ্রীকাকুলামের কেন্দ্রীয় স্কোয়াডের আমন্ত্রণেই সে অন্ধ্রে এসেছে। এখানে আসবার ইচ্ছা তার অনেকদিনের। কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করে রাখতে হয়েছিল তাকে। কারণ, নিজের ইচ্ছায় সে কিছু করতে পারে না। নির্দেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য প্রতিটি কর্মীর। সে নির্দেশ আসবে পার্টির কাছ থেকে। পার্টির বিশিষ্ট নেতা এবং সভ্যরা যা স্থির করবেন তাই হবে।

সাতষট্টির নকশালবাড়ীর সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম একদিন শেষ হল। সুবিধাবাদী যুক্তফ্রন্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভোগী ঝানু আই, সি, এস—শক্ত মানুষ ধর্মবীরা সশস্ত্র পুলিশ পাঠিয়ে দিনের পর দিন অত্যাচার চালালেন নকশালবাড়ীর গরীব কৃষকদের ওপর। ধরা পড়লেন বহু কর্মী। ধরা পড়লেন নকশালপন্থী নেতা কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, আরো অনেক। বহু অভিযোগ, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি। বিনা বিচারে বন্দী হয়ে রইলেন সকলে।

সভ্য দেশের আইন, বিনা বিচারের আইনও প্রণয়ন করেছে। অপরাধী-অপরাধী। আমাদের চোখে অপরাধী, আমাদের আইন বলছে অপরাধী, এর ওপর কোন কথা নেই। আমাদের যা খুশি তাই করবো। কারণ, রাষ্ট্র-ক্ষমতা আমাদের হাতে। শাসক আমরা। আমরাই সব। আমরা একমাত্র বিচারক।

বিচারকদের স্বেচ্ছাচারিতা, দমননীতিতে আন্দোলন সামান্য ব্যাহত হল মাত্র, কিন্তু শেষ হলনা। কারণ পরিচালক কেউ নেই। প্রায় সকলকেই ওরা কারারুদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন করেছিল শংকর, আমাদের সংগ্রাম কি শেষ হয়ে গেল?

প্রশ্নটা গভীরভাবেই করেছিল সে। জানতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে তিনি হেসেছিলেন।

—আপনি হাসছেন?

—তুমি তো বেঁচে আছ শংকর?

কথাটা বুঝতে পারেনি সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

—সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না শংকর কারণ, জীবনই সংগ্রাম। সংগ্রামের পথ তো সরল নয়। এ যে বড় আঁকা-বাঁকা কঠিন পথ। অজস্র বাঁক। এই বাঁকের মুখগুলিতে প্রয়োজন হলে অবশ্যই থামতে হবে, যদি পিছু হটবার প্রয়োজন হয় পিছু হটতেও হবে, তবে একসঙ্গে। প্যারী কমিউন মাত্র সত্তর দিন টিঁকে ছিল, কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের সংগ্রামও স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র। যতদিন না দেশের কৃষক, শ্রমিকরা পূর্ণ রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে পারছে, ততদিন সংগ্রাম শেষ হবে না। শংকর, তুমি একজন বিপ্লবী। এমন সন্দেহ জাগা বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয়নি। চেয়ারম্যান বলেছেন, It's infinite joy to pit oneself against heven and earth. শংকর, সারা বিশ্ব ভুবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেই তো বিপ্লবীর অশেষ আনন্দ। পাঞ্জা লড়ার মত মনোবল চাই বিপ্লবীর। মনকে দৃঢ় কঠিন করে গড়ে তুলতে হবে। আঘাত সহ্য করতে হবে, যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই হতাশ হলে চলবে না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে আমরা পরাজিত হয়েছি সত্য, আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি।

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। রাশিয়ার শ্রমিকরা পিটার্সবুর্গে, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে শান্তভাবে আসছিল জারের কাছে তাদের অভাব অনটনের কথা জানাতে। জারের আদেশে সেই মিছিলের ওপরও গুলি চালানো হয়। জার ভেবেছিল, গুলি চালালেই ওরা ভয় পাবে, পালিয়ে যাবে, কোনদিন আর কোনরকম দাবী জানাতে

আসবে না। কিন্তু জারের ওই রক্তাক্ত পৈশাচিকতায় জনগণের বিক্ষোভ ও রোষ জেগে ওঠে। সন্ধ্যার দিকে শহরের শ্রমিক এলাকাগুলিতে ব্যারিকেড গড়া স্থরু হয়।

এই বিপ্লবের সূত্রপাত। ব্যর্থ হয় ১৯০৫ সালের বিপ্লব। লেনিন বললেন, 'হয় মৃত্যু নয় মুক্তি!'

মৃত্যুহীন পথে এগিয়ে চললেন বীরের দল। শত শহীদের রক্ত-রাঙা পথে সফল হল বিপ্লব। ১৯১৭ সালের অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের মাধ্যমে মুক্ত হলেন জনগণ।

শহীদের অমর স্মৃতির উদ্দেশে ধ্বনিত হল শোক গাঁথা,

নিদারুণ সংগ্রামে ভূপতিত তোমরা
ভালবেসে মহাজনতায়,
যা পেরেছ সব দিলে জনগণ জন্য
তাদের জীবন মান মুক্তি স্পৃহায়

শীতল সিক্ত কারা, নিপীড়িত তোমরা,
দণ্ড হেনেছে দুষমন,
ফাঁসির মঞ্চ পানে চলে গেলে তোমরা
পায়ে নিগড়ের ঝন ঝন।

বিলাসপুরীর ভোজে জালিমের সুরা
আতঙ্ক চাপা দিতে চায়,
কেননা অমোঘ হাত দেয়ালে দেয়ালে
ভয়াবহ লেখা লিখে যায়।
মহিম, মহাবল, মুক্ত মানুষ
জাগবে এ কথা আছে জানা।
বিদায়, বিদায় ভাই, বীর্যের পথে
পাড়ি দিলে উদাত্তমনা।

—শংকর, মুক্ত হয়েছে রাশিয়া। মুক্তি এসেছে জনগণের জীবনে। কিন্তু যুদ্ধ তবু শেষ হয়নি। সুরু হয়েছে দাঙ্গা। প্রতি বিপ্লবীর দল মরিয়া হয়ে উঠেছে। চক্রান্ত করেছে। আক্রমণ চালিয়েছে। পবিত্র স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে বীরের দল। আজ আমাদের যুদ্ধ সুরু হয়েছে সবেমাত্র। শেষ হবে সেই দিন, যেদিন প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে শেষ করে ফেলতে পারবো। আজ আমরা ডাক দেব। আমরা বলবো:

ওঠো জাগো বন্দী বুভুক্ষার
ওঠো হতভাগ্যেরা হীন।
ন্যায় হানে বজ্রের ধিক্কার
আজ নব জন্মের দিন।
আর নয় সনাতনী শৃঙ্খল
ওঠো দাস, বন্ধন আর নাই।
নয়া বনিয়াদে ওঠে দুনিয়া
নগণ্য, সব কিছু তোমরাই।

বলবো,

ঘুমের ঘোরে পরা শেকলখানা
ঝাঁকিয়ে ফেলে চূর্ণ করে দে না।
অল্প ওরা, তোরা কনেকজনা!

গ্রামে, শহরে, বন্দরে আমাদের যেতে হবে। মানুষের মনে আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে হবে। বন্ধুর ছদ্মবেশে যারা শত্রুত করছে তাদের চিনিয়ে দিতে হবে। বিপ্লব নেতা করে না, করে জনগণ। কৃষক শ্রমিকই তো পারে বিপ্লব করতে। জনযুদ্ধ জনগণের, নেতার নয়। নকশালবাড়ির জনগণের বুকের রক্তে জ্বালা, আগুন যেন না নেভে। নিভবে না শংকর। এ আগুন নেভবার নয়। নিভবে সেদিন, যেদিন জনগণের জীবনে আসবে সত্যকারের মুক্তি।

কমরেড। কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল শংকর। তার দিকে চাইল।

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে বিস্ময়। জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে কমরেড?

—কি হবে? বিস্মিত শংকর প্রশ্ন করল তাকে।

—তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

দাঁড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য হ'ল শংকর। দেখল, অজ্ঞাতে কখন চলার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে তার। দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। কিন্তু দাঁড়াতে তো সে চায়নি। এগিয়ে যাবে, এই তো তার শপথ। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কমরেড। দাঁড়াতে আমি চাইনি। কিন্তু··

চুপ করে গেল শংকর। কৃষ্ণাম্মাও একটু লজ্জিত। একটু আগে যে সম্বোধন সে করেছে তাতে তার নারীমন লজ্জা পেয়েছে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কারো কথা ভাবছিলেন?

—একজনের কথা হঠাৎ এই পাহাড়ী পথের চড়াই উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওঁরা কোথায় গেলেন দেখছি না তো?

কৃষ্ণাম্মা বলল, সামান্য দূরে একখানি গ্রাম আছে। সেখানকার একজন কমরেড আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কমরেডরা গ্রামে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। একটু নীরব থেকে প্রশ্ন করল, যাঁর কথা মনে পড়ায় আপনার চলার গতি ব্যহত হয়েছিল, তিনি কি আপনার প্রিয়জন?

কৃষ্ণাম্মা কি জানতে চায় বুঝতে পারল শংকর। নারীমনের দুর্বার কৌতুহল। এ কৌতুহল তার সহজাত প্রবৃত্তি। মনের গঠন প্রকৃতি তাকে কৌতুহলী করে তোলে। বাধ্য হয় সে।

শংকরের মনটাও মুহূর্তে পরিবর্তিত হল। ভুলে গেল পারি-পার্শিকতা। ছেলেমানুষী পেয়ে বসল যেন তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ইচ্ছা করেই ফেলল সে।

কৃষ্ণাম্মা জিজ্ঞাসা করল, কি হল কমরেড?

অন্য দিকে মুখখানা ঘুরিয়ে নিল সে। রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিছু না।

একটু নীরবতা। কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ শোনা গেল, কমরেড।

তেমনি মুখ ঘোরানো অবস্থাতেই শংকর সাড়া দিল, কি?

—না বুঝে যে অপরাধ করেছি তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। একটু চুপ করে রইলো কৃষ্ণাম্মা। বলল, আমি যদি বুঝতে পারতাম আপনি ব্যথা পাবেন, তাহলে কিছু জানতে চাইতাম না।

শংকর রুদ্ধ অথচ মৃদুকণ্ঠে বলল, সত্যিই আমার অতি প্রিয়জন তিনি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশ ম্লান হল কৃষ্ণাম্মার মুখখানা, পরক্ষণেই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। বলল, তিনি কি…

—আমাদের একই পথের যাত্রী। তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলল শংকর। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভুল পথ থেকে তিনিই আমাকে টেনে এনেছেন। আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

—বলেন কি! কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠে আবার বিস্ময়ের প্রকাশ।

শংকর বলল, সত্য।

—তাহলে আপনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এলেন না কেন। কতজনই তো…

বাধা দিয়ে শংকর বলল, তিনিই তো আমাকে পাঠিয়েছেন এখানে।

—তিনি এলেন না?

—না। মাথা নাড়ল শংকর। বলল, তাঁর আসবার উপায় নেই যে।

—আপনি……

—আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে তিনিই আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন একদিন। বহুদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রায়ই দেখা হত তাঁর সঙ্গে। তারপর হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেলেন তিনি। একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর কথা। হঠাৎ একদিন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হল। দীর্ঘদিন পরে দেখলাম, দীর্ঘদিনের অদর্শনে বিস্মৃত হইনি আমরা কেউই। আমি তখন দিশাহারা। নিজের প্রতিই আস্থাহারা হচ্ছি ক্রমশঃ। তাঁর মতামত শুনলাম। অকপটে তিনি আমার কাছে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন। আমাকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, বিপ্লবের পথ ত্যাগে; আপন সুখ স্বাচ্ছন্দকে আঁকড়ে ধরে থেকে বিপ্লব হয় না। সর্বহারা শ্রেণীর একজন হতে হবে। শুনেছিলাম লেনিনের কথা, মাও সে তুঙয়ের কথা। তাঁদের ত্যাগের কথা, সংগ্রামের কথা। মানুষের প্রতি তাঁদের মমতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসার কথা। সাধারণ মানুষের থেকে কখনো ভিন্ন ভাবেননি তাঁরা নিজেদের। আততায়ীর আক্রমণের পরে লেনিন যখন মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, চিকিৎসকেরা তখন যেসব খাদ্য খেতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সাধারণ রেশন কার্ডে পাওয়া যায়না—বাজারে কোন চোরাকারবারির কাছে কেনা যায়। বন্ধুবান্ধবের শত অনুনয় সত্ত্বেও, যা নিয়মিত রেশনের মধ্যে নেই, যা সকলে পায়না, তা তিনি ছুঁতে অস্বীকার করেছিলেন। এমন দিনও গেছে তাঁর জীবনে, যেদিন সাধারণ মানুষ রুটি পায়নি, তিনিও অভুক্ত থেকেছেন সকলের সঙ্গে। অথচ তিনি তখন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ইচ্ছায় অসাধ্য কিছু ছিল না। কিন্তু নিজেকে তিনি সোভিয়েতের মানুষের থেকে আলাদা কখনো ভাবেন নি। তিনি জনগণের একজন।

দেখেছিলাম তাঁকে। তাঁর নিজস্ব যা কিছু ছিল সবই তিনি পার্টি ফাণ্ডে দিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের পেট চালান গ্রামের দুস্থ মানুষের

সেবা করে। তাঁদের অসুখে বিসুখে ওষুধ দেন, সেবা করেন রাত জেগে। এমন দিনও যায়, দেখেছি যেদিন কিছু জোটে না। তবু কোন অভিযোগ নেই, নেই অহংকার। কোনদিন প্রশ্ন করলে হেসে বলেছেন, শংকর, বিপ্লবের পথ একটু কঠিন বৈকি। নিজের খাদ্য নিজেকেই পরিশ্রম করে জোগাড় করে নিতে হবে।

একদিন মনে সংশয় জাগতে তিনি চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রামের ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। বিপ্লব কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় জেনেছিলাম। হঠাৎ পরাজয়টাকে চিরস্থায়ী ভেবে নেওয়া মূর্খামী ভিন্ন যে আর কিছু নয় বুঝতে পেরেছিলাম। যুদ্ধে জয় যেমন আছে, পরাজয়ও তেমনি মেনে নিতে হয় কখনো কখনো। কিন্তু কেন পরাজয় ঘটল, বিচ্যুতি দুর্বলতাকে কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন। চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রামে, আগষ্ট মাসের পরাজয়ের পর ২৫শে নভেম্বর ১৯২৮ সালে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে রিপোর্টে কমরেড মাও সে তুঙ্ বলেছিলেন, পরিবেষ্টনকারী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বাধীন রাজত্বের রণনীতি অবশ্যই রকমফের করতে হবে। শাসকশ্রেণীর রাজত্ব যখন সাময়িকভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে, তখন এক ধরণের রণনীতি, আবার যখন তার বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন আর এক ধরণের রণনীতি গ্রহণ করতে হবে। হুনান ও হুপে প্রদেশে লীসুঙ-জেন-এর সঙ্গে তাও শেঙ-চী-এর যুদ্ধ (১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে) এবং কোয়ান-টুঙ প্রদেশে চ্যাংফা-কুয়েই-র সঙ্গে লী-চী-পেন-এর যুদ্ধের (১৯২৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে) সময়ে শাসকশ্রেণীগুলো যেরকম বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই রকম সময়ে আমাদের রণনীতি তুলনামূলকভাবে দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে পারে এবং সামরিক কার্যকলাপের দ্বারা তুলনামূলকভাবে বড় বড় এলাকা ছিনিয়ে আনা যেতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে ভিত্তিটা মজবুত করার জন্য আমাদের যত্নবান হতেই হবে, যাতে শ্বেত-সন্ত্রাস যখন আঘাত হানবে তখন

আমাদের নিরাপদ নির্ভরস্থল কিছু থাকে। যখন শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্ব তুলনামূলকভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন আমাদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে এগোবার রণনীতি গ্রহণ করতে হবে। ঐ রকম সময়ে সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ কাজ হল দুঃসাহসিক-ভাবে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করা এবং স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে (ভূমি বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, পার্টিকে সম্প্রসারিত করা এবং স্থানীয় সশস্ত্র শক্তি সংগঠিত করা) সবচেয়ে খারাপ কাজ হল আমাদের কর্মীদের এধার ওধার ছড়িয়ে দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি স্থাপনের কাজে গাফিলতি দেখানো। ছোট ছোট বহু লাল এলাকা যে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তার কারণ, হয় সেখানে উপযুক্ত বাস্তব অবস্থা ছিল না, অথবা কৌশল-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিষয়ীগত ভুল ত্রুটি ছিল। কৌশলগত যে ভুল ত্রুটি ঘটেছে, তার একমাত্র কারণ, শাসকশ্রেণীগুলির রাজত্বের সাময়িক স্থায়িত্ব ও শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যে বিভেদ —এই দুই ধরণের পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টভাবে নির্ণয়ে ব্যর্থতা। এই সাময়িক স্থায়িত্বের সময় কিছু কিছু কমরেড দুঃসাহসিকভাবে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করার কথা বলেছিলেন। এমনকি বিস্তীর্ণ এলাকার রক্ষা-ব্যবস্থা শুধুমাত্র লাল রক্ষীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হোক—এমন প্রস্তাবও তাঁরা করেন। জমিদারদের দেওয়া সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালানো ছাড়াও শত্রুপক্ষ যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে কেন্দ্রীভূত আক্রমণও চালাতে পারে--একথা তাঁরা যেন ভুলে গিয়েছিলেন। স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি তৈরী-কাজে চরম অবহেলা দেখিয়েছেন এবং আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে যথেচ্ছ সম্প্রসারণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সামরিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এগোনোর নীতি গ্রহণের কথা বললে, বা স্থানীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে

কেন্দ্রীভূত করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলিতে মজবুত ভিত্তি তৈরি করে নিজেদের অবস্থান দুর্ভেদ্য করে তোলার নীতি গ্রহণের কথা বললেই তাকে 'রক্ষণশীল' বলে দেওয়া হত। আগষ্ট মাসে হুনান—কীয়াং-সি সীমান্ত অঞ্চলের এবং দক্ষিণ হুনানে চতুর্থ লাল ফৌজবাহিনীর যে পরাজয় ঘটলো তার মূলে আছে ওঁদের ভুল ধারণাগুলি।

সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ পার্টি কমিটি (সম্পাদক মাও সে তুং) এবং সেনাবাহিনী পার্টি কমিটি (সম্পাদক চেন ই) যে নীতিগুলি গ্রহণ করেছিলেন :

শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করো, লোখিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করো এবং পলায়নী মনোবৃত্তির বিরোধিতা করো।

স্বাধীন রাজত্বের এলাকাগুলিতে কৃষি বিপ্লবকে গভীরতর করো।

সেনাবাহিনীর পার্টি সংগঠনের সাহায্যে স্থানীয় পার্টি সংগঠনের বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হও এবং নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে স্থানীয় সশস্ত্র শক্তির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হও।

হুনানের শাসক শক্তি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও এবং তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্বল কীয়াং-সি শাসকশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান চালাও।

য়ুং সীনের উন্নতির জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালাও, সেখানে জনগণের একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করো এবং দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।

সময় বুঝে সমাগত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য লালফৌজের ইউনিটগুলিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করো, আর শত্রু যাতে আমাদের বাহিনীর অংশগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে ধরে একটার পর একটা খতম করে না ফেলতে পারে তার জন্য আমাদের বাহিনীকে বিভক্ত করে দেওয়ার বিরোধিতা করো।

স্বাধীন রাজত্বের এলাকাকে সম্প্রসারিত করার জন্য ঢেউ-এর পর

ঢেউয়ের মত করে এগিয়ে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করো এবং দুঃসাহসিক অগ্রগতির মাধ্যমে সম্প্রসারণের নীতির বিরোধিতা করো।

এই যথাযত কৌশলগুলি ছিল বলেই একের পর এক জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় দুটি ছোট দল আর ষাটটি জীর্ণ রাইফেল। তবু তাঁরা এগিয়ে গেছেন দুর্জয় সাহসের ওপর ভর করে। গেরিলা আক্রমণ চলেছে দিনের পর দিন। জনগণ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শত্রুরা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্বেও পরাজিত হয়েছে।

পরাজিত হয়েছেন তাঁরাও। নিজেদের ভুলে লালফৌজের বাহিনীও। আগষ্ট মাসের পরাজয়ের কারণগুলি হচ্ছে :

(১) কিছু অফিসার ও সৈন্য দোনা-মোনা করছিল, ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তারা লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। আর অন্যরা দক্ষিণে হুনানে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের মধ্যে উৎসাহের অভাব ছিল ; (২) গ্রীষ্মের ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যে পায়ে হেঁটে দীর্ঘপথ চলার ফলে আমাদের সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ; (৩) লিংসীয়েন থেকে কয়েক শত লি (৩লি = ১ মাইল) দূরে চলে যাওয়ার পর আমাদের সৈন্যরা সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ; (৪) দক্ষিণ হুনানের জনগণকে তখনও জাগিয়ে তোলা হয়নি। ফলে আমাদের অভিযান পুরোপুরিভাবে একটা হঠকারী সামরিক অভিযানে পরিণত হয়েছিল। শত্রুর পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ ছিলাম এবং (৫) যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না এবং অফিসার ও সৈন্যরা অভিযানের উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারেনি।

পরে, বিপ্লব জয়যুক্ত হবার আগে দীর্ঘদিন দুঃসহ অবস্থার মধ্যে তাঁদের লড়তে হয়েছে। পাঁচ হাজার লোকের পুরো সেনা-বাহিনীর শীতবস্ত্রের জন্য তুলোভরা কাঁথা আছে কিন্তু কাপড়ের অভাব। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় দু' ভাঁজ করা পাতলা কাপড়ের পোষাক

পরে কাটাতে হয়েছে। সামান্য আহার। প্রতিটি লড়াইয়ের পর কিছু লোক আহত হয়েছে। তা ছাড়া অপুষ্টিতে, ঠাণ্ডা লেগে ও অন্যান্য কারণেও বহু সৈন্য, অফিসার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চিংকাং পাহাড়ের ওপর হাসপাতালগুলিতে চীনা ও পাশ্চাত্য দু' ধরণের চিকিৎসারই বন্দোবস্ত আছে, নেই শুধু ডাক্তার আর ঔষধ।

সাধারণত, লড়াই করতে পারার আগে একজন সৈনিকের প্রয়োজন ছয়মাস বা এক বছরের শিক্ষা। কিন্তু কাল সৈন্য দলে ভর্তি হয়ে আজই লড়াইয়ে নামতে হয়েছে শুধুমাত্র সাহসের ওপর নির্ভর করে। ফলে আনাড়ী সৈনিককে অল্প কালের মধ্যেই প্রাণ দিতে হয়েছে। তবু কোন অভিযোগ ছিল না। কারণ, সকলেই বুঝেছিলেন, এ তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ। গণতন্ত্রের লড়াই।

বহু ঝড়, ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে লাল ফৌজ। তাদের দুর্বার গতি রোধ করার সামর্থ বিরুদ্ধ শক্তির হয়নি। পশুশক্তি পরাজিত হয়েছে। যুগযুগান্তের অন্যায়, পাপ আর অত্যাচারের অবসান ঘটেছে। মুক্ত হয়েছে চীনের জনগণ।

অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণাম্মা ডাকল, কমরেড!

শংকর তার মুখের দিকে চাইলো।

—আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি। বলল কৃষ্ণাম্মা।

শংকর বুঝতে পারল সব। তবু জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—আমি ভুল ধারণা করেছিলাম। অবিচার করেছিলাম আপনার ওপর।

—আপনার এই অবিচারটুকু কিন্তু আমার কাছে অনেক।

—কি। চমকে মুখ তুললো কৃষ্ণাম্মা। তার কালো মুখে এক ঝলক রক্ত।

—কিছু না। হাসল শংকর। বলল, আমাদের পথ চলার এখনও অনেক বাকী।

কৃষ্ণাম্মা মাথা নীচু করলো। ধরা পড়ে গেছে সে। লজ্জা পেল। কিন্তু লজ্জার মাঝেও যে এমন আনন্দের স্বাদ জড়িয়ে থাকে এই প্রথম সে অনুভব করলো তার জীবনে।

খানিকক্ষণ পরেই ফিরে এল চেন্না রাও। একাকী। হাতে ছোট একটা পুঁটলি। এসে বলল, কমরেড, আমাদের এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

কৃষ্ণাম্মা জানতে চাইলো, কেন?

—পাশের গ্রামে পুলিশী হামলা হয়েছে। আমরা পুলিশের ওপর আক্রমণ করবো। এই তোমাদের খাবার। তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে।

বোনের হাতে খাবারটা দিয়ে, কথাটা বলেই ছুটে চলে গেল চেন্না রাও। তাকে বাধা দেয় বা অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে তেমন সুযোগ সে দিল না।

চেন্না রাও যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে রইলো কৃষ্ণাম্মার। পরক্ষণে মৃদু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এখন খাবেন কমরেড?

যেন কিছুই হয়নি, অতি স্বাভাবিক ঘটনা। কৃষ্ণাম্মাকে দেখে এবং তার কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হল শংকরের। বলল, খাবো, কিন্তু ওরা ফিরবে কখন?

ছোট পুঁটলিটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে কৃষ্ণাম্মা। বড় একটা পাথরের ওপর পাতা পাততে পাততে একবার তার মুখের দিকে চাইল। মৃদুকণ্ঠে বলল, কেউ জানে না।

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চাইলো সে। বিস্মিতকণ্ঠে বলল, একি বলছেন আপনি?

কৃষ্ণাম্মার ততক্ষণে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, আপনি খেয়ে নিন।

শংকরের ততক্ষণে খাবার স্পৃহা চলে গেছে। কিন্তু 'খাব না' বলতেও পারল না সে। খেতে বসে মনে হল খাবার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। কৃষ্ণাম্মা দেখল। যেন বুঝতে পারল তার অবস্থাটা। মৃদুকণ্ঠে বলল, মিথ্যা মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। যা সত্য তাই বলেছি আমি।

—কিন্তু……। কি যেন বলতে চাইল শংকর।

ম্লান বেদনার একটু হাসি ফুটলো কৃষ্ণাম্মার ওষ্ঠে। বড়ো চোখ দুটিও যেন ছলছলিয়ে উঠল। শান্তকণ্ঠে বলল, সত্যিই কেউ জানে না, কি হবে। জানে না শ্রীকাকুলামের মানুষও, যে শিশুটি সবে ভূমিষ্ঠ হল, তার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তাও কেউ বলতে পারে না। কারণ, ওদের চোখে আমরা অপরাধী। তরুণের স্বপ্ন আমাদের, আমরা স্বপ্ন দেখেছি, ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক, যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে তাদের মুক্তি আনবো; মুক্তি আনবো শোষণ থেকে, মুক্তি আনবো অন্ধকার থেকে, দারিদ্র আর ক্ষুধা থেকে। আমরা বিপ্লবে বিশ্বাসী, সশস্ত্র কৃষকই যে বিপ্লব সফল করতে পারে এ বিশ্বাসে আমরা দৃঢ়। অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, বিফল হয়েছে তেলেঙ্গানা; কারণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন। কিন্তু আজ আমরা মুক্তি পথের সন্ধান পেয়েছি। মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারার সন্ধান

পেয়েছি আমরা। তেলেঙ্গানার ব্যর্থতাকে পেরিয়ে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সেই সত্য রূপ পেয়েছিল নকশালবাড়িতে।

সংশোধনবাদী কাউটস্কি যখন মার্কসের শিক্ষার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে বরবাদ করে, তাকে নির্বীর্য করে শুধু তার নাম ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের হাঁড়িকাঠে জনতার স্বার্থকে বলি দিতে গিয়েছিল তখন লেনিন লিখেছিলেন :

"মহান বিপ্লবীদের জীবিতকালে নিপীড়নকারী শ্রেণীগুলি অনবরত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, বর্বরতম বিদ্বেষ, হিংস্রতম ঘৃণা এবং মিথ্যা ও কুৎসার একেবারে বিবেক বিবর্জিত অভিযান চালিয়ে তাদের তত্ত্বগুলিকে আক্রমণ করে। তাদের মৃত্যুর পর চেষ্টা করা হয় তাদের নিরীহ বিগ্রহে পরিণত করার; তাদের, যাকে বলে সিদ্ধপুরুষ, তাই বানিয়ে তোলার এবং তাদের নামের চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করার; এই চেষ্টার উদ্দেশ্য হল, নিপীড়িত শ্রেণীগুলিকে "সান্ত্বনা" দেওয়া, তাদের ধাপ্পা দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী তত্ত্বের মর্মবস্তুটুকু ফেলে দিয়ে ঐ তত্ত্বকে নির্বীর্য করে দেওয়া, পঙ্কিল করে দেওয়া, তার বিপ্লবী ধারাকে ভোঁতা করে দেওয়া।"

লেনিন এই কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি তখন সেই সংশোধনবাদী শয়তানদের হাত থেকে বিপ্লবের মশাল কেড়ে নেন।

মার্কস এঙ্গেলসের শিক্ষার বিপ্লবী অন্তর্বস্তুকে লেনিন রক্ষা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাড়িয়ে তুলেছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিন সেই বিপ্লবেব মশাল হাতে তুলে নেন। আজ সে মশাল জ্বলছে চেয়ারম্যানের হাতে।

ভণ্ড লেনিন-পুজারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন চেয়ারম্যানের মন্ত্রশিষ্য কমরেড চারু মজুমদার ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি সৃষ্টি করে। চেয়ারম্যানের উত্তরাধিকারী ভাইস চেয়াম্যান

লিন পিয়াও যেভাবে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে, তাঁর জনযুদ্ধের তত্ত্বকে, তাঁর গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্বকে, সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ পতন এবং সমাজতন্ত্রের দ্রুত বিস্তৃতির যুগে তাঁর সর্বহারা বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলকে তুলে ধরলেন, তাকে আত্মস্থ করে ভারতীয় বিপ্লবের পরিস্থিতিতে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করলেন কমরেড চারু মজুমদার।

চেয়ারম্যান বলেছেন: "যদি বিপ্লব করতে হয়, তাহলে অবশ্যই একটা বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে।"

নকশালবাড়ির পর মুশাহারি, লখিমপুর খেরী। তৈরী হল শ্রীকাকুলাম। যার অভিনব অভিজ্ঞতার সার-সংকলন করে তৈরি হল ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। আধুনিক সংশোধনবাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে ভারতের বিপ্লবী রাজনীতিতে এই সর্বপ্রথম কৃষক পেল তার অনন্য সাধারণ ভূমিকার স্বীকৃতি। অন্নদাতা পেল মুক্তিদাতার মর্যাদা।

নকশালবাড়ীর বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেছিল সাতষট্টির প্রতিক্রিয়াশীল ফ্রন্ট সরকার। সতের মাস পরে রাজ্যপালের পুলিশবাহিনী গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে বন্দী রাখলো। উনসত্তরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আবার ক্ষমতায় এল যুক্তফ্রন্ট সরকার। প্রতিক্রিয়াশীল নয়, প্রগতিশীল ফ্রন্টসরকার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু বিনা সর্তে মুক্তি দিলেন কৃষক, বিপ্লবী ও নেতাদের।

১লা মে ১৯৬০ সালে মে দিবসে মনুমেন্টের পাদদেশে সভায় ভারতের তৃতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের শুভ সংবাদ ঘোষণা করলেন, শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড কানু সান্যাল।

ভারতবর্ষের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্যকারের বিপ্লবী পার্টি। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছে পার্টি। যে বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক শ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা সফলতা লাভ করেছে। পার্টির ডাকে এগিয়ে আসছেন শ্রমিকরা—বিপ্লবের নেতারা, বিপ্লবী কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গণবিপ্লবকে পরিচালিত করার জন্য এগিয়ে আসছেন দলে দলে বিপ্লবী যুব ছাত্ররা, ধনী কৃষকের একটা অংশ, মেহনতী মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

শাসকশ্রেণী আজ ভয়ার্ত—দিশাহারা। বিপ্লবকে ধ্বংস করতে ওরা চালাচ্ছে হিংস্রতম, বর্বরতম দমননীতি; গ্রেপ্তার আটক তো আছেই, সঙ্গে আছে বিচারের প্রহসনটুকু না করে, ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা। সেইজন্যেই আজ মারের বদলে পাল্টা মার, হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দেওয়া হচ্ছে, প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়া হচ্ছে, ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসকশ্রেণীর হত্যার একচেটিয়া অধিকারের দিন শেস হয়ে গেছে।

মৃত্যু? যদি মৃত্যু হয়?

এ দুনিয়ায় অমর তো কেউ থাকবে না চিরদিন! মরে কাপুরুষ, বীরের মৃত্যু নেই

বীরের মৃত্যু নেই। বীর কখনো মরে না। মরেননি কমরেড বাবুলাল, সুব্বারাও পানিগ্রাহী, পঞ্চাদ্রী কৃষ্ণমূর্তি, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, রমেশচন্দ্র সাহু, আনকাম্মা, সরস্বতী আম্মা, থামাডা গণপতি, গোরাকালা সন্ন্যাসী, গণমাধব রাও, গাডেলা লোকনাথম্, মারিপিস্তি বল্লভ রাও, উম্মা রাও আর ভাস্কর রাওরা। বীরশহীদ কমরেডরা চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

নকশালবাড়ির মাটিতে শহীদ হয়েছেন বাবুলাল। একা বাবুলাল পাঁচশো সশস্ত্র পুলিশ। অসংখ্য বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে

গেছে বাবুলালের বুকের পাঁজর, কিন্তু মুখে বেদনার চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখের অম্লান হাসিটুকু দিয়ে বাবুলাল প্রমাণ করে গেছেন প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনে মৃত্যু কত তুচ্ছ।

শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছেন কমরেড থামাডা গণপতি, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি, সুব্বারাও পানিগ্রাহী, রমেশ সাহু এবং ভাস্কর রাও। এঁদের কেউ কবি-নাট্যকার, কেউ মাষ্টার, ডাক্তার, জায়া ও জননী।

যেমন আপন পেশা, স্বাচ্ছন্দ, সংসার ছেড়ে বিপ্লবের ডাকে ছুটে এসেছিলেন ডাঃ ভাস্কর রাও তেমনি এসেছিলেন সুব্বারাও পানিগ্রাহী। তাঁর নাটক করে হাজার হাজার টাকা উঠেছে—আনুষ্ঠানকারীরা সেই টাকা দিতে চেয়েছে তাঁকে, সিনেমা থেকে ডেকেছে, দেখিয়েছে সুখের প্রলোভন, ধনী হওয়ার রাস্তা, কিন্তু সব কিছু তিনি প্রত্যাখান করেছেন। বলেছেন, আপন সুখের চেয়ে বৃহত্তর সুখ আমার কাম্য।

বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তিনি। তাঁর ওপর আক্রোশে শাসকশ্রেণী তাঁর ভাই ও বোনকে গ্রেপ্তার করেছে। অত্যাচার চালিয়েছে তাদের ওপর। কিন্তু কেন এই অত্যাচার, যারা অত্যাচার করেছে তারাও জানেনা কেন।

তেমনি আজকের সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রীকাকুলামের মানুষ নিজেরা নামেনি। নামতে বাধ্য হয়েছিল তারা। ১৯৬৭ সালের ৩১শে অক্টোবর লেভিডি অঞ্চলে দুজন কমরেডকে হত্যা করল বিনা কারণে। হয়তো কারণ ছিল, তা হল পার্টির আদর্শ প্রচার। কুড়ি বছরের সংসদীয় পথ যে গরীব সর্বহারাদেব কিছুই করেনি তা শুধু প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিচ্ছিল জনগণকে। দেখাচ্ছিল কুড়ি বছর আগে যার শুধুমাত্র কয়েক বিঘা জমি ছিল, কুড়ি বছরের মধ্যে তার কয়েক শো বিঘা জমি হল কেমন করে। কেমন করে কুড়ি বছরে ধনী আরো ধনী, গরীব আরো গরীব হল। কোন্ পথে? কাদের পরিশ্রমের ফসলে, বুকের রক্তের বিনিময়ে?

শ্রীকাকুলামের গিরিজনরা (পাহাড়ী) কেমন ভাবে দিনের পর দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। তাদের শ্রমের ফসল অন্যায়ভাবে লুঠে নিয়ে মুনাফার পাহাড় জমাচ্ছে জমিদার আর মুনাফাবাজের দল। কোন্ পথে, কেমন করে তারা ফাঁকি দিচ্ছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলিকে!

মানুষ জাগতে লাগল। তাদের পরিশ্রমের ফসল যে অন্যায়ভাবে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, বুঝতে পারল তারা। প্রতিবাদ জানাল। দা'বী করল ন্যায্য মূল্য।

খেপে উঠল জমিদার মহাজনের দল। দুজন কর্মীকে গুলী করে হত্যা করল তারা।

এই ঘটনার পর গিরিজন কৃষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়ল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠল তাদের কণ্ঠ। পাপের শাস্তি বিধান করল নিজের হাতে। সুরু হল গিরিজন আন্দোলন।

কুখ্যাত জমিদার জোতদারের দল ভীত হল। নিজেদের সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করল তারা। নিজেদের বাঁচাবার জন্য আবেদন জানাল তারা। স্বভাবতই শাসকশ্রেণী গিরিজন আন্দোলনের জঙ্গীপ্রকাশ দেখে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না। তারা সশস্ত্র ভাড়াটে বাহিনী প্রেরণ করল। ১৯৬০ সালের ৩রা মার্চ সুরু হল দমন, পীড়ন ও অত্যাচার।

মার খেল মানুষ। সহ্য করল অত্যাচার। তারপর সহ্যের সীমা অতিক্রম করার পর যখন বিপ্লবী জনতা পাল্টা মার সুরু করল, তখন নাগী রেড্ডীর দল বলল, এ অন্যায়। এভাবে বিপ্লব হয় না। এ পথ বিপ্লবের নয়। বিপ্লবের কথা শিখতে হবে পুঁথির পাতা পড়ে। সময় এখনো হয়নি। মিছিমিছি মরে লাভ কি? জীবনের দাম যে অনেক।

স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে মরছে। দেখছে কেমন করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে জীবনীশক্তি, তবু প্রতিবাদ করবে না, বাধা দেবে না। বাধা দেওয়া অন্যায় হবে বৈকী।

আমরা ধনীর দ্বারে করাঘাত করবো, পায়ে মাথা খুঁড়বো; বলবো, দয়া কর আমাদের, ভিক্ষা দাও। বলবো, আমাদের মেরো না তোমরা। করুণা করে বাঁচতে দাও।

না। এ বাঁচা বাঁচা নয়, মৃত্যু। জীবনের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। যারা মানুষের মনুষ্যত্বকে অহমিকায় মত্ত হয়ে পদদলিত করতে দ্বিধা করে না, তাদের ক্ষমা নেই। ক্ষমতার দম্ভে মত্ত অত্যাচারীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

বুলেটের জবাব ওঁরা বুলেট দিয়েই দিয়েছিলেন। একদিন অতর্কিতে সংখ্যায় বহুগুণ শত্রুবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। প্রথমে পালাবার চেষ্টা করলেন ওঁরা। দেখলেন সব পথ রুদ্ধ। তখন ঘুরে দাঁড়ালেন ওঁরাও।

পুলিশবাহিনী বলল, পালাবার সব পথ আমরা বন্ধ করেছি, ধরা তোমাদের দিতেই হবে। তোমরা ধরা দাও আমাদের হাতে।

ওঁরা নীরব রইলেন।

—কী, তোমরা ধরা দেবে না? জানতে চাইল ওরা।

তবু ওঁরা নীরব।

ওরা বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাদের। এর মধ্যে যদি বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ না করো তাহলে গুলি চালাতে বাধ্য হবো আমরা।

সময় মাত্র পাঁচ মিনিট। ওঁরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। প্রত্যেকের মুখেই বিচিত্র এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট। বড় দীর্ঘ সময় এই পাঁচটা মিনিট।

পাঁচ মিনিট পরে আবার ওরা বলল, পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেছে। এখনো বলছি, তোমরা ধরা দাও। নাহলে আমরা এবার সত্যিই গুলি চালাবো।

এতক্ষণ পুলিশ যেন ঠাট্টা করছিল। এবার সত্যিই ওরা গুলি চালাবে। কিন্তু ওকি। হঠাৎ গুলির শব্দ কেন? মুখ থুবড়ে

পড়ে গেল একজন রাইফেলধারী পুলিশ। আর একজন···
আরো একজন।

পুলিশের হাতেও গর্জে উঠল রাইফেল। অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্র একসঙ্গে বুলেট বৃষ্টি করছে। ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ। মাঝে মাঝে আহত পুলিশের আর্তনাদ।

ওঁরা নীরব। পুলিশের দল ওঁদের কোন আর্তনাদ শুনতে পেল না।

জীবনপণ সংগ্রাম। শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ওঁরা। তারপর এক সময় ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধীরে ধীরে ঢলে পড়েছিলেন মৃত্যুর কোলে, কিন্তু ওঁদের মুখে কোন বেদনার চিহ্ন ছিল না।

যুদ্ধ শেষ হতে পুলিশের দল ছুটে গিয়ে দেখল, ওঁরা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। মুখে মৃদু হাসির প্রসন্ন প্রকাশ!

ওঁরা হাসতে হাসতে বরণ করেছেন মৃত্যুকে!

শত্রুবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন ওঁরা কজন। কমরেড সুব্বারাও পানিগ্রাহী, স্বরস্বতী আম্মা, রমেশ সাহু, উন্‌কা আম্মা, নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি ও উম্মা রাও।

শত্রুকে বাধা দেওয়া বা যুদ্ধ করার সুযোগ তাঁরা পেলেন না। অসহায়ভাবে লোহার হাতকড়ি পরতে হল হাতে। ওঁদের গ্রেপ্তার করে সগর্বে ফিরে গেল পুলিশবাহিনী।

অন্ধকার সেলে বন্ধু এল ওঁদের কাছে। বলল, কেমন আছেন মিঃ পানিগ্রাহী?

কমরেড পানিগ্রাহী চাইলেন তার দিকে। স্বভাবসিদ্ধ শান্তকণ্ঠে

বললেন, আমার কেমন থাকার সংবাদটি তো আমার চেয়ে আপনারাই ভাল জানেন।

—এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনার ?

হাসলেন কমরেড পানিগ্রাহী, বললেন, আপনাদের অতিথি আমি নই, অতএব ভালমন্দের সংবাদ নেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা।

হাসল বন্ধু। বলল, আপনি যা বললেন তা হয়তো সবই সত্য, কিন্তু আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সত্যই শ্রদ্ধা করি। আপনার নাটক কবিতা পাঠ করতে আমি ভালবাসি।

—আমি ভালবাসি আমার দেশকে, জনগণকে।

—আপনার উপযুক্ত কথা। আপনার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছুই আশা করে।

—দেশের মানুষের সত্যকারের আশা পূরণের ব্রতই তো নিয়েছি।

—সেটা কী ?

—একমুঠো ক্ষুধার অন্ন।

—কিন্তু আপনি তো কবি ?

—প্রয়োজনে কবিও সৈনিক হতে বাধ্য হয়। প্রয়োজন অনুভব করেছি তাই মসী ছেড়ে অসি ধরেছি। অন্নহীন মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার শপথ নিয়েছি।

বন্ধু হাসল তাঁর কথা শুনে। বলল, এ আপনি ঠিক করেন নি।

—আপনাদের বিচারে ?

—আপনার কাজের বিচার বা সমালোচনা করি এত বড় দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি ভুল পথে চলছেন। এ পথ—পথ নয়।

—আপনি জানেন সত্যকারের পথ কোন্‌টা ?

—আমি ? চিন্তা করেছিল বন্ধু। বলছিল, আপনি ও পথ ত্যাগ করে চলে আসুন।

—কোথায় যাবো ?

—যে পথে যাচ্ছিলেন। আপনার ভাবনা কি ? আমি জানি সৌভাগ্য বারবার আপনাকে ধরা দিতে চেয়েছে। আপনি ধরা দেন নি। আপনি···

হেসেছিলেন কমরেড পানিগ্রাহী। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন ধরা দিইনি বলতে পারেন ?

—কেন ?

—জানেন না। কিন্তু আমি জানি। আপনি বলতে পারেন আমরা স্বাধীন না পরাধীন ?

—কেন, সবাই জানে আমরা স্বাধীন।

—সবাই জানে আমরা স্বাধীন! বিদ্রূপ করে উঠেছিল কমরেডের কণ্ঠ। বলেছিলেন, সবাইকে জানানো হয়েছে আমরা স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু কেমন সে স্বাধীনতা ? শুধু ইংরাজ চলে গেল বলেই আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু, আমাদের জীবন থেকে—যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছি কি আমরা ? অবাধ নিষ্ঠুরভাবে গরীবকে ধনীর শোষণের নামই কি সমাজতন্ত্র ? যে সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্রের ব্যবধান, অবিচার অত্যাচার, পীড়ন চলে, অন্যায় ভাবে মুনাফা লোঠে ধনীর দল, গরীবরা মার খায় দিনের পর দিন, প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ জানানো অন্যায়, মানুষে মানুষে বন্ধু-আত্মীয়ের সম্পর্ক নয় ; শোষক এবং শোষিত শ্রেণী, তার নাম তো স্বাধীনতা নয়! প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে সেদিন, যেদিন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, থাকবে না অন্যায় অত্যাচার, শেষ হবে অত্যাচারীর দল, সেই দিন আমরা স্বাধীন হবো। মুক্ত কণ্ঠে গাইবো স্বাধীনতার জয়গান। সেই পথেই চলেছি আমি। আমি সত্য পথের পথিক।

—কিন্তু ভুল করছেন আপনি।

—এই ভুলটুকুই আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। ভুলের সংশোধন হয়, অন্যায়ের হয় না।

—ও পথ আপনি ছেড়ে দিন।

—ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়?

—পার্টিকে অস্বীকার করুন আপনি।

—তারপর?

—যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হন…

—তাহলে আমাকে হত্যা করা হবে, এই তো? হেসেছিলেন কমরেড পানিগ্রাহী। বলেছিলেন, চেয়ারম্যান বলেছেন, "আমাদের সামনে হাজার হাজার শহীদ বীরত্বের সঙ্গে জনগণের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের সে পতাকা উর্দ্ধে তুলে, আসুন আমরা এগিয়ে চলি, তাদের রক্ত চিহ্ন বেয়ে।" আমরা তাঁর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। আমাদের মৃত্যুও ব্যর্থ হবে না কখনো। পার্টিকে অস্বীকার করার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

—এই আপনার শেষ কথা?

—আমাদের প্রথম ও শেষ কথা বলে কিছু নেই। আমার মত এবং পথের কোন পরিবর্তন হয় না। আমরা শোধনবাদীদের মত মিথ্যার বেসাতি করি না। আমরা জানি, মূল্য ছাড়া বিপ্লব হয় না এবং এ মূল্য রক্তের মূল্য, জীবনের মূল্য। এই হচ্ছে বিপ্লবের নিয়ম। বৃথা চেয়ারম্যান মাও আমাদের শেখাননি, "সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ-দুর্দশা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে।"

—তাহলে বাঁচতে আপনি চান না?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বাঁচতে কে না চায় বলুন? কিন্তু যাদের জন্যে আমরা বাঁচতে পারছি না তাদের নিশ্চিহ্ন করে মানুষের মত বাঁচতে চাই আমরা।

চলে এসেছিল বন্ধু। কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি। সকলের কাছেই

ঘুরেছিল। প্রস্তাব রেখেছিল, তাঁরা যদি তাঁদের পার্টিকে অস্বীকার করেন, তাঁরা যদি লিখে দেন যে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী)'র সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই, তাহলে তাঁদের হত্যা করা হবে না।

কমরেড নির্মলা কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন, জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলার আগে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও আপনার কণ্ঠটা কাঁপবে বলে আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু দেখলাম এতটুকু কাঁপল না আপনার কণ্ঠ।

—আমি সত্যিই আপনাদের মঙ্গল চাই।

—জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক করে?

—আমি শুধু পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলছি।

—পার্টি এবং জনগণ কী ভিন্ন?

—আমার মনে হয়······

—আপনার মনে হওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, হেসেছিলেন কমরেড নির্মলা। বলেছিলেন, লেনিন একসময় তাঁর পার্টি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে লেখেন, "বলশেভিক প্রতিনিধিদের চমৎকারিত্ব কথার ফুলঝুরিতে নয়, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবির বৈঠকখানায় হাজিরা দেওয়ায় নয়··, বরং শ্রমিক জনগণের সঙ্গে সম্পর্কে, সেই জনগণের মধ্যে আত্মোৎসর্গী কর্মে, অবৈধ প্রচারক ও সংগঠকের মামুলী, অদৃশ্য, গুরুভার, করতালিহীন, অতি বিপজ্জনক কাজ চালিয়ে যাওয়ায়।" পার্টিকে অস্বীকার করার অর্থই হল জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

—তাহলে ·····

বন্ধুর অসমাপ্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দেননি কমরেড নির্মলা। উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন মুখখানি।

পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হননি কেউই। ওদের সমস্ত চেষ্টা, কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। ওরা বিচলিত হয়েছে। ভেবে পায়নি এমন অটুট মনোবল কোথায় পেলেন ওঁরা।

এ বিশ্বাস লাভ করেছেন ওঁরা দেশ আর জাতির কাছে, ভারতের বিপ্লবী ঐতিহ্যের কাছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল সংগ্রামেরই ইতিহাস। সেই অতীত কাল থেকে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে চিরকাল ব্যাপক সংগ্রাম করে এসেছে জনগণ। ওঁরাও তো সেই বিপ্লবী জনগণের একজন। ওঁরা অনুসরণ করেছেন সেই পথ, যে পথ হাজার হাজার শহীদের রক্তে চিহ্নিত, ওঁরা বিশ্বাস রেখেছেন ভবিষ্যতের ওপর। ওঁরা আত্মোন্নতিকে ঘৃণা করেন। জনগণের মুক্তি ওঁদের জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান লক্ষ্য। ওঁরা বিশ্বাসী বিপ্লবে।

বিপ্লব আনবে মুক্তি! নতুন দিনের সূর্য!

বধ্য ভূমিতে জহ্লাদদের উদ্যত রাইফেলের সামনে ওঁরা দাঁড়িয়ে। মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই, চোখে নেই মৃত্যু ছায়া। ওঁরা নির্ভিক, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা।

শেষবারের মত প্রশ্ন করল জহ্লাদের দল, এখনও সময় আছে। বল, কি করবে তোমরা?

ওঁরা হাসছেন।

—তোমরা বাঁচতে চাও না?

—নিশ্চয়ই চাই। আমরা বাঁচবো। বেঁচে থাকবো চিরদিন। শত-সহস্র, লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবো আমরা। মৃত্যু আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

—তোমরা······

—আমরা জনগণের। তোমাদের সাধ্য কি আমাদের মারো?

একের পর এক গর্জে উঠল জহ্লাদদের হাতের রাইফেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ওঁদের দেহগুলি। শেষবারের মত ধ্বনিত হল ওঁদের মিলিত কণ্ঠ:

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জিন্দাবাদ···

গেরিলা দল গঠন: গেরিলা দল সম্পূর্ণ গোপনে গড়তে হবে। এই দলকে সেইরকম স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকেও গোপন রাখা উচিত যাদের সজাগতা এখনও প্রয়োজনীয় মানে উঠতে পারে নি, এমন কি সেই সব পার্টি ইউনিটগুলো থেকেও গোপন রাখতে হবে, যে সব ইউনিটগুলো এখনও বে-আইনী কাজকর্মের পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে পারে নি।

এই দল গঠন করার পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে চক্রান্তমূলক। রাজনৈতিক পার্টি ইউনিটগুলোর মিটিং এও এই চক্রান্তের কোন রূপ দেওয়া চলবে না। এটা হওয়া উচিত ব্যক্তিগত ও জনে জনে চক্রান্ত। বুদ্ধিজীবি কমরেডকেই এ ব্যাপারে যথাসম্ভব উদ্যোগ নিতে হবে। সেই কমরেডটি, তার ধারণার সবচেয়ে সম্ভাবনা আছে, এমন একটি গরীব কৃষকের কাছে যাবে ও কানে কানে বলবে, "এরকম এরকম জোতদারকে খতম করলে কি ভাল হয় না?" এইভাবে গেরিলাদের একজন একজন করে গোপনে বেছে একটি দল সংগঠিত করতে হবে।

এগুলো করার আগে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে গরীব কৃষকদের মধ্যে, সশস্ত্র ক্ষমতা দখলের কথা বেশ কিছু পরিমাণে প্রচার করে নিতেই হবে। কিন্তু গেরিলা আক্রমণ সুরু হওয়ার আগেই একটা গভীর প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা ভুল। ক্ষমতা দখলের কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে অর্থাৎ কৃষকদের জাগাতে হবে এবং তাদের নিজেদের গ্রামগুলিকে মুক্ত করার ওপর জোর দিতে হবে। তাদের নিজের নিজের এলাকায় স্থানীয়ভাবে ক্ষমতা দখল করতে হবে যাতে সামন্ত শোষক নয়, কৃষক জনতাই তাদের স্থানীয় ব্যাপারগুলোর একমাত্র

মিটমাট করার অধিকারী হতে পারে। এই জন্যই আমাদের স্থানীয় শ্রেণীশত্রুদের নির্মূল করার কাজ দিয়ে সুরু করতে হবে। একবার শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে এলাকাকে মুক্ত করতে পারলে (কাউকে মেরে, কেউ পালিয়ে গেলে) অত্যাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ কানা হয়ে যাবে। তার ফলে পুলিশ জানতে পারবে না কে গেরিলা আর কে গেরিলা নয় এবং কে নিজের জমি এবং কে জোতদারের জমি চাষ করে। (তাতে এমনকি ভূমিসংস্কারের কাজগুলোও জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতার অঙ্গ হিসাবে একটা বিপ্লবী সমিতির তত্ত্বাবধানেই হতে পারে।)

গেরিলা দলকে অবশ্যই ছোট, জোটবদ্ধ ও সচল হতে হবে। সুতরাং এর সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ সাতজনের বেশি হওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ একটা দলে গরিলা সদস্যদের যাচাই-এর মান হবে, এই দলটি প্রচলিত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আচমকা আক্রমণে একটা বা দুটো লোককে খতম করতে পারে কি না।

এই খবরাখবরগুলো অবশ্যই দলের বাইরে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ নয় --

(ক) গেরিলাদের নাম

(খ) বিশেষ শত্রু যাকে নির্মূল করার চক্রান্ত করা হয়েছে

এবং (গ) আক্রমণের সময় ও তারিখ।

নেতাঃ দলটি গঠন হওয়ার পর একজন কম্যাণ্ডার নিয়োগ করা দরকার।

অনুসন্ধানঃ বিশেষ শ্রেণীশত্রু, যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তার প্রতি স্থানীয় কৃষক জনসাধারণের অধিকাংশের ঘৃণা জাগিয়ে তোলা উচিৎ। এবং এর জন্যই তাদের মতামত জানার উদ্দেশ্যে একটা ছোটখাট খোঁজ খবরের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সোজা কথা হল, লক্ষ্য স্থির করার সময় আমাদের কোনো মনগড়া ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিৎ নয়। বরং জনগণের অধিকাংশের

ইচ্ছার দ্বারা চালিত হতে হবে। লক্ষ্য স্থির করার পর শ্রেণীশত্রুর চলাফেরা খুব নিখুঁতভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে আক্রমণের সবচেয়ে ভালো সময় ও স্থান ঠিক করা যায়। অনুসন্ধানের এই কাজটি বিশেষ করে দলের নেতারই করা উচিৎ।

আশ্রয় স্থল: নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে গেরিলা কাজের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটাকে সবচেয়ে যত্নে, সবচেয়ে মনোযোগ দিয়ে অবশ্যই করতে হবে। গেরিলাদের বেলায় প্রত্যেককে কোন লোকের বাড়ি, যার ওপর তার সবচেয়ে বেশি আস্থা আছে সেখানেই তার নিজের আশ্রয় নিজেকেই করতে হবে। অন্য কারোরই এই কাজ তার জন্য করে দেওয়া উচিৎ নয়

একজন কৃষক: পক্ষে কৃষক জনতার মধ্যে গোপনে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এটা কিন্তু কোন সন্দেহভাজন বুদ্ধিজীবি কমরেডের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। এই ব্যাপারে সে সবচেয়ে অসুবিধার মুখোমুখি হয়। সুতরাং তার আশ্রয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং নিরাপদ জায়গায় ঠিক করা উচিত। আশ্রয়স্থলগুলো গেরিলা আক্রমণের জায়গা থেকে দূরে বিভিন্ন গ্রামে আলাদা আলাদা করে ঠিক করা উচিৎ। শহরে একটা বাড়িতে, একজন পাশের প্রতিবেশীকে জানতে না দিয়েও গোপনে থাকতে পারে। কিন্তু গ্রামে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেইজন্য যে বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তার চারপাশে আমাদের কাজকর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকের বাড়ি থাকা উচিৎ।

অস্ত্র: এই স্তরে কোনরকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা উচিৎ নয়। গেরিলা ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে দা, বল্লম, সড়কি, কাস্তের ওপর আস্থা রাখতে হবে। দেশী বন্দুক কেনা বা তৈরি করার ওপর জোর দেওয়া অথবা শ্রেণী শত্রুর কাছ থেকে বন্দুক দখল করার ঝোঁক দেখা দিতে পারে। এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই করতে

হবে ধৈর্যের সঙ্গে। এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে, আমরা এই পর্যায়ে যদি কিছু বন্দুকও পাই তাহলে তা রক্ষা করতে আমরা সক্ষম হবো না। এগুলো প্রায় অবধারিতভাবে পুলিশের হাতে চলে যাবে। যদি তা সত্ত্বেও কিছু বন্দুক জোগাড় হয়ও, আমরা তা নিশ্চয়ই নষ্ট করবো না বা শত্রুর হাতে তুলে দেবো না বরং ভবিষ্যতের জন্য লুকিয়ে রাখবো এবং এর নিষ্ফল ব্যবহারে বাধা দেবো।

বুদ্ধিজীবি ক্যাডার এবং ঐ সমস্ত নেতারা যাদের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের যদি হঠাৎ শত্রু ঘিরে ফেলে তা হলে তাদের ভয় দেখান, ছত্রভঙ্গ করা অথবা মেরে ফেলার জন্য, তারা সঙ্গে ছোট পিস্তল রাখতে পারে। কিন্তু এর ওপর কখনও অযথা গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ নয়, কারণ, এটা জনগণের বদলে অস্ত্রের ওপর এক বিপজ্জনক আস্থা রাখতে উৎসাহ যোগাতে পারে।

পরিকল্পনা: অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে গেরিলা দলের সঙ্গে একত্রে বসে, এইবার বুদ্ধিজীবি কমরেডটিকে গোটা কাজটা, পিছিয়ে আনার পথগুলো এবং কখন ও কোথায় পরে দেখা হবে সেগুলো খুব বিস্তারিতভাবে সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে হবে।

আক্রমণ: যথাসম্ভব নিরীহ লোকের ভাণ করে গেরিলারা বিভিন্ন দিক থেকে আসবে। আগে ঠিক করা একটা জায়গায় এসে মিলবে। শত্রুর জন্যে তারা অপেক্ষা করবে এবং যখন সুযোগ আসবে তখনই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে ও শত্রুকে খতম করবে।

আমরা কখনও অধৈর্য হব না বা তাড়াহুড়ো করবো না, বিশেষ করে প্রথম আক্রমণের ক্ষেত্রে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে আক্রমণ করে বিফল হওয়ার চেয়ে আমাদের কয়েকটা প্রচেষ্টার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। প্রথম কয়েকটা কাজে শত্রুর বাড়ি চড়াও হওয়া এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা কষ্টকর হতে পারে সুতরাং তাকে খুন করার ওপরেই কেবলমাত্র বেশি জোর

দেওয়া ভালো। পরবর্তী সময়ে যখন জনগণ জেগে ওঠে এবং বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, আক্রমণগুলো নিয়মিত, আরও সহজ, আরও জোরদার হয় তখন শত্রুকে তার ঘাঁটিতেও খুন করা এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়। অবস্থার ক্রমে এত উন্নতি হবে যে একটা গেরিলা কাজের শেষে গেরিলারা নিজেরাই জনগণের কাছে বক্তৃতা করতে, এই কাজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে তারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতেও পারবে। আক্রমণের পর ধনী কৃষক ক্যাডার যদি থাকে এবং যদি সে ইচ্ছুকও থাকে তবুও তাকে বাদ দিতেই হবে। মধ্য কৃষক ক্যাডার এবং বুদ্ধিজীবি কমরেডদেরও সম্ভব হলে বাদ দেওয়া উচিৎ। এরকম ঘটনা বেশি বেশি ঘটলে ক্রমে এইসব ইচ্ছুক লড়াকুদের টেনে আনতে হবে। বস্তুত একটা সময়ে আওয়াজ উঠবে, "যে শ্রেণীশত্রুর রক্তে নিজের হাত রাঙায়নি সে কমিউনিষ্ট নামের উপযুক্ত নয়।"

ছত্রভঙ্গ : আক্রমণের পর গেরিলাদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে এবং তাদের আশ্রয় নিতে আদেশ করতে হবে। সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলতে হবে।

লড়াকুদের মনোবল অটুট রাখার জন্যে দলটির সঙ্গে ঘন ঘন নিয়মিত এবং গোপনে দেখা করতে হবে। প্রথম আক্রমণের পরে তাদের মনে যে ভয় জাগবেই তাকে রাজনীতি এবং উৎসাহপূর্ণ গল্প দিয়ে তাড়াতে হবে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ : সম্পূর্ণ শান্ত, কিছু একটা ঘটবে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। জনগণ যদিও অবশ্যম্ভাবীভাবে উৎসাহিত হবে, তবুও তারা তখন দ্বিধাগ্রস্ত এবং নিরপেক্ষ থাকবে। তখন রাজনৈতিক ক্যাডার এবং ইউনিটগুলো গা ঢাকা দিয়ে খুব সন্তর্পণে এগোতে থাকবে। মুখে মুখে প্রচার করে এবং এই কাজের কর্মসূচী বুঝিয়ে বলে আস্তে আস্তে তারা জনগণের ঠাণ্ডা ভাবকে

কাটিয়ে তুলবে। তাদের, আমাদের দিকে সুনিশ্চিতভাবে জয় করবে এবং তাদের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করে নেবে।

রাজনৈতিক ক্যাডার বরং নিরপেক্ষ লোকের মত ফিসফিস করে বলা সুরু করবে, "পাজিটা খতম হয়েছে, বেশ ভাল হয়েছে। যারা এটা করেছে তাদের বাহবা। সত্যি একটা বীরের মত কাজ হয়েছে। এইভাবে সবগুলো খতম হয়ে যাক্ এবং ওদের ছেড়ে যাওয়া এলাকা আমাদের নিজেদের হবে। এ সমস্ত জমি, এ সমস্ত ফসল, ধনসম্পদ আমরা পাশে, কারণ এই সব বদমাইসগুলো যদি এখানে না থাকে, তবে পুলিশ কি করে জানবে কার জমি কে চাষ করে?" যে মুহূর্তে জনগণ এতে সাড়া দিতে সুরু করবে, রাজনৈতিক ক্যাডাররা ক্রমে অনেক বেশি সাহসী হবে এবং ছোট গোপন গ্রুপ মিটিং করবে।

এক্ষেত্রে যে বুদ্ধিজীবি ক্যাডারটি, যে গোপনে অবস্থানের বিচার করছিল সে সাহস করে তার সাহসী দলটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং জনগণকে জাগানোর জন্য সভা করবে। এই পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তখন পর্যন্ত গেরিলাদের ভয় ভক্তি ভাব থেকে মুক্ত করার জন্য যতই চেষ্টা করে থাকুক না কেন, তার সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন বীর লড়াকুরা যখন জনগণের মধ্যেই অবস্থান করবে যেখানে তাদের নিজেদের শ্রেণীভাইরা তাদের সহযোগিতা, প্রশংসা এবং ভালবাসা জানাচ্ছে, তাদের কাঁধ চাপড়াচ্ছে এবং তখন তারা নতুন উৎসাহে উদ্দীপিত হয় এবং শত্রুর ওপর ঘৃণা বাড়ে দ্বিগুণ। তারা তখন নতুন পরিকল্পনা ফাঁদে, নতুন লক্ষ্য ঠিক করে এবং নতুন ইউনিট গড়ে। তাদের প্রত্যেকে তখন হয় আগুনে পোড়া ইস্পাত প্রত্যেকে তখন একাহাতে দশটা শত্রু মারতে পারে।

পুনর্জমায়েত: গেরিলাদের মনোবল এখন আকাশ ছোঁয়া।

তারা নতুন আক্রমণের জন্য উদ্‌গ্রীব, জনগণ জাগছে, তারা তাদের বীর গোষ্ঠির চারপাশে জমায়েত হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সুরু করেছে। তারাও নতুন আক্রমণ চায়। তারা উৎসুক চিত্তে এ-শত্রু ও-শত্রুকে চিনিয়ে দিচ্ছে, নতুন লক্ষ্যের পরামর্শ দিচ্ছে। তারা তখন শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য এগিয়ে আসে এবং দলটিকে গুরুত্বপূর্ণ খোঁজখবর সরবরাহ করে। স্বভাবতই পরবর্তী কাজকর্মগুলো আরও বেশি মনোবল ও আরও বেশি শক্তিশালী গণসমর্থন নিয়ে অপেক্ষাকৃত অনুকূল আবহাওয়ায় ঘটতে থাকবে কিন্তু গোপনতার নিয়মাবলী কখনও ভাঙা চলবে না।

গেরিলা গ্রুপটি একসঙ্গে বসে এবং জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী ও তাদের দেওয়া খোঁজখবরের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী শ্রেণীশত্রুকে খতম করার পরিকল্পনা নেয়।

পরবর্তী আক্রমণ ঘটে এবং এইভাবে একনাগাড়ে এর বিস্তার বাড়িয়ে নতুন গেরিলা দল সৃষ্টি করে এবং আঘাত করার নতুন নতুন জায়গা বাড়িয়ে তুলে এই প্রক্রিয়া ঘুরতে থাকে। জনগণের সক্রিয়তা এবং সমতা গ্রহণ প্রত্যেক নতুন নতুন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় এবং স্থানীয় শ্রেণীশত্রুদের ওপর সন্ত্রাসের রাজত্ব চেপে বসে।

যখন কয়েকটি আক্রমণাত্মক কাজ ঘটেছে এবং শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রয়োগ এবং কাজের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক ইউনিটগুলো ফিস ফিস করে ব্যাপক অর্থনৈতিক আওয়াজ তোলে, "শ্রেণীশত্রুর ফসল দখল করো।" -এই কথা গ্রাম এলাকায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ করে। এমন কি সবচেয়ে পেছিয়ে পড়া কৃষকও তখন এই যুদ্ধে নেমে পড়ে। কয়েকজন, এগিয়ে থাকা অংশের দ্বারা সুরু করা ক্ষমতা দখলের লড়াই, প্রচণ্ড জন উদ্যোগ ও গণকার্য-কলাপের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। জনযুদ্ধের আগুন সমগ্র গ্রাম এলাকাকে গ্রাস করে।

বিপ্লবী কৃষক কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে কমরেড চারু মজুমদার গ্রামাঞ্চলে "গেরিলা অ্যাকশন" সংগঠিত করা সম্পর্কে এই ব্যবহারিক উপদেশগুলি দেন।

বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের কী করণীয় সে সম্পর্কে তিনি বলেন:

এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমন-ভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব-কৃষক-শ্রমিক জনগণকে হেয় চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সব কিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তাছাড়া, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারাজীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুব-ছাত্রদের এই জনবিরোধী লেখাপড়ার পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন: যতো বেশি পড়াশুনা করবে ততো বেশি মূর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশি হবো যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। চীনের যুব ছাত্র-সমাজও মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুরুতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্জন করে। সেগুলো আবার চালু হয় প্রায় দু বছর বাদে ১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিজয়ের সময়ে।

চেয়ারম্যান বলেছেন: সত্যিকারের লৌহ প্রকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিম-ভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ প্রকার, এটাকে বিনাশ করা যে-কোন শক্তির পক্ষেও অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তাদের বিনাশ করব।

কমরেড চারু মজুমদার তাঁর "সংশোধনবাদের নির্দিষ্ট প্রকাশগুলির

বিরুদ্ধে লড়াই করুন" প্রবন্ধে লিখেছেন,—"বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব আমরা আরও দেখি, মানুষের চেয়ে অস্ত্রের উপর আমাদের বেশি নির্ভরতায়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, চেয়ারম্যান মাও-এর শিক্ষা, কমরেড লিন পিয়াও এর শিক্ষা: অস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত কৃষক খালি হাতেই এবং হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়েই শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে এবং সংগ্রামের প্রয়োজনে, বিপ্লবের তাগিদে, সে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় শাসকশ্রেণীর হাত থেকে। এইভাবেই গড়ে ওঠে জনতার সশস্ত্র বাহিনী। বাইরে থেকে অস্ত্র নিয়ে এসে বিপ্লবী যুদ্ধ করা যায় না; কারণ বিপ্লবী যুদ্ধে, চেয়ারম্যান শিখিয়েছেন কেবল নির্ভর করতে হয় জনতার উপর।

"বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ। কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতাও বলে, উন্নত অস্ত্র দিলেই গেরিলা যুদ্ধ সুরু করা যায় না। সেই অস্ত্র ধারণ করার মত মানুষ তৈরি করতে হয়। যতদিন সে মানুষ তৈরি না হচ্ছে ততদিন সে অস্ত্র অর্থহীন। সে মানুষ তৈরি হয় একমাত্র বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রামের মারফতে, শ্রেণীশত্রুদের খতম করার মারফতে। এ কাজ যে গেরিলা ইউনিট করেনি, সেই ইউনিট বন্দুক নিয়েও কিছু করতে পারবে না।"

বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন "বিপ্লবী কর্মীরা নিশ্চয়ই ভুল করতে পারে। আজকে ভুল কাজের সমালোচনা করা কমরেডদের সাহায্য করবার জন্য। সমালোচনা করো পার্টিকে গড়বার জন্য, ধ্বংস করবার জন্য নয়—পুরানো পার্টিতে আমাদের যা করতে হয়েছে। পুরানো পার্টি সংশোধনবাদী পার্টি, প্রতিবিপ্লবী পার্টি, সেখানে আমাদের সমালোচনা ছিল ভাঙার জন্য, নতুন পার্টি বিপ্লবী পার্টি, এখানে আমাদের সমালোচনা গড়ার জন্য। কিন্তু ভুল

যদি বার বার হয়, আগে তদন্ত করো। পার্টির বাইরে বিপ্লবী জনতার কাছে থেকেও তদন্ত করো। তার আগে কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার কোনও অধিকার তোমার নেই।"

আমরা বলি, "চীনের পথ আমাদের পথ।" "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।"

কিন্তু কেন? কেন একথা বলি? শংকর প্রশ্ন করেছিল নিজেকে।

বিরাট দেশ—অথচ কোন ঋণ নেই। এই হল মহান চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিজয়ের একটি জীবন্ত নিদর্শন। চীনের মানুষ চেয়ারম্যানের উপদেশ, "স্বাধীনতা রক্ষা করে. নিজের উদ্যোগে নিজেদের শক্তি ও চেষ্টার পরে নির্ভরশীল হবে" গ্রহণ করেই এই আশ্চর্য সফলতা অর্জন করেছেন।

নতুন চীন ক্ষমতায় এসেছে মাত্র কুড়ি বছর আগে। প্রতিক্রিয়াশীল কুও মিন্টাং চক্র দেশকে নিঃস্ব করে চম্পট দিয়েছিল। উৎপাদন ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে; কোটি কোটি মানুষ চরম দারিদ্রতার মধ্যে নিমগ্ন মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্য আকাশ স্পর্শ করেছে এমনি অবস্থায় ফেলে গেল চীনকে চিয়াং কাইশেক। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এর চেয়ে আর কী খারাপ হতে পারে? লক্ষ কোটি টাকার দরকার দেশকে নতুন করে গড়ে তুলতে। কিন্তু কোথায় অর্থ?

দেশ মুক্ত হবার পূর্বে তিনি লেখেছিলেন, "আমাদের নীতি কি

হবে? আমাদের নীতি হবে নিজের শক্তির ওপর দাঁড়ান। এবং তার অর্থ হল নিজের চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করা।" তিনি আরও বলেছিলেন, "পৃথিবীতে সব থেকে দামী জিনিষ হল সাধারণ মানুষ। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ সমস্ত রকম আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারবে।"

তিনি আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য ডাক দিলেন।

চীন আজ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তরিত হচ্ছে। শ্রমিক ও কৃষক শোষণমুক্ত হয়ে উৎপাদনে নিজেরা উদ্যোগী হয়েছেন। এইভাবে আত্মনির্ভরশীলতার সাহায্যে বড় বড় কাজে হাত দেবার জন্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সেগুলো দেশের অভ্যন্তরের উৎপাদন থেকে আসতে সুরু করল। এটা একটা কথাই নয় য, সমাজতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় উপনিবেশ থেকে লুণ্ঠন অথবা নোট ছাপিয়ে, ট্যাক্স বৃদ্ধি করে এবং জিনিষের দাম বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। এতে নিজের দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর বোঝা চাপানো হয়। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশ সাম্রাজ্যবাদীর দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াতে পারে না, যেমন প্রতিক্রিয়াশীল কুও মিণ্টাং সরকার করেছিল। এই ঋণ গ্রহণ মানে ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া।

তাহলে সমাজতন্ত্র গঠনে কোন্ শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে? নিজের দেশের মানুষের শক্তির ওপর? না, বিদেশী "সাহায্যের" অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের খপ্পরে আসা? সমাজতান্ত্রিক পথ, না, পুঁজিবাদী রাস্তা—কোন্টা?

তিনি জোর দিলেন নির্ভুল স্বাধীনতা রক্ষা করে নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা রেখে অগ্রসর হতে। এই আত্মনির্ভরশীল নীতি গ্রহণ করার অর্থ—নিজের দেশের মানুষের শক্তি ও কঠিন শ্রমের ওপর নির্ভর করে দেশকে গঠন করতে হবে, কষ্টসহিষ্ণু ও মিতব্যয়ী হয়ে।

কিন্তু পার্টির মধ্যে লুকিয়েছিল এক বিশ্বাসঘাতক, তার নাম

লিউ শাও-চি। সে বেশ চাতুরীর সঙ্গে মাও-এর নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াল—সংশোধনবাদীরা যা করে থাকে—যাতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আবার দেশে স্থাপন করা যায়। বিদেশী সাহায্যে অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। সে চেয়েছিল পুঁজিবাদী প্রথায় অর্থের ম্যানেজিং এজেন্সী চালু করতে। যার ফল হতো মুদ্রামূল্য হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি ও লটারীর টিকিট বিক্রী ব্যবস্থা করা। লিউ শাও-চি ভেবেছিল শ্রমিকশ্রেণীকে দোহন করে প্রলেতারীয় ব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী প্রথার প্রবর্তন করতে। আসল মতলব ছিল চীনকে আবার উপনিবেশ অথবা আধা-উপনিবেশে পরিণত করার।

তিনি বছরের পর বছর যুদ্ধ করেছেন। শেষ পর্যন্ত মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্লাবনে প্রতিবিপ্লবী দুর্গ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। স্বাধীন, আত্মপ্রত্যয় নীতির ফলে চীনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। দেশ মুক্ত হওয়ার পর উৎপাদন বেড়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট

অর্থনৈতিক ভিত্তি যতই দৃঢ়তর হচ্ছে, ততই সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে; রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয় সমান তালে চলছে। রাজস্ব এখন মুখ্যতঃ দেশের অভ্যন্তর থেকেই আদায় হচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী।

অবশ্য গোড়ার দিকে জনগণতান্ত্রিক চীনে আন্তর্দেশীয় বণ্ড ছাড়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থের লগ্নি। এই বণ্ডের টাকা সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের জন্যে ব্যয় হয়েছিল। এই বণ্ডগুলির একটি 'জনগণের বিজয় বণ্ড' (People's Victory Bonds) ১৯৫০-এ এবং 'জাতীয় অর্থনৈতিক গঠন বণ্ড' (National Economic Construction Bonds) যেটা ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮-তে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। এই বণ্ডগুলির মোট মূল্য ছিল ৩,৮৪০ মিলিয়ন ইয়েন। সুদ নিয়ে এই অংশটা ছিল ৪,৮১০ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৫৮-র মধ্যেই এগুলি পরিশোধ হয়ে যায়। ১৯৬৮-র

পর বাজারে আর কোন বণ্ড ছাড়া হয়নি। এবং জাতীয় বণ্ড সুদে আসলে সময়মত পরিশোধ করা হয়েছিল।

জনগণতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধ ও উত্তর কোরিয়ার সাহায্যের জন্য চীনকে বৈদেশিক অর্থ সাহায্য নিতে হয়েছিল মাত্র একবার। চীন সে সময়ে স্তালিন পরিচালিত সোভিয়েত দেশ থেকে মোট ১,৪০৬ মিলিয়ন নয়া রুবল ঋণ গ্রহণ করেছিল। এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সমস্ত ঋণের টাকা ১৯৬৫-তে পরিশোধ করে দেয়।

চীনের আভ্যন্তরীণ বণ্ড ও সোভিয়েত থেকে ঋণ গ্রহণ সাম্রাজ্য-বাদী, অথবা সংশোধনবাদী অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

কারণ, চীন বণ্ড ও বৈদেশিক ঋণ নিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের জন্য এবং শ্রমিক শ্রেণীর সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য। এবং এই ঋণ গ্রহণ ও বণ্ড বিক্রী ছিল অল্প মেয়াদী ব্যাপার। ১৯৪৯-৫২ তে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এবং উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করার জন্য যে ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছিল তাতে চীনকে খানিকটা অর্থনৈতিক বিপাকের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তথাপি চীন নতুন করে ঋণ গ্রহণ না করে নিজের দেশের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্র গঠনে নিমগ্ন হয়েছিল।

যখন সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীরা ঘরে বাইরে ঋণের জালে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েছে, তখন একমাত্র চীনই ভারমুক্ত কোন ঋণ নেই।

পুঁজিবাদীদের শাসকচক্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্র প্রয়োগ করে অতি মুনাফা অর্জন করে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। নিজেদের শ্রমিক শ্রেণীকে দোহন করতে পুঁজিবাদীদের কিছুমাত্র দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তাদের বিদেশী ঋণ ও দেশী বণ্ড শ্রমিক শ্রেণীকে ঠকাবার

জন্যই বাজারে ছাড়া হয়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শাসকরা যে ঋণ গ্রহণ করে তা নিতান্তই প্রতিক্রিয়াশীল। তারা বাজারে বণ্ড ছাড়ে, বিদেশের কাছে ঋণ নেয় কেবল যুদ্ধের খরচ সংগ্রহ করার জন্য। ঋণের বেশির ভাগ অর্থই ব্যয় হয় যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতে। এর ফলে একচেটিয়া ধনিক শ্রেণী দারুণ মুনাফা লোঠে। মরে সাধারণ শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের বোঝা শ্রমিক শ্রেণীর ঘাড়ে এসে পড়েছে। ১৯১৩তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বণ্ড ছাড়ার ফলে মাথাপিছু গড়ে ৩৯ ডলার করে দিতে হয়েছিল সাধারণ শ্রমিককে। যুদ্ধ চলাকালীন সেটা বেড়ে উঠেছিল ৮০ ডলারে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঋণের বোঝা এসে দাঁড়িয়েছিল ১,৩০০ ডলারে। বর্তমানে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আমেরিকার সাধারণ নাগরিককে দিতে হচ্ছে ২,০০০ ডলারের ওপর।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী—যারা পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে সব থেকে ধনী, এদের সরকারী হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে, ১৯৫৮-র জুলাই পর্যন্ত তাদের আন্তর্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ৩৫১৭০০ মিলিয়ন ডলার। অঙ্কটা নিজের দেশের মোট রাজস্বের দ্বিগুণ। বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১৯৫৮-র মে পর্যন্ত ৩৩,১ ০ মিলিয়ন ডলার।

ব্রিটেনের ঋণপত্র ছাড়ার দরুণ আজ ঘরোয়া ঋণ ৩৩,৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড; অর্থাৎ ১৯৫৮র মোট রাজস্বের তিনগুণ। আর বিদেশী ঋণ হল, ১৯৫৮র জুন পর্যন্ত ৫,৬০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

সোভিয়েতের প্রদত্ত হিসাব মত ১৯৫৪-৫৬ তিন বছরে বাণিজ্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে ১,০০০ মিলিয়ন রুবল; এবং এ ঋণ পুঁজিবাদী দেশ থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারত সরকারের ১৯৫৯ সালের সরকারী বিবরণ থেকে জানা যায় জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১১৯,৫০০ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ বার্ষিক রাজস্বের চার পাঁচ গুণ বেশি।

কিন্তু, চীনে কোন ঋণ নেই না আন্তর্দেশী, না বিদেশের ঋণ।

এবং এর মূলে, স্বাধীনতা রক্ষা, অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ, আত্মপ্রত্যয়, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হওয়া।

আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করতে পারব। সমস্ত সমস্যার সমাধানের একটিমাত্র জবাবই আছে, নিজের হাতে সব কাজ করা।"

এই নীতি গ্রহণ করেই চীনের মানুষ তাদের দারিদ্রতা ও পিছিয়ে থাকার ছবির আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে; পুরাতন আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশকে স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। এই অর্থনীতির দরুণই দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ঋণের চিহ্নমাত্র নেই।

চীনের আর্থিক আয় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্রোত বেয়ে। রাজস্বের শতকরা নব্বই ভাগ পাওয়া যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় শিল্প ব্যবস্থার দরুণ। মোট রাজস্বের শতকরা সাত ভাগ আসছে কৃষি থেকে। এর ফলে যেমন কৃষকের আয় বাড়ছে, তেমনি জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হচ্ছে।

মূলধনের টাকা পাওয়া যাচ্ছে ব্যাঙ্কের আমানত থেকে। আর্থিক সঙ্গতি অত্যন্ত দৃঢ়। নোটের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল। জনসাধারণের যে সব দ্রব্য খুবই প্রয়োজনীয় তার ওপর সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে—যাতে দাম না বাড়ে।

শ্রমিকের বেকার হবার আতঙ্ক নেই। কৃষকের চিন্তা নেই শীতের ও অনাহারের। কাউকে আয়কর দিতে হয় না। শ্রমিক কর্মচারীর চিকিৎসার খরচ নেই—শ্রমিক বীমা প্রভৃতির জন্যেও ব্যয় নেই। বাড়িভাড়া ও অন্যান্য খরচ (আলো প্রভৃতি) নামমাত্র।

চেয়ারম্যানের নীতি হল: "আর্থিক অবস্থার উন্নতি কর, জিনিষের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখ।"

আমাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। ধনী আরো ধনী হচ্ছে—গরীব হচ্ছে ভিখারী। ভিখারীর জীবনই আজ সবচেয়ে উন্নত মানের একমাত্র চিন্তা শুধু পেটের। পেটটুকু ভরলেই আর কোন বালাইয়ের ধার ধারে না। কারণ, ভিখারীর ভোটাধিকার নেই। ভোটাধিকার না থাকার অর্থই হল মুক্তি। আমরা ক্রমশঃ মুক্তির পথে এগিয়ে চলেছি।

অথচ একদিন আমাদের কী না ছিল! সুখ ছিল, শান্তি ছিল—ছিল সম্পদের ছড়াছড়ি।

ইতিহাস মিথ্যা বলে না। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ছায়াপথে ভারতের সুখ শান্তি সম্পদ আস্তে আস্তে নিঃশেষ হল। দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন নিঃশেষ করে দিল একটা দেশকে। ভেঙ্গে দিয়ে গেল মানুষের মেরুদণ্ড। পাঠান-মুঘল, ফরাসী-ইংরেজ, পর্তুগীজ—কে লোঠেনি ভারতের সম্পদ; ভারতের ঐশ্বর্য্যে নিজের দেশের ঐশ্বর্য্য বাড়ায়নি? সবাই—সকলেই এসেছে আর লুঠে নিয়ে গেছে। ভালবাসেনি কেউ, লুঠেরা কখনো ভালবাসতে পারে না। বিদেশীর ভালবাসা বিনা স্বার্থে জন্মায় না।

কিন্তু এত লুণ্ঠনের পরেও নাকি ভারতের সম্পদ শেষ হয়নি। আছে—অনেক আছে। সব সম্পদ শেষ হবার পরও মানুষগুলো আছে। আছে তাদের বুকের উষ্ণ রক্ত।

মেরুদণ্ডহীন ভারতবর্ষ! দীন ভারতবর্ষ! পরাধীন ভারতবর্ষ!

গর্জে উঠেছিল বাঙ্গালী কিশোর যুবকের হাতে পিস্তল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দিয়েছিলেন, বন্দে মাতরম্!

কেন দিয়েছিলেন? কিসের জন্ম দিয়েছিলেন? অসংখ্য শহীদের বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম, আত্মবিসর্জন, কেন? কি চেয়েছিলেন তাঁরা? মুক্তি। মুক্তি কী শুধু বিদেশী শাসকদের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে—অন্যায়, অত্যাচার-পীড়ন থেকে নয়? তাঁরা কি শুধুমাত্র নামে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন? মানুষের মুক্তি কি তাঁদের কাম্য ছিল না?

ছিল-ছিল-ছিল। শংকরের সমস্ত অন্তরাত্মা একসঙ্গে গর্জে উঠেছে। ভারত-মুক্তির মধ্যে মানব-মুক্তির স্বপ্ন নিশ্চয়ই তাঁরা দেখেছিলেন। বিদেশী শাসকদের দূর করে নিশ্চয়ই তাঁরা সুখ, শান্তি স্বাচ্ছন্দে ভরা, একজাতি, একপ্রাণ, একতার পথে এগিয়ে যেতেন। ক্ষুধার্তের মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন, দুর্বলের ওপর অত্যাচার নিশ্চয়ই তাঁরা বন্ধ করতেন। তাঁদের পথে ভারত যদি মুক্ত হত মানুষ নিশ্চয়ই আপন অধিকার ফিরে পেত।

আজ কি তাহলে মানুষের কোন অধিকার নেই? আজকের ভারতীয় গণতন্ত্র কি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নি? মানুষ কি আজও পরাধীন?

নিশ্চয়ই নয়, আমরা স্বাধীন। ভোটের বাক্সে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ধনী-দরিদ্র-উচ্চ-নীচ, সবল-দুর্বলের ব্যবধান শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে দূর হয়েছে, ভোটের বাক্সে। যে ধনী মানুষটির ছায়া দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেনা, একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারি। এর চেয়ে পরম সৌভাগ্য আর কি হতে পারে আমাদের? আমরা যে সকলেই সমান। গরীব দেশের গরীব নাগরিক আমরা, আর কি চাই?

স্বাধীনতার হাত বদল হয়েছে আপোষ নীতিতে। দেশের অঙ্গচ্ছেদ করে যাঁরা স্বাধীনতা নিতে অস্বীকার করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে বাধ্য ছেলের মত ভারত বিভাগ মেনে নিলেন তাঁরা। কথায় আর কাজে যাদের দুস্তর ব্যবধান, স্বাধীনতার প্রাক্কালেই প্রমাণিত হল,

তাঁরাই হলেন ভারতের ভাগ্য বিধাতা। স্বেচ্ছাচারী জহ্লাদের দল হলেন স্থায় নীতি স্বাধীনতার রক্ষক।

ইতিহাসে বাইশটা বছর কিছু নয়। কিন্তু বাইশটা বছরের ইতিহাস দেশের অসংখ্য মানুষের জীবনে তিক্ততার সৃষ্টি করেছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে দেশটাকে। দেশের সম্পদ, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে।

দেশ উন্নত হচ্ছে। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে সম্ভাবনাময়। দুঃখ থাকবে না, থাকবে না দারিদ্র। মানুষ পেট ভরে খাবে, হাসবে, সুখ আর শান্তির দিন ফিরে পাবে। সেই জন্যই বিদেশের দেশে দেশে ভারতের ছোটাছুটি। আদান প্রদান। দেশকে স্বয়ং নির্ভর করে গড়ে তুলতেই হবে।

ভারত-সোভিয়েত বানিজ্যের ক্ষেত্রে রাশিয়া ভারত থেকে যে মাল নেয়, তার দাম দেয় ঐ মালের আন্তর্জাতিক দাম অপেক্ষা অনেক কম হারে। পক্ষান্তরে ভারতে যে মাল তারা রপ্তানী করে তার দাম আদায় করে নেয় অনেক বেশি। মিথ্যা নয়। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি বলে রাশিয়া আগামী তিন বছর ভিলাই থেকে এক মিলিয়ন টন ইস্পাত কিনবে; কিন্তু দাম দেবে ইস্পাতের দাম অপেক্ষা শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ কম হারে। শুধু তাই নয়, ভারত থেকে রাশিয়া যে কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্য কেনে তার দাম দেয় আন্তর্জাতিক হার অপেক্ষা শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ কম হারে। অথচ রাশিয়া যে যন্ত্র-পাতি ভারতে পাঠায় তার দাম আন্তর্জাতিক হার অপেক্ষা শতকরা ১০ থেকে ৩০ ভাগ বেশি আদায় করে। রাশিয়া ভারতের কাছে নিকেল বিক্রয় করে টন প্রতি ৩০,০০০ টাকা দামে, অথচ ইয়োরোপে নিকেলের দাম টন প্রতি ১৫,০০০ টাকা মাত্র। রাশিয়া ভারতকে পনেরো হাজার ট্রাক্টর দিয়ে দাম নিয়েছে ইয়োরোপের ট্রাক্টরের তিনগুণ বেশি। ভারতে ১৩টি পাবলিক সেক্টর ভুক্ত কারখানায় বর্তমানে ৯৩০ জন রুশ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত আছেন (ভারতীয় বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের সংখ্যা দিন

দিন বাড়ছে। সম্ভবত তাঁদের বেকারত্বের একমাত্র কারণ অযোগ্যতা নয়, তাঁরা ভারতীয়)। এবং তাঁদের গড় মাসিক বেতন ৩৫,০০০ টাকা ও বহুবিধ সুখ সুবিধা (আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মাসিক বেতন পান ১০,০০০ টাকা, একজন রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়ার তাঁর চেয়ে সাড়ে তিনগুণ বেশি) দেওয়া হয়। এবং যে তেরটি কারখানা রাশিয়ার সাহায্যে চলছে তার মধ্যে দশটি চলছে লোকসানে, তিনটিতে লাভ হয় অতি সামান্য। অদূর ভবিষ্যতে বাকি তিনটি যদি লোকসানে চলে তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বর্তমানে তেরটির মধ্যে দশটিতে লোকসান, তিনটিতে সামান্য লাভ, কম লাভ নয়! এখন দশটি কারখানার তিন বছরের লোকসান খুব একটা বেশি নয়, মাত্র ১০৫ কোটি টাকা! ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯ এর হিসাব অনুযায়ী

এখানেই শেষ নয়। রাশিয়া আমাদের বন্ধু। অনগ্রসর ভারতকে স্বাবলম্বী করে তুলতে রাশিয়া তার বন্ধুত্বের বাহু প্রসারিত করে দিয়েছে। তাঁরাই তৈরি করছেন বোকারোর ইস্পাত কারখানা। নির্মাণে ব্যয় মাত্র ২২০০ কোটি টাকা। হয়তো বোকারোর মত কারখানা তৈরি করতে ওর চেয়ে অনেক কম টাকা লাগে, কিন্তু একটু বেশি লাগবে। এখানেও সেই কারণ, রাশিয়ান এক্সপার্ট, টেকনিশান, ইঞ্জিনীয়াদের মাহিনা, আন্তর্জাতিক দাম অপেক্ষা বহুগুণ বেশি দামে রাশিয়ান যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যে সব জিনিষ এখানে উৎপাদিত হয় তাও রাশিয়া থেকে নিয়ে আসা। কারখানার প্রয়োজনীয় ইটটি পর্যন্ত রাশিয়া থেকে আনা হবে।

এর ওপর যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আসছে সেগুলি সেকেলে, পরিত্যক্ত এবং বর্তমানে অচল। হৃষিকেশের ঔষধ কারখায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রাশিয়া পাঠিয়েছে তা আধুনিক তো নয়ই, বরং পুরান ধরণের বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে ১০ টন টেট্রামিলিয়ন দরকার সেখানে কিনতে বাধ্য করিয়েছে ১২০ টন।

রাশিয়ার সাহায্যে নির্মিত হায়দ্রাবাদের কারখানায় বছরে এক কোটি টাকার মাল উৎপন্ন হয়, খরচ পড়ে আট কোটি টাকা। বছরে লোকসানের পরিমাণ সামান্য, মাত্র সাত কোটি টাকা। এবং হৃষিকেশের কারখানায় পেনিসিলিন তৈরি করার কথা ছিল কিন্তু রাশিয়া সেখানে তৈরি করছে পশুখাদ্য। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে পেনিসিলিন কারখানায় পশু খাদ্য তৈরি হয় কি করে? পশু খাদ্যের কারখানায় পশু খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু তৈরি করা কি সম্ভব?

বোকারোর ইস্পাত কারখানা চালু হওয়ার কথা ছিল ১৯৫৮ সালে। এখন শোনা যাচ্ছে ১৯৫৪ সালের আগে তাঁরা কারখানা নির্মাণের কাজ শেষ করতে পারবেন না। এবং বোকারো কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে পাঠাবার আগেই রাশিয়া একবার চীনে পাঠিয়েছিল। কিন্তু চীন বেশ কয়েক বছর আগে এই মালগুলি অকেজো বলে রাশিয়াকে ফেরৎ পাঠায়। চীনের ফেরৎ দেওয়া অকেজো যন্ত্রপাতি দিয়েই বোকারোর ইস্পাত কারখানা নির্মিত হচ্ছে। কারখানা নির্মাণ শেষ হলে সুরু হবে উৎপাদন। বর্তমানে ভারতের অন্যান্য ইস্পাত কারখানায় প্রতি টন ইস্পাতে খরচ পড়ে ১[illegible]০০ টাকা, কিন্তু বোকারো কারখানায় প্রতি টন ইস্পাত উৎপাদনের খরচ পড়বে ২৮০০ টাকা। এখানেও লাভ!

এ পর্যন্ত রাশিয়া ভারতকে ঋণ দিয়েছে ১০১২ কোটি টাকা। অর্থনীতিবিদরা হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত ঋণের পরিমাণ অপাত মূল্য বা ফেস ভ্যালু অনুসারে হলেও আসল মূল্য অনেক কম। কারণ, ওই টাকার একটা বিরাট অংশ, (সবটা হলেও মন্দ হত না) ধরতে গেলে বেশির ভাগই রাশিয়া নিজেদের টেকনিশিয়ান প্রভৃতির মাইনে, পরিত্যক্ত আবর্জনার গুদামে পড়ে থাকা অচল যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ নিয়ে সরে পড়ে। প্রকৃত বন্ধুর মত কাজই ভারতের সঙ্গে করে রাশিয়া।

কিন্তু কেন করে? কিসের জোরে তাদের এত সাহস? একটা

দেশকে সাহায্যের নামে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দুঃসাহস তাদের হল কেমন করে?

হয়তো এ তাদের দুঃসাহস নয়, নীতি। নয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি। সাম্রাজ্যবাদীর দল আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সাহায্যের নামে শোষণ চালাচ্ছে। বন্ধুর ছদ্মবেশে করছে চরম শত্রুতা। তাদের বাধা দেয়, প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে তেমন সাহস নেই। এই সাহসটুকুর অভাব ঘটে স্বার্থের সংঘাতে। স্বেচ্ছাচারীর দল তাদের স্বেচ্ছাচারের বনিয়াদ ঠিক রাখার জন্যে এইসব নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের হাত ধরে, বন্ধু বলে পরিচিত করে, শয়তানকে বানায় দোসর। কারণ, তাদের বিপদের দিনে একমাত্র এরাই হবে সহায়।

দেশের মানুষ? জনগণ!

তারা তো দাস আমাদের। আমরাই সব, সত্য! আমাদের ইচ্ছায় চলবে জনগণ। যদি না চলে মরবে। জনগণ কেউ নয়। শুধু আমরা।

শংকর ভেবেছে, দেখেছে। মানুষ গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। কারণ, সে দুটি খেতে চেয়েছিল। কেন তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তর পেয়েছিল আঘাত। কারণ, স্বেচ্ছাচারীর হাতে শক্তি, অস্ত্র তার সহায়—নিরস্ত্র মানুষ শুধু চিৎকার করতে পারে। ভোটের বাক্সও তো ওদের হাতে। শেষ নেই দালালের।

স্বাধীনতার বাইশ বছরের মধ্যে একটা দেশ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। ভুল নীতি, অযোগ্য পরিচালনা, স্বজন পোষণ মনোভাব, সমাজের এক শ্রেণীর প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দুর্নীতি, তোষণ, সাম্প্রদায়ী-কতাকে প্রশ্রয় দেওয়া, যত কিছু অন্যায় অনাচার, পাপ করা সম্ভব, তাই করেছে। সাধারণ মানুষ, দেশের জনগণকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বেইমানী করেছে মানুষের সঙ্গে। একমাত্র কারণ, আমিত্ব। আমরাই সব। আমাদের ইচ্ছাই ইচ্ছা। বিদেশের হাটে দেশ আর

মানুষকে বিকিয়ে দিতে ওদের বিবেকে এতটুকু বাধেনি। ওরা বিবেক বিবর্জিত।

অথচ মুখে জনগণের নামে লাল ঝরানো কথা। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ বাইশটা বছর। আজও হচ্ছে।

বামপন্থী দলগুলো শুধু দলীয় কোন্দলে ওস্তাদ। নেতৃত্বের কোমর বাঁধা ঝগড়ায় পটু। মুখে মার্কস এঙ্গেলস, লেনিনের কথা। তাঁদের পথে চলার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিপরীত। সাধারণ মানুষের জন্য কেউ নেই। তাদের শুধু ঠকানো হয় বারবার।

সেই জন্যেই শংকর সরে এসেছিল। পাপীদের দোসর হয়ে থাকতে সে পারেনি। থাকলে হয়তো তার নিজের কিছু ভাল হত। কিন্তু শুধুমাত্র নিজের ভাল তো সে চায় নি।

সে ভেবেছিল জনগণের কথা। অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি। মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল সে। আর সে জানে, আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারাই সেই মুক্তি আনা সম্ভব। মার্কস এঙ্গেলসের নির্দেশিত পথ, মহান অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়, মাও সে তুঙ চিন্তা ধারাই সে মুক্তি আনতে পারে ভারতীয় জনগণের জীবনে।

আজকের এ স্বাধীনতা কি আমাদের স্বাধীনতা, ভারতের লক্ষ কোটি খেটে খাওয়া মানুষের স্বাধীনতা? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে সে। যদি এ স্বাধীনতা লক্ষ কোটি জনগণের স্বাধীনতা হয়, তাহলে কেন এ স্বাধীনতার মর্যাদা শয়তানদের হাতে পড়ে বারবার লাঞ্ছিত অপমানিত হয়? কেমন করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর দল তাদের নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে সাহস করে। কেন তাদের শোষণ বন্ধ হয় না? কেন?

না, আমরা স্বাধীন নই। বুকের রক্ত দিয়ে শত্রুর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারিনি স্বাধীনতা, তাদের পরানো শোষনের শিকল আমরা ছিন্ন করতে পারিনি আমাদের বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতে। স্বরাজ মিলেছে আমাদের, কিন্তু স্বাধীনতা পাইনি।

সেই না-পাওয়া স্বাধীনতাই আমরা পেতে চাই। শেষ করতে চাই অন্যায় অত্যাচার। গরীবের খুনে গড়ে ওঠে যাদের সুখের ইমারত, তাদের সে ইমারত চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চাই। আমরা আত্ম-নির্ভর হতে চাই। বন্ধ করতে চাই রাশিয়া, আমেরিকার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ।

আমরা গড়ে তুলবো এক শ্রেণীহীন সমাজ। মানুষের সমান অধিকার। দুঃশাসনের গর্বিত স্পর্দ্ধা অহঙ্কার ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিতে চাই আমরা।

সেই পথে এগিয়ে চলেছি। এগিয়ে যাব। যতক্ষণ না অত্যাচারীর দল নিঃশেষ হচ্ছে আমরা থামবো না। বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ পরিক্রমা আমাদের শেষ হবে সেইদিন—যেদিন:

ও সোনায় ভরা শস্যক্ষেত।
এখন তোমায় দেখে
ভাবতে পারে কেউ
সে কি খাটুনি খেটে
তোমায় সাজাল এমন সাজে।

তুমি যে হয়েছ সিক্ত
সে তো নয় রাতের শিশিরে;
তোমার শরীরে ঝরেছে
যে কৃষকের ঘাম

চাষীর গর্ব আনন্দের ভাণ্ডার হয়ে উঠবে। শ্রমিকের চোরা কুঠুরিতে আসবে আলো। নতুন দিনের নতুন আলোয় মানুষ গাইবে নতুন দিনের সঙ্গীত।

আসবে, সেদিন আসবে!

সেদিন আসছে।

আজ:

...দিক হতে দিকে বিদ্রোহ ছোটে

বসে থাকবার বেলা নেই মোটে
রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ—

সুর্যটা মধ্য গগনে জ্বলছে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ক্লান্ত দুপুর। একটা ম্লান বিষণ্ণতা শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়গুলির মধ্যে বিরাজ করছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সকালের পাখিদের কাকলিধ্বনি এখন এই বিষণ্ণ দুপুরে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। মধ্য বসন্তের বাতাসে গ্রীষ্মের আমেজ।

শংকরের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। কৃষ্ণাম্মা কিছু তফাতে ছোট একটা খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে আছে দূরে সমতলের দিকে। বাদামের খেত। রূপালী ফিতের মত উড়িষ্যা সীমান্তের নদী, তারপরই উড়িষ্যার সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী।

চড়াই উৎরাই পার হতে হতে সকালে চেন্না রাও বলেছিল, আরো গোটা চার পাঁচ পাহাড় আমাদের পার হতে হবে, তারপর 'সেণ্টার' এর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের।

শংকর জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ পৌঁছতে পারবো আমরা?

—আশা তো করছি সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব। উত্তর দিয়েছিল চেন্না রাও।

হিসাব করেছিল শংকর। ছটা দিনের হিসাব। ছ দিন আগে বাংলা ছেড়ে অন্ধ্রের পথে পাড়ি দিয়েছিল। হাওড়া ষ্টেশনে এসে মাদ্রাজগামী ট্রেন ধরেছিল। বাংলার পর উড়িষ্যা, অন্ধ্রের মাটিতে

পা দিয়েছিল। দেখেছিল মাটি ও মানুষে কোন তফাৎ নেই। ভাষার ব্যববান হৃদয়ের উত্তাপে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল।

তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, তুমি শ্রীকাকুলাম যাবে শংকর?

শ্রীকাকুলাম। অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম।

মনে পড়েছিল আর একটি নাম, তেলেঙ্গানা। ব্যর্থ তেলেঙ্গানা, বিফল তেলেঙ্গানা। অন্ধ্র প্রদেশের তেলেঙ্গানার কৃষক নারী পুরুষ, নিজাম আর ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ পাঁচ বছর লড়াই করেছিল। জেলে গেছে, সাজা খেটেছে আর সংশোধনবাদীদের প্ররোচনায় ভোট দিয়ে সুদিনের নিরর্থক আশায় কষ্টভোগ করেছে দিনের পর দিন।

শ্রীকাকুলাম সংশোধনবাদীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছে। জনগণের কাছে পরিচিত করেছে তাদের আসল রূপ। এগিয়ে গেছে আপন লক্ষ্য পথে। সে পথ বিপ্লবের পথ। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উপলব্ধি করেছে, মাও-সে-তুঙ চিন্তাধারা সত্য সত্যই বর্তমান যুগের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর (Proletarian) আদর্শের সর্বোচ্চ রূপ, আর তা সত্যসত্যই বাস্তববাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

পাঁচ বছর আগে, চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সহ-সভাপতি লিন পিয়াও সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্টদের জন্য সূত্রীকরণ (Generalisation) করেছিলেন যে, "শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ করার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধই মৌলিক···কিন্তু অনুকূল অবস্থায় চলমান যুদ্ধের সুযোগকে কোন ক্রমেই ছাড়া চলবে না।"

মার্কস, এঙ্গেলস বলেছিলেন, "শান্তিপুর্ণ উপায়ে পুঁজিপতিদের ক্ষমতা লুপ্ত করে পুঁজিবাদী সম্পত্তিকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা অসম্ভব। পুঁজিবাদী সমাজে কলকারখানার সর্বহারারা সবচেয়ে বিপ্লবী ও সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী এবং সর্বহারা শ্রেণীই, পুঁজিবাদী

শোষণ-শাসনে ক্ষুব্ধ অন্যান্য মেহনতী জনগণকে নিজেদের নেতৃত্বে একজোট করে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারে এবং বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে ”

মার্কস, এঙ্গেলসের নির্দেশিত পথে, লেনিনের নেতৃত্বে জয়যুক্ত হল মহান অক্টোবর (২৫শে অক্টোবর ১৯১৭) সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের লাল পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরলেন সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী।

সর্বহারা শ্রেণীর প্রিয় নেতা কমরেড স্তালিন তাঁর ১৯২৫ সালের বিখ্যাত বক্তৃতায় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক (নভেম্বর) বিপ্লবের বাণীকে আরও বিকশিত করলেন। প্রাচ্যের পরাধীন দেশের মুক্তির পথের নিশানা ঠিক করে দিলেন তিনি।

তাঁর সেই মহান নির্দেশকে অনুসরণ করে মাও সে তুঙ আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক চীনে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব - যার কেন্দ্রীয় কাজ সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, তার নেতৃত্ব দেন। সফল হল লংমার্চ (অন্‌দি লংমার্চ উইথ চেয়ারম্যান মাও)। মুক্ত চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র।

আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক ভারতে আজ মাও সে তুঙ চিন্তাধারার সূচনা নকশালবাড়িতে। দাবানলের রূপ নিয়েছে শ্রীকাকুলামে, ছড়িয়ে পড়ছে ভারতে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পৃথিবীর দেশে দেশে।

শ্রীকাকুলামে যাওয়ার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি শংকর। জিজ্ঞাসা করেছিল, সত্যি ?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সত্যাই।

মুহূর্তে মনটা এক অনাস্বাদিত পুলকে ভরে উঠেছিল। পরক্ষণে বলেছিল, আমার অনাবশ্যক কৌতুহলকে আপনি ক্ষমা করবেন, তবু আমি জিজ্ঞাসা না করে পারছি না, আমার এ সৌভাগ্যের কারণ কি ? কি এমন যোগ্যতা আমি দেখাতে পেরেছি, যার জন্যে আমাকে এমন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে ?

তার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত স্থির ছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি নিজেকে অযোগ্য ভাবতে শিখেছো, শংকর?

তাঁর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসার উত্তরে সহসা কিছু বলতে পারেনি সে। নীরব ছিল। অযোগ্য! এমন কথা সে কোনদিন ভাবেনি। বিচার করেনি যোগ্যতার। শুধু কাজ করে গেছে পালন করেছে নির্দেশ। সাধ্যমত চেষ্টা করেছে মানুষের ভাল করার। মানুষকে আপন করে নিয়েছে আপনার জন হয়ে উঠেছে সকলের। বলেছে, আমি কর্তব্য পালন করে গেছি

—শুধু কর্তব্য!

—আমি স্বপ্ন দেখেছি মুক্তির। আলোর প্রত্যাশী আমি। চাই অত্যাচারের অবসান, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা।

—কোন্ পথে?

—সংশোধনবাদীদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

—কেন নয়?

—সংশোধনবাদ মানেই তো সুবিধাবাদ বিপ্লব কখনই আপোষ নীতিতে হয় না। আপোষহীন সংগ্রামই শ্রেণী ঐক্য গড়ে তোলে, বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

আর কথা বলেননি তিনি। অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন। কি যেন চিন্তা করেছিলেন গভীরভাবে। এক সময় মৃদু কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল তাঁর। তিনি ডেকেছিলেন, শংকর!

—বলুন।

—ইচ্ছা ছিল আমিই যাব। কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তাই তোমার নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম।

—কেন?

—এ প্রশ্নের উত্তরটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেননি। বলেছিলেন, আমার একটু অসুবিধা আছে।

—কি অসুবিধা? শুনতে চেয়েছিল শংকর।

—আমি—আমি অসুস্থ। কথাটা মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন তিনি।

চমকে উঠেছিল সে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। চকিতে একটা কথা মনে পড়েছিল। ক'মাস আগে একবার এমন একটা সন্দেহ তার মনেও জেগেছিল। একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কার যেন কাতরতা শুনতে পেয়েছিল। উঠে আলো জেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিল। সে মুখ বিবর্ণ, পাংশু। ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি হয়েছে আপনার?

অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পেতে পেতে বলেছিলেন, কিছু হয়নি, তুমি শুয়ে পড়।

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে আপনার।

—না-না।

—আপনি আমার কাছে লুকোচ্ছেন। আমি আপনার কাতরতা শুনতে পেয়েছি।

—ও কিছু নয়। এমন আমার হয়। কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবে।

শুয়ে পড়েছিল সে। তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন একসময়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আশ্চর্য হয়েছিল শংকর। দেখতে পেয়েছিল তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন। অথচ অন্য দিন তার ঘুম ভাঙার অনেক আগেই তিনি উঠে পড়েন। কোন কোন দিন ঘুম থেকে ডেকে তোলেন পর্যন্ত। সেই প্রথম ব্যতিক্রম দেখতে পেয়েছিল সে। নিজের কাজ থাকা সত্ত্বেও বেরুতে পারেনি।

বেশ কিছুটা বেলায় ঘুম ভেঙেছিল তাঁর তাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন আছেন?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ভালই। তুমি কখন ফিরলে?

—আমি আজ কোথাও বেরোয়নি।

—যাওনি ?

—না

—ছিঃ ছিঃ! ধিক্কার দিয়েছিলেন যেন। জিজ্ঞসা করেছিলেন, কেন যাওনি ?

-- কাল আপনার ওই রকম…

কথাটা শেষ করতে পারেনি। ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আমার কাছে বসে থেকে কি করলে তুমি? নিজের কাজকে অবহেলা করলে কেন? তুমি যে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, একথা আমার আগে জানা ছিল না।

সত্যই অন্যায় করেছে বুঝতে পেরেছিল শংকর নিজের কাজকে অবহেলা করেছে সে। মৃদুকণ্ঠে বলেছিল, সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে।

—ভবিষ্যতে এমন যেন না হয়। শান্তকণ্ঠে কথাটা বলেছিলেন তিনি। কিন্তু তার মনে হয়েছিল যেন কঠিন আদেশ জানালেন তিনি। বলেছিলেন, শংকর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা জীবনের অভিশাপ।

সেই তিনি প্রথম স্বীকার করেছিলেন, তিনি অসুস্থ। দীর্ঘ পথে যাত্রা করা আজ আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। বলেছিলেন, শংকর তুমি ঘুরে এসো, দেখে এসো।

বিদায় দেওয়ার আগে বলেছিলেন, সাবধানে যাবে। চোখ এবং কান খোলা রাখবে। জানবে তুমি যে পথে চলেছো তার প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। সারা অন্ধ্রের গ্রাম, সহর, রেল ষ্টেশন গুপ্তচরে ছেয়ে দিয়েছে সেখানকার কংগ্রেস সরকার। এতটুকু ভুল যদি করো তাহলে সে ভুলের সংশোধন হয়তো হবে না।

পথ চলার প্রতিটি নির্দেশ দেওয়া ছিল। সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছে সে। ট্রেনের কামরায় উঠেছে গুপ্তচর। পাশে বসেছে। অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সংবাদের আদান প্রদান করেছে। অন্ধ্র আগমনের কারণ জানতে চেয়েছে। শংকর তার ব্যাগ থেকে বার

করে দেখিয়েছে পরিচয় পত্র। একটি বিখ্যাত কোম্পানীর কাজের লোক সে।

অপ্রস্তুত হয়েছেন ভদ্রলোক। ধরা পড়ে গিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। মনে মনে হেসেছে শংকর. এই বুদ্ধি নিয়ে গুপ্তচর হয়েছে!

পূর্ব নির্দিষ্ট ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিয়েছে শংকর। নির্দেশ দিয়েছে হোটেলে যাওয়ার। কিন্তু পথিমধ্যে গাড়ি থামিয়েছে পুলিশ। জেরার পর জেরা। যথাযথ উত্তর দিয়েছে সে। নিঃসন্দেহ হয়ে রেহাই দিয়েছে পুলিশ।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছে, পুলিশ ট্যাক্সি থামিয়ে অমন জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন?

পালটা প্রশ্ন করেছে ড্রাইভার, ট্রেনে কেউ আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি?

মনে পড়েছিল শংকরের। বলেছিল, এক ভদ্রলোক কিছু কিছু জানতে চেয়েছিলেন আমার কাছে।

হেসেছিল ড্রাইভার যুবক। বলেছিল, ভদ্রলোক বলে আপনার মনে হলেও তিনি পুলিশের গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নন। আর শুধু ট্যাক্সি নয়, বাস, লরি সব কিছুতেই ওদের খোঁজাখুঁজি।

—কি খুঁজছে ওরা?

—গেরিলা।

—গেরিলা? অবাক হয়েছিল শংকর। জিজ্ঞাসা করেছিল, এমনিভাবে গেরিলা ধরছে ওরা?

ধরতে আর পারছে কই? শুধু খোঁজাখুঁজিই সার হচ্ছে পুলিশের। কেউ তো আর গেরিলার লেবেল এঁটে বেরুচ্ছে না। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছিল ড্রাইভার যুবক।

পৌঁছে দিয়েছিল হোটেলে। সেখানে স্নান সেরে বিশ্রাম নিয়েছিল। রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল এক সময়। ক্লান্ত শরীর কিন্তু ঘুম আসেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছিল।

এখানেই তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। যথা সময়ে কমরেডরা এসে নিয়ে যাবেন।

তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। দরোজায় শব্দ শুনে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল তার। উঠে দরোজা খুলে দিয়েছিল। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী একটি যুবক এগিয়ে এসে হাতটা জড়িয়ে ধরে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি প্রস্তুত কমরেড ?

—নিশ্চয়ই।

—আসুন।

যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। হোটেলের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকা অনেকগুলি ট্যাক্সির একটিতে তুজনে উঠে বসেছিল।

মিটার ডাউন করে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাবেন কমরেড ?

ড্রাইভারের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠেছিল শংকর। মুখটা তার বড় পরিচিত।

মৃদু হেসেছিল সকালের পরিচিত ট্যাক্সি ড্রাইভার যুবকটি।

কৃষ্ণাম্মা দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার সুদূর প্রসারিত। মধ্যাহ্নের সূর্যটা পশ্চিমে হেলার সময় হয়ে আসছে। চেন্না রাও অপেক্ষা করতে বলে গেছে তাদের।

রাস্তার মাঝে হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়েছিল সহযাত্রী যুবক। অপেক্ষা করতে বলে দরজা খুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সংকীর্ণ একটি গলি পথে।

তুজনে চুপচাপ বসেছিল ট্যাক্সিতে। গাড়ির মধ্যের আলো নেভানো। একটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, কমরেড সিগারেট।

—ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাইনা।

একটু অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। যুবক আপন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছিল।

একটু পরেই ফিরে এসেছিল যুবক। তার উদ্দেশ্যে বলেছিল, আপনি নামুন এখানে। ড্রাইভার যুবককে বলেছিল, আপনি এখন ফিরে যান কমরেড। এনার জিনিষগুলি হোটেল থেকে…

যুবক উত্তর দিয়েছিল, আশা করছি সেগুলির ব্যবস্থা এতক্ষণে নিশ্চয়ই হয়েছে। আচ্ছা ধন্যবাদ।

শংকর বলেছিল, ধন্যবাদ

হেসেছিল যুবক। বলেছিল, আবার দেখা হবে।

—নিশ্চয়ই হবে

ওরা দুজন এগিয়ে গিয়েছিল। যুবক গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছিল।

সে রাত্রে বিশ্রাম মিলেছিল। পরিচয় হয়েছিল চেন্না রাও আর তার সহযাত্রী কমরেডদের সঙ্গে। পুলিশ, গোয়েন্দাদের সতর্ক প্রহরার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন সহর গ্রাম ঘুরিয়ে এখানে নিয়ে এল তাকে। ছ'টা দিনে কখনো সহরে, কখনো গ্রামে, কারো না কারো বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। সে কে? কি তার পরিচয়, জানবার এতটুকু কৌতূহল প্রকাশ করতে দেখেনি একটি শিশুর মুখেও। নির্বিকার ভাবে খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করেছেন সকলে। পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসে খাইয়েছেন। ব্যাস। আর কিছু নয়। শুধু বিদায় নেবার সময় হাত জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আবার আসবেন।

আসবে, নিশ্চয়ই আসবে।

সেদিন আসছে। সকলে আসবে। পরস্পরের সঙ্গে মিলবে। ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এক হয়ে যাবে। নতুন দিনের সূর্য করজ্জল প্রভাত লগ্নে মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা পড়বে মানুষ।

কমরেড! কৃষ্ণাম্মার আহ্বানে তার দিকে ফিরে তাকাল শংকর। তাকে দেখল। বলল, আমাকে কিছু বলবেন?

কৃষ্ণাম্মার চোখ দুটো ছলছলে। কণ্ঠ অবরুদ্ধ। বলল, আমার মনে হয় ওঁদের কোন বিপদ হয়েছে।

—বিপদ?

—হ্যাঁ, কমরেড! আমার মন বলছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম সে দৃশ্য!

—কি দেখলেন?

—ওঁদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলি। এক জায়গায় জড়ো করে শয়তানের দল আনন্দে উৎসব করছে। ওদের চোখের দৃষ্টিতে পশুর ক্ষুধা! ওরা ভোজ সারবে কমরেডদের উষ্ণ রক্ত মাখা তাজা মাংসে!

কৃষ্ণাম্মার কথাগুলো শুনতে শুনতে বারবার শিউরে উঠল শংকর। ওর মুখের দিকে ভালভাবে তাকাল। দু-চোখের দৃষ্টি কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে মনে হল। ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। তবে কি কৃষ্ণাম্মা······না-না······তা কেমন করে সম্ভব? অসহায় বোধ করলো সে নিজেকে। কি করবে, সহসা ভেবে পেল না। কথা বলতে পারল না।

কৃষ্ণাম্মা আবার দূরের দিকে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত করে দিয়েছে। চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কি দেখছে, ভাবছে, ওই জানে।

শংকর মৃদুকণ্ঠে ওকে ডাকল, কমরেড।

কিন্তু সে ডাক ওর কানে পৌঁছাল না। শুনতে পেলনা কৃষ্ণাম্মা।

শংকর বুঝতে পারল ও বিচলিত হয়েছে। ওর নারীমন আতঙ্কে ভরে গেছে! দুঃস্বপ্ন দেখেছে! ভয়, শঙ্কা আতঙ্ক ও চেপে

রাখতে পারেনি। মনের দুর্বলতাটুকু রোধ করা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

অন্ধ্রের মেয়ে কৃষ্ণাম্মা। যে অন্ধ্রের মেয়েরা ঘর সংসার, পুত্র, কন্যা, পরিজন ত্যাগ করে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সহ্য করেছে পুলিশের অত্যাচার, পুরুষের সঙ্গে 'অ্যাকশনে' যোগ দিয়ে হাত রাঙিয়েছে শ্রেণী শত্রুর রক্তে! দেশের শত্রু, মানুষের শত্রুদের বুকে আঘাত হানতে এতটুকু বিচলিত হয়নি, হাত কাঁপেনি।

অন্ধ্রের মহিলা কমরেডরা প্রথম দিকে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু ২৭শে মে (১৯৫৯) কমরেড কৃষ্ণমূর্তি ও অপর দু'জন কমরেডের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন, আমরাও অস্ত্র ধরবো। কমরেডদের হত্যার প্রতিশোধ নেব আমরা!

সোমপেটা আঞ্চলিক পার্টি কমিটি প্রথমে রাজি হতে চাননি। ওঁদের অনেক করে বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিশোধ আমরাই নেব শয়তান জমিদার আর দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতকটাকে নিশ্চয়ই সাজা দেব আমরা। আপনাদের ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তাই পালন করুন আপনারা।

—কেন, আমরা কি প্রতিশোধ নিতে পারিনা? কমরেডদের হত্যা কি আমাদের বুকে বাজেনি? অধৈর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁরা!

নেতৃস্থানীয়রা মহিলাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মহিলা কমরেডরাও যে গেরিলা অভিযানে এগিয়ে আসবেন, শ্রেণীশত্রুর বুকের রক্তে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইবেন, এ তাঁরা বিশ্বাস করতে পারেন নি। শেষকালে বাধ্য হয়েছিলেন মত দিতে। তবু তাঁদের মনের সন্দেহ দূর হয়নি

তারপর সেই দিনটা। ১৯শে জুন ১৯৫৯ সাল।

সোমপেটা আঞ্চলিক পার্টি কমিটির নেতৃত্বে তেখালু তালুকের

অন্তর্গত আকুলপালিতে ঘটল মহিলা কমরেডদের গেরিলা অভিযান। বহুসংখ্যক মহিলা কমরেড যোগ দিলেন সেই অভিযানে। নিখুঁত অভিযান। এতটুকু ত্রুটি নেই কোথাও। সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল সম্পূর্ণ ঘটনা।

চারিদিক থেকে ওঁরা ঘিরে ফেললেন জমিদার বাড়ী। চারিদিক থেকে আক্রমণ চালালেন। ওঁদের গতি রুদ্ধ করে, বাধা দেয়, তেমন সাধ্য হল না জমিদার বা তার পোষা গুণ্ডাদের।

মুহূর্তে জমিদারকে হত্যা করলেন ওঁরা। বাজেয়াপ্ত করলেন সম্পত্তি। জমিদার-বাড়ীর দেওয়ালে নিহত জমিদারের রক্ত দিয়ে লিখলেন কটি কথা: "তুই পি-কে'কে হত্যা করিয়েছিস, আমরা তোদের সকলকেই খতম করব—এই সবে স্থরু।"

তারপর যেমন গিয়েছিলেন তেমনি ফিরে এলেন। পুলিশ এসে নিহত জমিদারের লাশ ছাড়া আর কিছুই পেলনা।

কিছু না পেলেই পশুর দল ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পুলিশ, শান্তিরক্ষক—ভুলে যায় সে কথা। কেউই রেহাই পায় না তাদের অত্যাচার থেকে। পশু ক্ষুধা মেটায় তারা। কেউ একটি কথাও বলে না। সন্ধান বলে দেয় না মুক্তি যোদ্ধাদের। নারীত্বের চেয়েও মুক্তি যে তাদের কাছে অনেক বড়। তারা জানে, বিশ্বাস করে, এই অত্যাচার উৎপীড়ন, শোষণের অবসান একদিন হবেই। সেদিন অন্যায়ের, পাপের শাস্তি ওদের পেতেই হবে। আজকের এই অত্যাচার তো অস্তিমের কবর খনন।

জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনযুদ্ধ একদিন বিজয় লাভ করবেই। শুধু বাবুলাল, কৃষ্ণমূর্তি, উম্মা রাও নয়, আরো হাজার হাজার বীর বিপ্লবীর খুন ঢালতে হবে; হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে। তবেই আসবে স্বর্ণ সম্ভাবনাময় সেদিন। প্রকৃত স্বাধীনতা। শোষণ শাসনমুক্ত এক নতুন রাষ্ট্র। প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বহারার অধিকার।

কমরেড! কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠস্বর। শংকর তার দিকে চাইল।

কৃষ্ণাম্মা মৃদু কণ্ঠে বলল, ক্ষণিক আগে যে দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছি তার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন বুঝতে পারছি আমি, আপন স্বার্থ চিন্তা করেই অমন উতলা হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয়নি, যা ভাবছি তা অন্যায়।

— কেন? জানতে চাইল শংকর।

—আমি বেশি ভেবেছিলাম ভাইয়ের কথা। কিন্তু এখন তো আমরা শুধু মাত্র ভাইবোন নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের পথ এবং লক্ষ্য যদিও একই তবুও হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিলে চলবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর আঘাতে যদি আমাদের একজনের মৃত্যু ঘটে তবুও থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে শেষ লক্ষ্যে। এখন যে কাঁদবার সময় আমাদের নয়

—কমরেড!

—আমি ভুল করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

কৃষ্ণাম্মার কথাগুলি শুনলো শংকর। কোন উত্তর দিল না। মনে পড়ল তার নকশালবাড়ির কথা। সেখানেও প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশী অভিযান সুরু হয়েছিল। বিপ্লবী মুক্তি যোদ্ধাদের ধরবার জন্য হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল। ব্যর্থতায় ক্ষিপ্ত হয়ে চালিয়েছিল সীমাহীন বর্বরতা।

কিন্তু নকশালবাড়ির জনগণ বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেয় নি পুলিশের হাতে।

যদি ধরিয়ে দিত, যদি পুলিশের কাছে বলে দিত আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সন্ধান, তাহলেও কি তারা রেহাই পেত? সব পুলিশই কি তাহলে নারীকে মায়ের মত সম্মান দিত?

না, দিত না।

সম্মান কি জিনিস পুলিশ জানে না। সম্মানের মূল্য পুলিশ বোঝে না।

কিন্তু কেন? কেন বোঝে না ওরা? ওরা কি মানুষ নয়?

নিশ্চয়ই মানুষ। পুলিশও মানুষ। পুলিশের মধ্যেও স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, মহত্ব সবই আছে। তেমনি আছে কিছু অমানুষ। আর যারা মানুষ ছিল তাদের অমানুষে পরিণত করা হয়। তারা বাধ্য হয় অমানুষ হয়ে উঠতে।

শয়তানদের স্বার্থ রক্ষায় পুলিশ বড় হাতিয়ার। পুলিশের হাতের হাতিয়ার যদি মানুষের বুক লক্ষ্য করে উদ্যত না হয়ে শয়তানদের বুকে লক্ষ্য স্থির করে, তাহলে ওদের সুখের স্বপ্ন এক মুহূর্তে ছিঁড়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

সেটুকু বোঝে ওরা। ওই স্বেচ্ছাচারী শয়তানের দল। যারা ভাল থাকতে চায়, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করতে চায় তাদের বাধ্য করানো হয় অন্যায় করতে। কালে অন্যায় করার মোহ একদিন গ্রাস করে তাদের। শেষ মনুষ্যত্ব বোধটুকু বিনষ্ট হয়।

মালিকের স্বার্থে আইন। শ্রমিকের দল তাদের ন্যায্য দাবী জানালে পুলিশ ছোটে। পুলিশ ছুটতে বাধ্য হয়। না ছুটে ওদের কোন উপায় নেই। হাত-পা বাঁধা। ওরা সরকারের দাস, সরকারের হুকুম, হুকুম ওদের মানতেই হবে। বিচার করার অধিকার নেই। গুলি চালিয়ে যদি অতি প্রিয়জনকেও মারতে হয়, তবু মারতে হবে।

পুলিশ শান্তিরক্ষক, পুলিশ মানুষের বন্ধু, কিন্তু স্বেচ্ছাচারীর দল নিজেদের স্বার্থে পুলিশকে দিয়ে অশান্তি ঘটায়, বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করে। মানুষ পুলিশ-পশুতে পরিণত হয়েছে। তা যদি না হবে কেমন করে ওরা স্বেচ্ছাচারীদের অন্যায় হুকুম মেনে নেয়, পালন করে?

প্রগতিশীল যুক্তফ্রন্টের পুলিশী অভিযান স্নুরু হয়েছিল নকশাল-বাড়ির গ্রামে গ্রামে। ত্রাস আর বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল পুলিশ। ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধির হুকুমে গ্রামকে গ্রাম তছনছ করেছিল। রক্ত, অশ্রু, ক্রন্দন। শিশু নারীর করুণ ক্রন্দন ওদের মনকে টলাতে পারেনি, মায়া জাগায়নি। জেলখানা ভরিয়ে তুলেছিল নিরীহ মানুষদের দিয়ে। প্রতিকার ছিল না। প্রতিকার কিসের? কারা প্রতিকার করবে?

হাতিঘিষার ছোট্ট ঘরখানার অন্ধকারে একদিন গর্জে উঠেছিল শংকরের কণ্ঠ। বলেছিল, এ অন্যায়, অত্যাচার আমি আর দেখতে পারছি না।

তাঁর মৃদু কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল, তবু তোমাকে সহ্য করতে হচ্ছে না।

—হচ্ছে না বলেই তো জ্বালা, এত দাহ।

—কি করবে তাহলে ভাবছো? তেমনি মৃদু কণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—কি করবো? প্রশ্ন করেছিল সে।

—তুমিও কি মার খেতে চাও, চাও ওদের অত্যাচার সহ্য করতে?

—না, আমি ওদের মারতে চাই। এমন মার মারবো যাতে ওরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

—ক'জনকে মারবে তুমি?

– ক'জনকে মারব কি?

—আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমার একার পক্ষে কজন পুলিশকে মারা সম্ভব হবে?

—একজনকেও তো মারতে পারবো?

—তা পারবে। তাঁর কণ্ঠ একটু নীরব ছিল। ক্ষণকাল পরে বলেছিলেন, কিন্তু একজনকে মারলেই তো হবে না। একশো জনকে, হাজার জনকে, যারা অশান্তির আগুন জ্বালাবার জন্যে আসবে

তাদেরই মেরে শেষ করে দিতে হবে। কিন্তু এই হাজার জনকে মারা তোমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। হাজার জনকে মারতে গেলে তোমার মত অনেক জনের দরকার। তোমার মত অনেক জনকে তৈরি করে নিতে হবে তোমায়।

—কিন্তু এখন যে………। চুপ করে গিয়েছিল সে।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এখন কি ?

—এখন চুপ করে থাকতে হবে ? নীরবে দেখতে হবে পুলিশের এই নারকীয় অত্যাচার ?

—উপায় কি ?

—নেই ?

—শক্তি যেখানে অসমান সেখানে সহ্য করা ভিন্ন কোন পথ তো আমি দেখিনা। তুমি একা। কিন্তু চারজন যখন হবে তখন নিশ্চয়ই চুপ করে থাকবে না। হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিতে হয় শংকর। কিন্তু তার আগে শক্তি সংগঠিত করতে হবে। চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে সবার আগে।

—কিন্তু মুখের কথায় মানুষ জাগবে কি ?

—নিশ্চয়ই জাগবে না, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যা করছো সবই জনগণের জন্য।

—কিন্তু ততদিনে যদি…

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, না শংকর তা হবে না। নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না নকশালবাড়ির এই জাগরণ। নকশালবাড়ির মানুষের এই আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবেনা। মানুষের বিপ্লবী চেতনা কখনো নষ্ট হয় না। একদিন দেখবে নকশালবাড়ির এ আগুন বাংলাদেশে, সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে। নকশালবাড়ির মানুষের ওপর স্বেচ্ছাচারী শাসক শ্রেণীর পুলিশী পীড়ন, অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। নকশালবাড়ির জনগণের আজকের এই আত্মত্যাগ নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।

সেদিন তার কথার প্রতিবাদ করতে পারেনি শংকর। সমর্থনও জানায়নি। একটু দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়েই কাজ করেছে। কিন্তু তার কথাই যে সত্য, দেখল একদিন।

চেন্না রাও বলেছিল, কমরেড, তুমি সঙ্গে রয়েছো তাই, নাহলে একটা না একটা শয়তানকে নিশ্চই শেষ করে দিতুম।

চেন্না রাওয়ের কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি সে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় শয়তান?

—ওই তো। ইসারায় একটা পুলিশকে দেখিয়েছিল সে।

শংকর বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, পুলিশকে মারবে কেন?

নিশ্চয়ই মারবো। চেয়ারম্যান বলেছেন, "পুলিশ দেখলেই মারো।" তিনি ঠিকই বলেছেন। স্বেচ্ছাচারী শয়তানের সবচেয়ে বড় দোসর ওরা। ওদের শয়তানীই তো মানুষকে সর্বহারা করে। সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু ওরা। যেহেতু ওরা শান্তিরক্ষক, সেইহেতু মানুষের সংসারে আগুন জ্বালাতে ওরা এতটুকু দ্বিধা করে না। ওদের স্বেচ্ছাচার তো নির্দোষকে দোষী সাজায়। উৎকোচে মুক্তি পায় শয়তান।

— কিন্তু ওরা তো আমাদের কারো না কারো সংসারের কেউ-না কেউ?

—নিশ্চয়ই কেউ-না কেউ। কিন্তু তা ওরা মনে রাখে না। শয়তানের জন্মও তো সংসারে। স্বার্থ মানুষকে শয়তান বানায়। স্বার্থহানি ঘটলে মানুষ মানুষের বুকে ছুরি বসায়। সেচ্ছাচারীর দল নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ওদেরও স্বার্থপর শয়তানে পরিণত করেছে।

—কিন্তু ওদের মারলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

—নিশ্চয়ই নয়। মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সবচেয়ে বড় বাধা ওরা। অত্যাচারীর দল ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে

আমাদের আঘাত হানবার জন্যে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এর পরিবর্তন ঘটবে।

—কেমন করে?

- যেমন করে মহান চীন বিপ্লবে ঘটেছিল। বন্দী কুও মিন্টাং-এর সৈন্যরা স্বেচ্ছায় একদিন যোগ দিয়েছিল লাল ফৌজে! মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা। কমরেড মাও সে তুঙ চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট পেশ করা রিপোর্টে সামরিক প্রশ্নাবলীতে লিখেছেন:—যেহেতু সীমান্ত অঞ্চলের সংগ্রাম একান্তভাবেই সামরিক সংগ্রাম, সেজন্য পার্টি ও জনসাধারণ উভয়কেই যুদ্ধের উপযোগী করে প্রস্তুত রাখতে হবে। কেমন করে শত্রুর মোকাবিলা করা যায়, কিভাবে যুদ্ধ চালানো যায় সেই সমস্যাই আমাদের দৈনন্দিন কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে উঠেছে। স্বাধীন রাষ্ট্র হলে তাকে অবশ্যই সশস্ত্র হতে হবে। স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানেই কায়েম করা হোক না কেন, সশস্ত্র শক্তি না থাকলে বা সশস্ত্র শক্তি অপ্রচুর হলে অথবা শত্রুর মোকাবিলার জন্য ভুল রণকৌশল গ্রহণ করলে শত্রু সঙ্গে সঙ্গে সেই এলাকা দখল করে নেবে। প্রতিদিন সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠছে বলে আমাদের সমস্যাগুলিও অত্যন্ত জটিল ও গুরুতর হয়েছে উঠছে।

সীমান্ত অঞ্চলের লাল ফৌজ গড়ে উঠেছে এদের নিয়ে:—

১। যে সব সৈন্য আগে ইয়েতিং ও হো লুং এর অধীনে চাও চৌ ও সোয়াতৌ-এ ছিল (কমরেড ইয়েতিং ও হো লুং-এর অধীনস্থ এই সব সৈন্যরা ১৯২৭ সালের ১লা আগষ্টে "নানচাং অভ্যুত্থান" ঘটায়। কোয়াং টু প্রদেশের চাও চৌ ও সোয়াতৌ-এর দিকে এগুবার পথে এরা পরাজিত হয় এবং কমরেড চু তে, লিন পিয়াও ও চেন ই-র দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি ইউনিট কিয়াং সির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ হুনানে সরে যায় গেরিলা কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার জন্য। ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে

তারা চিং কাং পাহাড়ে কমরেড মাও-সে-তুঙ বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে।)

২। য়ুচাং-এর ভূতপূর্ব জাতীয় সরকারের "গার্ডস রেজিমেণ্ট" (১৯২৭ সালের বিপ্লবী দিনগুলিতে, উচাং-এ অবস্থিত জাতীয় সরকারের "গার্ডস রেজিমেণ্টের" অধিকাংশ ক্যাডরই কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ সালের জুলাই মাসের শেষে ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পর "নানচাং অভ্যুত্থানে" যোগদান করার জন্য এই রেজিমেণ্টটি উচাং ত্যাগ করে যাবার পথে যখন তারা শুনতে পায় যে বিপ্লবী সৈন্যরা ইতিমধ্যেই নানচাং ছেড়ে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেছে তখন এই রেজিমেণ্ট পিং কিয়াং এবং লিউ ইবাং-এর সশস্ত্র কৃষক বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার জন্য ঘুর পথে পশ্চিম কিয়াং সির অন্তর্গত লিউ শুই-তে পৌছায়।)

৩। পিংকিয়াং ও লিউ ইয়াং-এর কৃষকরা (১৯২৭ সালের বসন্তকালে হুনান প্রদেশের পিং কিয়াং ও লিউ ইয়াং অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী একটি সশস্ত্র কৃষকবাহিনী তৈরি করা হয়। ২১শে মে তারিখে সুকে সিয়াং, চ্যাং শাতে একটি প্রতিবিপ্লবী ব্যুপ [ক্ষমতা দখল] সংঘটিত করে এবং বিপ্লবী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। তখন প্রতিবিপ্লবীদের উপর আঘাত হানবার জন্য ৩১শে মে তারিখে কৃষকদের সশস্ত্রবাহিনী চ্যাং শার দিকে রওনা হয়। কিন্তু সুবিধাবাদী চেন্ তু সিউ তাদের থামায় এবং ফিরিয়ে দেয়। এরপর এই বাহিনীর একটি অংশকে পুরা একটি রেজিমেণ্ট হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয় গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। ১লা আগষ্টে "নানচাং অভ্যুত্থান" ঘটার পর, এই সশস্ত্র কৃষকেরা, কিয়াং সি প্রদেশের সিউ শুইও টুং কুতে এবং হুনান প্রদেশের পিংকিয়াং ও লিউইয়াং-এ উচাং জাতীয় সরকারের পূর্বতন "গার্ডস রেজিমেণ্ট" এর সঙ্গে যোগদান করে। এরপর তারা কিয়াংসির পিংসিয়াং-এর সশস্ত্র কয়লাখনি

শ্রমিকদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে "শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থান" [সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে] সংঘটিত করে। অক্টোবর মাসে কমরেড মাও-সে-তুঙ এই বাহিনীগুলিকে পরিচালনা করেন এবং চিংকাং পাহাড়ে নিয়ে যান।)

(৪) দক্ষিণ হুনানের কৃষক (১৯২৮ সালের প্রথম দিকে, যখন কমরেড-চুতে দক্ষিণ হুনানের বিপ্লবী গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, তখন ইচাং, চেনচো, লেইয়াং, ফুলীন ও জেফিং কাউন্টিতে কৃষকদের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলিতে এর আগেই কৃষক আন্দোলন দৃঢ়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। পরবর্তী-কালে কমরেড চুতের পরিচালনায়, তারা চিংকাং পাহাড়ে যায় এবং কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর বাহিনীতে যোগদান করে) ও স্যুইকেটথানের শ্রমিকরা (হুনান প্রদেশের অন্তর্গত চ্যাঙ নিং এর স্যুইকৌমান সীমার খনির জন্য বিখ্যাত। ১৯২২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেখান-কার খনি শ্রমিকেরা একটি ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করে এবং অনেক বছর ধরে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ১৯২৭ সালের "শরৎকালীন ফসল অভ্যুত্থানের" পর অনেক খনি শ্রমিকই লাল ফৌজে যোগদান করে।)

(৫) থুকে-সিয়াং, তাঙ সেঙচি, পাই চুঙ্সী, চু পেই-তে, য়ুসাং এবং সিয়াং শী-হুই-এর অধীনস্ত সৈন্যদের মধ্যে যাদের বন্দী করা হয়েছিল ; এবং

(৬) সীমান্ত অঞ্চলের কাউন্টিগুলির কৃষকেরা।

যাই হোক, এক বছরেরও বেশি সময় ব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহের পর, আগে যারা ইয়েতিং ও হোলং-এর অধীনে ছিল সেই সব সৈন্যদের এবং "গার্ডস রেজিমেন্ট" এবং পিং কিয়াং ও লিউ ইয়াং-এর কৃষকদের মধ্যে মাত্র তিনভাগের একভাগ অবশিষ্ট আছে। দক্ষিণ হুনানের কৃষকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশি। তাই যদিও প্রথম চারটি শ্রেণীর সৈন্যরাই এখনও লাল ফৌজের মূল শক্তি, কিন্তু সংখ্যার

দিক থেকে এখন তাদের চেয়ে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর সৈন্যরা অনেক বেশি। তা ছাড়া শেষের এই দুই শ্রেণীর সৈন্যদের মধ্যে কৃষকদের তুলনায় ধৃত বন্দী সৈন্যদের সংখ্যাই বেশি। এইখান থেকে সৈন্যক্ষয় পূরণ না করা হলে জনশক্তির অভাব গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আবার, রাইফেলের সংখ্যা যে রকম বেড়েছে, সৈন্যের সংখ্যা তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ছে না। রাইফেল সহজে খোয়া যায় না, কিন্তু সৈন্যেরা আহত বা নিহত হয়, অসুস্থ হয়ে পড়ে বা দলত্যাগ করে পালায়, কাজেই সৈন্য ক্ষয় হয় আরও সহজে। হুনান প্রাদেশিক কমিটি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আনুয়ান (কিয়াং সি প্রদেশে পিংসিয়াং কাউন্টিতে অবস্থিত আনউয়ান কয়লা খনিতে বারো হাজার শ্রমিক কাজ করত। এর মালিক ছিল "হান-ইয়ে-পিং আয়রন ও ষ্টিল কোম্পানী।" কমিউনিষ্ট পার্টির হুনান প্রাদেশিক কমিটি যে সব সংগঠককে পাঠান তাঁরা ১৯২১ সালে ঐখানে পার্টি সংগঠন ও খনি শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৈরি করেন) থেকে শ্রমিকদের আমাদের কাছে পাঠাবেন। আমরা একান্ত আশা করে আছি তাঁরা কাজ করবেন বলে।

শ্রেণী উৎপত্তির দিক থেকে লাল ফৌজের সৈন্যদের কিছু অংশ এসেছে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে আর কিছু অংশ এসেছে বাউণ্ডুলে-সর্বহারাদের মধ্য থেকে। অবশ্য এই বাউণ্ডুলে সর্বহারাদের সংখ্যাটি বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে তারা লড়াই করতে পারে। আর লড়াই তো এখন প্রত্যেক দিনই হচ্ছে, হতাহতের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে, ফলে এমনকি এদের মধ্য থেকেও সৈন্যক্ষয় পূরণের জন্য লোক জোগাড় করাও আর সহজসাধ্য নয়। এরকম পরিস্থিতিতে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, রাজনৈতিক শিক্ষাকে আরো জোরদার করা।

লাল ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশ এসেছে ভাড়াটে সৈন্য বাহিনী থেকে। কিন্তু একবার লাল ফৌজে এলে তাদের চরিত্র

পালটে যায়। প্রথম কথা, লাল ফৌজ ভাড়াটে প্রথা তুলে দিয়েছে। এতে সৈন্যরা অনুভব করে তারা অন্য কারো জন্য লড়ছে না. লড়ছে নিজেদের জন্য, জনগণের জন্য।

চেন্না রাও বলেছিল, আজকের স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশবাহিনী, ভাড়াটে বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্যেই জনগণের ওপর অত্যাচার করতে এতটুকু হাত কাঁপেনা ওদের। হত্যার উল্লাসে ওরা মত্ত। খুনের নেশায় ওরা মাতাল। স্বেচ্ছাচারীর দল ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে বুঝিয়েছে, যেহেতু তোমাদের হাতে অস্ত্র দিলাম, সেইহেতু তোমরা অজেয়। যা ইচ্ছা তোমাদের তাই করো, আমরা আছি।

কিন্তু আমাদের সংগ্রাম অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। আমরা চাই অন্যায় অত্যাচারের অবসান। সর্বহারার স্বার্থরক্ষা। মানুষের অধিকার চাই আমরা। চাই মুক্তি। কিন্তু অত্যাচারীর দল যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের সেই পার্থিব মুক্তি আসতে পারে না। জনগণের জন্যই আমাদের এই জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে শত্রুর ভূমিকায় যে আমাদের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করবে তাকেই আমরা শেষ করে দেব। হিংসার জবাব হিংসা দিয়েই দিচ্ছি আমরা। স্বৈরাচারী কংগ্রেস সরকারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী পুলিশ আজ আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার ভূমিকা নিয়েছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরাও শেষ করছি তাদের। কিন্তু তারা একদিন নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, আঘাতের পর আঘাতে তাদের চেতনা সঞ্চার হবে, শয়তানী দূর হবে তাদের মন থেকে। তারা বুঝবে আমাদের আঘাত হানা তাদের বিরুদ্ধে নয়, যে অত্যাচারীর দল রক্ষকের ভূমিকা নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। সেদিন নিশ্চয়ই তারা তাদের কৃত অন্যায়ের পাপের সংশোধন করবে। কিন্তু যতক্ষণ না তারা তা করছে, যতক্ষণ তারা শয়তানদের দাসত্ব করবে ততক্ষণ আমরাও তাদের আঘাত হানবে, অত্যাচারের শাস্তি দেব।

তাদের বুঝিয়ে দেব অস্ত্রই সব নয়, জনগণ—জনগণ যদি ইচ্ছা করে তাহলে তাদের কয়েক মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে তাদের রাইফেল ধরা হাত।

চেন্না রাও আর তার সঙ্গীরা আক্রমণ করতে গেছে পুলিশকে। তারা বুঝিয়ে দেবে, মুখ বুজে আঘাত সহ্য করার দিন আর নেই।

তাদের দুজনকে বলে গেছে অপেক্ষা করতে।

কতক্ষণ, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তারা। সূর্যের আলো ম্লান হচ্ছে। ছায়া ঘনাচ্ছে বিকালের। গোধূলির শেষে সূর্য অস্ত যাবে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাস করবে বিশ্বচরাচর।

কিন্তু অপেক্ষা করে না থাকা ছাড়াও কোন উপায় নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত এ স্থান। কৃষ্ণাম্মা পথ চেনে কিনা তাও জানে না। জিজ্ঞাসা করাটা অশোভন দেখায় বলেই জিজ্ঞাসা করেনি।

শংকর ভাবল। কৃষ্ণাম্মার আশঙ্কাটা তার মনেও প্রতিফলিত হল। তবে কি ওর কথাটাই সত্য ?

না না, তা কেমন করে হয়! হয় না ?

শংকর ভাবতে পারল না।

কৃষ্ণাম্মা ভাবছিল। অনেক কথাই মনে পড়ছিল তার। মনে পড়েছিল ভাইয়ের কথা। হঠাৎই একদিন বিশাখাপত্তনম থেকে চলে এল ও তিন বছর আগের কথা। বাবা তখনও বেঁচে। ওকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কোন খবর না দিয়ে চলে এলি যে ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল ও। বাবাকে অন্য কথা বলে বুঝিয়েছিল। কিন্তু ও যে সত্য কথা বলছে না সেটা বুঝতে পেরেছিল কৃষ্ণাম্মা। এক সময় আড়ালে চেপে ধরেছিল। বলেছিল, বাবাকে মিথ্যা বলে বোঝাতে পারলেও আমাকে পারনি।

ও বলেছিল, কি মিথ্যা বলেছি?

—তুমি শুধু একবার বাড়ি আসনি, বরাবরের জন্য চলে এসেছো।

—কে বললে? যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল ও।

কৃষ্ণাম্মা বলেছিল, বলছি আমি। মা যদি বেঁচে থাকতো মাও ধরতে পারতো।

মায়ের কথায় ওর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল। দীর্ঘদিন আগে মা মারা গেছে। মারা গেছে বললে ভুল হয়। মাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তারা তখন খুব ছোট। বড় হয়ে শুনেছে, গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে মা আত্মহত্যা করেছিল।

ও বলেছিল, ধরতে হয়তো পারতো মা, কিন্তু আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করতো না।

ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল কৃষ্ণাম্মা। কথা বলতে পারেনি।

ও বলেছিল, এছাড়া অন্য কথা আমার পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়। আমি নিজের ভবিষ্যতের জন্য লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আপন সুখ স্বাচ্ছন্দের। অথচ আমার দেশ, গ্রাম, ঘরের মানুষ অনাহার, অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করছে। আমরা নামে স্বাধীন, কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে যে জিনিষ, আমাদের তা নেই। প্রতিটি পদক্ষেপে বাধা. সেই বাধা অপসারিত করতে চাই আমরা। গড়ে তুলতে চাই সত্যকারের স্বাধীন রাষ্ট্র। জনগণের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু কেমন হবে সে রূপ? মার্কস, "এঙ্গেলস প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিষ্টরা" প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন, বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেওয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত

প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন শক্তির মোট সমষ্টিটাকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।

স্বরুতে অবশ্যই সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন পরিস্থিতির উপর স্বৈরাচারী আক্রমণ ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং তা করতে হবে এমন সব ব্যবস্থা মারফৎ যা অর্থনীতির দিক থেকে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু যাত্রাপথে এরা নিজ সীমা ছাড়িয়ে যাবে এবং পুরানো সমাজ ব্যবস্থার উপর আরও আক্রমণ প্রয়োজনীয় করে তুলবে, উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা অপরিহার্য।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবশ্যই এই ব্যবস্থাগুলি হবে বিভিন্ন।

তা সত্বেও সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মোটের ওপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য :

১। জমি মালিকানার অবসান, জমির সমস্ত খাজনা জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয়।

২। উচ্চ মাত্রার ক্রমবর্ধমান হারে আয়কর।

৩। সবরকমের উত্তরাধিকার বিলোপ।

৪। সমস্ত দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি।

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও নিরঙ্কুশ একচেটিয়া সহ একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ সমস্ত ক্রেডিট রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৬। যোগাযোগ ও পরিবহনের সমস্ত উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকরণ।

৭। রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন কলকারখানা ও উৎপাদন উপকরণের প্রসার; পতিত জমির আবাদ এবং এক সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র জমির উন্নতিসাধন।

৮। সকলের পক্ষে সমান শ্রমবাধ্যতা। শিল্পবাহিনী গঠন, বিশেষত কৃষিকার্যের জন্য।

৯। কৃষিকার্যের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের সংযুক্তি; সারাদেশের জনসংখ্যার আরো বেশি সমভাবে বণ্টন মারফৎ ক্রমে ক্রমে সহর ও গ্রামের প্রভেদ লোপ।

১০। সরকারী বিদ্যালয়ে সকল শিশুর বিনা খরচে শিক্ষা। ফাক্টরীতে বর্তমান ধরণের শিশু শ্রমের অবসান। শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সংযুক্তি ইত্যাদি।

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী পার্থক্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিপুল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হবে, তখন সরকারী (পাবলিক) শক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতা হল একশ্রেণীর উপর অত্যাচার চালাবার জন্য অপর শ্রেণীর সংগঠিত শক্তি মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই-এর ভিতর অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসকশ্রেণীতে পরিণত করে ও শাসকশ্রেণী হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে তারা যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তাহলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বিরোধ তথা সরকার শ্রেণীর অস্তিত্বটাই দূর করে বসবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসাবে তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটাবে।

শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের সর্তে।

ওর কথা শুনে বুঝতে আর কিছু বাকী থাকেনি কৃষ্ণাম্মার।

ওর কাছে একদিন কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের শ্রীকাকুলামের জেলা কমিটির রিপোর্ট দেখেছিল। তাতে লেখা ছিল:

বর্তমানে আমরা সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যে রয়েছি। যে পথ আমরা

অনুসরণ করছি তা হল বর্তমানে আমাদের সংগ্রাম সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে উপনীত জনযুদ্ধের পথ। যে কৌশল আমরা গ্রহণ করেছি তা হল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল। আমরা জানি যে জনযুদ্ধের প্রাথমিক কর্তব্য হল গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি এলাকা গঠন করে সহর ঘিরে ধরা এবং শেষ পর্যন্ত সহর দখল করা। গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়তে হলে সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা শ্রেণীশত্রুদের নির্মূল করার মধ্য দিয়েই কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনার মান বাড়ানো সম্ভব বলে আমরা মনে করি। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতিতেই বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে ওঠে না। শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামে, সকল পিছিয়ে পড়া দেশ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশ, বিশেষ করে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় জনযুদ্ধের এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

জনযুদ্ধের এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন আজকের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতা ও শিক্ষক চেয়ারম্যান মাও। চীনের মত একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে চেয়ারম্যান মাও-এর দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধের এই তত্ত্বটি সর্বপ্রথমে জয়লাভ করে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকশিত করে চেয়ারম্যান মাও সম্পূর্ণ এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করলেন। আজকের দুনিয়ায় এই রূপটিই হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বোচ্চ বিকশিত রূপ। এই কারণেই জনযুদ্ধের বিপুল গতি দেখে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পদলেহী সংশোধনবাদীরাসহ সকল প্রতিক্রিয়াশীলরাই আতঙ্কগ্রস্ত।

সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ লুণ্ঠনের পুরানো কায়দা ছেড়ে নতুন কায়দা গ্রহণ করেছে। পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে প্রত্যক্ষ ভাবে শোষণ না করে পরোক্ষ ভাবে শোষণের পথ ধরেছে। কার্যত, এই কায়দায় শোষণ করাটা অনেক বেশি কার্যকরী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন। সোভিয়েত

সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন অন্য সকল সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সারা দুনিয়ায় অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই শক্তির নোংরা হাত পিছিয়ে পড়া দেশ—এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিতে এগিয়ে এসেছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের দুঃখ দারিদ্রের মূল কারণ এই মার্কিন ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদীরা—এরাই দুনিয়ার জনগণের মূল শত্রু জনগণ যদি দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটাতে, উন্নতির পথে অগ্রসর হতে চায় তবে এই দুই আন্তর্জাতিক শোষকের সঙ্গে—সোভিয়েত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। এরাই জনগণের সুখ, শান্তি ও উন্নতির প্রধান বাধা।

কি হবে সংগ্রামের পথ?

বস্তুতপক্ষে চেয়ারম্যান মাও কর্তৃক উদ্ভাবিত চীন বিপ্লবে পরীক্ষিত বিজয়লাভের একমাত্র পথ জনযুদ্ধের পথ ছাড়া জনগণের কাছে আর অন্য কোন পথ নেই। মহান চীন বিপ্লবে জনযুদ্ধের বিজয়লাভ দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের কাছে মুক্তি পথের সন্ধান এনে দিল। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে জনগণ উপলব্ধি করলেন যে, একমাত্র জনযুদ্ধের পথেই সংগ্রামে বিজয় লাভ করা সম্ভব। আজকের দিনে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার মত পিছিয়ে পড়া দেশসমূহে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে জনযুদ্ধের গেরিলা কায়দায় লড়াই ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছে। এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের তৈরি দেয়ালে চিড় ধরেছে—জনগণের এই সব শত্রুরা আতঙ্কে থরহরিকম্পমান। চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র মহান চীনের মহান কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণ প্রচণ্ড শক্তিতে, দুষমনদের তৈরি সমস্ত বেড়াজাল সুকঠিন দেওয়ালগুলিতে আঘাতের

পর আঘাত করে গুঁড়িয়ে ফেলছেন। বাস্তবিকই বর্তমান যুগটি হল সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের সেবাদাস প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এ যুগটি নিপীড়িত দেশসমূহের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল। পিছিয়ে পড়া অনুন্নত দেশসমূহে পরিপক্ক বিপ্লবী পরিস্থিতি উপস্থিত। এই সময়টি গণতান্ত্রিক বিপ্লব হাসিল করার পক্ষে সুযোগ্য সময়। চমৎকার অনুকূল পরিস্থিতিতে যে কোন দেশের যে কোন অঞ্চলেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের যে কোন সংগ্রামী স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে সক্ষম। তাই প্রতিটি বিপ্লবীর এবং বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রে এই স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে পরিণত করে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই মুখ্য ও আশু কর্তব্য

আমাদেরও আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেই কারণে এই দেশের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ হাসিল করতে চেয়ারম্যান মাও এর জনযুদ্ধের লাইন ছাড়া অন্য কোন পথই থাকতে পারে না। আমরা আন্তরিকতার সাথেই এই মহান লাইনটি গ্রহণ করেছি। এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা খুবই সঙ্গত যে মুখে জনযুদ্ধের লাইন গ্রহণ করা এবং কার্যত সেটি প্রয়োগ করা এক কথা নয় ভারতের বুকে মহান জনযুদ্ধ সুরু হয়েছে। আমরা মনে করি ১৯৫৭ সালে নকশালবাড়িতে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই সুমহান কাজের উদ্বোধন হয়েছে। আমাদের দেশে বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে সামন্ত জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব খুবই প্রকট এবং এই দ্বন্দ্বটিই আজ মুখ্য দ্বন্দ্বরূপে উপস্থিত। কেমলমাত্র দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েই আমরা আগামী দফোর অগ্রসর হতে পারি। এবং এই দ্বন্দ্বের সমাধান একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক শ্রেণীর সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম দ্বারাই সম্ভব অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের বিপ্লবের স্তরটি হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর। সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের দ্বারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের

আশু কর্তব্য সমাধা করাই বর্তনান মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই হচ্ছে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য। ঐ বক্তব্য অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বক্তব্যের উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের জেলার শ্রেণীশত্রুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়টিকে বিবেচনা করে আমাদের সংগ্রামের পদ্ধতি স্থির করি। এই বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি, যে, শ্রেণীশত্রুদের অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রতিরোধ করতেই হবে এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরিপূরক হবে।

চেয়ারম্যান মাও আমাদের মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।" আমরা সমস্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে চেয়ারম্যানের শিক্ষাটিকে উপলব্ধি করি। আমাদের জেলার সংগ্রামের বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, এই প্রতিরোধ সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এবং এই রাজনৈতিক ক্ষমতা বন্দুকের উপর ভরসা রেখেই দখল করা সম্ভব।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর আমরা কমিউনিষ্ট পার্টি জেলা কমিটির পক্ষে একটি সিদ্ধান্ত ইস্তাহার প্রকাশ করে বিলি করি। ঐ ইস্তাহারে আমরা জনগণের কাছে আবেদন করি, "গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগ্রামের ঘাঁটি গড়ে তোলবার জন্য কৃষক সংগ্রামকে সমর্থন করুন। জেলার কৃষক জনতা চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারাকেই সংগ্রামের নেতৃত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কমিউনিষ্ট পার্টি, এই বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামকে পূর্ণ বিজয়ের পথে নিয়ে যেতে, অন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহকে এই মহান সংগ্রামের সমর্থনে সামিল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

সংগঠিত ভাবে সমস্ত জমিদারদের ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং এদের নির্মূল করার জন্য পুলিশবাহিনীকে প্রতিরোধ করে গ্রামাঞ্চলে

বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তুলে জনগণের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে জনগণের উদ্যোগ বৃদ্ধির কথাটিও আমরা বিবেচনা করি। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সংগ্রাম খুবই কার্যকর।

আগস্ট (১৯৬৯) মাসের গোড়ার দিকে রায়তাঙ্গা সংগ্রাম কমিটি সোমপেটা তালুকে সংগ্রামের বিবরণ দিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন। বললেন:

বন্ধুগণ ও বীর বিপ্লবী কৃষকগণ!

আমাদের তালুকের জনগণ এক মহান উন্নত স্তরে উঠেছেন। যুগ যুগ ব্যাপী শোষণ থেকে আমাদের গ্রামাঞ্চলের জনতার মুক্তি খুব নিকটে এসে গেছে। ইতিমধ্যেই আমাদের সশস্ত্র কৃষকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছেন এবং এইভাবে চিরস্থায়ী মুক্তি অর্জনের জন্য শত্রুদের মারণ আঘাত হানছেন। সংগ্রাম সুরু করার পর খুব অল্প দিনের মধ্যেই যে আমরা বড় রকমের বিজয় অর্জন করতে পেরেছি, তার কারণ কি? তার কারণ, আমরা আমাদের সংগ্রাম চালাচ্ছি মাও সে তুঙ চিন্তাধারায়; আমাদের সংগ্রাম জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থের অনুকূল; আমাদের কৃষক গেরিলারা ও বিপ্লবী কৃষকেরা মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অস্ত্র নিয়ে ব্যাঘ্র গতিতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং ছাত্র কর্মচারী ও জনতার অন্যান্য অংশের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি।

আমরা যে বিজয় অর্জন করলাম তাকে শুধু আরও বিস্তৃত করলেই চলবে না, তাকে আরও সুদৃঢ় করতে হবে। আমাদের মহান নেতা কমরেড মাও সে তুঙ আমাদের শিখিয়েছেন: "ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকে না।" এখনই অনেক গ্রামের জনগণ, হাতের কাছে যে অস্ত্র পাওয়া যায় তাই দিয়েই গণফৌজ গঠন করতে চলেছেন। প্রত্যেক গ্রামে রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি গঠিত হচ্ছে। এই হবে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের সংস্থা। এই সংগ্রাম

সমিতি, যা অস্ত্র পাওয়া যায় তাই দিয়েই দিয়েই জনগণকে সশস্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করবে। শোষকদের ও তাদের সেনাবাহিনীকে পাল্টা মার দিতে হবে। অনেক গ্রামে যে জমি জোতদারদের হাত থেকে আমরা নিচ্ছি কিম্বা যা ওরা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে সেই জমি চাষ করার জন্য আমাদের জনগণ গণফৌজের সঙ্গে আলোচনা করছেন। এই "রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি" এদের সম্পর্কে বিশদ ও বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করেছে চাষ করার জন্য সশস্ত্র ভাবে কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের গেরিলাদের সহযোগিতা সব সময়ই জনগণ ও কৃষকেরা পাবেন। আমরা আশা করি এই কাজটি তাঁরা দ্রুত সম্পন্ন করবেন।

কৃষিবিপ্লব জিন্দাবাদ।

মাও সে তুং চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

সমস্ত জনগণ রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতিতে যোগ দিন।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

সোমপেটা এলাকা কমিটি এবং

সোমপেটা এলাকা রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি।

সোমপেটা ...৮ '৫৯

আমিও বিপ্লবী দলে যোগ দেব! কিছুদিন পরে বাড়ি ফেরার পর চেন্না রাওকে কথাটা বলেছিল কৃষ্ণাম্মা।

কৃষ্ণাম্মার কথাটা শুনে এক মুহূর্ত নীরব ছিল ও। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

এই প্রশ্নটার উত্তর কৃষ্ণাম্মার জানা থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারেনি। বলতে পারেনি কেন সে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে চায়।

চেন্না রাও যেন এক কঠিন হৃদয় পরীক্ষক। মৃদু হেসে বলেছিল, এসব চিন্তা মনে ঠাঁই না দেওয়াই ভাল। কারণ, পথটা তো সুখের নয়।

—কিন্তু সুখের আশায় তো বিপ্লব ?

—সেটা বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে নয়।

—নয় কেন ?

—নিজের জন্যে নয়, জনগণের জন্যে এ লড়াই। আমরা জনগণের জন্যে জীবনপণ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি। আত্মসুখের চিন্তাকে আমরা মনে ঠাঁই দিইনা।

—আমিও তো না দিতে পারি ?

—সেটা পরীক্ষান্তে বোঝা যাবে।

—কেমন সে পরীক্ষা ?

—কাজ করতে হবে।

—কি কাজ ?

—কাজের কি শেষ আছে। হেসেছিল ও। বলেছিল, ভাইবোনের সম্পর্ক হলেও কার্যক্ষেত্রে কোনরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের চলে না। কাজ করতে চাও করো। প্রথমে গ্রামে থেকেই কাজ করো।

—তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?

—নিয়ে যাব না একথা বলছি না। যদি প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। অবশ্য নিয়ে যাওয়ার আগে সেণ্টার-এর অনুমতি দরকার।

—সেণ্টার কে ?

—কমরেড সত্যনারায়ণ। আমাদের গপ্পা গুরু (বড় গুরু)।

—তাঁর অনুমতি প্রয়োজন ?

—নিশ্চয়ই। তোমায় কাজে যোগ্যতার প্রমাণও দিতে হবে বৈকি। শুধু ভিড় বাড়ালেই তো চলবে না।

সঙ্গে নিয়ে যায়নি চেন্না রাও। কাজ সুরু করেছিল কৃষ্ণাম্মা। প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। আর স্বপ্ন দেখেছে সেদিনটার, অন্যায় শোষণমুক্ত ভারতবর্ষের উজ্জ্বল রক্তাক্ত দিনটার।

তেলেঙ্গানা, নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম। একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ জাগবে। হাজার হাজার শ্রীকাকুলাম মাথা তুলবে প্রদেশে প্রদেশে। ছিঁড়ে ফেলবে বন্ধন আর অত্যাচারের নাগপাশ।

সেদিন আসছে! সেদিন আসবেই।

চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট কমরেড মাও সে তুঙ যে রিপোর্টটি পেশ করেন, তাতে "আমাদের স্বাধীন রাজত্বের জন্ম স্থান নির্ধারণের প্রশ্ন"-তে তিনি লেখেন :

উত্তর কেয়াং টং থেকে সুরু করে হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত বরাবর যে এলাকাটি দক্ষিণ হুপে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, সেটি পুরোপুরিভাবে লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। ওই পর্বতমালাটি আমরা ঘুরেছি। এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে, নিং কাংকে কেন্দ্র করে মধ্যবর্তী অংশটাই আমাদের সশস্ত্র স্বাধীন রাজত্বের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। উত্তরাংশের ভূ প্রকৃতি এমন যে সেটা, কি আক্রমণ, কি প্রতিরক্ষা কোন দিক থেকেই আমাদের পক্ষে উপযোগী নয়। তার উপর এই অংশটা শত্রুর বড় বড় রাজনৈতিক কেন্দ্রগুলির খুবই কাছে। তাছাড়া, দ্রুতগতিতে চ্যাংসা বা উহান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা না করলে লিউইয়াং, লিলিং পিংসিয়াং এবং টুংকুতে বড় কোন বাহিনী মোতায়েন করে রাখা

রীতিমত বিপজ্জনক। দক্ষিণ অংশের ভূ-প্রকৃতি উত্তরাংশের চেয়ে ভাল বটে কিন্তু সেখানে আমাদের গণভিত্তি মধ্যবর্তী অংশের মত অত ভাল নয়। তাছাড়া মধ্যবর্তী অংশ থেকে আমরা হুনান ও কিয়াংসির উপর যে বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারি, ওখান থেকে ততখানি পারবো না। মধ্যবর্তী অংশে আমরা যে কোন কাজই করি না কেন তার প্রভাব ওই দুই প্রদেশের নিম্নাংশের নদী উপত্যকাগুলির উপরে গিয়ে পড়তে পারে। মধ্যবর্তী অংশে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে। যথা:

(১) একটি গণভিত্তি, যেটা আমরা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তৈরি করেছি।

(২) পার্টি সংগঠনের উপযুক্ত বেশ ভাল একটি ভিত্তি

(৩) স্থানীয় সশস্ত্রবাহিনী, যেটা এক বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেটা সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভালরকম অভিজ্ঞ -এটি একটি দুর্লভ কৃতিত্ব। লালফৌজের চতুর্থ বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় এই বাহিনা একসঙ্গে হলে কোন শত্রুর সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করবে।

(৪) অতি চমৎকার সামরিক ঘাঁটিস্বরূপ চিংকাং পাহাড় এবং সমস্ত কাউন্টিতেই আমাদের স্থানীয় সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলি।

(৫) এই অংশ থেকে দুটি প্রদেশের উপর এবং তাদের নদীগুলি নিম্ননদী উপত্যকাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। এই প্রভাবের অনেকখানি রাজনৈতিক গুরুত্ব সমন্বিত, যা দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসির নেই। দক্ষিণ হুনান বা দক্ষিণ কিয়াংসি যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সেটা শুধু নিজ নিজ প্রদেশের মধ্যেই অথবা নিজ নিজ প্রদেশের পশ্চাৎভূমিতে এবং নদী-উপত্যকাগুলির উপরের দিকের অংশতেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। মধ্যবর্তী অংশের অসুবিধা হচ্ছে এই যে, এই অংশ দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন রাজত্বের অধীনে আছে এবং শত্রুর বিরাট আকারের "ঘেরাও ও দমনের"

সম্মুখীন হয়েছে। তার ফলে, এই অংশের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী, বিশেষভাবে নগদ টাকার অভাব, অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

কাজের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জুন ও জুলাই মাসের কয়েক সপ্তাহের ভিতর হুনান প্রাদেশিক কমিটি, তিনটি বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা বলেছেন। প্রথমে য়ুয়ান তে-শেঙ এলেন এবং লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা আমাদের ছিল, সেটিকে অনুমোদন করলেন। তারপর এলেন তু সিউ-চিং এবং ইয়াং কাই মিং। তাঁরা পীড়াপীড়ি করে বললেন, সীমান্ত অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য মাত্র দুইশত রাইফেল এবং লালরক্ষী বাহিনীকে রেখে দিয়ে লালফৌজের উচিত বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে দক্ষিণ হুনানের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাঁরা বললেন এটাই হচ্ছে, "একদম সঠিক" নীতি। তৃতীয়বার, প্রায় দশদিন পরে য়ুয়ান তে-শেঙ পুনরায় একটি চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিতে আমাদের প্রচুর তিরস্কার করা হল, সেই সঙ্গে পীড়াপীড়ি করে লেখা হল লাল ফৌজ যেন পূর্ব হুনানের দিকে রওনা হয়। এইটিকেও আবার সঠিক নীতি বলে বলা হল, জানানো হল "বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে" এই নীতিকে কার্যকরী করতে হবে।

এই সব অনমনীয় নির্দেশের ফলে আমরা মহা ফাঁপরে পড়লাম। নির্দেশ না মানার অর্থ অবাধ্যতা, অথচ নির্দেশ পালন করতে গেলে পরাজয় সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় বার্তাটি আসার পর সেনাবাহিনীর কমিটি, সীমান্ত অঞ্চলের বিশেষ কমিটি এবং য়ুংসীনে পার্টির কাউন্টি কমিটির একটি যুক্ত সভা হয়। সভায় তাঁরা প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশাবলী কার্যকরী না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—দক্ষিণ হুনানের দিকে রওয়া হওয়া বিপজ্জনক হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। কিন্তু তু সিউ চিং এবং ইয়াং কাই মিং প্রাদেশিক কমিটির পরিকল্পনাটিই আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন এবং ২৯নং রেজিমেন্টের বাড়ি ফিরে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে কয়েকদিন পর চেন-চৌ নামক

কাউন্টি শহরের উপর আক্রমণ চালাবার জন্য লালফৌজকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে যান। এই করে এঁরা সীমান্ত অঞ্চল ও লালফৌজ এই উভয়েরই পরাজয় ঘটান। লালফৌজকে প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য হারাতে হয় এবং সীমান্ত অঞ্চলে অসংখ্য বাড়ি ঘর পুড়ে যায় এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলে। কাউন্টির পর কাউন্টি শত্রুদের পুনর্দখল করা যায় নি। হুনান, হুপে ও কিয়াং সি প্রদেশের জমিদার শাসকদের মধ্যে ভাঙন না ধরতেই লালফৌজের প্রধান বাহিনীর পক্ষে পূর্ব হুনানে রওনা হয়ে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে উচিৎ হত না। জুলাই মাসে যদি আমরা দক্ষিণ হুনানের দিকে অগ্রসর না হতাম, তাহলে আমরা যে শুধুমাত্র সীমান্ত অঞ্চলে আগষ্ট মাসের পরাজয় এড়াতে পারতাম তাই নয়, আমরা কিয়াং সি প্রদেশে চ্যাংশুতে কুয়োমিণ্টাং-এর ষষ্ঠ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াং চুনের কুয়োমিণ্টাং বাহিনীর যে লড়াই বেধে গিয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে য়ুং সীনের শত্রু সৈন্যদের ধ্বংস করতে পারতাম, কিয়ান ও আনফু দখল করতে পারতাম। শুধু তাই নয়, ফলে আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর পক্ষে পিংসিয়াং পৌছান সম্ভব হত এবং লোসিয়াও পর্বতমালার উত্তরাংশে পঞ্চম লালফৌজ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাও সম্ভব হত, যা বলা হল সে সমস্তই যদি সত্যই ঘটতো, তাহলেও নিসকাংই হত আমাদের সদর দপ্তরের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা এবং শুধুমাত্র গেরিলা-বাহিনীগুলিকেই পূর্ব হুনানে পাঠানো উচিৎ হত। জমিদারদের পরস্পরের ভিতর লড়াই তখনও আরম্ভ হয়নি এবং দুর্দান্ত শত্রুবাহিনী তখনও হুনান সীমান্তে পিং সিয়াং, চালিং, য়ুসীয়েন-এ অবস্থান করছে; তখন যদি আমাদের প্রধান বাহিনীকে উত্তর দিকে সরিয়ে নিতাম তাহলে শত্রুকে আমরা সুযোগই করে দিতাম। কেন্দ্রীয় কমিটি দক্ষিণ বা পূর্ব হুনানের দিকে এগিয়ে যাবার প্রশ্নটিকে বিবেচনার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এই দুই পথই হত বিপজ্জনক।

পূর্ব হুনান অভিযানের প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি বটে, কিন্তু দক্ষিণ হুনান অভিযান ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সব সময় স্মরণযোগ্য।

যে সময় জমিদার শ্রেণীর শাসনে ভাঙন ধরে সেই সময় এখনও আসেনি, এবং সীমান্ত অঞ্চলের চারপাশে শত্রুর যে "দমনকারী" বাহিনীগুলিকে মোতায়েন রাখা হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশ রেজিমেণ্টেরও বেশি হবে। কিন্তু আমরা যদি নগদ টাকা সংগ্রহের পথ বার করে যেতে পারি (খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্যাটা এখন আর বড় সমস্যা নয়) তাহলে, সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে—যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, আমরা ঐ শত্রুবাহিনীগুলির সঙ্গে, এমন কি এদের চেয়েও বড় বাহিনীর সঙ্গে এঁটে উঠতে সক্ষম হব। সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে এই বলা যায় যে, লালফৌজ সরে অন্য কোথাও চলে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন হয়েছিল আগষ্ট মাসে।

আমাদের সব লালরক্ষী বাহিনীই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ঠিকই, তবে পার্টি এবং আমাদের গণভিত্তির উপর এমন আঘাত আসবে যে, তা পঙ্গু হয়ে পড়বে। তাছাড়া, পাহাড়গুলিতে আমাদের পা রাখবার মত জায়গা যদিও আছে কিন্তু সমতলভূমিতে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মত আমাদের সবাইকেই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। আর লাল ফৌজ যদি সরে অন্যত্র চলে না যায় তবে যে ভিত্তি আমাদের আছে তার উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে আমরা আশপাশের এলাকাগুলিতে বিস্তার লাভ করতে পারবো এবং আমাদের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদি আমরা লাল ফৌজকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই তবে তার একমাত্র পথ হচ্ছে চিং কাং পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গা, যেখানে আমাদের ভাল গণভিত্তি আছে, যথা নিং কাং, য়ুং সীন, লিং সীয়েন এবং সুইচুয়ান কাউন্টিতে শত্রুকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত করা এবং হুনান ও কিয়াং সি প্রদেশের শত্রু

সৈন্যদের ভিতরকার স্বার্থ বৈষম্য, এবং সব দিকেই তাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার প্রয়োজনবোধ করায় তারা যে নিজেদের বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম হয়ে পড়বে এগুলিকে কাজে লাগানো। সঠিক কৌশল গ্রহণ করা, যে যুদ্ধে জিততে পারবো না সে যুদ্ধে না নামা এবং অস্ত্রশস্ত্র দখল করা ও শত্রুসৈন্য বন্দী করা – এইগুলির দ্বারা লাল ফৌজকে আমরা সম্প্রসারিত করতে পারি। লাল ফৌজের মূল অংশটি যদি দক্ষিণ হুনানে অভিযোগ না যেত তাহলে এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে প্রস্তুতি মূলক কাজ করা হয়েছিল তাতে করে আগষ্ট মাসে লাল ফৌজকে নিঃসন্দেহে আরও সম্প্রসারিত করা যেত। এই ভুল সত্বেও, লাল ফৌজ সীমান্ত অঞ্চলে ফিরে এসেছে। এখানকার ভূ-প্রকৃতি অনুকূল, জনগণও এখানে বন্ধুভাবাপন্ন। সম্ভাবনা এখনও খারাপ নয়। লড়াই চালাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও সীমান্ত অঞ্চলের মত বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করার পরিশ্রম সহ্য করার ক্ষমতা থাকলে তবেই লাল ফৌজ নিজের অস্ত্রশস্ত্র বাড়াতে পারে, শিক্ষা দিয়ে ভালো ভালো সৈন্য তৈরি করতে পারবে। পুরো একবছর ধরে সীমান্ত অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। হুনান, হুপে, কিয়াং সি এবং সত্য বলতে কি, গোটা দেশেরই জমিদার শ্রেণীর মধ্যে এই ঘটনা ঘৃণার উদ্রেক ঘটিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে চারপাশের প্রদেশগুলির শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের মনে আশা ভরসাও জাগিয়ে তুলেছে। সৈনিকদের কথা বিবেচনা করুন। সামান্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে "ডাকাত-দমন" সংগ্রামকে যুদ্ধবাজ সামন্ত প্রভুরা প্রধান কাজ করে তুলেছে, তারা বলছে যে, "একটা বছরে চলে গেল, দশ লক্ষ ডলার খরচ হয়ে গেল ডাকাত দমনের প্রচেষ্টায়" (লু তি-পিং), অথবা "লাল ফৌজে কুড়ি হাজার সৈন্য ও পাঁচ হাজার রাইফেল আছে" (ওয়াং চুন)। এইসব কারণে ওদের সৈন্য ও ভগ্নোৎসাহ ছোট অফিসারদের মনোযোগ আমাদের দিকে ঘুরেছে। শত্রুপক্ষ থেকে আরও বেশি

বেশি সৈন্য দল ছেড়ে দিয়ে আমাদের বাহিনীতে যোগদান করবে।

এইভাবে লাল ফৌজে সৈন্য ভর্তির আর একটা উৎস পাওয়া যাবে। তাছাড়া সীমান্ত অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডা যে কখনও নত হয়নি, এই ঘটনাই দেখিয়ে দিচ্ছে শাসকশ্রেণীগুলি কত দেউলিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি কতখানি।

সুতরাং আমরা মনে করি—এবং এ কথা আমরা সব সময়েই মনে করছি যে, লোসিয়াও পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশে লাল রাজনৈতিত ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং তার সম্প্রসারণ ঘটানো একান্তভাবেই প্রয়োজনীয় এবং সঠিক কাজ।

কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর চিং কাং পাহাড়ে সংগ্রামের মতই আজ অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামের সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে লক্ষ্যপথে। শ্রীকাকুলামের তিনশত গ্রাম আজ মুক্ত এলাকা। লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে। উড়ছে লাল ঝাণ্ডা।

অদূর ভবিষ্যতে একদিন শ্রীকাকুলামের পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসবে মুক্তি-সেনার দল। ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। অত্যাচারী শাসকশ্রেণীর অন্যায় পাপের শাস্তি দেবে তারা।

দেরী নেই, সেদিন নিকটেই!

মুক্তির পদধ্বনি আজ দিকে দিকে। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে।

সেদিন আসছে—কড়া নাড়ছে। আসছে। আসবেই।

দিনের আলো ম্লান হচ্ছে। সন্ধ্যা। পাখিদের কাকলিধ্বনি স্তিমিত। যে যার আপন নীড়ে ফিরে গেছে।

বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিমাভাটুকু মুছে যাচ্ছে। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে নামছে রাত্রির অন্ধকার। আকাশের বুকে একটি দুটি করে ফুটে উঠছে সন্ধ্যাতারা। জোনাকীর জ্বলা নেভা সুরু হয়েছে ঝোপে-ঝাড়ে।

কৃষ্ণাম্মা তখনও তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে আছে দূরের দিকে।

আজ সারাদিন অভুক্ত ও। চেন্না রাওয়ের দিয়ে যাওয়া খাবার একেপাশে পড়ে। শংকর ওকে অনুরোধ করতে পারেনি।

চিন্তিত শংকর এখন ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, কমরেড!

শংকরের সে আহ্বান কৃষ্ণাম্মার কানে পৌঁছাল না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

এবার ওর গায়ে হাত দিল শংকর ডাকল, কমরেড!

চমকে ফিরে চাইলো কৃষ্ণাম্মা। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। যেন সে আর সহজ, স্বাভাবিক নয়।

কৃষ্ণাম্মার সেই অপ্রকৃতিস্থতা দেখে ভয় পেলনা শংকর। বিমূঢ় ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে ওর হাত দু'টা চেপে ধরলো। বলল, কি হয়েছে কমরেড?

অনেকক্ষণ শংকরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো কৃষ্ণাম্মা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। মৃদুকণ্ঠে যেন কত ভয়ে ভয়ে বলল, কি জানি।

কৃষ্ণাম্মা জানেনা কি হয়েছে তার। শংকর ওকে ধরে বসিয়ে দিল। বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন কমরেড।

—যদি ওরা আসে?

—আমি আপনার ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলবো।

—আচ্ছা। বলে, সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লো কৃষ্ণাম্মা। একটু পরে ওর দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে শংকর দেখতে পেল ও ঘুমিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। নিদ্রার কোলে নিশ্চিন্তে ও সমর্পণ করেছে নিজেকে।

ওর ঘুমন্ত মুখখানির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো শংকর। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বড় সুন্দর আর পবিত্র বলে মনে হল ঘুমন্ত মুখখানিকে। মনের গহনে স্বপ্ন-কামনা বোধটুকু মুহূর্তে শিহরে ওঠে। নিজেকে সংযত করে সে। ছিঃ ছিঃ, একি ভাবছে সে। এ দুর্বলতাটুকু বিপ্লবীর শোভা পায়না বিপ্লবীর স্বপ্ন তো প্রেম নয়, মুক্তি। সে মুক্তি পথের পথিক। বন্ধনের মায়ায় ভুললে তো তার চলবে না।

কিন্তু...

না না, কোন কিন্তু নয়। নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিল সে। দূরে সরে গেল। শ্রীকাকুলামের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তাকাল সীমাহীন আকাশের দিকে।

কদিনের কথা একে একে মনে পড়ল তার। মনে পড়ল গত রাত্রিটাকে। একখানি সুন্দর মুখের ছবি ভেসে উঠল তার মানস পটে। দুটি আশ্চর্য সুন্দর আঁখি। সে আঁখির ভাষা তার অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছেছিল। সাড়া দিতে পারেনি সে।

কেন?

ভাবল শংকর। তার মন ছিল মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। শয়তানদের পৈশাচিকতা তার মনটাকে ক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। সেইজন্যেই......

চমকে উঠল শংকর। গত রাত্রির ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। পাহাড়ী পথে একটি আলোকশিখা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। কাছে— আরো কাছে।

কে আসছে? কারা আসছে?

চঞ্চল হয়ে উঠল শংকর। তার মনে হল চেন্নারাওরা ফিরে আসছে।

এগিয়ে গেল শংকর। ছুটে গেল।

না, চেন্না রাওরা নয়। আলো হাতে এসে দাঁড়িয়েছে এক বৃদ্ধ। অপরিচিত।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো নির্নিমেষ। একসময় বৃদ্ধের ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কমরেড শংকর?

মাথা নাড়ল শংকর। জানালো সেই বটে।

একটু ইতস্ততঃ করলো বৃদ্ধ। আবার সেই ভাঙা ভাঙা কণ্ঠ শোনা গেল, একটা দুঃসংবাদ আছে কমরেড।

শংকরের মাথাটা ঘুরে উঠল। মনে হল, পাহাড়টা দুলছে। পায়ের নীচের পাহাড়ী পথের পাথরগুলো সরে যাচ্ছে। বৃদ্ধ তার হাতটা ধরে ফেললো।

শংকর বিকৃতকণ্ঠে বলল, আমি শুনতে চাই না।

বৃদ্ধ একমুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তারপর অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠে বলল, ভেঙে পড়লে চলবে না কমরেড। আমাদের দশজন কমরেড বীরের মত যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু ওদের অন্ততঃ বিশ পঁচিশ জনকে খতম করেছেন। আর যুদ্ধের সময় নয়, পুলিশগুলোকে শেষ করে ওঁরা যখন বিশ্রাম করছিলেন ছোট্ট বনটার ধারে বসে, সেই সময় আমাদেরই এক বিশ্বাসঘাতক অন্য একটা দলকে নিয়ে এসে ওদের দেখিয়ে দেয়। ওঁরা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছেন। মৃত্যুর পরেও ওঁদের হাতে ধরাছিল রাইফেল।

—এখন ……

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। বাধা দিয়ে বলল, ওদের দেহগুলি শয়তানরা নিয়ে গেছে। আমরা বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনারা

আমাদের গ্রামে চলুন? আমি নিতে এসেছি আপনাদের দুজনকে।

—না। কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ।

বজ্রাঘাত হলেও এত চমকাত না শংকর। ফিরে দেখল ঘুম ভেঙে কৃষ্ণাম্মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের পিছনে, কেউ লক্ষ্য করেনি।

—কিন্তু……। কি যেন বলতে চাইল বৃদ্ধ।

—আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলল কৃষ্ণাম্মা।

বিদায় নিয়ে বৃদ্ধ ফিরে যাচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে। বৃদ্ধের হাতের আলোটুকু একসময় মিলিয়ে গেল পাহাড়ী পথের বাঁকে।

কৃষ্ণাম্মার মুখের দিকে চাইল শংকর। ওকে দেখল। ডাকল, কমরেড!

কৃষ্ণাম্মার কণ্ঠ ম্লান। মৃদুকণ্ঠে বলল, ওঁদের মৃত্যুতে দুঃখ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু এই দুঃখটুকু সহ্য করতেই হবে।

শংকর কি ভুল শুনছে, না, যা শুনছে তা সত্যি নয়? কৃষ্ণাম্মা কি পাগল হয়ে গেল? সন্দেহ হল তার। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কৃষ্ণাম্মা।

—এই সত্যি। অবরুদ্ধ কণ্ঠ তার। বলল, চল।

—কোথায়?

—সেণ্টারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তো?

—এই রাত্রে?

—রাত্রি একসময় প্রভাত হবেই।

—কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনবে কেমন করে?

অন্ধকারে কৃষ্ণাম্মার গলায় হাসি শোনা গেল। শংকর শুনলো হাসি নয়, কান্না। কৃষ্ণাম্মা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, পথ

ঠিক চিনে নেব। অন্ধকারে চলার গতি কেউ রুদ্ধ করতে পারেনা আমাদের।

—কমরেড!

কৃষ্ণাম্মা অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে একখানা হাত ধরলো ওর।

শংকর বলল, চল।

জতুগৃহের জ্বালা

ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কয়েক টুকরো আগুনের শিখা। চিতায় শোয়ানো মৃতদেহটাকে ঘিরে শ্মশানভূমির আলো আঁধারে কটা স্থির নিস্পন্দ পাষাণ মূর্তি। মৃতের আত্মীয়, পরিচিতজন।

মধ্য রাত্রি। শেষ আষাঢ়ের ঘোলাটে আকাশ। অদূরে গঙ্গা, কুলু-কুলু স্রোতের শব্দ। অশথ বটের ডালে ডালে মৃদু হাওয়ার কাঁপন। শকুন-শিশুর কান্না। শৃগালের আর্ত হাহাকার। শ্মশানভূমির একপ্রান্তে মৃত শিশুর দেহ নিয়ে সারমেয় কূলে দ্বন্দ্ব। কাঁদছে কিশোর ছেলেটা। গুমরে কেঁদে উঠছে বার বার।

আজকের রাত্রি! গত দিনের সন্ধ্যা…

একটা দিন। আলো ঝলমলে, রৌদ্রদগ্ধ, উজ্জ্বল—পবিত্র…না, শুধু একটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা। কালসন্ধ্যা। একটা পরিবারের জীবনে। কটা মানুষের সংসারে। বুক ফাটা আর্ত হাহাকারে কেঁপে উঠেছিল পুরাতন বাড়িটার ভিত। ছুটে এসেছিল মা। না, সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেনি শেষ বারের মত। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল পথে।

হঠাৎ চাঞ্চল্য। ব্যস্ততা। ছোটাছুটি। ভয় পাওয়া ছেলেটা ছুটছে। ছুটছে-ছুটছে! নিরাপদ আশ্রয়। বাড়ির দরজা মাত্র আর কয়েক গজ। গুলির আওয়াজ। অব্যর্থ লক্ষ্য। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ছেলেটা। কয়েক মুহূর্ত ছট্‌ফট্ করলো। রক্তে ভিজিয়ে দিল খানিকটা মাটি। সে মাটিতে আজও দাগ আছে। লাল রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। মুছে যাবে আগামী কাল!

ভিজে কাঠ ধরছে। অল্প ধোঁয়া। আগুন জ্বলছে। একটু পরে ও-ধোঁয়াটুকু আগুনের সঙ্গে মিশে যাবে। পোড়া মাংসের গন্ধে

বাতাসটা ভারী হবে। চব্বিশ বছরের যৌবনটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এক সময়। এখনও রয়েছে, যৌবনের আধার ওর দেহটা। থাকবে না।

কি যেন নাম ছেলেটার? হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্বাধীন, স্বাধীন চৌধুরী। চব্বিশের যৌবনে চলে গেল, মুক্ত হল! হারিয়ে গেল। মুছে যেতে বাধ্য হল সমাজ সংসার থেকে।

কেন?

দুর্ঘটনা!

ভুল। শুধু মাত্র ভুলের জন্যে। ওর নিজের অথবা তার, যে ওকে মেরেছে; ওকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। ও ছুটেছিল, ও ছুটেছিল বলেই গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল সে। ও যদি ভুল করে না ছুটতো, তাহলে সে নিশ্চই ভুল করে গুলি চালাতো না। কারণ, ওকে তো সে মারতে চায়নি। কেন মারবে? একটা যৌবনের মূল্য কি কম?

যৌবনের অপচয় সমাজ এবং রাষ্ট্রের যে কত বড় ক্ষতি, কে তা না জানে! যৌবনই তো জাতির মেরুদণ্ড। আগামী দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনাময় দীপ্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে প্রয়োজন তো বলিষ্ঠ যৌবনের। দেশকে, জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশের যুব সমাজ। যৌবনকে নষ্ট করা, ক্ষয় হতে দেওয়া চলবে না। যুব সমাজ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, কি রইলো তাহলে দেশ এবং জাতির?

তাহলে স্বাধীনকে মারা হল কেন? কেন তাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হল?

হত্যা? না-না, হত্যা নয়। ভুল। স্বাধীনের নিয়তি। নিয়তি স্বাধীনকে টেনে নিয়েছে। স্বাধীন মরতোই। নিজের ভুলে সে ওভাবে মারা গেল। মুহূর্তের ভুল। মনকে সান্ত্বনা দিতে হলে বলতে হয়, উভয় পক্ষেরই, কিন্তু ভুলটা তারই। শুধু ভুল নয়, সে অপরাধই করেছিল। ছুটে পালানোর চেষ্টাটা তার অপরাধ বৈকি!

সে যদি দাঁড়িয়ে থাকতো, দাঁড়িয়ে থেকে যদি গুলি খেয়ে মরতো, তাহলে তার অপরাধ থাকতো না। তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা চলতো, যে তাকে মেরেছে তাকে। কিন্তু তা সে করেনি। পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে। বাঁচতে কি পারলো? পারলো না। ছুটে পালানোর অপরাধের শাস্তি তাকে নিতেই হল।

আর সে দাঁড়িয়ে থেকেও যদি মরতো, তাহলেও অপরাধী হোত সে। কেন সে পালায় নি? বীরত্ব দেখাচ্ছিল?

স্বাধীনকে মরতেই হত!

পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছিল তার। বাঁচার অধিকার হারিয়ে ছিল সে।

কারণ,স্বাধীন যে বাঁচতে চেয়েছিল।

বেঁচে থাকতে চাওয়াটাই তার অপরাধ!

স্বাধীনের বাবা শূন্য দৃষ্টিতে বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি যেন কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না, বুঝতে পারছিলেন না। শুধু দেখছিলেন। বড়বাবুর ছল-ছল দুই চোখে। তাঁর কাতর মুখখানা। কত দুঃখী তিনি। বেদনাদায়ক ঘটনাটার জন্যে কতখানি মর্মাহত!

বড়বাবু বলেছিলেন, নির্মলেন্দুবাবু, আপনার ছেলের মৃত্যুটা যদিও একটা এ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছু নয়, তবু এর জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত জানবেন। আপনাকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই। ডেড-বডি যাতে তাড়াতাড়ি পান তার ব্যবস্থা আমি করছি।

ব্যাস, আর কিছু নয়। আর কিছু আশা করাও অন্যায়। অন্যায়কারীদের দমন করতে গিয়েই তো দুর্ঘটনা! বড়বাবুর দুঃখ প্রকাশটা ফালতু লাভ বৈকি!

স্বাধীনের বাবার ত্থ' চোখে একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। কি যেন বলতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু পারেন নি।

বড়বাবু বুঝেছিলেন তাঁর নীরব চোখের ভাষা। স্নিগ্ধকণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন, কিছু বলবেন?

ঘাড় নেড়েছিলেন স্বাধীনের বাবা। কিছু বলতে চান তিনি।

—বলুন? বলেছিলেন বড়বাবু।

স্বাধীনের বাবার গলাটা কেঁপেছিল। ত্থ' চোখে বেদনার ছায়া। অস্পষ্টকণ্ঠে বলেছিলেন, একটা অনুরোধ।

—নিশ্চই-নিশ্চই! ব্যস্ত হয়েছিলেন বড়বাবু। কি বলতে চান বলুন?

ওকে কি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না?

প্রথমে বুঝতে পারেননি বড়বাবু। পরে গম্ভীর হয়েছিলেন। মৃত্থকণ্ঠে বলেছিলেন, আজ্ঞে না।

—কিন্তু···। শেষ চেষ্টা করেছিলেন স্বাধীনের বাবা।

– অ্যাম সরি মিঃ চৌধুরী। মাথাটা কবার নেড়েছিলেন বড়বাবু। বলেছিলেন, সত্যিই আমি ত্থঃখিত। আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থাটা। কিন্তু আমি নিরুপায়। পোস্টমর্টম ছাড়া লাশ ছাড়বে না। মাথা ফাটিয়ে, বুকটা চিরে ডাক্তাররা কি যে দেখেন তাঁরাই জানেন। ডোমেরা সেলাইটা পর্যন্ত ভাল করে করে দেয়না। তবে আপনার ছেলের সেলাই-টেলাইগুলো যাতে ভাল করে করে দেয় সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

স্বাধীনের বাবা বড়বাবুর কথাগুলো শুনছিলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন।

একধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যব্রত। বড়বাবুকে দেখছিলেন তিনি। তাঁর কথা শুনছিলেন। কিছু ভেবেছিলেন কি? না, তিনিও কিছু ভাবেন নি। শুধু তাঁর একটা কথাই বারবার মনে হয়েছিল সে সময়, বড়বাবু পাকা অভিনেতা, নিখুঁত তাঁর অভিনয়।

শুধু জ্বালা ধরেছিল বুকের গভীরে, অসহ্য দাহ। মনে পড়েছিল ক'মাস আগের একটা দিনকে।

সেদিন বড়বাবুর দরবারে হাজির হয়েছিলেন নিতান্ত বাধ্য হয়েই। হাজির হতে বাধ্য হয়েছিলেন আরো অনেকেই। তাঁদের কারো ছেলে, ভাই-ভাইপো অথবা আত্মীয়। তিনি গিয়েছিলেন অনাত্মীয় একটি ছেলের জন্যে।

সকাল থেকে বিকাল। দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বড়বাবু দরবারে এলেন সন্ধ্যা হয় হয়। হৈ-হৈ চিৎকার। বড়বাবুর হুমকি, 'যারা চিৎকার করছে সকলকে লকআপে ভরে দাও।' কিন্তু যাদের ভরা হয়েছে তারা সকলে দাঁড়িয়ে আছে গাদাগাদি করে। একটু যে বসবে সে জায়গা সেখানে নেই।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

বড়বাবুর তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, কে আপনি ?

নিজের নাম বলেছিলেন তিনি।

—আপনি এখানে এলেন কেন ? যেন গর্জে উঠেছিলেন তিনি। কার হুকুমে এখানে এসেছেন ? যান, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

অপমানটা বুকে বিঁধেছিল। দীর্ঘদিনে ওভাবে অপমানিত তিনি কারো কাছে হননি। এখানকার আবাল-বৃদ্ধ সকলের পরিচিত, শ্রদ্ধা ভালবাসার পাত্র তিনি। থানাতে পরিচিতের সংখ্যাও তাঁর কম নয়। বড়বাবু তাঁকে চেনেন না। নতুন এসেছেন তিনি। এসেছেন অশান্ত জায়গাটাকে শান্ত করতে। অন্যায়কারীদের শাস্তি দিতে।

বড়বাবুর অপমানটা তাঁর বুকে যতই বিঁধুক, উত্তেজিত তিনি হননি। অদ্ভুত শান্ত এবং সংযত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, অপেক্ষা তো সেই সকাল থেকেই করছি। সমস্ত রাত্রি কি অপেক্ষা করতে হবে ?

বিষ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন বড়বাবু। গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, আমার কাজ আছে।

—একাজটাও আপনার কাজ।

—তার মানে? ফুঁসে উঠেছিলেন তিনি, কি বলতে চান আপনি?

বড়বাবুর রাগ দেখে হাসি পেয়েছিল তাঁর। কিন্তু গম্ভীর হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আপনার লোকেরা আজ সকালে কটি ভাল ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে।

—ভাল ছেলেকে? বিদ্রূপ করে উঠেছিল বড়বাবুর কণ্ঠ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেগুলি সত্যিই ভাল।

—কি করে জানলেন?

—আমি সকলকেই চিনি।

—কিন্তু আপনার চেনা বা জানাটাই তো সব নয়। হাসি ফুটেছিল বড়বাবুর মুখে। বলেছিলেন, আপনাদের চেনা-জানার বাইরেও কিছু থাকে। আপনারা গার্জেনের দলতো তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন না?

—কিন্তু ছেলেগুলি ভাল।

—সিনেমা দেখেনা?

—তা দেখে।

—বিড়ি সিগারেট খায় না?

—তা হয়তো খায়।

—হয়তো নয়, খায়। আপনাদের দেখিয়ে খায়না, তাইতো?

—হবে।

— তাহলে তারা যে আরো কিছু করে না তা আপনারা জানলেন কি করে?

—কিন্তু···

আবার সেই হাসি। বলেছিলেন, আপনারা যা জানেন না

আমরা তা জানি। সব জানার পর তবেই ধরা হয়েছে। গোপন প্রেমের মত, গোপন ব্যাধিও সকলের চোখে ধরা পড়েনা। কিন্তু দুটোই সমান অনিষ্টকর। তাই···,আবার মুচকি হেসেছিলেন তিনি।

তিনি চুপ করে বসে শুনেছিলেন বড়বাবুর কথাগুলো, অদ্ভুত যুক্তি!

বড়বাবু চুপ করে থাকেন নি। বলেছিলেন, ভুল নামের কাউকে আমরা ধরে আনিনি।

— ওদের কি ধরেই রাখবেন? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তো বটেই।

—কিন্তু যাদের ধরে আনা উচিত তাদের কিন্তু ধরেন নি।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কেন যে তাদের ধরা হয়নি তা আমরাও যেমন জানি, তেমনি আপনারও জানেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বড়বাবু। জ্বলন্ত চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কি বলতে চান আপনি?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বুঝতে পারেন নি?

—বেরিয়ে যান। গেট আউট, আই সে গেট আউট। অসহ্য রাগে থর থর করে কেঁপেছিলেন তিনি।

আবার হেসেছিলেন সত্যব্রত। রাগ করেন নি। বলেছিলেন, তাড়াতে হবেনা, আমি নিজেই যাচ্ছি। যে ছেলেগুলিকে ধরে এনেছেন ওগুলো সত্যিই ভাল ছেলে। ওদের যাতে ধরে না রাখতে পারেন তার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর সিনেমা দেখা বা লুকিয়ে সিগারেট খাওয়াটা বয়েসের ধর্ম। একদিন আপনি আমিও ও ধর্মটা পালন করেছি।

ফিরে আসছিলেন তিনি। বড়বাবু ডেকেছিলেন, শুনুন।

দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

বড়বাবু বলেছিলেন, একটা কথা শুনে যান, ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আপনাকে আমি অ্যারেষ্ট করতে পারি।

গম্ভীর হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কথাটা আমার জানা রইলো।

আর দাঁড়ান নি। চলে এসেছিলেন। অনেক ধরাধরি করে ছাড়িয়ে এনেছিলেন ছেলেগুলোকে।

স্বাধীনের বাবার সঙ্গে আজ আবার তিনি গিয়েছিলেন থানায়। কেউ ডাকেনি তাঁকে। গিয়েছিলেন কর্তব্যবোধে। শুনেছিলেন বড়বাবুর কথাগুলো। ভুল! এ্যাক্সিডেন্ট! দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্বাধীন চৌধুরীর।

তাই কি? না। তিনি দেখেছেন। দেখেছে আরো অনেকেই। চব্বিশ বছরের ছেলেটার মৃত্যু যারা দেখেছে, কেউ বলবে না, ওটা ছিল দুর্ঘটনা। ছেলেটাকে না মারলেও চলতো। মারা হয়েছিল।

কিন্তু কেন মারা হল ওকে? ওর অপরাধ কি?

ভয় পেয়ে ছুটেছিল বলেই মারতে হবে? মেরে শান্তি রক্ষা করতে হবে?

তাহলে যে সব সমাজ বিরোধীর দল প্রকাশ্যে দিনের আলোয় শান্তি রক্ষকদের চোখের সামনে কোমরে পিস্তল গুঁজে লুটপাট করছে, তাদের মারা হচ্ছে না কেন? কোন স্বার্থে তারা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তারা কি শান্তি ভঙ্গ করছে না? জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার মূলে কি তারা নয়?

ছাপান্ন বছরের জীবনটাতে কিছু কম দেখেন নি সত্যব্রত। অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যৌবনে দেশের নামে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অত্যাচার কিছু কম সহ্য করেন নি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী হয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে। একদিন মুক্ত হয়েছে দেশ। মুক্তি লাভ করেছেন।

তারপর?

কর্মী সত্যব্রত নেতা হতে চাননি। নেতা সাজার অভিলাষ তাঁর মনে জাগেনি। ভাঙা শরীরের জন্যে কর্মী হওয়ার সাধ

জাগেনি আর। দেশ তো মুক্ত হয়েছে, আর কেন? কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন নিজের ইচ্ছা মত। ফিরে এসেছেন একদিন।

তাঁকে ফিরে পেতে চেয়েছেন অনেকেই। বলেছেন, আপনি আমাদের মধ্যে আসুন।

হেসেছেন তিনি। রহস্য করে বলেছেন, কে বললে আমি আপনাদের মধ্যে নেই?

তাঁরা বলেছেন, আমরা সে কথা বলছি না।

—নতুন কিছু বলতে চান? জানতে চেয়েছেন তিনি।

—আমরা নিজেদের মধ্যে পেতে চাই আপনাকে। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তার মানে আপনাদের মত থাকতে হবে আমাকে?

বিব্রত বোধ করেছিলেন তাঁরা। বলেছিলেন, না-না তা নয়…

—আমি নিজের মতই থাকতে চাই। বলেছিলেন তিনি। পাশ কাটিয়েছিলেন। পাশ না কাটিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। কারণ…

না, তিনি ভাবতে পারেন নি। আশা ভঙ্গের বেদনায় তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। দিনের পর দিন তিনি চিন্তা করেছেন। ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছেন। কি চেয়েছিলেন? কেন উৎসর্গ করেছিলেন জীবন? কিসের জন্যে?

স্বাধীনতা। মুক্তি। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন দেশকে-জাতিকে। কিন্তু এই কি সেই মুক্তি? কোথায় মুক্তির আদন্দ? এত বেদনা কেন? কেন আর্ত হাহাকার?

সাতষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, কেমন আছো সত্য?

বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সত্যব্রত। কোন উত্তব দিতে পারেননি। নীরবে চুপচাপ বসেছিলেন।

—তুমি বড় রোগা হয়ে গেছো! বাবা বলেছিলেন তাঁকে।

চকিতে একবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই মাথাটা নীচু করে নিয়েছিলেন। মনে পড়েছিল বাইশ বছর আগের একটি রাত্রি।

সেইমাত্র বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। বাবা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁকে দেখেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কলেজ থেকে এই ফিরলে ?

উত্তর দিতে পারেননি সত্যব্রত। চকিতে একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মাথা নীচু করে নিয়েছিলেন।

বাবা বলেছিলেন, তুমি মুখ হাত ধুয়ে, খেয়ে আমার কাছে একবার এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

তিনি নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন সত্যব্রত।

—বসো। তাঁকে দেখে বলেছিলেন বাবা।

সত্যব্রত বসেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, তোমাকে কেন ডেকেছি তুমি বলতে পারো ?

—আজ্ঞে না। উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

—তুমি কিছু ভেবেছো ?

বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সত্যব্রত। বুঝতে পারেননি বাবা কি বলতে চান।

একটু নীরব ছিলেন বাবা। গড়গড়ায় কটা টান দিয়েছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, দেখ সত্য, তুমি আমার প্রথম সন্তান। তোমার দুটি বোন আর একটা ভাই আছে। তোমাদের সকলের দায়িত্বভার আমার ওপর। তোমার বোনেদের বিয়ের চিন্তাও আমাকেই করতে হচ্ছে। তোমাদের মা থাকলে তিনি হয়তো এ চিন্তাটা করতেন।

—আমাকে কি করতে বলেন আপনি ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—আমি সেটা তোমার কাছ থেকেই জানতে চাইছি।

একটু নীরব ছিলেন তিনি। একটু চিন্তা করেছিলেন। বলেছিলেন, আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

বাবার মুখে মৃদু হাসির ক্ষীণ একটু রেখা ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, সব ছাড়তে পারবে ?

বাবার হাসি, তাঁর প্রশ্নটা ইঙ্গিতপূর্ণ। চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি। বুঝতে পারেননি বাবা কি বলতে চান। তবু তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি আমাকে কলেজ ছেড়ে দিতে বলছেন ?

—তোমার কি মনে হয় ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

সত্যব্রত নীরব। বুঝতে পেরেছিলেন, যা তিনি গোপন রাখতে চেয়েছেন তা গোপন রাখতে পারেননি। বাবার পরের কথাটায় চমকে উঠেছিলেন ভীষণ ভাবে।

বাবা সহজ ভাবে বলেছিলেন, পুলিশের খাতায় তোমার নাম উঠেছে সত্য।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সত্যব্রত।

বাবা বলেছিলেন, তোমার কোন কিছুই আর গোপন নেই। দিন কয়েক আগে আমি জেনেছি। সরকারী কর্মচারীর ছেলে বলেই এখনও তোমাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আমাকে ডেকে জানতে চাওয়া হয়েছে, আমি আমার ছেলেকে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবো কি না।

—আপনি কি বলেছেন ? মৃদুকণ্ঠে জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—সত্যমিথ্যা না জেনে কোন কথা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

—ওঃ, বলে কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন সত্যব্রত। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?

—তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি সত্য ?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়েছিলেন তিনি।

—এখন তাহলে তুমিই বল, তুমি কি করবে ?

—আমি বলবো ?

—হ্যাঁ সত্য, তুমি বলবে। তোমার ব্যক্তিসত্বাকে আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী চালাবো না।

—আমি যদি বলি…। চুপ করেছিলেন তিনি।

—নির্ভয়ে তুমি তোমার কথা বল। আমার পক্ষে বেদনাদায়ক হলেও সহ্য করার মত মনোবলের অভাব আমার হবে না।

সত্যব্রত বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

বাড়ি ছেড়েছেন সত্যব্রত। একদিন দেশের কাজে জেলে গেছেন। বাবা যতদিন চাকরী করেছেন ততদিন কোন সংবাদ নেননি তাঁর। পরে একদিন সংবাদ পেয়েছেন। ছোট ভাই প্রিয়ব্রতর চিঠি গেছে তাঁর নামে। তারপর দেশ স্বাধীন হতে মুক্ত সত্যব্রত একদিন ফিরে এসেছেন বাড়ি।

সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ এক সময় প্রশ্ন করেছিলেন, এ তোমরা কি করলে সত্য ?

কি করলে, সত্যব্রত কি করলে তোমরা ?

এ তোমরা কি করলে ?

চিন্তা করেছেন তিনি। দিনের পর দিন। এ কি তাঁরা করেছেন ? কেন করেছেন ? কেন অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছেন ? কিসের জন্যে করেছেন ?

স্বাধীনতা। শুধুমাত্র স্বাধীনতার জন্যে খণ্ডিত হয়েছে ভারতবর্ষ। হিন্দুস্থান-পাকিস্থান। ছিন্ন ভিন্ন দুটি অংশ। কোন প্রয়োজন ছিল কি ?

ছিল। ভারতবর্ষ খণ্ডিত না হলে স্বাধীনতা পাওয়া যেত না।

অথচ বড় প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতার। মুক্তি দুয়ারে এসে ফিরে যাবে, তাতো হতে পারে না। মুক্তি চাই। যে কোন মূল্যে। রক্ত অশ্রু হাহাকার এনেছে মুক্তি। এনেছে অভিশাপ। স্বার্থ আর লালসা হয়েছে জয়ী। জীবনের জয়গাথা ধ্বনিত হয়নি। আর্ত হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আকাশ, বাতাস। ভারতের জাতীয় নেতাদের মুনাফার থলি পূর্ণ করে তুলতে আত্মত্যাগ করেছে মুক্তিকামী হতভাগ্য মানুষের দল।

সুরু হয়েছে ফাটকা বাজি। একদিকে পাঞ্জাব— অন্যদিকে বাংলা। রাজধানী দিল্লী। বাস্তুহারার দল স্বাধীনতার মূল্য দিতে পথে নেমেছে। কিছু মূল্য পেয়েছ পাঞ্জাব। কারণ, দিল্লী দূর অস্ত নয়। মানুষের মিছিলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে দিল্লী। সুখের রাজ্যপাটে ঘনিয়েছে কালো ছায়া। পাঞ্জাবী নেতার দল 'মারকে লেঙ্গে' নীতি গ্রহণ করেছেন। অতএব পরিত্রাণের একমাত্র পথ 'দিতে হবে'। পুনর্বাসনের সুষ্ঠনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। হয়েছে লোক বিনিময়, সম্পত্তি বিনিময়। পেয়েছে সাহায্য। মাথা গোঁজার আশ্রয় মিলেছে। মিলেছে নাগরিক অধিকার।

আর বাংলা ?

বাংলাও পেয়েছে। বাঙালী উদ্বাস্তুরাও কিছু কম পায়নি! দেওয়া হয়েছে ডোল। সরকারী ঋণ। পাঠানো হয়েছে শিবিরে শিবিরে। কিন্তু বিনিময় হয়নি লোক, সম্পত্তি। কারণ বাঙালী শান্তিপ্রিয় জাতি। ভিন্ন রাষ্ট্রে তারা সুখে শান্তিতেই থাকবে। হিন্দু মুসলমানের ধর্মের ভেদ থাকলেও বাঙালী-বাঙালীই। আর সেইজন্যেই রুদ্ধ হয়নি উদ্বাস্তু আগমন। শেষ হয়নি বাঙালী হিন্দুর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। নারীর ইজ্জত ধূ-লুণ্ঠিত।

মুক্ত সত্যব্রত পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে জর্জরিত হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এ শুধু অন্যায় নয়, মহাপাপ। স্বাধীনতার নামে নেতাদের ব্যাভিচার।

কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছে। কিন্তু কংগ্রেস কাদের? শুধু নেতাদের, না ভারতবর্ষের মানুষের? কংগ্রেসের নামে স্বার্থ-তুষ্ট নেতার দল খণ্ডিত ভারতবর্ষের ইজারা নিয়েছিল বলেই মনে হয়েছিল তাঁর। মনে হয়েছিল, দিন যাদের শেষ হয়ে আসছে, ভোগ বিলাসের হাতছানি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন নি। রাজা বাদশার গল্প শোনা মানুষগুলো রাজা-বাদশা সাজবার প্রলোভন ছাড়তে পারেননি। তা যদি পারতেন, দেশকে এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারতেন না।

আর এভাবে মরতেও হত না স্বাধীনকে?

চিতা জ্বলছে। ওরা সকলে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে শকুন-শিশুর কান্না। কুকুরগুলোর ঝগড়া আর শোনা যাচ্ছে না। শ্মশান জুড়ে স্তব্ধতা।

গঙ্গার কুলু-কুলু স্রোতধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আকাশে বর্ষার মেঘ।

সত্যব্রত দাঁড়িয়ে আছেন। একাকী। তিনি দেখছেন। একটা মৃতদেহ পুড়ছে। মৃতের কিশোর ভাইটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চিতার দিকে।

ওকি কিছু ভাবছে? কি ভাবছে? ওর মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। চোখে জল নেই। বিস্ফারিত দৃষ্টি। আপন-জনকে পুড়ে ছাই হতে দেখছে ও।

আজ, প্রতিদিনই এমনি বহুজনের কেউ না কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে। কোথাও পুলিশের গুলিতে, কোথাও বা গুপ্তহত্যায় মারা যাচ্ছে কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ আজ হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পরিপূর্ণ মহড়া চলেছে আজ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে।

কিন্তু কেন ?

কেন ? ভাবলেন সত্যব্রত। কেন আজ এই খুনের নেশা ? নেশা কি ? হত্যাই কি সমস্যা সমাধানের পথ ? হত্যাকারীরা ধরা পড়ছে না কেন ?

সত্যব্রত জানেন না। এই ছোট্ট জায়গাটায় পর পর কটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। বার বার পুলিশ, মিলিটারী আর সি, আর, পি,র দল তছনছ করলো সব কিছু। ধরে নিয়ে গেল কিছু রাজনীতি-করা ছেলেকে। কিন্তু যারা রাজনীতি করে, তাদের চেয়ে, যারা কিছু করেনা, ধরে নিয়ে যাওয়া ছেলেদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি।

পুলিশের জিজ্ঞাস্য, বোমাবাজি কতদিন চলছে ?

—বোমা ? ছেলেটা ভয়ে সারা।

—বল তোদের দলে কে কে আছে ?

—আমি দল করি না।

—মিথ্যে কথা।

—বিশ্বাস করুন···

—বিশ্বাস করুন ! আমরা কিছু জানি না। তোর নাম মিথ্যে মিথ্যে লিখে পাঠিয়েছে ?

—সত্যি আমি কোন দল করিনা।

—দল করিস না ? বটে। এই ছেলেগুলোকে চিনিস ?

—হ্যাঁ।

—ওরা কি করে জানিস ?

—না।

—ওদের সঙ্গে ঘুরিস্ না ?

—মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই।

—কেন ?

—ওরা আমার বন্ধু।

—বন্ধু ! আচ্ছা, এবার তাহলে বলে ফেলতো ধন, কোথায় গেলে ওদের সন্ধান পাওয়া যায় ?

—আমি জানি না।

—ফের মিথ্যে কথা।

মার-মার-মার। মেরে মেরে আধমরা করে ফেলেছিল ছেলেটাকে। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসার পর দেখা গিয়েছিল সুস্থ ছেলেটা আর সুস্থ নেই। আতঙ্ক তার চোখে মুখে। হারিয়ে ফেলেছে বাইরে বেরুবার সাহস। শুধু ভয় আর ভয়।

ভয়, আতঙ্ক আর মৃত্যুর পদধ্বনি এখানে। নিজের অধিকারের সীমার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। অধিকারের সীমা কতটুকু, কেউ তা জানে না।

কেন আজ এই অবস্থা ? পদে পদে মৃত্যু ভয় ?

কেন আজ দিবানিশি অষ্টপ্রহর শঙ্কা আর অনিশ্চয়তার অন্ধকার ? কেন ?

বঞ্চিত বাংলা। লাঞ্ছিত বাংলা। প্রতারিত বাংলা। বাঙালী তার নিজ বাসভূমে আপন অধিকার হারা !

বাঙালীর কোন অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তবু বাঙালী আছে, বাঙালী ছিল, বাঙালী থাকবে। বাঙালীকে শেষ করার চেষ্টা অতীতে হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, হয়তো ভবিষ্যতেও হবে। বাঙালীকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের শেষ নেই। বাঙ্গালীকে মারতে হবে, শেষ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গকে করতে হবে শ্মশান ভূমি।

সেই চক্রান্তই চলেছে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা গোপনে। প্রকাশ্যে বাঙালীকে মারা হয়েছে আসামে। আসামের সেই 'বাঙ্গাল

খেদাও' আন্দোলনে মদত যুগিয়েছিল স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের আসাম সরকার। গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচারের নীরব দর্শক ছিল শান্তি-রক্ষকের দল। কোথাও বা সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তারা। সমর্থন করেছেন মন্ত্রী আর অসমীয়া নেতারা।

লুঠ, অগ্নি সংযোগ, হত্যা—কি হয়নি সেখানে? নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। প্রতিকার হয়নি। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে। কারণ, মরেছে যে বাঙালী। লুণ্ঠিত হয়েছে যে বঙ্গনারীর ইজ্জত!

সেদিন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং কন্যা শ্রীমতী গান্ধী বাঙালীর দুর্গতি দর্শনে গিয়েছিলেন। নয়নভরে দেখেছিলেন বাঙালীর লাঞ্ছনা, বাঙালীর চরম সর্বনাশ। কোন কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে জিভ আড়ষ্ট বোধ করেছিল। মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত তিনি করতে পারেন নি। শুধু করেছিলেন দুঃখ প্রকাশ। নিপুণ অভিনেতা সার্থক অভিনয় শেষে সগর্বে বাঙালী নিধনের রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিলেন তখত-ই-তাউসে, দিল্লীতে।

তিনি বলতে পারেন নি,—এ অপরাধের শাস্তি পেতে হবে। যারা এ জঘন্য অপরাধ করছে তাদের ক্ষমা নেই।

বলতে পারেন নি তিনি। বলবার সাধ্য তাঁর ছিল না। কারণ···

হয়তো তিনি বলতেন। বলতেন, যদি বাঙালী অত্যাচারীত, লাঞ্ছিত ধর্ষিত না হয়ে হত ভারত রাষ্ট্রের অন্য কোন প্রদেশ বাসীর দল, তাহলে নিশ্চই তাঁর বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর রোষে ক্ষোভে হুঙ্কার দিয়ে উঠতো! অন্যায়ের প্রতিকার করতেন তিনি। অপরাধীদের খুঁজে বার করে নিশ্চই শাস্তি দিতেন। করেন নি শুধুমাত্র বাঙালী মরেছিল বলেই।

বাঙালীকে নিয়ে যড়যন্ত্র স্বাধীনতার পরে নয়, স্বাধীনতার আগেও তার নমুনা মেলে। এবং অবিভক্ত বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ

কংগ্রেস নামের অবাঙালী নেতার দল বেশ প্ল্যান করেই প্রবেশ করায়। হিন্দু এবং মুসলমান ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও বাঙালীত্বকে বিসর্জন দেয়নি সেদিন। সাম্প্রদায়িকতা নয়, দেশের কথাই ছিল সেদিনকার কয়েকজন জাতীয় নেতার মনে। বাংলা, এবং বাঙালীকে সর্বশক্তি দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। হিন্দু অথবা মুসলমান নয়, বাংলা, আমরা বাঙালী।

১৯৩৫-এর 'গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট,' 'কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ড' ইত্যাদির পর কংগ্রেস ব্রিটিশের অধীনে যথাসম্ভব স্বায়ত্ব শাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১৯৩৭ সালে হল সাধারণ নির্বাচন।

বাংলা দেশের ২৫০টি আসনের মধ্যে বেশি পেল মুসলিম লীগ। তারপর জনাব ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। কংগ্রেস মাত্র ৫৪টি।

মন্ত্রীসভা গঠন করতে হলে কোয়ালিশন ভিন্ন উপায় নেই। ব্যালেন্স অব পাওয়ার কৃষক প্রজা পার্টির হাতে। মুসলিম লীগ চাইলো কৃষক প্রজা পার্টি তাদের সঙ্গে যোগ দিক। কিন্তু ফজলুল হক সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত দলের দিকে না গিয়ে কংগ্রেসের দরবারে এলেন। কোয়ালিশন করতে চাইলেন কংগ্রেসের সঙ্গে।

বাংলা দেশের কংগ্রেস নেতা তখন শরৎচন্দ্র বসু। ভগ্নস্বাস্থ সুভাষচন্দ্র তখন দূরে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের কড়া নির্দেশ, কংগ্রেস দেশের কোথাও কোয়ালিশনে অংশ নেবেনা। তাতে দেশ যদি জাহান্নামে যায় তো যাক। কংগ্রেসের চরিত্র নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না।

রাত্রি দুটো।

ক্লান্ত অবসন্ন ফজলুল হক। তবু তিনি সর্বনাশা ভাঙনরোধে শেষ চেষ্টা করলেন। চরম দুর্দিন থেকে একটা জাতিকে বাঁচাতে চাইলেন। বললেন, হিন্দু অথবা মুসলিম নই, আমরা বাঙালী। একটা সমগ্র জাতির ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে এভাবে ঠেলে দেবেন না।

কিন্তু কি সাধ্য সেদিন শরৎচন্দ্র বসুর। কি করতে পারেন তিনি। কোথায় সে সাধ্য তাঁর? মানুষ নয়, দল। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ। সে নির্দেশকে অমান্য করার সাধ্য তাঁর নেই। তিনি নিরুপায়।

তবু তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। অনুমতি চেয়েছেন, পান নি। বাঙালীকে শুধুমাত্র বাঙালী হয়ে বেঁচে থাকবার অনুমতি দেয়নি হাইকম্যাণ্ডের সদস্যরা।

ব্যর্থ হয়েছিল শের-ই-বাঙাল জনাব ফজলুল হকের কাকুতি মিনতি। রাত্রি দুটো পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এক সময়। নিরুপায় ফজলুল হক পরদিন মুসলিম লীগের সহযোগিতায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলে, হাইকম্যাণ্ড প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশের আল্লাবক্স মন্ত্রীসভা, পরে আসামের সাদুল্লা মন্ত্রীসভার সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশনের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে কংগ্রেসের কোয়ালিশনের অনুমতি মেলেনি। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের তখন ধনুর্ভঙ্গ পণ, কোয়ালিশন চলবে না। কংগ্রেস তার চরিত্র নষ্ট করবে না।

তাই কি?

হয়তো তা নয়। বাঙালী রাজনীতিকদের অদূরদর্শিতা অথবা জাতীয় নেতাদের! হয়তো বা আরো কিছু। দেশ অথবা মানুষ নয়, দল। দলবাজিই ভারতের রাজনীতির মূলধন। সেদিন ছিল,

আজও আছে। মানুষের মূল্য সেদিন দেওয়া হয়নি, দলের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। আজও হচ্ছে। দেশ মানুষের হলেও, দল নেতার। নেতাই তো সব। দেশ -বা মানুষ জাহান্নমে যাকনা কেন।

দেশের কথা সেদিন ভাবা হয়নি। ভাবা হয়নি মানুষের কথা। হয়তো বা ভাবা হয়েছিল, কিন্তু সে চিন্তায় কোন ভবিষ্যৎ চিত্র ফুটে ওঠেনি। আগামী দিনের ভয়াবহ পরিণতিটা ভাবতে পারেন নি সেদিন স্বাধীন ভারতের একপায়ে খাড়া নেতার দল। ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে বসেছিলেন তাঁরা। ছোটার অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিলনা। তাই ছুটতে গিয়ে বার বার তাঁরা পড়লেন। উঠলেন। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়লো লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষ। উজ্জ্বল বর্ণালী দিন নয়, অমানিশার অন্ধকার ভরা রাত্রি। বেঁচে থাকার মর্মন্তুদ আর্তহাহাকার। শুধু নেই, নেই আর নেই।

সমস্ত ভারতবর্ষের অতি সাধারণ মানুষ আজ আশাভঙ্গের ব্যথায় মুহ্যমান। কপালে করাঘাত করা ভিন্ন কোন পথ নেই, তবু আশার আলো দেখে ছুটে চলে। নেতার দলের কথার ফুলঝরিতে মুগ্ধ হয়। ভোটের বাক্সে পরিতৃপ্তি খোঁজে!

সেদিন বাংলা বাঁচতে চেয়েছিল। বাঙালী বাঁচতে চেয়েছিল। হিন্দু অথবা মুসলমান নয়, বাঙালী। বাঙালীর নেতা হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ফজলুল হক। কংগ্রেস বাঁচতে দেয়নি। বাঙালীর বাঁচার অধিকারকে কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস নামের একটা জাতীয়তা-বাদী দলের অদূরদর্শী কিছু যোগ্য নেতার দল! কংগ্রেসের নাগপাশে বাঁধা ছিলেন বাংলার নেতা শরৎচন্দ্র বসু। বাঙালী হয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আর এক বাঙালীকে।

কিছুদিন পরে বাঙালী ফজলুল হক হলেন মুসলমান। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগে যোগ দিলেন তিনি। কিন্তু বাংলার সর্বনাশ সহ্য করতে পারলেন না। গভর্ণর স্যার জন হাবার্ট

আর ইংরেজ আই, সি, এস সেক্রেটারীদের সঙ্গে মত বিরোধ সুরু হল তাঁর। সে বিরোধ চরম পর্যায়ে পেঁাছাতে মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়তে হল তাঁকে।

ফজলুল হকের পর সুরাবর্দী ও নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলা দেশে আবার শাসনক্ষমতায় এল মুসলিম লীগ।

এল ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস।

মহানগরী কলকাতা। একটি ধ্বনি, 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' পবিত্রভূমি লড়াই করে নেবে। সুরু হল লড়াই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অবর্ণনীয়। রক্ত-রক্ত আর রক্ত। বাঙালী নয়, হিন্দু এবং মুসলমান! বাঙালীর রক্তে বাঙালী হাত রাঙালো না, হিন্দুর রক্তে মুসলমান অর্জন করতে চাইলো তার পবিত্রভূমি। প্রদেশ গভর্ণমেণ্ট সহায়।

কলকাতার পর নোয়াখালি। দু' মাস পরে সেখানেও সুরু হল হিন্দু-নিধন যজ্ঞ। কারণ, মুসলমানের পাকিস্তান অর্জনের জন্য হিন্দুহত্যা ভিন্ন অন্য পথ নেই। অবশ্য জাতির জনক সেদিন পড়িমড়ি করে ছুটে এসেছিলেন দাঙ্গা বন্ধ করতে। অনুশোচনায় প্রাণ কেঁদেছে তাঁর, অশ্রুপাত করেছেন। বুঝিয়েছেন, এ ঠিক নয়। কিন্তু একবারও উচ্চারণ করেন নি, এ অন্যায়, এ মহাপাপ, এই নিষ্ঠুরতার শাস্তি পেতে হবে। সে সাধ্য তাঁর ছিল না। সে অধিকার তিনি অর্জন করতে পারেন নি। সাম্প্রদায়িকতার বিযাক্ত আবহাওয়া তিনিই তো সৃষ্টি করেছিলেন। জাতি নয়, ধর্মভিত্তিক মানুষের অন্যায় আবদার সমর্থন করেছিলেন। খিলাফৎ সমর্থন তো তাঁর জীবনের অদূরদর্শিতার অক্ষম পরিণতি। মানুষকে মানুষের পরিচয়ে বেঁচে থাকতে দেননি। কিছু স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষের জঘন্য মনোবৃত্তিকে তিনি তাঁর মহাপুরুষের দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণে বিচার করেননি। বিশাল ভারতের বিভিন্ন ভাবাভাষি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের একতাবোধকে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের কাছে

বিকিয়ে দিয়েছিলেন। মেনে নিয়েছিলেন, মুসলমানরা আগে মুসলমান, তারপর ভারতীয়।

অবশ্য বাঙালী একবার শেষ চেষ্টা করেছিল। বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ইংরেজ। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাঙালীর রুদ্র রোষে বঙ্গভঙ্গের ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু মনের কোণের গোপন ইচ্ছাকে তারা দূর করতে পারেনি। বাংলাকে না ভেঙে তাদের শান্তি ছিল না।

কিন্তু কেন?

বাংলাকে খণ্ডিত করার জঘন্য মনোবৃত্তি কেন জেগেছিল তাদের মনে?

বাঙালী ভীরু কাপুরুষ, বাঙালী আত্ম-বিস্মৃত জাতি, বাঙালী স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা!

তাই কি? বাঙালীর নামে সমস্ত অপবাদগুলোই কি সত্য?

ইতিহাস?

না, বাঙালীর কোন অতীত ইতিহাস নেই, যা আছে তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু বাঙালী নামে বিরূপতা আছে। ছিল—আছে। আগামী দিনের ইতিহাসে বাঙালীর স্থান কোথায় হবে ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন।

কিন্তু ব্রিটিশশক্তি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় আসার পর বাঙালী যেমন তার গুণগুলোকে আহরণ করেছে, তেমনি দোষগুলোকেও মেনে নিতে পারেনি। বাঙালী যেমন ইংরেজের সহায় হয়েছে, তেমনি শত্রুতাও করেছে। এবং বাঙালী একদিন বুঝেছে, শত্রুকে তাড়াতে হলে শত্রুর সঙ্গে শত্রুতাই করতে হবে। শত্রু কখনো বন্ধু হতে পারে না। ইংরেজের সঙ্গে বৈরিতায় বাঙালী এগিয়েছে শত্রুরূপে। হাতে তুলে নিয়েছে মারণাস্ত্র।

বাংলার সম্পদে ভরেছে ইংরেজের ঘর। শোষণের পীঠস্থান

বাংলা। ভবিষ্যতের বিপদ শঙ্কায় বাংলাকে ভেঙে দু-টুকরা করে হীনবল করতে চেয়েছ ইংরেজ।

পারেনি। এবং যা তারা নিজেরা পারেনি, তাদের আরাধ্য কাজ শেষ করেছে কংগ্রেস নামের জাতীয় দল আর সাম্প্রদায়িকতার স্বর্ণখনি মুসলিম লীগ। কর্ণধারগণের নাম নেহেরু, প্যাটেল, জিন্না। জাতির জনক প্রথমে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন। অনেক মহার্ঘ্য-বাণীই তিনি বিতরণ করেছিলেন। দেশ খণ্ডনকে নিজের অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন। কিন্তু কোথা দিয়ে যেন কি সব হয়ে গেল! একদিন জাতির জনকের কণ্ঠ প্রতিবাদে আর মুখর হতে দেখা গেল না। কেমন যেন ভিন্ন সুরে গাইতে সুরু করলেন তিনি। অমূল্য-অমূল্য সব বাণী দিতে লাগলেন তাঁর প্রার্থনা সভার ভাষণে।

দেশ ভাগ হয়ে গেল। যদিও দলিলে লেখা হল প্রদেশ খণ্ডন। এল স্বাধীনতা।

দেশের সীমানা নিয়ে হল গণভোট। আমাদের শ্রীহট্ট-সুরমা উপত্যকায় গণভোট গ্রহণ করা হল ৪ঠা জুলাই, ১৯৭৭ সালে। অবশ্য শ্রীহট্টের গণভোট গ্রহণের ব্যাপারে জাতির জনকের অবদান বড় কম নয়! প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেনসার বয়কটের ফরমাস দিয়েছিলেন। ফলে, শ্রীহট্টের বহু হিন্দু পরিবার আদম সুমারীতে নাম লেখাননি। ফল, হিন্দুর স্থলে মুসলমানের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং গণভোটের প্রয়োজন দেখা দেওয়া।

সেদিন গণভোট কেমন হয়েছিল? তার ফলাফলই বা কি?

আসামের শ্রীহট্ট-সুরমা উপত্যকার প্রায় সকলেই বাঙালী। ভোটের দিন যাতে ভারতের পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তার জন্যে শুধুমাত্র বাঙালী হিন্দু নয়, ভারত প্রেমিক কিছু মুসলমানও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। কিন্তু জেলা কংগ্রেসের গান্ধীবাদী সম্পাদক চাননি শ্রীহট্ট ভারতে আসুক।

স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্বেচ্ছাসেবক পাঠাতে চেয়েছিলেন শ্রীহট্টে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় গোপীনাথ বরদলুই তাঁর প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে আগত স্বেচ্ছা-সেবকদের ছদ্মবেশে গুণ্ডাবাহিনী এসে যখন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল, মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে ভোট দিতে বাধ্য করিয়েছিল, অথবা হিন্দুদের ভোট প্রদান থেকে বিরত রেখেছিল, তখন কিন্তু বরদলুই মশাই একটি কথাও বলেননি। অভিযোগ কর্ণগোচর হওয়া সত্ত্বেও চেষ্টা করেননি গুণ্ডাবাহিনীর অত্যাচার বন্ধ করতে। জেগে ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

অবশ্য জেগে ঘুমোবার যথেষ্ট কারণও সেদিন ছিল। অন্যতম কারণ, আসামে অসমীয়া ভাষীদের সংখ্যা বাংলা ভাষীদের থেকে কমে যাওয়ার আশংকা ছিল। তাই শ্রীহট্টের একাংশ গণভোটের নামে প্রহসনে পরিণত হয়ে পাকিস্তানভুক্ত হয়েছে।

গণভোটের ফল ঘোষণার পর শ্রীহট্টের অনেক নেতা সেদিন দিল্লীর দরবারে আবেদন নিবেদন জানান। প্রতিবাদ করেন। কিন্তু কোন প্রতিকার হয়না। সেদিন কংগ্রেসী নেতার দল শ্রীহট্টের বাঙালীদের আবেদনে কর্ণপাত করা প্রয়োজন বোধ করেননি। সহানুভূতি অথবা সহযোগিতার জন্যে যে মনের প্রয়োজন হয়, সেদিন তা তাঁদের ছিল না। হয়তো বা মন তাঁদের ছিল, ছিল না মনে কোন ইচ্ছা। ইচ্ছাকৃত ভাবেই বাঙালীর আবেদনে তাঁরা কান দেননি। বাঙালীকে সাহায্য করেননি। আসামে বাঙালীর ইচ্ছার কি মূল্য থাকতে পারে?

সেদিন ছিল না। আজও নেই। বাঙালীর দাবী, দাবী নয়। বাঙালীর চাওয়া পাওয়ার হিসাব রাখতে গেলে চলে না। বাঙালী মরেছে, মরছে, মরবে।

বাঙালী শিলচরে মরেছে। কেন মরেছে? কিসের জন্যে মরেছে বাঙালীর বুকের ভাষা, বুকের ভাষার জন্যে ছেলেমেয়ে

নির্বিশেষে মরেছে। মাতৃভাষা বাংলার জন্যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে এগারোটি প্রাণ বলি হয়েছে ঘাতকের অস্ত্রে।

বলি হয়েছে আরো অসংখ্য প্রাণ। স্বাধীনতার মূল্য দিয়েছে বাঙালী। আজও মূল্য দেওয়া শেষ হয়নি তার। আজ তার প্রতি পদক্ষেপে আঘাত, বঞ্চনা, অভিশাপ।

বাঙালীর ঘরে আজ অন্ন নেই। বাঙালীর পরণে বস্ত্র নেই। নেই নিরাপত্তা, শান্তি। দিবানিশি অষ্টপ্রহর সে শুধু যুদ্ধ করছে। ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। বঞ্চিত করা হচ্ছে তাকে। ঠকানো হচ্ছে। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তার সমস্ত অধিকার।

সত্যই কি তাই ?

চমকে উঠলেন সত্যব্রত। একি ভাবছেন তিনি ? একি অশুভ চিন্তা? এমন সংকীর্ণ মনোভাব তা তাঁর ছিল না। শুধুমাত্র বাঙালী-বাঙালী তো তিনি কোনদিন করেননি।

তাহলে ?

স্বাধীনের মৃত্যু কি তাঁকে সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন মানুষে পরিণত করে গেছে ? একটি মৃত্যু কি সবকিছু ওলট পালট করে দিল ?

তা কেন ? সত্য নয়। তিনি ঠিকই আছেন। যেমন ছিলেন।

কি ছিলেন তিনি ? রাজনৈতিক কর্মী। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। দেশের জন্য দুঃখ ভোগ করেছেন, কষ্ট স্বীকার করেছেন, ধরা পড়ে অনেক মার খেয়েছেন, জেলে গেছেন। কিন্তু কারাগার তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, মুক্তি পেয়েছেন তিনি। কিন্তু মূল্য কি পেলেন ?

যশ, অর্থ, সম্পদ ? না, কিছু নয়। মুক্তির আনন্দ ? স্বাধীনতার সুখ?

কোথায় ?

দুঃখ, হতাশা, আর্তনাদ-হাহাকার। কোথায় শান্তি? মুক্তির আনন্দ কতদূরে ?

সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ পিতার প্রশ্ন, এ তোমরা কি করলে ?

কি করেছে তারা ? কংগ্রেস কি করেছে ? কি করেনি কংগ্রেস ?

কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছে। দেশের মানুষ মুক্তি লাভ করেছে বিদেশী শাসকদের শাসনের নাগপাশ থেকে। মুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীন। ফিরে পেয়েছে হারানো অধিকার। ফিরে পেয়েছে আত্মসম্মান, মর্যাদা। শেষ হয়েছে দাসত্বের দিন।

কংগ্রেসের জন্যে। ইংরেজকে ভারত ছাড়া করেছে কংগ্রেস। জাতির জনক আর তাঁর মন্ত্রশিষ্যের দল সাগর পারে আপন দেশে সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছে ইংরেজকে। খণ্ডিত করেছে অখণ্ড ভারতকে। প্রাধান্য দিয়েছে ধর্মকে। মানুষ নয়, ধর্ম। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে আরো একটি রাষ্ট্র—পাকিস্তান।

কিন্তু কেন ? কেন সৃষ্টি হল পাকিস্তান ? ধর্ম নিরপেক্ষ নেতার দল কেন মেনে নিলেন বিচ্ছেদ—অঙ্গচ্ছেদ ?

সে ইতিহাস আলোর নয় -অন্ধকারের। অন্ধত্ব-অস্মিকার আহম্মকী। লোভ লালনা আর স্বার্থপরতার কলঙ্ক। গোষ্ঠী স্বার্থের ধ্বজাধারী কংগ্রেস গণমুক্তির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বুঝে নিয়েছে নেতা সাজার হিস্যা। মেনে নিয়েছে আর এক স্বার্থপর সাম্প্রায়িকতা-বাদী মানুষের একগুঁয়েমী। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে কারণ, বৃষবৃক্ষ যে তাদেরই সৃষ্টি। না মেনে উপায় ছিল না সেদিন।

সত্যই কি ছিল না ?

কঠিন প্রশ্ন। উত্তরও সহজ নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি পেল ? ভারত এবং পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ, যাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না, আজ স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে কি পেয়েছে তারা, কতটুকু পূর্ণ হয়েছে তাদের প্রত্যাশা ?

সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূর্ণ করার জন্যে স্বাধীনতা যাজ্ঞা করা হয়নি। হয়েছিল যাদের জন্যে, - তারা খুশি। ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ পুরোমাত্রায় রক্ষিত।

একই রাষ্ট্রের খণ্ড তুই অংশ আজ পরস্পরের শত্রু। স্বাধীনতা দিয়েছে হিংসা, দ্বেষ। অহিংসার মহামন্ত্র মুছে গেছে চিরতরে।

কেন মুছে গেছে ? কেন মুছে গেল ? কারা মুছে দিল মানুষের ভবিষ্যৎ ? কাদের জন্যে ভাই বসালো ভাইয়ের বুকে ছুরি ? পুত্রের সামনে ধর্ষিতা হল মা ? বোন হারালো ভাইয়ের হাতে ইজ্জত ? কাদের জন্যে ? তারা কারা ?

ভুল। ভুল হয়েছিল সেদিন। উদ্‌ভ্রান্ত নেতার দল সেদিন বুঝতে পারেননি দেশভাগের তুঃখজনক পরিণতির কথাটা। অহিংসার মহামন্ত্রে দীক্ষিত নেতার দল ভেবেছিলেন ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ হিংসা ভুলে গেছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগের নেতার দল পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়ে মুক্তির আনন্দে জাতীয় সংগীত গাইবে!

জাতীয় সংগীত সেদিন গাওয়া হয়েছিল, রক্ত অশ্রুতে আর্তনাদে হাহাকারে তুই রাষ্ট্রেই, হতভাগ্য মানুষের দল। শক্তি পূজারী পাঞ্জাবে সুরু হয়েছিল তাণ্ডব নৃত্য। দিল্লীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা।

আর বাংলায় ?

বাঙালী মার খেয়েছে, মরেছে। স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে দলে দলে সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে চলে এসেছে নতুন একটা দেশে। রেখে এসেছে স্বামী সন্তান, পিতা মাতা কন্যাকে। হিন্দু নারীর যৌবন লুটেছে মুসলিম লীগের অতি উৎসাহী যুবক গুণ্ডার দল।

লুটেছে এখানেও। সহায় সম্বলহীন পথের ভিখারী উদ্বাস্তু কন্যার ইজ্জত এখানে অক্ষত থাকেনি। সুযোগ সন্ধানীর অভাব কোথাও হয় না। চলেছে পশুত্বের তাণ্ডব লীলা।

তাণ্ডব লীলার শেষ কি আজও হয়েছে ? হয়নি। ছিন্নমূল

বাঙালী উদ্বাস্তুরা আজও করুণাপ্রার্থী। তাদের অপরাধ, তারা বাঙালী। তাদের অপরাধ, তারা মরেনি কেন? তারা সমস্যা। তারা জঞ্জাল। তারা ভারতবর্ষের অভিশাপ।

সমস্যা শুধু উদ্বাস্তুরা নয়। ভারতবর্ষের সমস্যা আজ বাংলা—বাঙালী।

কিন্তু কেন আজ বাংলা সমস্যা, সমস্যা বাঙালী?

কেন?

কিশোর ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁকে দেখছে।

হাত বাড়ালেন তিনি। ওকে ছুঁলেন। কাছে টেনে নিলেন।

সত্যব্রতর বুকের কাছে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ছেলেটা। একসময় কথা বলল। জিজ্ঞাসা করলো, আর কতক্ষণ লাগবে সত্যদা?

ও কি জানতে চায় বুঝতে পারলেন না তিনি। জ্বলন্ত চিতার দিকে দৃষ্টি পড়তে বুঝতে পারলেন। বললেন, বাড়ি যাবি তুই?

— আমি সে কথা বলছি না।

—তবে? জানতে চাইলেন সত্যব্রত।

—দাদার দেহটা পুড়ে ছাই হতে আর কতক্ষণ লাগবে?

কথাটা শুনে একটু চমকালেন সত্যব্রত। ওর মুখের দিকে তাকালেন। ম্লান অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখখানা বড় শীর্ণ দেখাচ্ছে। আজ সমস্ত দিন ও সঙ্গে আছে। নীরবে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কাঁদেনি, একটি কথা বলেনি। শুধু দেখছে।

দেখেছেন সত্যব্রত। থানা থেকে হাসপাতালে গেছেন। বসে বসে অপেক্ষা করেছেন। সকাল থেকে দুপুর। বিকাল হয়-হয়, ডাক্তার এলেন। ডিউটি তাঁর সকাল থেকেই, কিন্তু সকালে মড়া কাটতে তাঁর ইচ্ছা করে না। যদিও ডোমেরাই সব করে। তবু তিনি নারাজ। কারণ, সকালে তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিস আছে।

ডোমেদের বাসস্থানের কাছে ছোট্ট ঘরটায় স্বাধীনের দেহটা পড়েছিল। অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছিল নোংরা মেঝেতে। এক রাত্রির মধ্যে ফুলে বিকৃত আকার ধারণ করেছিল স্বাধীনের ছিপছিপে শরীরটা। এক সার লাল পিঁপড়ে সার বেঁধে ঘোরা ফেরা করছিল মৃতদেহটার মুখে চোখে, সর্বাঙ্গে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন সত্যব্রত। দেখতে দেখতে অনেক কথাই মনে পড়েছিল তাঁর। পরিচিত ছেলেটার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের কথা তাঁর অজানা ছিল না। স্বাধীনেরও 'সত্যদা' ছিলেন তিনি।

দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্ত সত্যব্রত ফিরে এসেছিলেন। ফিরে এসে কিছুদিন চুপচাপ বসেছিলেন বাড়িতে। তারপর বাবার মৃত্যু হল। বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

ছোটভাই, ভাইপোরা, ভ্রাতৃবধূ বাধা দিয়েছিলেন। বোনেরা এসে তাদের কাছে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কারো অনুরোধই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। তিনি পালাতে চেয়েছিলেন পরিচিতদের মাঝ থেকে। পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও কি তিনি দুঃসহ অবস্থাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন?

পাননি। যেখানে গেছেন একই অবস্থা। সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। দেখেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার দৌলতে কেউ গুছিয়ে বসেছে। যার একদিন কিছুই ছিলনা, দু'তিন বছরের মধ্যে বাড়ি গাড়ি করেছে। কেউ-বা নিঃস্ব রিক্ত।

যারা সম্পদশালী হয়ে উঠেছে তাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, কি করে এমনটা সম্ভব হল?

স্পষ্ট উত্তর কোথাও পাওয়া যায়নি। মুচকি হাসিতে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে বন্ধু।

পরে অতীতের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে পথে দেখা হয়েছিল

সত্যব্রতর। ফিরে এসেছেন সত্যব্রত। কিছুদিন নির্জন-বাস। একদিন ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলেছেন, এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে আর আমার ভাল লাগছে না।

—কোন অসুবিধা হচ্ছে তোমার? জানতে চেয়েছে ভাই।

—না তা নয়। একটা কিছু আমাকে করতে হবে।

—কি করবে?

—তাই চিন্তা করছি। কিন্তু একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। তবে রাজনীতি আর নয়।

—তাহলে কি করবে?

চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। বলেছেন, মনে কর, আমি যদি কোন ব্যবসা করি?

—ব্যবসা? দাদার মুখের দিকে তাকিয়েছে অধ্যাপক ভাই। বলেছে, কি ব্যবসা তুমি করবে?

—যে কোন ব্যবসা। সৎভাবে কিছু উপার্জন করতে চাই।

—কিন্তু দাদা···। কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেছে ছোট ভাই।

—কি বলছিস বলনা? জানতে চেয়েছেন তিনি।

—সৎভাবে উপার্জন করতে গেলে তোমার লাভের ঘরে মা-লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কোনদিনই পড়বে না।

—কেন? অবাক হয়েছেন তিনি।

ছোট ভাই বলেছে, দেশ স্বাধীন হবার পরে তোমরা বলেছিলে, ব্যবসাদাররা যদি সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন না করে তাহলে তাদের ল্যাম্প-পোষ্টে বেঁধে চাবকানো হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত ক'জন ব্যবসা-দারকে ল্যাম্প-পোষ্টে বাঁধা হয়েছে? ক'জন ব্যবসাদার সৎভাবে উপার্জন করেছে?

একজনকেও তার ব্যবসায় অসাধুতা অবলম্বনের জন্যে শাস্তি দেওয়া হয়নি। শাস্তি দেবে কে? ভারতবর্ষের অসাধু ব্যবসাদারদের শাস্তি দেবার সাধ্য কারো ছিল না।

কারণ, ধনী ব্যবসাদারদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল কংগ্রেস। ভারতবর্ষের মানুষ নয়, ব্যবসাদারদের জন্যে বিচারবুদ্ধি বিবেককে বিসর্জন দিয়ে স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছিল।

স্বাধীন ভারতে সেই ব্যবসাদারের দল দিনে দিনে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শোষণ করেছে দেশের মানুষকে। আজও সে শোষণের গতি অব্যাহত।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে গেছে। কিন্তু তার দৌলতে কতটুকু লাভবান হয়েছে সাধারণ মানুষ? কি পেয়েছে তারা?

শুধু ব্যবসাদারদের অসাধুতা নয়, সরকারের বলিষ্ঠ নির্ভুল অর্থনীতি রূপায়ণের ব্যর্থতাও এর অন্যতম কারণ। এক একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষ দরিদ্র থেকে দারিদ্রতর হয়েছে।

স্বাধীনতার পর যেদিন থেকে ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে সেদিন থেকেই ডেফিসিট ফিনান্সের আশ্রয় নিয়েছে। অর্থ বাজেটে ঘাটতি, বাড়তি নোট ছাপিয়ে পূরণ করা হয়েছে। ফলে, বাড়তি নোটের বোঝা বাজারে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যও উর্ধ্বগতি হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে এমন কাজ অন্যায় নয়। কিন্তু সামঞ্জস্যহীনভাবে কাজটা হলেই দেখা দেয় দুর্ভোগ। টাকাটা যদি উৎপাদন বাড়াবার জন্যে লগ্নী করা হয় এবং আশানুরূপ উৎপাদন যদি বাড়ে তাহলে দ্রব্যমূল্য স্ফীতি একটা সহজ সীমার মধ্যে থাকে। মানুষ নতুন নতুন চাকরীর সুযোগ পায়, মজবুত হয় অর্থনীতির ভিত।

অর্থনীতির ভিত-ই মজবুত করতে চেয়েছিল ভারত সরকার। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল। ফলে, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়া হয়েছে। লাভের বদলে লোভের সুযোগ বেড়েছে। ধীরে ধীরে দুর্গতির চরম সীমায় নেমে গেছে সাধারণ মানুষ।

চায়ের দোকান খুলেছেন সত্যব্রত।

ছোট ভাই বলেছে, বাড়ির কাজটা বাইরেই সারবে তাহলে ?

সত্যব্রত উত্তর না দিয়ে হেসেছেন।

কিন্তু পরিচিত মানুষ ঘোরতর আপত্তি করেছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়তে কজন এসেছে তাঁর কাছে। বলেছে, এ আপনি কি করছেন সত্যবাবু ?

—কি করলাম ? জানতে চেয়েছেন তিনি।

আপনি আমাদের মধ্যে আসুন। আপনার ব্যক্তিত্ব, সুনামকে এভাবে নষ্ট করবেন না।

—এতে কি সত্যই আমার দুর্নাম হবে ?

—নিশ্চই হবে। জোর দিয়েছে তারা। আপনার সুনাম দুর্নাম যে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত। একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী হয়ে এ আপনি কি করছেন ? কেন করছেন ? কীসের জন্য করছেন ?

চিন্তা করেছেন তিনি। বলেছেন, কিছু একটা করতে হবে তো ?

—করবার আরো অনেক কিছুই তো রয়েছে !

—কি করবো ?

—আপনি আমাদের মধ্যে আসুন। আমাদের বহু কর্মীই নতুন। অভিজ্ঞতা অনেকের নেই বললেই চলে। আপনি আমাদের মধ্যে এসে আমাদের কাজে সাধ্যমত সাহায্য করুন।

—কি তোমাদের কাজ ?

—কাজ তো অনেক। সামনে নির্বাচন। প্রথমবারের নির্বাচনের মত দ্বিতীয়বারেও আমরা যে অতি সহজে জয়লাভ করবো সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

—কেন ?

—সেইটুকুই তো জানতে চাই। কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে, কাদের ত্রুটি থাকছে, সেটুকু আপনি আপনার অভিজ্ঞতার দৃষ্টি দিয়ে সংশোধন করে দিন।

—সংশোধন করে দিতে চাইলেও কি তোমরা সংশোধন করে দিতে পারবে?

—চেষ্টা তো করবো।

—কি দিয়ে চেষ্টা করবে? কোথায় সে সামর্থ তোমাদের? কতটুকু তোমাদের শক্তি? শুধুমাত্র আসর জমিয়ে রাখা ভিন্ন বাংলাদেশে কংগ্রেসের আর কিছু করার নেই।

—একি বলছেন আপনি? আহত হয়েছিল বক্তা।

হেসেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, কিছু মনে কোরনা। তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যে কথাটা আমি বলিনি। এটা আমার শোনা কথা। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ এই কথাই বলছে।

তরুণ কর্মীটি তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। এক সময় জানতে চেয়েছিল, এটা কি আপনারও কথা নয়?

—আমার?

—হ্যাঁ?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার? বিব্রত বোধ করেছিল তরুণ কর্মীটি। বলেছিল, আমি এ বিষয়ে কিছু ভাবিনি।

—অথচ চিন্তাটা তোমারই আগে করা উচিৎ ছিল।

—কিন্তু…।

হেসেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, আমিও কিছু চিন্তা করিনি।

সত্যিই কি কিছু চিন্তা করেননি সত্যব্রত? নিশ্চই করেছেন। দিনের পর দিন ভগ্ন-আশা মনটাকে নিয়ে অস্থির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করেছেন। ভেবেছেন, কি চেয়েছিলেন তিনি। শুধু তিনি নিজে নন, তাঁর মত অনেকেই। কি চেয়েছিল মানুষ?

শুধুই স্বাধীনতা ? শুধুমাত্র বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি ?

দেশের শত্রু, জাতির শত্রু ইংরেজ। ইংরেজকে না তাড়াতে পারলে দারিদ্র দূর হবে না, অশিক্ষার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে মানুষ। ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশকে দারিদ্র-মুক্ত করতে হবে। মানুষ পাবে তার বাঁচার পথ।

বাঁচার পথ কি মানুষ পেয়েছে ? দূর হয়েছে দারিদ্র ? কেটেছে অশিক্ষার অন্ধকার ?

না। হয়নি। বাঁচার পথ মানুষ পায়নি। পেয়েছে শুধু দারিদ্র আর জ্বালা।

খণ্ড বাংলায় শুরু হয়েছে শরণার্থীর আগমন। স্বাধীনতার মূল্য বাবদ সব খুইয়ে হাজির হয়েছে তারা। বাধ্য হয়েছে চলে আসতে। সরকারী হিসাবে নাম লেখানো উদ্বাস্তুর সংখ্যা ঃ

১৯৪৭	সালে	৩৭৭৮৯৯	জন
৪৮	,,	৪১৯০১৮	,,
৪৯	,,	২৭৫৫৯২	,,
৫০	,,	৯২৫১৮৫	,,
৫১-৫২	,,	৪৭৭১৮৬	,,
৫৩	,,	৬০৬৪৭	,,
৫৪	,,	১০৫৮৫০	,,
৫৫	,,	২১১৫৭৩	,,
৫৬	,,	২৪৬৮৪০	,,
৫৭	,,	৯১৩৩	,,
৫৮-৬০	,,	১৮৪৫৩	,,

হিসাবে ১৯৪৬ সালের ৪৪৬২৪ জন উদ্বাস্তুকে ধরা হয়নি।

আর ৫১ সালের মাত্র কটা মাসে আশী লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। যদিও এর মধ্যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছাড়া কিছু সেখানকার নাগরীকও (মুসলমান) আছে।

স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন, আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে পৃথক হচ্ছি। ঘর আমাদের ঠিকই রইলো। শুধু দুটি হাঁড়ি আলাদা হল।

হাঁড়ি আলাদার নমুনা যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা কিছু কম লাভ হয়নি। স্বাধীনতা এসেছে সর্বভারতে। উদ্বাস্তু সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের। কেন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি, ভিক্ষুককে দানের পূন্য সঞ্চয়ের মত। আজও সেই অবস্থা। পাক-বর্বরতার বলী মানুষগুলো যখন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তখন তাদের আশ্রয়দানের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গের। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ আশ্রয় দিতে নারাজ। কারণ, সমস্যাটা যে সর্বভারতীয়! দায় দায়িত্ব নিতে তখন তারা নিশ্চই বাধ্য নয়।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ সকলের কাছে মুক্তদ্বার। বিহার বিহারীদের, উড়িষ্যা উড়িষ্যা-বাসীদের, গুজরাট, অন্ধ্র, আসাম, মহারাষ্ট্র সে সব প্রদেশের অধিবাসীদের। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সকলের। বেকার বাঙালী যুবকদের চাকরী নেই। অবাঙালী মিল মালিক তার নিজের দেশের মানুষকে চাকরী দিয়ে, যদি ছিটেফোঁটা থাকে তাহলেই বাংলার যুবকদের দেবে। যদি না দেয় তাতেও কোন বাধ্য বাধকতা নেই। সব কিছুই মর্জি বা দয়ার ওপর নির্ভর করছে।

প্রতিবাদ অথবা প্রতিকার? তাহলেই বাঙালী হবে সংকীর্ণমনা, প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতার দল ধর্মঘটে নামবেন, বাংলা বন্ধ্ করবেন কিন্তু বাঙালীর অধিকার অর্জনের আন্দোলনে ভুলেও পা বাড়াবেন না।

সত্যব্রতর চায়ের দোকানে দিনরাত্রি আড্ডা দেওয়া একদল বেকার ছেলে একদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

একজন আক্ষেপ করে বলেছিল, জানেন দাদা, গতজন্মে অনেক পাপ করেছিলুম, তাই এজন্মে বাঙালী হয়ে জন্মেছি!

—কেন? কেন? কেন? অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিল।

ছেলেটা বলেছিল, কেন নয় তাই বল?

—তোর আক্ষেপের কারণটা আগে শুনি।

—শুনে লাভ হবে কিছু?

—শুনে রাখিতো?

—শুনে রেখে লাভ কিছুই হবেনা। কত কিছু নিয়ে ধর্মঘট হচ্ছে, হরতালের ডাক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা যে জষ্টি মাসের গরমে কুকুরের মত ধুঁকে ধুঁকে শেষ হতে চলেছি তার জন্যে কি হচ্ছে শুনি?

—শেষ হয়ে যাচ্ছি! অবাক হয়েছিল একজন। কই শেষ হয়ে যাচ্ছি?

—যাচ্ছিনা?

—না। বিজ্ঞের মত মাথা নেড়েছিল সে। মুচকি হেসে বলেছিল, শেষ হয়ে গেলে মিছিলে ঝাণ্ডা উঁচু করে কারা এগিয়ে যাবে বল?

—ঠিক—ঠিক। সমর্থন করেছিল অন্যজন। বলেছিল, আমরা যদি বেকার না থেকে সকলেই কাজের মানুষ হয়ে পড়ি তাহলে আমাদের এই খণ্ড বঙ্গের সাকুল্যে ছত্রিশটা পার্টির দিনরাতের কর্মী জুটবে কোথা থেকে?

তাড়া দিয়েছিলেন সত্যব্রত, এই হতভাগার দল এখুনি দোকান থেকে বেরো সব। দোকানে বসে রাজনীতি কপচালেই গায়ে গরম জল ঢেলে দেব।

—আমরা তো রাজনীতি করছিনা দাদা। বলেছিল একজন।

—চোদ্দ ছত্রিশ, কর্মী, মিছিল ওসব কি?

—কোড, দাদা কোড। বেকারদের মর্মজ্বালার জাবর কাটা। বলতে পারেন দেলা।

—বাঁদরামী হচ্ছে সব? দোকানটা তোদের জন্যেই উঠবে দেখছি। হয় সিনেমার আলোচনা, নাহলে রাজনীতি; এছাড়া দেখছি তোরা আর কিছু জানিস না।

—আর পিতার হোটেলে ত্বুবেলা ত্বুমুঠো অন্ন। মাতৃদেবীর কাছে কয়েক আনা পয়সা। এই নিয়েই তো বেঁচে আছি।

—বাদাম ভাজা বিক্রী করগে যানা?

—কেউ কিনবে না। পুরানো বাদামওয়ালাগুলো সব পাড়া বহুদিন থেকে ইজারা নিয়ে বসে আছে। ওর থেকে 'মেরা নাম জোকার'-এর টিকিট ব্ল্যাক করা ভাল।

—তাই করগে যা। কিছু তো রোজগার হবে?

—তা হবে কিন্তু লজ্জা হচ্ছে।

—কেন?

—অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেগুলোর কাছ থেকে ক'আনা পয়সা বেশি নিতে মন চায়না।

—বইটা তো শুনেছি ভালই।

—নিশ্চই ভাল। খুব ভাল। শিক্ষামূলক ছবি। সিমির জলে ভেজা উরু, কষ্ট্যুম পরা দেহ, আর নাগর দোলায় পদ্মিনীর ছুরির খোঁচায় ছেঁড়া জামা, বারবার দেখার মত। বার বার দেখানোও হয়েছে। ছেলে বুড়ো সকলের দেখবার মত বই!

অবাক হয়ে শুনেছিলেন সত্যব্রত। কিছু না বুঝতে পেরে বলেছিলেন, বইটা ভাল?

—ভাল মানে, খুব ভাল। আজকালকার অধিকাংশ হিন্দী ছবিই শিক্ষামূলক। আপনি জীবিত কি মৃত অনুভব করতে পারবেন। আর সেইজন্যেই অবাধ ছাড়পত্র।

হিন্দী ছবির সমালোচনায় কখনো মুখর হয়ে উঠেছে ছেলেগুলো

আবার কখনো দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার ঘুরে এসে জমা হয়েছে চায়ের দোকানে। আলোচনায় মেতেছে।

শুনেছেন সত্যব্রত। কিছু বুঝেছেন। কিছু বুঝতে পারেননি।

এক সময় বিরক্ত হয়ে বলেছেন, হ্যাঁরে তোদের কি সিনেমা ছাড়া আর কিছু নেই ?

—কেন থাকবে না দাদা, আছে। আমাদের সামনে দুটো কাজ, একটা লাইন লাগিয়ে সিনেমা দেখা, অন্যটা রাজনীতি করা।

—সংসারের কাজও তো কিছু কিছু করতে পারিস ?

—সংসার ? কোথায় সংসার দাদা ? আমাদের সংসার আছে নাকি ? কোনদিন হবে কি ?

—কিন্তু বাড়ির কাজ ?

—বাড়ি ? কার বাড়ি ? বাড়িতে কতটুকু অধিকার আমাদের ? আমরা তো বাড়ির আপদ—সংসারের বোঝা।

—কেন ?

—আমরা যে বেকার, দাদা। বেকারের কোন অধিকার নেই।

—কে বললে ?

—বলতে হয়না। আমরা বুঝতে পারি। তিলে তিলে বুঝেছি আমরা। দিনের পর দিন আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এখন আমরা নীরব দর্শক। সংসার নাটকে কাটা সৈনিক।

—কিছু করতে পারিস না ?

—ইচ্ছা তো করে কিছু করি। দিনের পর দিন লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি সহ্য হয়! সেটা কি কিছু কম করছি। যোগ্যতা যে নেই তাই-বা বুঝবো কেমন করে। কে আমাদের যোগ্যতা যাচাই করতে সুযোগ দিচ্ছে ? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরীর আবেদন জানাচ্ছি। সৌভাগ্যবশতঃ ডাক পেলে হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছি মনে করে ছুটে যাচ্ছি। হরি হরি ! গিয়ে দেখছি মাত্র

চারটি পোষ্টের জন্যে শত খানেক হাজির। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছি। একে অন্যকে চিনতে পারছি না। চোখাচোখি হলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছি। আমরা সকলে সকলের শত্রু। চাকরীর রনাঙ্গনে ভদ্রতা করা চলে না। বন্ধুত্বের কোন স্থান সেখানে নেই। ডাক পড়ে। শুটে-বুটে সাহেব সাজার দল জানতে চায় নাম। পরীক্ষা করে, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলো। তারপর প্রশ্ন, বাংলাদেশের কোন পার্টির কর্মী আমি ?

একজন প্রতিবাদ করে, গুল দিচ্ছিস ?

—নারে সত্যি কথা। গতমাসে যে ইণ্টারভ্যুটা দিয়েছিলুম, আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কোন্ দল করি।

—মিথ্যে কথা বলছিস।

—বেশ মিথ্যেই বলছি। হেসেছিল সে। বলেছিল, কোন দল করি না শুনে প্রধান প্রশ্নকর্তা সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সশব্দে বলেছিলেন, আপনি তো তাহলে গুডবয়। আপনার কথাটা আমাদের মনে থাকবে। মনে রেখেছেন কিনা জানি না, তবে চাকরি করার জন্যে আমার ডাক আসেনি।

সকলের বন্ধু সত্যব্রত পাড়ার বেকার ছেলেগুলোর কথা শুনেছেন। তাঁর প্রশ্ন, আজ পশ্চিমবঙ্গে বেকার ছেলেদের সকলের কথাই কি এক ? সকলেই কি বাঁচতে চায় ? বেকার থাকতে চায় না কেউ ?

বেকার আগেও ছিল, আজও রয়েছে। কিন্তু এমন মহামারী আকার ধারণ করেনি কোনদিন।

আজ শুধু অভিযোগ—অভিযোগ আর অভিযোগ। অভিযোগের অন্ত নেই আজ। কিন্তু অভিযোগের সৃষ্টি হল কেন ?

উদ্বাস্তু সমস্যা আজ পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে অন্যতম। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর অপ্রতিহত গতিতে আগমনের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের সব কিছু আজ ভরা ডুবি। সত্যিই কি তাই ?

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কেন বাধ্য হয়েছে তারা ? কিসের জন্য চলে আসছে ? তারা কি সেখানে থাকতে পারতো না ?

থাকতে পারলে নিশ্চই চলে আসত না। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতা নামের দুঃস্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে। তারা সব হারিয়ে ভিখারী হয়েছে। তাদের ভিখারী করার ষড়যন্ত্রের নায়কের দল, গান্ধী, প্যাটেল, নেহেরু। সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যা বাড়িয়ে গেছেন তাঁরা। প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট তাঁদের ভেদনীতি বাংলাকে করেছে সমস্যা-সঙ্কুল।

পশ্চিম বাংলার সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা নয়, কিন্তু পশ্চিম বাংলার আয় সর্ব-ভারতীয়। পশ্চিম বাংলার অর্থে সমগ্রভারতের অধিকার আছে।

বাংলার অর্থে বাংলা পুষ্ট হয়নি। পুষ্ট হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষ। দিনের পর দিন। চব্বিশটা বছর পশ্চিম বাংলাকে শোষণ করা হয়েছে। হয়তো আগামী দিনগুলোতেও হবে।

১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে লুঠে নিয়ে গেছে ৫৭৭ কোটি টাকা আর ভিক্ষাস্বরূপ দিয়েছে ৫০ কোটি টাকা। ৫০ কোটি টাকায় পশ্চিমবঙ্গ তার হাজার সমস্যার সমাধান করবে। আর ৫২৭ কোটি টাকায় উন্নতি করা হবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের।

প্রতিবাদ অথবা প্রতিকার ?

অতীতে কিছু কিছু মৃদু প্রতিবাদ হয়েছে। প্রতিকারের আশা সুদূর পরাহত। প্রতিকার করবে কারা ? কাদের দ্বারা প্রতিকার সম্ভব ? রাজনৈতিক দলগুলি ? ছিঃ ছিঃ, সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি যে

তাঁদের কলঙ্কিত হবে! প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বেন যে তাঁরা! সর্ব ভারতীয় নেতা সাজার সম্মান যে তাঁরা হারিয়ে ফেলবেন!

সম্মান যদি না রইলো কি রইলো তাহলে? বাংলা মরছে মরুক, বাঙালী মরছে মরুক। নেতার দল জিন্দা থাকুন। সমস্ত ভারতে সম্মান যেন তাঁদের অটুট থাকে।

শুধু কি বাঙালীই বঞ্চিত হয়েছে? ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মানুষ, নিম্নবিত্ত গরীব জনসাধারণ আজ স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে কতটুকু লাভবান হয়েছে? প্রত্যাশা কতটা পূর্ণ হয়েছে? কি পেয়েছে তারা?

অথচ সাধারণ মানুষ যাতে লাভবান হয়, দু বেলা দু মুঠো ক্ষুধার অন্ন পায় তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। ঢাক্কা নিনাদে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ করা হয়েছে। কিন্তু গরীব জনসাধারণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। বরং স্বাধীনতার দৌলতে তাদের অবস্থা আরো নিম্নগামী হয়েছে। সেই অনাহার, নিরক্ষরতা আর অ-স্বাস্থ্য।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সময় ভারতের কয়েকজন অর্থ-নীতিবিদ্ ডেফিসিট ফিনান্সিং-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের দুর্ভাগ্য, তাঁদের মতামতের মূল্য সেদিন দেওয়া হয়নি। কারণ, সেদিন নেহেরু-সরকার নিজস্ব মতেই চলতে চেয়েছিলেন।

প্রথম যোজনায় অনুমিত খরচ ছিল ২০৬৯ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ হয়েছিল ২০১২.৪ কোটি টাকা। টাকার শতকরা ৪৩.২৫ ভাগ খরচ হয়েছিল কৃষিখাতে। শিল্প, খনিজদ্রব্য খাতে খরচ হয়েছিল মাত্র ৭ ভাগ। সেইজন্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনাকে কৃষির প্রতি ঝোঁক সম্পন্ন বলা হয়। ভাকরা, নাঙ্গাল, দামোদর-ভ্যালি সেচপ্রকল্প বাবদ বহু কোটি টাকা খরচ হয়।

প্রথম যোজনার অর্থনৈতিক সম্পদের সূত্র ঃ (কোটি টাকায়)

সরকারের সঞ্চয়	অনুমিত টাকার পরিমাণ	প্রকৃত পরিমাণ
বাজেটে সঞ্চয়	৫৬৮·০	৫৭৪·৩
রেল থেকে সঞ্চয়	১৭০·০	১১৫·৪
জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ	১০৫·০	২০৫·০
স্বল্প সঞ্চয়	২৭০·০	৩০৬·০
আমানত ও তহবিল	১৩৫·০	৯১·০
ঘটতি ঃ—		
বৈদেশিক ঋণ	১৫৬·০	২০৩·২
ডেফিসিট ফিনান্সিং	৬৫৫·০	৫৩১·৯

প্রথম যোজনায় বিনিয়োগের লক্ষ্য যেখানে ছিল ২০৬৯ কোটি টাকা সেখানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির বাজেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১২৫৮ কোটি টাকা। ঘাটতি ছিল ৮১১ কোটি টাকা। পরে যোজনার লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তিত হয়ে হয় ২৩৭৮ কোটি টাকা। ফলে ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। এবং ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩২ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় যোজনায় ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। যোজনায় প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছিল ৪৮০০ কোটি টাকা। খরচ হয়েছিল ৪৬০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় যোজনায় অর্থনৈতিক সম্পদের সূত্র ঃ—

সূত্র	অনুমিত পরিমাণ (কোটি টাকায়)	প্রকৃত পরিমাণ (কোটি টাকায়)
রাজস্বের উদ্বৃত্ত অংশ	৮০০	১২০
জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ	১২০০	১১৮০
রেল দপ্তর থেকে প্রাপ্ত	১৫০	১৫০

সূত্র	অনুমিত পরিমাণ (কোটি টাকায়)	প্রকৃত পরিমাণ (কোটি টাকায়)
প্রফিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য আমানত থেকে	২৫০	২৩০
বৈদেশিক ঋণ	৮০০	১০৯০
ডেফিসিট ফিনান্সিং	১২০০	৯৪৮
অতিরিক্ত পন্থার আশ্রয়ে ঘাটতি পূরণ	৪০০	

প্রথম যোজনায় আভ্যন্তরীণ সূত্রে টাকা পাওয়া গিয়েছিল ৬৩.৫%, দ্বিতীয় যোজনায় ৫৩.৭%। প্রথম যোজনায় বৈদেশিক সাহায্যের নামে ঋণ ১০%, দ্বিতীয় যোজনায় ২৩.৭%। প্রথম যোজনায় অতিরিক্ত কর ধার্য মারফৎ পাওয়া গিয়েছিল ১২.৭%, দ্বিতীয় যোজনায় ২২.৯% (করের বোঝা দ্বিতীয় যোজনায় বেশ ভাল ভাবেই বাড়ানো হয়েছিল।) অবশ্য ঘাটতির পরিমাণ প্রথম যোজনায় ছিল ২৬.৪%, দ্বিতীয় যোজনায় কমে হল ২০.৬%। কিন্তু ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের পরিমাণ সামান্য বেড়ে হল দ্বিগুন। করভার ও ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের মাত্রা বাড়ল, যোজনা খাতের কাঁচা টাকা বাজারে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সমতালে বাড়েনি উৎপাদন, ফলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি।

মানুষ ঠেকে শেখে। ভুল হলে ভুলের সংশোধন করে নেয়। কিন্তু সরকারী ব্যাপারে ওসবের বালাই নেই। তৃতীয় যোজনাতেও এই ধারার কোন পরিবর্তন হয়নি।

তৃতীয় যোজনায় অর্থনৈতিক সম্পদের সূত্র :—

বাজেট সূত্রে	অনুমিত পরিমাণ (কোটি টাকায়)	প্রকৃত পরিমাণ (কোটি টাকায়)
রাজস্বের উদ্বৃত্ত	৫৫০	৪১৯
রেলদপ্তর থেকে প্রাপ্ত	১০০	৬২

বাজেট সূত্রে	অনুমিত পরিমাণ (কোটি টাকায়)	প্রকৃত পরিমাণ (কোটি টাকায়)
অন্যান্য সরকারী সংস্থা থেকে	৪৫০	৩৭৩
জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ	৮০০	৮২৩
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি	২৬৫	৩৩৬
বাধ্যতামূলক আমানত	—	১১৭
স্বল্প সঞ্চয়	৬০০	৫৬৫
ইস্পাত ইকুয়ালাইজেশন ফাণ্ড	১০৫	৩৪
বিবিধ মূলধন প্রাপ্তি	১৭০	২৩৮
অতিরিক্ত কর সরকারী কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সাহায্যে	১৭১৩	২৮৯২
বৈদেশিক ঋণ	২২০০	২৪২৩
ঘাটতি ঃ ডেফিসিট ফিনান্সিং	৫৫০	১১২৩

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে। সুরু হচ্ছে চতুর্থ পরিকল্পনার তোড়জোড়। কিন্তু কতটুকু লাভ হয়েছে? কতটা উন্নতি করেছে দেশ? জাতি কোন সাফল্যের দিকে এগিয়ে গেছে?

গেছে কি? কেমন সে যাওয়া?

বর্তমানে ভারত সরকার বাইরে থেকে দু উপায়ে সাহায্য নিয়ে থাকে। সরকারী এবং বেসরকারী পন্থায়।

বেসরকারী পন্থা হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে এদেশে শিল্পকেন্দ্র চালানো। ১৯৬৬ সালে ৫৩১টা বিদেশী কোম্পানী এইভাবে চুক্তির মাধ্যমে এদেশে ব্যবসা চালাতো।

একটা দেশের প্রথমাবস্থায় এ পন্থার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু ওই সব বিদেশী কোম্পানীগুলো কি করেছে?

বিদেশী কোম্পানীগুলো শিল্প কৌশল শেখানোর নামে নিজেদের দেশের লোক আমদানী করেছে। পেটেন্ট ও প্রসেসের যুক্তি তুলে ভারতীয়দের কিছুই শেখায়নি। মেশিন, স্পেয়ার পার্টস আর কতকগুলি বিশেষ ধরণের কাঁচা মাল প্রায় সবসময় নিজেদের দেশ থেকে আমদানী করিয়েছে। ফলে এদেশীয় অর্থ দিনের পর দিন চলে গেছে বিদেশে।

১৯৫৬-৫৭ সালের রিপোর্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলে যে, এই সব বিদেশী কোম্পানী যত টাকা এদেশে বিনিয়োগ করে, সে টাকা ওরা চার পাঁচ বছরের মধ্যেই রয়্যালটি, সুদ, ফি, লাভ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ দেশে নিয়ে যায়। তারপর?

তারপর অব্যাহত বেগে ওদের ভাণ্ডারে মুনাফার হার বেড়েই চলে।

প্রতিকার? কোথায় প্রতিকার? দেশ উন্নত হচ্ছে। সম্পদশালী হয়ে উঠছে দেশ! দেশের মানুষ সুদিন এলে নিশ্চই এর ফল লাভ করবে বৈকি!

আর সরকারী ঋণ?

ভারত সরকার প্রতি বছরই বিদেশ থেকে ঋণ নিচ্ছে। ঋণ না নিয়ে উপায় নেই। দুনিয়ার সব থেকে ছোট যে দেশটা সে দেশ থেকেও ভারত ঋণ নিয়েছে। নিয়েছে দেশের মানুষের জন্যে। দেশকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্যে। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় তার জন্যে। বেকারত্ব দূর করার জন্যে!

ভারতবর্ষের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ছিল ৩২ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৬০ সালে তা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬৬৬৩·৩ কোটি টাকায়।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সাড়ে পনেরো কোটি ডলারের পরিকল্পনা বহির্ভূত এক নতুন ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতের এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদী মার্কিন ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ২৫১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ১৮৮৪ কোটি টাকা মাত্র !

ভারতে যত মার্কিন ঋণ দেওয়া হয়েছে তার প্রায় এক চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রায়। কুড়ি বছর পরে এই ধরণের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০০০ কোটি ডলার, মাত্র ৭৫০০ কোটি টাকা।

ভারতবর্ষ দুহাতে বিদেশ থেকে ঋণের টাকা কুড়িয়েছে। ফলে সুস্থ এবং সুষ্ঠ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কখনই গ্রহণ করা হয়নি। পয়সার যখন অভাব নেই, বাবুগিরিতে খামতি থাকে কেন। সব কিছুই ঢিলেঢালা ভাবে এগিয়ে চলেছে। প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয়নি। মূল সমস্যা সমস্যাই থেকে গেছে।

খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে খাদ্য নিয়ে এসে। কৃষি সমস্যা, সমস্যাই থেকে গেছে ততদিন যতদিন না আমেরিকা চোখ রাঙিয়ে বলেছে, কৃষিতে উন্নতি করো নচেৎ পি. এল ৪৮০ আর জুটবে না। আর দেখতে না দেখতে রাতারাতি খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ! কটা বছরেই দেশটা খাদ্যে স্বয়ং নির্ভর ! নেতাদের স্বগর্ব ঘোষণা, আমাদের খাদ্য সমস্যা নেই (সত্যিই কি নেই ? ভারতবর্ষের প্রতিটি নিরন্ন মানুষ দু মুঠো পাচ্ছে কি ?)। সবুজ বিপ্লবে ভারত জয়যুক্ত (আহা, মরি-মরি) !

মেসিন পত্তরের অভাব হলেই নিয়ে আসা হয়েছে বিদেশ থেকে। ফলে শিল্পাদি গড়ে ওঠার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়না। তবে, সুখের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেসিনের নামে যা এসেছে তা অচল, কোথাও বা বহুদিন গুদামে পড়ে থাকা মেসিন নামের লোহার দানব। অবশ্য কিছু কিছু সত্যিকারের ভাল মেসিন সত্যিই এসেছে। তবে, বৈদেশিক ঋণের বেশ কিছু অর্থ বিদেশের জঞ্জাল সাফ করে এদেশে আমদানী

করা হয়েছে (না আনলে চলবে কেন, ঋণটা কি এমনি দিয়েছে ? পরস্পরকে দেখতে হবে বৈকি)।

তবে, ১৯৫৬-৫৭ সালে ঋণ শোধ করার জন্যে যত অর্থ দিতে হয়েছিল তার পরিমাণ সেই বছরে পাওয়া ঋণের শতকরা মাত্র চব্বিশ ভাগ।

আর মাত্র তিন বছরে (১৯৫৯-৬০) এর পরিমাণ বেড়ে হয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশ ভাগ।

১৯৫৯-৬০ সালে ভারত এড ইণ্ডিয়া ক্লাব থেকে ঋণ পাবে ১১০ কোটি ডলার, আর এর মধ্যে ৫৫ কোটি ডলার যাবে পুরানো ঋণ শোধ দেওয়ার জন্যে।

১৯৫৯-৬০ সালে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে ঋণের দরুণ পেয়েছিল ৪২ কোটি টাকা, কিন্তু পুরাণো ঋণ পরিশোধের জন্যে এই বছরে রাশিয়াকে দিতে হয়েছে মাত্র ৭১ কোটি টাকা।

অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, কিন্তু···দিবে আর নিবে—মিলাবে মিলিবে—পাবে না কিছুই। কাব্‌লের টাকার মতই। টাকা নয়, শুধু মাত্র স্থদের পাহাড়।

কিন্তু কেন এমন হল ? কেন দিনের পর দিন বিশ্বের দরবারে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে ভারত ? কিসের জন্যে ?

কারণ নিশ্চই আছে। যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ। বৈদেশিক সাহায্য ভিন্ন কোন একটা দেশ উন্নতির শিখরে উঠতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের ভুল নীতির জন্যে পরমুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি। স্বাবলম্বী হতে কতদিন যাবে আমরা জানিনা। বিশ্বাস, যেদিন স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ভারতবর্ষের মানুষ সেদিন তো আর 'গরীবি হঠাও' ধ্বনি চলবে না।

তাহলে সেদিন কি হবে ?

কোন্ ধ্বনি তোলা হবে ভোটের বাক্সের জন্যে ?

স্বাধীনের ভাইয়ের কণ্ঠস্বরটা শোনা গেল। চুপি চুপি আস্তে বলল, আমার ভাল লাগছে না সত্যদা।

আবছা অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকালেন সত্যব্রত। মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন, কেন?

—কি জানি। উদাস শোনাল কিশোর ছেলেটার গলাটা। বলল, একটুও ভাল লাগছে না আমার।

—ভয় করছে? ওর হাত ধরলেন তিনি।

—না, ভয় নয়। এখানে কোন ভয় নেই। কিন্তু…একটু চুপ করে রইলো ও। এক সময় বলল, জানেন বাড়িতে থাকলেই বরং ভয় করে।

অবাক হলেন সত্যব্রত। বললেন, সেকি রে? বাড়িতে থাকলে ভয় করে কেন?

—তাইতো করে। রোজই ভয়-ভয় করে।

—রোজ?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে রাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুকের মধ্যেটায় কেমন কাঁপুনি থাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে জেগে শুয়ে থাকি। কিছুতেই ঘুমোতে পারি না।

—তোর কি…।

বাধা দিল স্বাধীনের ভাই। বলল, না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। কোন অসুখ নয়। আমি বেশ জানি আমার কোন অসুখ করেনি। কারণ অসুখ করার আগে আমি বুঝতে পারি। হঠাৎ আমার কিছু হয় না।

—তাহলে ভয় করে কেন?

—কি জানি। একটু অন্ধকার হলেই কেমন গা ছম ছম করে। মনে হয়…

ছেলেটা চুপ করে গেল। সত্যব্রতও চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, তোর এই ভয় করার কথাটা কাউকে বলেছিলি ?

—শুধু দাদা জানতো। দাদার সঙ্গে শুতুম আমি। একদিন বলেছিলুম দাদাকে। দাদা বলেছিল, ও কিছু নয়। তুই ভয় পাসনি। তবু আমার ভয়টা যায়নি। একটু চুপ করে থেকে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা সত্যদা, আমি ভয় পাই কেন ?

উত্তর দিতে পারলেন না সত্যব্রত। উত্তর তাঁর জানা নেই। হয়তো বা উত্তর তিনি দিতে পারেন। ছেলেটার প্রশ্নের উত্তর মিলেও যেতে পারে। কিন্তু সেটাই যে সত্য তা তিনি নিজে জানেন না।

ভয় আর সন্ত্রাস। পশ্চিমবঙ্গ আজ ভয়ে দিশাহারা—অস্থির। চতুর্দিকে শুধু ভয় ভয় আর ভয়।

ভয় কি তাঁর নিজের নেই ? তিনি কি ভয় করেন না ?

হ্যাঁ, তাঁর নিজেরও ভয় করে। মাঝে মাঝে দুরন্ত ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। একি হচ্ছে ? একি চলেছে আজ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ? কেন আজ এই পরিণতি ?

পরিণতি ! চিন্তা করেছেন তিনি। অনেক আশা-স্বপ্নের বিকৃত রূপ দর্শনে শিউরে উঠেছেন। অনেক নিদারুণ দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত ক্ষুব্ধ করেছে। ক্ষমতার অপপ্রয়োগে গর্জে উঠতে চেয়েছে তাঁর কণ্ঠ। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করেছে···না, তিনি নিজেকে সংযত করেছেন। তিনি ব্যর্থতার হাহাকারে অন্তরে গুমরে কেঁদে মরেছেন। তিনি মনের কাছে মাথা কুটেছেন।

তিনি ভুল করেছিলেন।···

ভুল করেছিল ভারতীয় নেতার দল। ভুল করেছে পশ্চিমবঙ্গের নেতার দলও। দিনের পর দিন ভুল করে গেছেন তাঁরা। ভুল করেছেন জেনেও ভুল করেছেন।

কিন্তু সত্যই কি ভুল করেছিলেন তাঁরা? না, ভুলের মুখোশের অন্তরালে ষড়যন্ত্র করেছেন। দেশ অথবা মানুষ নয়, নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করেছেন দিনের পর দিন।

কোনটা সত্যি? কি করেছেন তাঁরা? কোন স্বার্থে জলাঞ্জলী দিয়েছেন দেশ এবং মানুষের স্বার্থ?

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কংগ্রেস সুদীর্ঘ একুশ বছর ভারত উদ্ধার করে গেছে। সার্থক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে গেছে লক্ষ্য পথে। কিন্তু কোন লক্ষ্যে পৌঁছেছে তারা?

দীর্ঘ একুশ বছরে কংগ্রেসী রামরাজ্যে ছয় কোটি মানুষকে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছে দৈনিক বত্রিশ পয়সা অথবা তার চেয়েও কম আয়ে। চার কোটি মানুষ জীবন ধারণ করেছে দৈনিক পঁচিশ পয়সা অথবা তার চেয়েও কম আয়ে। দু কোটি মানুষের দৈনিক আয় বারো পয়সা অথবা তার চেয়েও কম। জনসমষ্টির ষাট শতাংশের মাথা পিছু মাসিক ব্যয়ের ক্ষমতা ছিল কুড়ি টাকারও কম।

এক কথায় এ তথ্যের প্রতিবাদ করা যায়। আপাত দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনেও হয়না। কিন্তু সরকারী ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে থেকে এ তথ্য নেওয়া। এবং এ তথ্য বেশ কয়েক বছর আগেকার।

তাহলে কি এখন এ তথ্যের পরিবর্তন হয়েছে? সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে কি এখন?

পরিবর্তন নিশ্চই হয়েছে। তবে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়নি, অবণতির চরম সীমায় নেমে গেছে অসংখ্য মানুষ। 'গরীবি হঠাও' শ্লোগানের বুলিতে ভুলে ভোটের বাক্সে তাদের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে। আশা, নিশ্চই তাদের ভাল হবে। তারা সুখের মুখ দেখতে পাবে। তাদের দুঃখ দারিদ্রের অবসান ঘটবে।

গত একুশ বছরে ভারত জোড়া কংগ্রেসী শাসনে লাভবান তাহলে কারা হয়েছে ? কতটুকুই বা লাভবান হয়েছে তারা ?

লাভবান হয়েছে অতি সামান্য সংখ্যক পরিবার। লাভও তাদের এমন কিছু বলার মত নয়। এত একুশ বছরে সাধারণ মানুষ যখন দারিদ্রের শেষ সীমায় পৌঁছেছে, তখন, মাত্র তিন বছরে বিড়লারা তাদের সম্পত্তি বাড়িয়েছে ২৯৩ কোটি টাকা থেকে ৪৩৭·৫ কোটি টাকা ; বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১৪৫ কোটি টাকা।

১৯৫৫ সালের মনোপলি কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় ভারতের ৭৫টি শিল্পপতি গোষ্ঠীর হাতে রয়েছে ১৫৩৬টি শিল্প, যার আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৫০ কোটি টাকা আর তাদের 'ঘোষিত' সম্পত্তির পরিমাণ ২০৬৫·৯৫ কোটি টাকা। এবং আনন্দের বিষয়, দেশের উৎপাদনশীল মূলধনের প্রায় ৪৬·৯ শতাংশই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

অবশ্য এদের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠী ; টাটা, বিড়লা, মার্টিনবার্ন ২২৫টি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে, যার সম্পত্তির পরিমাণ ৮৯০ কোটি টাকা।

জাতীর জনকের স্নেহাভাজন বিড়লারা! জাতীয় নেতাদের স্নেহের পাত্র বিড়লারা! স্বাধীন ভারতে তাদের অনেক জাল জোচ্চুরি জালিয়াতি বহুবার ধরা পড়েছে। বহুবার তারা কর ফাঁকি দেওয়ার বদনামে বদনামী হয়েছে। কিন্তু আইন তাদের কখনো কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। কারণ, স্বাধীন ভারতের বহু নেতাই তাদের রূপচাঁদের গোয়ালের খোঁটায় বাঁধা ছিলেন (এবং এখনও নাকি আছেন!)। তাই ক্ষমা সুন্দর চোখে তাদের সব অপরাধ সহ্য

করা হয়েছিল। এবং নয়া দিল্লীর বিড়লা ভবন নামের ধ্বংস স্তূপটি সরকারকে হস্তান্তরের মূল্য বাবদ পেয়েছে ৫৫৪৮৬৬৪৭ টাকা ৩৫ পয়সা মাত্র (এ টাকা নিশ্চই তারা দেশের উন্নতি সাধনে ব্যয় করবে!)।

ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই ধনীক শ্রেণী ভারতবর্ষের কংগ্রেসী (অভিযোগ অ-কংগ্রেসী নেতাদেরও নাকি) নেতাদের আপনজন। ধনীক শ্রেণীর অন্যায়, অন্যায় নয়। ধনীরা মাঝে মধ্যে একটু আধটু ভুল করে অপরাধ করবে বৈকি। তাদের সে অন্যায় অপরাধের বিচার করতে গেলে চলে? আইন মেনে তো কাজ চলা সম্ভব নয়। ন্যায্য বিচারের কথা আইনের পাতাতেই লিপিবদ্ধ থাক। তাছাড়া এই ধনীক শ্রেণীর সহযোগিতাতেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ধনীদের অর্থই। সে কথা ভুলে তাদের অন্যায়ের বিচার করতে যাওয়া শুধু মাত্র অন্যায় নয়, মহাপাপ।

ধনী শিল্পপতির দল যত অন্যায়ই করুক, যত অসদুপায়েই তারা অর্থ উপার্জন করুক, তাদের গায়ে কাঁটার আঁচড়টি দেবার সাধ্য কারো নেই। কারণ ধনীক শ্রেণী দেশ এবং জাতির মেরুদণ্ড। তাদের সুবিধার জন্যেই তো 'গরীবি হঠাও'য়ের অভিযান। গরীব যদি ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে না সরে যায় অদূর ভবিষ্যতে বিশাল ভারতবর্ষ যে নরককুণ্ডে পরিণত হবে!

ভারতবর্ষ নাকি কৃষি প্রধান দেশ। ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা—কবির কল্পনা, না বাস্তবের সত্য? তবে নির্মম সত্য গ্রামাঞ্চলের অবস্থা। শোচনীয় সেখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা।

গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে নীচেকার পাঁচ শতাংশ গৃহস্থের কোন বিত্ত নেই। তার পরবর্তী পঞ্চাশ শতাংশ, গ্রামীণ সম্পদের মাত্র সাত সতাংশ ভোগ করে।

গ্রামের মানুষের দৈনিক গড়পড়তা আয় ঃ

সর্বনিম্ন ১ কোটি মানুষ ২৭ পয়সা

পরবর্তী ৫ কোটি মানুষ ৩২ পয়সা

পরবর্তী ৫ কোটি মানুষ ৪২ পয়সা

ভারতবর্ষে গ্রামের সংখ্যা ৫·৬৭ লক্ষ। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার বিপুল অংশ গ্রামবাসী। জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল গ্রাম। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল গ্রামোন্নয়ণ। পণ্ডিত নেহেরু এক সময় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি গ্রামের ঘরে ঘরে তিনি পৌঁছে দেবেন আলো। অন্ধকারের দিন শেষ হবে গ্রামে।

কিন্তু অন্ধকারের দিন সত্য সত্যই কি শেষ হয়েছে? গ্রামের মানুষ কি আলোর সন্ধান পেয়েছে?

গত একুশ বছরের হিসাবে ঃ—

(শতাংশের হিসাবে)

রাজ্য	ডাক ঘর নেই	বাজার নেই	ডাক্তার নেই
কেরালা	৫৬·১	৭২·৭	৭৯·১
মধ্যপ্রদেশ	৯১·৬	৯৬·৬	৯৮·২
আসাম	৮৫·২	৮৯·৭	৯৩·৩
মহারাষ্ট্র	৭৯·৫	৯২·৫	৯৩·১
অন্ধ্র	৪৭·৭	৯৪·৬	৮৮·২
মহীশূর	৬২ ৪	৯৬·০	৮৯·৪
পাঞ্জাব	৭৭·০	৯৭·৭	৯১·৬
উড়িষ্যা	৭৮·৫	৯০·৩	৯৪·২
উত্তরপ্রদেশ	৯১·৬	৯৬·৫	৯৫·৮
তামিলনাড়ু	৫০·০	৯৩·২	৯০·৩
পশ্চিমবঙ্গ	৮৭·২	৯৩·৯	৮৯·৪

কংগ্রেসী সুশাসনের একুশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮৭·২টি গ্রামে কোন ডাকঘর নেই। বাজার নেই শতকরা ৯৩·৯টি গ্রামে।

এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার শতকরা ৮৯·৪টি গ্রামে একজন ডাক্তার পর্যন্ত নেই।

কিন্তু নেই কেন?

কেন নেই সে কৈফিয়ৎ হয়তো তলব করা যায় কিন্তু সদুত্তর পাওয়া যাবে না। হয়তো জবাব পাওয়া যাবে, সে জবাব আসবে শান্তিরক্ষক বাহিনীর লাঠি অথবা রাইফেলের মুখ থেকে। কারণ, এই স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী শাসকবর্গের কাছ থেকে মানুষ সুবিচারের পরিবর্তে লাভ করেছে লাঞ্ছনা আর উৎপীড়ন।

বিশ বছরের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার এমনই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই বেকারের সংখ্যা বেশি। কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলো শুধুমাত্র খুলে রাখা হয়েছে বেকারের সংখ্যা গণনার জন্যে। কারণ, নাম লেখানো বেকারদের শতকরা দশজনও কাজ পায়না। নাম না লেখানো বেকারের সংখ্যা যে কত তার হিসাব কে রাখে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নাকি দেশের উন্নতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের মাথা পিছু বাৎসরিক আয়ের মাত্রা দ্বিতীয়. পরিকল্পনায় বেড়েছিল। কম বেড়েছিল শুধু পশ্চিমবঙ্গে।

এই বৃদ্ধির মাত্রা মহারাষ্ট্রে ৩·৭ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৩·৯ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১·৬ শতাংশ।

অথচ শিল্প-শক্তির দিক থেকে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের এই প্রথম স্থানের অধিকারী হওয়া ঘটেছিল বৃটিশ আমলে।

উৎপাদনে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে ৭৫৬ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রে ৬৪৯ কোটি টাকা, বিহারে ২৯০ কোটি টাকা।

কিন্তু রেজিষ্টার্ড কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে

৭ লক্ষ ৯৫ হাজার, বিহারে ২ লক্ষ ৩ হাজার আর মহারাষ্ট্রে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পপ্রধান রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, (এক সময় ছিল, হয়তো এখনো আছে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে থাকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ,...কারণ বর্ণনা করতে গেলে প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়তে হবে, কিন্তু সৎ কংগ্রেসী জাতীয় নেতার দল কখনো প্রকাশ্যে কখনো অপ্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাঁদের নগ্ন নির্লজ্জ সংকীর্ণমনা প্রাদেশিকতাবাদের প্রকাশ যখন ঘটে তখন সন্দেহ জাগে মানুষ নামক জন্তু· ভগবানের কোন্ চিড়িয়াখানায় সৃষ্ট? ভারত নামক উপমহাদেশে এক জাতি, একপ্রাণ, একতা শুধুমাত্র কবির কল্পনা? বাস্তব সত্যে তাকি কোনদিনই সম্ভব হবে না?)।

১৯৫৩ সালের হিসাবে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বাৎসরিক মাথা পিছু গড় আয় ছিল গুজরাটে ১৭৩১ টাকা, ত্রিপুরাতে ১৫৮৬ টাকা, মধ্যপ্রদেশে ১৬৮৫ টাকা, মহারাষ্ট্রে ১৭৩১ টাকা আর শিল্পপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে ১৩৫০ টাকা।

আর আজ?

আজ মাথা পিছু গড় আয় নিশ্চই বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে ভোগ্য পণ্যের দাম। পশ্চিমবঙ্গ অতীতের মত আজও ব্যবসায়ীদের কাছে সুখের স্বর্গ রাজ্য। এখানে আইন আছে, আইন প্রয়োগ কর্তার দলও সদা জাগ্রত কিন্তু আইনের প্রয়োগ এখানে হয় না। কারণ অসাধু ব্যবসায়ীর দলকে রক্ষনাবেক্ষণ করে চলে কোন এক অদৃশ্য শক্তি। ব্যবসায়ীর দলের পায়ে কাঁটার আঁচড় লাগলে বুকে যেন শেল হানে তাঁদের। তাঁরা তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে সব সময় রক্ষা করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সাধু ব্যবসায়ীর দলকে!

তাই তেলে ভেজাল দেওয়া এখানে অপরাধ বলে গণ্য নয়। রেশনের তেলের লেন-দেনকে তাঁরা কৌশলে বন্ধ করে দেওয়ার

ক্ষমতা রাখেন। শিশুর খাদ্য নিয়ে চলে চোরা কারবার। সেই সঙ্গে সরকারী ডেয়ারীর দুধও অনিয়মিত সরবরাহ হয়। কারণ তা নাহলে বাজারের শিশুর খাদ্য কেনার ক্রেতা থাকবে না। রেশনের দোকানে নিয়মিত পাওয়া যায় শুধুমাত্র আতপ চাল (বাংলাদেশে ধান চাষ নাকি হচ্ছে না! অবশ্য সবুজ বিপ্লবে আমরা জয়যুক্ত। আমাদের খাদ্য সংকট মিটে গেছে)। চিনি আজ খোলা বাজারে সুলভে বিক্রী হচ্ছে! কারণ ব্যবসায়ীর দলকে কিছু লুঠে নিতে হবে তো?

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে শুধু নেই-নেই আর নেই। কিন্তু সত্য সত্যই কি নেই? কেন নেই? কাদের জন্যে নেই?

এই অভাব সৃষ্টি করে রাখা, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই কেন এই মর্মান্তিক পাশা খেলা? কাদের স্বার্থে আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবন নিয়ে জঘন্য ষড়যন্ত্র?

বুঝলেন, এ শুধু ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সমস্ত ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এমন শোচনীয় অবস্থা আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না। এমন অবাধ লুণ্ঠন কোথাও চলে না। চলে শুধু এখানে, এই বাংলা দেশে।

সত্যব্রত ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনেছিলেন। শুনে চুপ করেছিলেন।

—আচ্ছা! কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

—প্রতিকার? সত্যব্রত প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন তাঁর কথার।

—হ্যাঁ প্রতিকার। সমস্ত ভারতবর্ষে যা হয় না এখানে তা হয় কেন? যারা এইভাবে দিনের পর দিন কালোবাজারীতে মুনাফা লোঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা কোথা থেকে এত সাহস পায়?

—কালোবাজারী করতে গেলে কি সাহসের প্রয়োজন হয়? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—হয়না? অবাক হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, নিশ্চই সাহসের দরকার হয়।

চুপ করেছিলেন সত্যব্রত।

ভদ্রলোক কিন্তু চুপ করে থাকেন নি। বলেছিলেন, কালোবাজারী যেন একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশি দামে কিনতেও আমরা অভ্যস্থ হয়ে গেছি। কোন জিনিষের বেশি দাম, না নিলেই যেন অবাক হই।

সত্যব্রত হেসে ফেলেছিলেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনি হাসছেন?

বিব্রতবোধ করেছিলেন সত্যব্রত। ভদ্রলোক তাঁর পরিচিত। দোকানের খদ্দের। প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে এক কাপ চা খাওয়ার জন্যে আসেন। একটু কাগজটা দেখেন। বলেছিলেন, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি ঠিক···

—না। আমি কিছু মনে করিনি। তিনি বলেছিলেন, হাসি আমারও মাঝে মাঝে পায়। যখন ভাবি কি করে আমরা বেঁচে আছি?

আশ্চর্য হয়েছিলেন সত্যব্রত। প্রশ্ন করেছিলেন, কেন?

—এর নাম কি বাঁচা? আমরা কি সত্যিই বেঁচে আছি? আপনি বলুন?

—কি বলবো? জানতে চেয়েছিলেন অবাক সত্যব্রত।

—আপনার নিজের কথা।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ, আপনার কথাটাই চিন্তা করুন।

—কি চিন্তা করবো?

—আপনি কি বেঁচে আছেন?

কঠিন প্রশ্ন। অথবা পাগলের প্রলাপ বলে ধরতে পারতেন। কিন্তু পারেননি সত্যব্রত। ভদ্রলোকের প্রশ্নের অন্তর্নিহীত অর্থ উপলব্ধি করে তিনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারেননি, তিনি সত্যই বেঁচে আছেন।

তাহলে ?

চিন্তা করেছিলেন সত্যব্রত। তিনি তাহলে কি, জীবিত না মৃত ? মৃত বলে মেনে নিতে রাজী হননি, আবার জীবিত বলে ভাবতেও সংশয় জেগেছে। আসলে নিজের কথা ভাবতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমি জানতুম আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না। পারবো না আমিও। কারণ আমি আপনি, আমরা জীবিত কি মৃত সে কথা ভাবতে কবে যেন একদিন ভুলে গেছি। তাই কেউ যদি হঠাৎ প্রশ্ন করে জানতে চায় চমকে উঠি, প্রথমটায় বিভ্রান্ত বোধ করি। উত্তর খুঁজতে ব্যর্থ হয়ে চুপ করে থাকি।

—কেন ?

—কেন যে চুপ করে থাকি তারও সঠিক কোন কারণ নেই। হয়তো তার একটাই কারণ আছে, প্রশ্নটা স্বাভাবিক নয়।

হেসেছিলেন তিনি। সত্যব্রতও হেসেছিলেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আপনি আমার কথায় কিছু মনে করলেন না তো ?

—না-না। এতে মনে করার কি আছে ?

—না থাকলেও আছে। জ্ঞান দিলাম ভেবে কিছু মনে করতে দোষ কি ? একটু উল্টো পাল্টা কথা বলার বিপদ তো আজ কম নয়। তাই সব সময় সাবধানে সবদিক বাঁচিয়ে সেই সঙ্গে নিজে বেঁচে চলবার চেষ্টা করি। খোলা চোখে অন্ধত্বের ভান করি। নাহলে…।

কথাটা শেষ করেন নি তিনি। হেসেছিলেন। হাসি মুখেই দোকান থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

সত্যব্রত তাঁর দোকানের ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হ্যাঁরে, ভদ্রলোক যা বলে গেলেন সবই তো বসে বসে শুনলি, কিছু বুঝতে পারলি ?

দোকানের কর্মচারী। কিন্তু সে-ই সব। সেই চা করে, কাপ ধোয় ; দোকান চালানোর সব দায়িত্বই তার। সত্যব্রত শুধু বসে বসে সময় কাটান। কখনো ভীড় হলে ওকে সাহায্য করেন।

তাই সত্যব্রতর কাছে ওর খাতির বড় কম নয়। বয়েস কম হলে কি হয়, বোঝে সবই। ব্যবহারেও বিজ্ঞ। বলেছিল, তোমাকে ভদ্রবাবু বলে গেল তুমি মরে গেছো।

চমকে উঠেছিলেন সত্যব্রত, সে কিরে ?

গম্ভীরভাবে ছেলেটা বলেছিল, ভদ্রবাবু তো তাই বললে।

—তুই ঠিক বলছিস ? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—আমি নিজের কানে শুনেছি।

—আমাকে তাহলে মরা বলে গেলেন ?

—হ্যাঁ, তাইতো বলে গেল। ভদ্রবাবু নকুলকেও এমন কথা সব বলে। অনেক বড় বড় কথা বলে। আমি অনেক দিন শুনেছি।

আশ্বস্ত হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তাহলে তোর ওই ভদ্রবাবু ভদ্রলোকটি এমনই ?

—তুমি কি তাহলে ভদ্রবাবুর কথা শুনে মরে গেছো ভাবছো ?

—তা ভাববো কেন ?

—খবরদার ভেবো না।

সাবধান করে দিয়েছিল ছেলেটা। চিন্তা করতে নিষেধ করেছিল সত্যব্রতকে। কিন্তু তিনি কি ছেলেটার নিষেধ শুনে চিন্তা করা থেকে বিরত ছিলেন ? চিন্তা কি তিনি আগেও করেন নি ?

বহুদিন চিন্তা করেছেন তিনি। বহু বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছেন। মিলিয়েছেন হিসাব। মেলেনি। বারবার ভুল হয়ে গেছে হিসাবে। যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করেছেন।

স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন স্বাধীনতার জন্যে। মুক্ত হবে ভারতবর্ষ। বিদেশী শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। আনন্দে, হাসিতে সুখে সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে মানুষের ঘর। স্বার্থক হবে তাঁদের দুঃখ ভোগ, শতেক লাঞ্ছনা, অন্ধকার কারা-যন্ত্রণা।

কিন্তু একি হল? কোথায় সে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা? কোথায় সুখ সমৃদ্ধির আনন্দ লহরী? এ যে কান্না। আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে মানুষের চাপা দীর্ঘশ্বাস। হতাশা আর গ্লানির প্রতিচ্ছবি।

স্বাধীনতা লাভের কিছুক্ষণ আগে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে এসে পৌঁছেছিল একের পর এক প্রতিটি সংবাদ। স্বাধীনতা হস্তান্তরের প্রতিটি সংবাদ অজানা থাকেনি তাঁদের। কিছু সহকর্মী বন্ধু রোষে ক্ষোভে গর্জে উঠেছিল।

বলেছিল, কংগ্রেস দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। নেহেরু, প্যাটেল ভ্রান্তপথে এগুচ্ছে। মুক্তি নয়, এ বৃটিশের কাছে আর এক দাসত্বের দাসখত।

একদল বলেছিল, ঠিকই করছেন নেহেরু, প্যাটেল। এ ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের অন্য উপায় নেই।

—তাহলে প্রয়োজন নেই এমন স্বাধীনতার।

—তুমি, প্রয়োজন নেই বললেই তো স্বাধীনতা থেমে থাকবে না। যা আসছে তাকে আসতে দাও।

—তাহলে অন্যায়কেই মেনে নিতে বল?

—অন্যায় বলে তুমি মনে করছো কেন? অন্যায় বলে ভাবছো কেন?

—অন্যায়কে অন্যায় বলেই ভাবতে শিখেছি যে।

—মুসলমানরা আমাদের মিত্র নয়। জিন্নার দলকে আলাদা করে দেওয়াই উচিত।

—কিন্তু বন্ধু, মানুষের চেয়ে ধর্ম কি বড়?

—ধর্মের চেয়ে মানুষ কি বড়?

—নিশ্চই বড়। মনুষ্যত্ব বোধই মানুষের বড় ধর্ম। সেই মনুষ্যত্ব-হীনতারই পরিচয় দিচ্ছেন আমাদের নেতার দল। আজ হয়তো তাঁরা দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ক্লান্তিতে অথবা স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদগ্র বাসনায় এ কথা বুঝতে পারছেন না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এর ফল বিষময় হতে বাধ্য।

—তুমি কি গণনা করে দেখেছো?

—গণনা নয়, ইতিহাসের শিক্ষা। দুঃখের বিষয়, এই শিক্ষাকেই মোহের বশবর্তী হয়ে আমাদের নেতার দল অস্বীকার করতে চাইছেন। একটা জাতির সর্বনাশ করছেন।

—সর্বনাশ নয় বন্ধু, এতে বরং ভালই হবে। শান্তিতে বসবাস করতে পারা যাবে।

—এটা কি তোমার কথা?

—না বন্ধু, এটাও ইতিহাসের শিক্ষা। এক সংসারে থেকে অশান্তি ভোগ করার চেয়ে পৃথক সংসার করাই কি শ্রেয় নয়? ভুল যেদিন অনুভব করা যাবে সেদিন আবার আমরা একসঙ্গে হবো।

—ভাঙা কলসী হয়তো জোড়া লাগে, জোড়ার দাগ থাকলেও কাজ চলে, কিন্তু ভাঙা মন আর জোড়া লাগে না বন্ধু। ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ আমরা করছি সত্য কিন্তু শত্রুতার বিরোধ কোনদিনই শেষ হবার নয়। আর…

—বল?

—এই যে বিভেদ, অবিভক্ত ভারতকে টুকরো করে স্বাধীনতা ক্রয় করা, একি দেশের মানুষ চায়?

—না চাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

—চায় কিনা তাই আমি জানতে চাই।

—মনে কর দেশের মানুষ যদি না চায় ?

—না চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

—তারা চায় কি চায় না তা জানার উপায় কি ?

—তাদের কাছে জানতে চাওয়া উচিৎ।

—কারা জানবে ?

—জানবে তাঁরা, যাঁরা তাদের সমর্থনে নেতা হয়েছেন।

—যখন তারা নেতা নির্বাচনের জন্যে ভোট দিয়েছে তখনই তো তাদের ভাল মন্দের দায় দায়িত্ব সবই অর্পণ করেছে নেতাদের ওপর।

—একি তোমার কথা ?

—না, এ ভারতবর্ষের জনগণের কথা।

—না, এ তোমার কথা। এ আমাদের দেশের নেতাদের ভুল ধারণা। নেহেরু, প্যাটেলের কোন অধিকার ছিল না ইংরেজের সঙ্গে আপোষের আলোচনায়, দেশটাকে টুকরো করে স্বাধীনতার নামে দুর্ভাগ্যকে গ্রহণ করা।

দুর্ভাগ্য !

হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনতার নামে দুর্ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছি।

একদিন স্বাধীনতাকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে হয়েছিল সত্যব্রতর। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ স্বগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, আমাদের উদ্বাস্তু সমস্যা নেই। গান্ধীবাদী নেতা চরম নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব কালে। জঘন্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন এই মানুষটি দীর্ঘদিন পরে শয়তানের পার্শ্বচররূপে আবার বাংলার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গান্ধীবাদের সারমর্ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তাঁর পি, ডি, এফ মন্ত্রীসভার স্বল্প কালীন রাজত্বকালে। সেই প্রথম সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সন্ত্রাসের কাল। তাঁরই রাজত্বকালে পুলিশের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটেছিল শিক্ষায়তনে। সেই প্রথম হুগলী জেলার উত্তরপাড়া কলেজে

ছাত্রদের রক্তে চলেছিল পুলিশের হোলী খেলা। সেই প্রথম কলেজ-প্রাঙ্গনে ছাত্রীরা হয়েছিল লাঞ্ছিতা!

পাড়ার একটি ছেলে। উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্র। সত্যব্রতকে বলেছিল, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, কিন্তু আমি মিথ্যে কথা বলছি না; ছাত্ররা নির্দোষ একথাও আমি বলছি না, দোষ হয়তো আমাদেরও আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার কি আমাদের নেই? কলেজ থেকে সামান্য দূরে মাঠে কুশপুত্তলিকা দাহ করেছিলাম আমরা। কিন্তু কলেজের মধ্যে কোনরকম গণ্ডগোল হয়নি। তাহলে পুলিশকে টেলিফোন করে ডেকে এনেছিল কে? (অভিযোগ, যিনি পুলিশ ডেকেছিলেন পরে তিনি ছাত্রদের স্বপক্ষে কথা বলেন। এবং ঘটনার প্রতিবাদ জানান।)! কেন এসেছিল পুলিশ? ছাত্রদের পেটাবার জন্যে? ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করার জন্যে? শাসক তার ক্ষমতা জাহির করতে চেয়েছিল? দেখাতে চেয়েছিল, সভ্য সমাজের, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের ক্ষমতা ন্যায় এবং সত্যের টুঁটি চেপে ধরতে কত সক্ষম? অন্যায় এবং অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কি অপরাধ? শোষণ, পীড়ন, যথেচ্ছাচার গণতন্ত্রের মূল মন্ত্র?

সত্যব্রত উত্তর দিতে পারেননি। উত্তর তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু তিনি একদিন দেখেছিলেন, উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের, আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে।

মৃত্যু ঘটেছে তাঁর নিজেরই।

বাংলা কি মরে গেছে! মরে গেছে বাঙালী? অথবা দীর্ঘদিনের শোষণে-শাসনে বাঙালী আজ ক্লান্ত, অবসন্ন, মৃতপ্রায়? বিস্মৃতির অন্ধকরে তার চেতনার অপমৃত্যু?

বাঙালী মরে গেছে ! বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে। বাঙালী নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বহারা, পথের জঞ্জাল। বাঙালী নামে আজ আর কোন মোহ নেই—আছে কলঙ্কের ছোঁয়া।

কোনটা সত্য ? বাঙালী মরে গেছে ?

বাঙালী আজ আর সম্মানের অধিকারী নয়, বাঙালী আজ ঘৃণার পাত্র। বাঙালীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে আজ চেষ্টা চলেছে ভারত জুড়ে। কিন্তু বাঙালী রাজনৈতিক নেতারা চান সর্ব ভারতীয় হতে। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা তাঁরা বলেন, বলেন না শুধু বাংলার কথা। বাঙালী হয়ে বাঙালীর কথা বলতে জিভ তাঁদের আড়ষ্ট হয়ে যায়।

বাঙলার ঘরে ঘরে অভুক্ত মানুষ। কলে কারখানায় অসন্তুষ্ট শ্রমিক, ক্ষেতে খামারে নিরন্ন কঙ্কালসার চাষী। শিক্ষিত বেকারের দলে ভরে যাচ্ছে দেশ। অশান্তি আর অশান্তি। অশান্তির আগুনে নিয়ত জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ, জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, জ্বালার তার শেষ নেই।

কিন্তু কেন এই জ্বালা ? কিসের জ্বালা ? এ জ্বালা কি সত্য সত্যই দূর হবার নয় ?

সত্যব্রতর বুকেও একদিন জ্বালা ধরেছিল। আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলতে দেখেছিলেন বাংলাকে। অবিভক্ত বাংলাকে। আর আজ ?

আজও বাংলা জ্বলছে। জ্বলছে বাঙালীর ঘর। বাঙালী পুড়ছে, পুড়ছে বাংলা।

এ আগুন কি নেভানো যায় না ? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। এ জ্বালার হাত থেকে সত্যই কি নিস্তার নেই ? বাঙালী কি অবলুপ্তির পথে ?

না, না। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে কণ্ঠ। আত্মবিশ্বাস জেগে

উঠেছে। আলোর সন্ধানে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আলো চাই, একটু আলো। আমি পথ হারিয়েছি!

পথ হারিয়েছি! খুঁজে পাচ্ছিনা পথ! পথ ছিল—আছে।

পথের ধারে বিশ্রাম স্থল ছোট্ট চায়ের দোকানটায় আজ দীর্ঘ ষোল বছর বসে আছেন সত্যব্রত। দোকানের সেই এক ফোঁটা ছোট্ট ছেলেটা বড় হল, বৃদ্ধ হলেন তিনি। কিন্তু সেই ছোট্ট দোকানটা এতগুলো বছর পার হওয়ার পরেও সেই ছোট্টই আছে। চেষ্টা করেননি বড় করার। কারণ তার যথেষ্ট রয়েছে, তিনি ওটাকে বিশ্রাম স্থল করেই রাখলেন।

ভাই একদিন বলেছিল, আর কেন বড়দা, এবার ওটুকু ত্যাগ করো।

হেসে বলেছিলেন, বেশ তো আছি।

ছোট ভাই বলেছিল, মনকে ভুলিয়ে লাভ কি ?

হাসেন নি তিনি। একটু যেন আঘাত পেয়েছিলেন। অভিমান জেগেছিল। আহত ম্লান কণ্ঠে বলেছিলেন, কেড়ে নিতে চাস ?

হেসেছিল ছোটভাই। বলেছিল, কেড়ে নেওয়া যায় ?

—যায় না ? জানতে চেয়েছিলেন।

—হয়তো যায়। কিন্তু···

—কী ?

—ফিরে পেতেও দেরি হয় না।

—কেমন করে ?

—তাতো তুমিই জানো। গম্ভীর হয়েছিল ছোট ভাই। বলেছিল, জীবনের শেষ প্রান্তে আমরা ফিরে পেতে চেয়েছি।

বিপন্ন বিস্ময়ে ছোট ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে দুর্বল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, কি চেয়েছিস তোরা ?

—তোমাকে।

—আমার মনটাকে ?

—তাও।

—কিন্তু…কিন্তু আমি যে…

বলতে পারেননি সত্যব্রত। বলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে সেদিন। বলতে পারেন নি, মনটাকে আমি যে হারিয়ে ফেলেছি। শুধুমাত্র কায়াটা নিয়ে কি করবি তোরা ?

অথবা বলেননি, শুধু দেহটাই আছে, মনটার মৃত্যু ঘটেছে ; পারবি মনটাকে ফিরিয়ে আনতে !

শুধু হেসেছিলেন। শব্দহীন হাসি। সে হাসিতে প্রাণের স্পর্শ ছিলনা। নীরব ছিল ছোট ভাই। স্তব্ধ-ম্লান দৃষ্টিতে চেয়েছিল প্রিয়জনের মুখের দিকে।

সেদিনও চেয়েছিল ওরা। অসংখ্য মানুষ। ভাগ্যহত মানুষের দল অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সামান্য করুণালাভের আশায় করজোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল বিদেশী শাসন মুক্ত ভারতভূমিতে। স্বাধীনতার মূল্য বাবদ আর এক বাংলায় (?) রেখে এসেছিল জীবনের স্বপ্ন সাধনা, প্রাণের ধন জন্মভূমি ! কেউ রেখে এসেছিল স্বামী, কেউবা সন্তান, কন্যা মাতা পত্নীকে। ছেড়ে এসেছিল সোনায় ভরা শস্যক্ষেত, স্বপ্নের নীড়, প্রাণের সম্পদ গৃহদেবতাকে। দিয়ে এসেছিল বুকের রক্ত, নারীত্বের অমূল্য সম্পদ—স্বাধীনতার মূল্য !

খণ্ড বঙ্গে স্থান নেই। স্থান কোথা ? আশ্রয়—নিরাপত্তা ? জীবন ধারণের জন্যে একমুঠো অন্নের ব্যবস্থা ?

আছে। আছে আশ্রয়, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবেনা। খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমস্ত ব্যবস্থাই করা হয়েছে বাংলার ছিন্নমূল মানুষগুলির জন্যে। স্বাধীনতার উত্তরাধিকারী কংগ্রেস আর তার উপযুক্ত নেতার দল বাংলার উদ্বাস্তু মানুষগুলির প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন

নি। পাঠিয়ে দিয়েছেন জঙ্গলে, রুক্ষ মরুতে। ভাগ্যবানের দল গিয়ে পড়েছে মনুষ্য বাসের উপোযোগী ভূমিতে। আপন শক্তিতে গড়ে নিয়েছে ভবিষ্যৎ। সুখী হয়েছে, শান্তি পেয়েছে।

কিন্তু কতজন? কতজন পেয়েছে বাঁচার অধিকার? যারা পায়নি, পেলনা; তাদের অপরাধ কি? কোন অপরাধে তারা অপরাধী?

বাঙালী!

বাঙালী বলেই কি তাদের বঞ্চিত করা হল?

কঠিন প্রশ্ন! সত্যব্রতকে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল একদিন। তীক্ষ্ণ বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল প্রশ্নকারী, শুধু বাঙালী বলেই কি অসহায় নিরাশ্রয় মানুষগুলোর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন আপনারা?

—একথা কেন বলছ? বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি।

—বলবার যথেষ্ট কারণ কি নেই? বাঙালী শরণার্থীরা আপনাদের কৃপার পাত্র?

—না, না।

—না যদি, তাহলে কেন তাদের নিয়ে জুয়া খেলা চলছে?

— কে বললে একথা?

— যেই বলুক, অথবা আমিই বলছি।

—এ তোমার ··

বাধা দিয়েছিল সে। বলেছিল, রাগের কথা বলছেন?

—না, তা নয়। তবে বাঙালী শরণার্থীর সংখ্যা তো নেহাৎ কম নয়। যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে কিছুদিন সময় নিশ্চই দিতে হবে বৈকি।

—কতদিন?

হেসে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, এবার কিন্তু রাগের কথা বলে মনে হচ্ছে আমার।

—আপনার যাই মনে হোক না কেন। আমার জিজ্ঞাসা,

কোনদিনই বাঙালী উদ্বাস্তুদের সমস্যা আপনারা যথাযথভাবে সমাধান করবেন কি ?

—না করার মধ্যে কি থাকতে পারে ?

গম্ভীর হয়েছিল সে। বলেছিল, আমার কথাগুলো শুনতে হয়তো খারাপ লাগছে আপনার। আমার প্রশ্নগুলোও হয়তো ভদ্রতার লেশহীন। হয়তো আমাকে আপনার মনে হচ্ছে, আমি লোকটা প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট। আমার সম্পর্কে আপনার যাই মনে হোক, আমার কথাগুলো আপনার যতই খারাপ লাগুক, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙালী উদ্বাস্তুদের নিয়ে পাশা খেলা চলছে।

—কিছু মনে কোর না, তোমার এ কথা মনে হওয়ার কারণ ?

—কারণ কি একটা ?

সত্যব্রত কথা বলেননি।

সে একটু চুপ করেছিল। একটু ভেবেছিল। তাঁকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করেছিল। বলেছিল, শুধু বাংলাই তো ভাগ হয়নি। ভাগ হয়েছে পাঞ্জাব। তাহলে বাঙালীই শুধু মরলো কেন ?

—পাঞ্জাবের মানুষও মরেছে।

—আমি সে মরার কথা বলছি না।

—তাহলে ?

—আমি জানতে চাই বাঙালীকেই শুধু মারা হচ্ছে কেন ?

সত্যব্রত চুপ করেছিলেন।

প্রশ্নকারী বলেছিল, ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলের সব সমস্যা কেমন করে মিটে গেল, জানেন তো সত্যব্রতবাবু ?

সত্যব্রত তবুও নীরব ছিলেন।

হেসেছিলেন সে। রঙ্গভরা কণ্ঠে বলেছিল, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ দেখেছেন ? দেখেন নি। কিন্তু আশ্চর্য প্রদীপের গল্প নিশ্চয়ই শুনেছেন, কি অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিল সেই ছোট্ট প্রদীপটা। আলাদীন সেই প্রদীপের অধিকারী হয়ে তার কত সমস্যার সমাধান

করেছে। নিঃস্ব রিক্ত অবস্থা থেকে ধনী-শ্রেষ্ঠ হয়েছে। তেমনি স্বাধীনতা নামের আশ্চর্য প্রদীপের ক্ষমতার অধিকারী, আমাদের জাতীয় নেতার দল, কেন্দ্র নামক দৈত্যের সাহায্যে পশ্চিমাঞ্চলের দশ লক্ষ তেষট্টি হাজার শরণার্থীকে তিরিশ লক্ষ একর জমি দিয়েছেন, গ্রামাঞ্চলে সাত লক্ষ বাসস্থান দিয়েছেন, শহরে দু লক্ষ সাতাশি হাজার বাড়ি, দোকান ঘর ইত্যাদি দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো দিয়েছেন পঁয়ষট্টি কোটি টাকা। না-না, ধার হিসাবে নয়, এককালীন সাহায্য হিসাবে।

সত্যব্রত শুনেছিলেন।

সে বলেছিল, বাঙালী উদ্বাস্তুদের কি কিছু দেয়নি? কে বললে দেয়নি; নিশ্চই দিয়েছে। অনেক দেওয়া হয়েছে। কি-কি দিয়েছে জানেন? বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দৌলতে বহু বেকারের চাকরী দিয়েছে এবং এ চাকরী পাকা, এই চাকরী করতে করতেই তাঁরা তাঁদের সরকারী চাকরীর কার্যকাল শেষ করতে পারবেন (কোন সন্দেহ নেই)। দিয়েছে, সরকারী ভাগ্য বিধাতাদের মারফৎ অমানুষিক ব্যবহার, অবহেলা, মাঝে মধ্যে মৃদু উৎপীড়ন। দিয়েছে, বেঁচে থাকার জন্যে চালের চোরাই চালানকারী হওয়ার সুযোগ (স্ত্রী-পুরুষ, কিশোর কিশোরী, বালক বৃদ্ধ, এমনকি শিশুরা পর্যন্ত)। উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণে অবাধ অধিকার, পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি, সমাজ বিরোধী হওয়ার মনোবল, কি দেয়নি ; সব তো দিয়েছে। শুধু দেয়নি সামান্য একটা জিনিষ, বাঁচার প্রকৃত অধিকার।

আবার হেসেছিল সে। সত্যব্রতকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে বলেছিল, আপনি হয়তো আমার কথায় অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। ভাবছেন, আমি আমাদের জাতীয় সরকারের অন্যায় সমালোচনা করছি। সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই। আমিও স্বীকার করছি সে কথা। সমালোচনা করা অন্যায় বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, শুধু সমালোচনায় কিছু হয় না—

সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে হয়, সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হয় ; দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আত্মত্যাগ, দুঃখ স্বীকার করে নিতে হয়। সত্যব্রত বাবু, এ আমার সমালোচনা নয়, আমার 'কি পেয়েছে' তার হিসাব। সেই হিসাব কি মিলেছে ? যোগফল কি নির্ভুল ? পক্ষপাতিত্বের চিহ্নমাত্র কি কোথাও নেই ? নেই কি বঞ্চনার এতটুকু অবহেলা ?

—কিন্তু···। কিন্তু কি যেন বলতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

সে হেসেছিল। ম্লান হাসিতে তাঁর শীর্ণ মুখমণ্ডল কুঁচকে উঠেছিল। বলেছিল, বলতে লজ্জা করে সত্যব্রত বাবু। ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের কেন্দ্র করে লাভের মুনাফা লোঠার ছড়াছড়ি দেখে লজ্জায় ঘৃণায় মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। একটা কথাই বারবার মনে হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামী সত্যব্রতর কত অভাব। চায়ের দোকান না করে উদ্বাস্তুদের দৌলতে বাড়ি গাড়ি করতে কি আপনি পারতেন না ? অথবা বন্যায় ভাসা মানুষগুলোর জন্যে সরকারী ত্রাণ সামগ্রীতে সম্পদ বাড়াতে ? কোথায় বাধা ছিল আপনার ?

কথাটা শুনে হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ত্রাণ সামগ্রী আমাকে তো দিতনা ?

—কেন দিত না ?

—কেন দেবে তাই বল ? আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।

— কেন চলে এলেন আপনি ?

—আর কি ভাল লাগে ? বয়েস হয়েছে না ?

— অজুহাত ?

—না সত্যি। আমি ক্লান্ত। চাই বিশ্রাম। তবে···

—কী ?

—অন্যকে বঞ্চিত করতে আমি পারতাম না বোধ হয়।

—কেন ?

হেসেছিলেন সত্যব্রত। কিন্তু জোরে হাসতে পারেন নি। হেসে

কথা বলতে চেষ্টা করলেও তাঁর কণ্ঠস্বরটা ম্লান শুনিয়েছিল। বলেছিলেন, আমার বিবেকে বাধতো।

বিবেক! সত্যব্রতর বিবেক। বিংশ শতাব্দীতে বিবেকের দোহাই দিচ্ছেন সত্যব্রত।

কিন্তু বিবেক, না অক্ষমতা? অন্যকে বঞ্চিত করার মধ্যেও ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে। ক্ষমতার প্রয়োজন হয়। না হলে বঞ্চিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ধরা পড়ে অপদস্থ হতে হয়।

তাঁর নিজের কি ক্ষমতা ছিল না? চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। ক্ষমতা তাঁর ছিল। সুযোগও এসেছিল। কিন্তু সে সুযোগকে তিনি গ্রহণ করেন নি। করলে কি ভাল করতেন, তাও ভেবেছেন। নিজের ভাল হয়তো হত—অন্যের মঙ্গল করা সম্ভব হয়ে উঠতো না। কারণ? অক্ষমতা। বিবেকের দংশন জ্বালা অনুভব করেছিলেন তিনি।

অথচ বিবেকহীনতার নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশে প্রতিবাদের কণ্ঠ গর্জে ওঠেনি তাঁর। একাকী দূরে সরে এসেছেন।

এক বন্ধু একসময় কথায় কথায় তাঁকে বলেছিল, তুমি ভুল করলে সত্যব্রত। সবকিছু ছেড়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণ করা তোমার উচিৎ হয়নি। অভিমান করে দূরে সরে থেকে কি লাভ হল বলতে পারো?

গম্ভীর সত্যব্রত জানতে চেয়েছিলেন, আমি না থাকায় লোকসান কতটা হয়েছে তা কি তুমি জান?

বন্ধু বলেছিল, আমি তোমার নিজের কথাই বলছি সত্যব্রত।

—আমার নিজের কথা? আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, নিজের কথা ভাববার সময় অথবা সৌভাগ্য আমার এখনও পর্যন্ত হয়নি।

—কিন্তু নিজের কথাটাও ভাবতে হয় বন্ধু। নিজের কথা যদি

ভাবতে না সময় পাও, অন্যের কথা ভাববে কখন ? যা চিন্তা করবে তা হবে অসম্পূর্ণ।

—নিজেকে দিয়ে বিচার করতে বলছো ?

—আমার তো মনে হয় ··

বাধা দিয়েছিলেন তিনি। হেসে বলেছিলেন, অমন চিন্তা করার শক্তি ভগবান আমাকে দেননি।

—ভগবানকে জড়াচ্ছ কেন ?

—জড়াচ্ছি এইজন্যে, আত্মার অবমাননা মহাপাপ। লোভ লালসার চোরাগলিতে হোঁচট খেতে আমি রাজি নই। আমি অন্ততঃ নিজের কাছেও সৎ থাকতে চাই।

—সকলের মাঝে কি সৎ থাকা সম্ভব নয় ?

—কজন পারে ?

—তুমি বলছো···

—সকলকে অসৎ বলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, অসতের সংস্পর্শে সৎও অসৎ হয়ে যায়। অসতের ভীড়ে সৎ যায় হারিয়ে। কি লাভ ?

—তুমি যে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে ?

— সাধু হয়ে বাঁচার চেষ্টা করছি।

—অসাধুও সাধু হয় সত্যব্রত।

তিনি উত্তর দেননি। অনাবশ্যক কথা বলতে ইচ্ছা করেনি তাঁর আর।

বন্ধু বলেছিল, অন্ততঃ আমি তোমার ভাল চেয়েছিলাম সত্যব্রত।

—শুধু আমার ভাল চাওয়াই তো ভাল নয়। আমি একটা মাত্র মানুষ। দেশ এবং অসংখ্য মানুষের মঙ্গল কামনাই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

বন্ধু উত্তর দেয়নি। সত্যব্রত জানতেন, উত্তর সে দিতে পারবে না। ক্ষমতা যখন করায়ত্ব হয় সেই ক্ষমতার সাহায্যে ক্ষমতাসীনের দল আপন-আপন স্বার্থসিদ্ধির পথই প্রথম খোঁজে। সেই সঙ্গে বার-

বার লক্ষ্য রাখে ক্ষমতা ঠিকঠিক বজায় আছে কি না। আর সেই সঙ্গে বাধার সৃষ্টি হলে সে বাধাকে যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, অপসারিত করতে এতটুকু দ্বিধা করে না। শুধুমাত্র নিজ লক্ষ্য পূরণ, আপন স্বার্থ, দেশ জাহান্নামে যাক, দেশের মানুষের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের মধ্যে দেশ এবং দেশের মানুষের কথা কজন চিন্তা করেছেন? কজন দেশের উন্নতিতে, মানুষের দুর্দশা মোচনে ব্রতী হয়েছেন? নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন শুধুমাত্র দেশ এবং মানুষের জন্যে?

অথচ দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবেন বলে, এগিয়ে এসেছেন অসংখ্য মানুষ। প্রতিশ্রুতির প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছেন সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ। মানুষের আশা-উদ্দীপনা আকাঙ্ক্ষাকে আপন কাজে লাগিয়েছেন। যোগ্য নেতার সম্মান নিয়ে নির্বাচন নামক বৈতরণী পার হয়েছেন অকুতভয় মাঝির মত। কিন্তু তারপর?

কাণ্ডারী হওয়ার মনোবল আর দেখা যায়নি তাঁদের মধ্যে। প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বকে অস্বীকার করেছেন। গুছিয়ে নিয়েছেন আপন-আপন স্বার্থ। নেতার সম্মানে, আপন স্বার্থ রক্ষার জোয়ালে বাঁধা পড়তে বাধ্য হয়েছেন।

কাণ্ডারী হওয়ার যোগ্যতা কি তাঁদের ছিলনা? বাংলাকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল?

হয়তো ছিল না।

তাহলে বাংলাকে রক্ষা করা হলনা কেন? কেন বাঙালীকে আজ জীবনভর দিন যাপনের গ্লানি বহন করে বেঁচে থাকতে হয়? শুধু ক্ষত-ক্ষত আর ক্ষত! অজস্র ক্ষত চিহ্নে ভরে গেছে আজ পশ্চিমবঙ্গের বুক। সারা শরীরে শুধু মালিন্য আর ব্যাধি।

কিন্তু কেন এমন হল? দুরারোগ্য ব্যাধি কি কোনদিনই

নিরাময় হবে না ? সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা কি আর সম্ভব নয় ? বাঁচতে না পারার কারণই বা কি ?

কারণ কি একটা, অসংখ্য কারণ। ব্যাধিও একাধিক। হাজার সমস্যায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। সে যেন আজ অতীত দিনের ফেরিওয়ালা। সারা শরীরে তার মলীন আয়না ঝোলানো। একদিন হয়তো স্পষ্ট-উজ্জ্বল ছিল। আজ ম্লান, বিবর্ণ।

কিন্তু বিবর্ণ একদিনে হয়নি। রঙ তার ধূসরতা লাভ করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতীতের প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা বাংলা হারিয়েছে তার ঐতিহ্য, তার সম্মান, তার স্বপ্ন। তার বাঁচার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা আজ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। সে মরতে চলেছে।

কিন্তু কেন মরতে চলেছে ? কেন সে বাঁচতে পারল না ?

কেন তার এই মৃত্যুপথে যাত্রা ?

কারণ অসংখ্য। সঠিক কারণ নির্ণয় হয়তো সম্ভব নয়। হয়তো বা অক্ষমতা।

অভিযোগ অসংখ্য। ষড়যন্ত্রের প্রমাণও যথেষ্ট। প্রতিকার ছিল না কি ? ছিল। প্রতিকার করা হয়নি। কেন ? কেন অন্যায়কে সমর্থন করা হয়েছে ? কেন মেনে নেওয়া হয়েছে অবিচার ?

অবিচার ! অসংখ্য অবিচারের পসরা তুলে দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মস্তকে। ষড়যন্ত্রের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখা হয়েছে বাংলাকে। অনেকাংশে দায়ী, বাংলার ভাগ্য বিধাতার দল।

বাঙালী নেতা সেজেছে। নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কিন্তু নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেনি।

খণ্ড ভারতবর্ষ এক। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক এবং অভিন্ন। কিন্তু সত্য সত্যই কি তাই ? ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ কি (নেতার দলও) একজাতি-একপ্রাণ ? একতার সাধনা কি সত্য সত্যই সফল হয়েছে ? সার্থক হয়েছে ভারত স্বপ্ন ?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিন।

ভারত-প্রধান পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আনন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বাংলার পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি থেকে অর্জ্জিত এক্সপোর্ট ডিউটির বেশির ভাগটাই নিঃশঙ্কচিত্তে কেটে নিলেন। আগে, পরাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ডিউটির বখরার অনুপাত নির্দিষ্ট ছিল। স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে বেশির ভাগটা নিল দিল্লী—ফাউ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গও কিছু পেল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে উপস্থিত। তাঁরা শুনলেন, দেখলেন, কি বুঝলেন তা শুধু তাঁরাই জানেন। কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদ, অথবা যুক্তির অবতারণা করা পর্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেননি। এমন কি ভারত-প্রধান তাঁর কাজটি সম্পন্ন করার আগে কেন তাঁদের একবার জানালেন না তাও তাঁরা জানতে চাননি, বঞ্চিত করার মর্মজ্বালা বা নিজেদের অপমানিত বোধ করা তো অনেক দূরের কথা!

নেতার দল সেদিন নির্বাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলেন। হয়তো বা চেয়েছিলেন ভারত-প্রধানের কাছে এগিয়ে যেতে। চিন্তা করেছিলেন আপন স্বার্থের কথা। অথবা ভেবেছিলেন দলীয় সংহতির কথা। দলীয় সংহতি বিনষ্ট হবে, বদনাম রটবে, প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়তে হবে।

কোনটাই চাননি বাঙালী নেতার দল। শুধু মানিয়ে চলেছেন। মেনে নিয়েছেন অন্যায়, রফা করেছেন সংহতির সঙ্গে। দেশ অথবা মানুষ নয়, দল। দলের বদনাম হবে!

দল নয়, দেশ এবং মানুষের জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন একজন। দেশ এবং দশের মঙ্গলের কথা একজনই প্রথম অনুভব না করলেও, দশের এবং দেশের মঙ্গল যাতে হয়, তার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু

মুসলমানের সর্ব্বনাশা ভাঙন রোধের চেষ্টা করেছিলেন তিনিই। ধন সম্পদ নয়, দারিদ্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, ব্যথিত করেছিল। চেয়েছিলেন মুক্তি। আপোষহীন সংগ্রামের পথ করেছিলেন লক্ষ্য।

কিন্তু ধনীর কাছে বিকিয়ে যাওয়া নেতার দল তাঁর ঔদ্ধত্যকে মেনে নিতে পারেননি। দাসত্বের মনোভাবে গড়া মন বিদেশী প্রভুদের বিরাগ ভাজন হতে আশঙ্কা বোধ করেছিল। ব্যক্তি সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল নেতাদের কণ্ঠ। জাতির জনককে দলে টেনে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করেছিলেন তাঁরা। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে।

বাংলা দেশের আর একজন মানুষ। সর্ব ভারতীয় নেতা নন, একজন বাঙালী, বিধানচন্দ্র রায়। শুধুমাত্র একজন বাঙালী তাঁর একক শক্তিতে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঙালীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

আর কেউ?

হয়তো আরো কেউ আছেন। কিন্তু কি করেছেন, কতটুকু করেছেন তা জানা যায়নি। আর কারো চেষ্টাই সম্পূর্ণ হয়নি। মঙ্গল হয়নি বাঙালীর। বরং অনেকেই অমঙ্গলের ঘনঘটা ঘটিয়েছেন সাধ্যানুযায়ী।

বাঁচতে চেয়েছে বাংলা। বাঁচতে চেয়েছে বাঙালী।

বাঁচার দুরন্ত ইচ্ছাটুকু সম্বল করে রিক্ত নিঃস্ব বাঙালী এসে দাঁড়াল আর এক বাংলার দ্বারে।

এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও। শুধুমাত্র বাঁচার জন্যে তারাও ছুটে এসেছিল। ছুটে আসা সার্থক হয়েছিল তাদের। তারা বাঁচতে পেরেছিল। বাঁচতে পারল না শুধু বাঙালী।

কেন পারল না? কেন বাঙালীর মাথায়, কিছু লোভী স্বার্থপর

সুবিধাবাদী মানুষের পাপের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল? কেন অধিকার হারা করা হল বাঙালীকে?

অভিযোগ! মিথ্যা অভিযোগ! সব মিথ্যা!

মিথ্যা ১৯৫০ সালটা!

মিথ্যা লিয়াকত-নেহেরু চুক্তি!

চুক্তি! অদ্ভুত চুক্তি। অদ্ভুত সেই চুক্তির সর্ত। সেই চুক্তির সর্তে বাঙালী শরণার্থীদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত হল।

সুন্দর বন্দোবস্ত, চমৎকার বন্দোবস্ত। বাস্তুহারা বাঙালীদের চার হাত তুলে জয়ধ্বনি দেওয়ার মত বন্দোবস্ত! বাঙালী জাতির জীবন সার্থক। বাঙালী উদ্বাস্তুরা সব পাবে, যা ছিল সব ফিরে পাবে। তাদের পথে পড়ে থাকতে হবেনা, অনাহারের জ্বালায় দগ্ধাতে হবেনা, সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল বলে আক্ষেপ করতে হবে না। সব ফিরে পাবে তারা। সেই ব্যবস্থাই করেছেন পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু। শুধু··

হ্যাঁ, শুধু তাদের ফিরে যেতে হবে। যদি তারা আবার পূর্ববঙ্গে ফিরে যায়, তাহলে তারা তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনর্দখল পাবে। নচেৎ···

তারপর ১৯৫৪ সাল।

তৈরি হল 'কমপেনসেশন অ্যাক্ট'। তৈরি করলেন কেন্দ্রীয় সরকার। তৈরি করা হল বাঙালী উদ্বাস্তুদের জন্যে। আইন করে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা পাকা করা হল। একি বাঙালী উদ্বাস্তুদের কম সৌভাগ্যের ব্যাপার!

কিন্তু বাঙালী উদ্বাস্তুদের এই সৌভাগ্যটাকে মাত্র একজন বাঙালী সহ্য করতে পারলেন না। এই সৌভাগ্যের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল মাত্র একজন বাঙালীর কণ্ঠ। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর পদত্যাগ নিস্ফল হল। প্রতিবাদের প্রতিকার কিছু

হল না। প্রতিবাদ জানাতে আর কোন বাঙালী নেতা পদত্যাগ করলেন না।

অতএব……

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সত্য সত্যই কি বাঙালী উদ্বাস্তুদের কিছু দেয়নি, অথবা তাদের জন্যে কিছুই করে নি? নথিভুক্ত বিয়াল্লিশ লক্ষ বাঙালী উদ্বাস্তুর মধ্যে সর্বভারতীয় সমস্যার সমাধানে সর্বভারতে সাড়ে চার লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে তেইশ লক্ষ মানুষের স্থান। আর সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ মানুষ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করছে।

আজ আবার স্থুরু হয়েছে মানুষের মিছিল। সত্তর থেকে আশি লক্ষ মানুষ এসেছে। এখনও আসছে। আরও নাকি আসবে!

কিন্তু কেন এই উদ্বাস্তু আগমন? না, পাকিস্তানে বাঙালী তার অধিকার স্থাপন করতে চেয়েছিল। বাঙালী সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল, তার ন্যায্য দাবী। কিন্তু দাবী তার দাবী মেনে নেওয়া হয়নি। জঙ্গী-শাসকচক্র বুটের তলায় পিষে ফেলতে চেয়েছে বাঙালীকে, ঘরছাড়া হতে বাধ্য করা হয়েছে বাঙালীকে। নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে ছুটে এসেছে বাঙালী।

কিন্তু এই বাঙালী কারা? অধিক পরিমাণে কারা ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে?

হিন্দু, পাকিস্তানের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা স্থুরু করতে বাধ্য হয়েছে। একমাত্র আশা ভরসার স্থল তাদের ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পোঁছেছে তারা।

কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় কি মিলেছে? মিলবে কি কোনদিন?

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যা। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান তিনি কেমন করে করবেন?

একাত্তরে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, কোথায় স্থান হবে তাদের?

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা কি পাবে তাদের অনিশ্চিত জীবনে পূর্ণ অধিকার? না, সেই পূর্বগামীদের মতই তাদের জীবন নিয়েও সুরু হবে ছিনিমিনি খেলা?

ছিনিমিনি খেলা কোথাও কোথাও সুরু যে হয়নি তাও নয়। জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ উদ্বাস্তুদের স্থান দিতে অস্বীকার করেছে। যুক্তির অবতারণাও অবশ্য করা হয়েছে সেই সঙ্গে।

অতএব, উদ্বাস্তুরা যখন বাঙালী তখন সমস্যাটাও বাংলার। প্রথমে শোনা গিয়েছিল জাতীয় সমস্যার দায়দায়িত্ব সবই কেন্দ্রের। কিন্তু এখন পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে উদ্বাস্তু ত্রাণের ব্যয় ধরা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে, কেন্দ্র নয়, বাঙালী উদ্বাস্তুদের সব দায়দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গকেই বহন করতে হবে।

প্রতিবাদ অথবা প্রতিকার?

কে করবে? অতীতে হয়নি, আগামী দিনেও হবে না। কারণ, দলের দলী থাকতে হলে বহু অন্যায়ের সঙ্গেই আপোষ করে চলতে হয়। রাজনীতির দাবা খেলায় ভুল চালের স্থান নেই। নিজের জায়গা ঠিক রাখাটাই বড় কথা। অসংখ্য মানুষের জন্যে বৃথা চিন্তা করে লাভ কি? ভগবান জীব দিয়েছেন, আহার কি তিনি দেবেন না?

জ্বলন্ত চিতার মধ্যে স্বাধীনের দেহটা পুড়ছে। কে একজন মাঝে মাঝে বাঁশ দিয়ে কাঠগুলো ঠেলে ঠিক করে দিচ্ছে। পোড়া দেহটা থেকে ছাই ঝেড়ে দিচ্ছে।

দেখছিলেন সত্যব্রত। এইভাবে মৃতদেহের সংকার দেখা তাঁর জীবনে এই প্রথম। মা যখন মারা যান তখন বয়েস ছিল অল্প।

তাঁকে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। বাবা, মায়ের মুখাগ্নি করতে রাজি হননি। ছোট মামা মায়ের মুখে আগুন দিয়েছিলেন।

বাবার মৃত্যুর সময় বাড়ি ছিলেন না। বোনের বাড়ি থেকে খবর পেয়ে যখন এসে পৌঁছেছিলেন, দাহকার্য তখন প্রায় শেষ। একটু পরেই চিতায় জল ঢালা সুরু হয়েছিল। তাঁকেও জল ঢালতে বলেছিল ভাইয়ের শ্বশুর। রাজি হননি তিনি। অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

ভাই হয়তো তার শ্বশুরের কাছে শুনে থাকবে ব্যাপারটা। অনেকদিন পরে বাবার চিতায় জল ঢালতে অস্বীকার করার কারণ জানতে চেয়েছিল। সত্যব্রত সেদিন গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন, জল ঢাললেই কি নিবৃত্ত হত।

আশ্চর্য হয়েছিল ছোট ভাই। জানতে চেয়েছিল, কিসের কথা তুমি বলছ দাদা ?

ম্লান কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, আমার জন্যে বাবার মনের দুঃখের আগুন !

নীরব ছিল ছোট ভাই। তিনি বলেছিলেন, আগুনকে নেভানো যায়না।

কথা বলেনি ছোট ভাই। হয়তো বুঝতে পেরেছিল তাঁর মনের দুঃখটা।

দুঃখ ! চিন্তা করেছেন তিনি। অনেকের মনের দুঃখের ধারণাটাও তাঁর জানা। অনেকেই তাঁর জন্যে দুঃখ বোধ করেন। কিন্তু তিনি নিজে কি কোনদিন দুঃখ বোধ করেছেন ? দুঃখ বোধের অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় আলোড়িত হয়েছে কি ?

'না' বললে হয়তো সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু দুঃখ বোধটা তাঁকে কোনদিনই সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করতে পারেনি। তিনি দুঃখের দরিয়ায় কোনদিনই ভেসে যাননি। শুধুমাত্র নিজের জন্যে তিনি কখনো দুঃখীত হননি।

কিন্তু দুঃখীত তিনি হয়েছেন। লজ্জা জেগেছে। নির্লজ্জতার নগ্ন প্রকাশে তিনি কখনো ভেবেছেন, মানুষের মূল্য বোধহয় কিছু নেই। মানুষ কত সস্তা হয়ে গেছে।

মানুষ বলতে, মানুষের জীবন। মানুষের জীবনের মূল্য কিছু নয়। মূল্য অর্থের। অর্থহীন মানুষ যেন মানুষ নয়। পশুরও জীবনের মূল্য আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অতি সাধারণ দীন দরিদ্র মানুষ অধম জীব মাত্র।

অথচ স্বাধীন ভারতে জাতীয় নেতাদের মুখে বিশাল ভারতের অসংখ্য অধম জীবগুলির কথাই শোনা গেছে বার বার। আজও শোনা যায়। হয়তো আগামী দিনেও শোনা যাবে। কিন্তু মানুষ নামধারী অসংখ্য জীবগুলি অধমই থেকে যাবে।

অথচ দীন দরিদ্র অসংখ্য মানুষগুলি সত্য সত্যই অধম ; না, অধম করে রাখা হয়েছে ? দেশ নাকি অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে ! ধনী আরো ধনী হয়েছে। সম্পদে ভরে গেছে তার ঘর কিন্তু গরীব অর্দ্ধাহারী নিরন্ন অসহায় মানুষগুলোর স্বাধীনতা লাভের সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর পরেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। যে অন্ধকারে তারা ছিল, সেই অন্ধকারেই তারা রয়ে গেল। কোন্ কারণে ?

ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা দারিদ্র। দারিদ্র সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু। তাই প্রধান শত্রু দারিদ্রকে দূর করার জন্যে স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিন থেকে আমাদের জাতীয় নেতার দল কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেশ বিদেশের সহযোগিতা, সাহায্যে পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা ফেঁদেছেন। কিন্তু কতটুকু দূর হয়েছে দারিদ্র ? কতটা লাভবান হয়েছে মানুষ ? সত্যই হয়েছে কি ?

হয়েছে। ধনী হয়েছে আরো ধনী, দরিদ্র নিঃস্ব রিক্ত পথের ভিখারী। ধনতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনীর অর্থক্ষুধা প্রবল আকার ধারণ করেছে। দরিদ্র হারিয়েছে তার বাঁচার অধিকার।

একথা এক বন্ধুকে এক সময় বলেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, এপথ ঠিক পথ নয়। এপথে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তোমরা ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছ।

বন্ধু বলেছিল, কিছু মনে কোরনা সত্যব্রত। তুমি আমার বন্ধু। একসঙ্গে দেশের জন্যে কাজ করেছি। তাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ, এমন দুঃসাহস তুমি অন্য কোথাও প্রকাশ কোরনা।

বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। জানতে চেয়েছিলেন, দুঃসাহস তুমি কাকে বলতে চাইছো?

—তোমার অপপ্রচারকে।

—অপপ্রচার? ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, তুমি তাহলে বলছো আমি তোমাদের নামে অপপ্রচার করছি?

—তোমার কি মনে হয়, তা কি তুমি করছো না?

—ভুলকে ভুল বলা অপপ্রচার নয়।

—কিন্তু ভুল বলাটাই তো তোমার দুঃসাহস।

—তাই বলে ভয়ে মিথ্যাকে মেনে নেব?

—চুপ করেও তো থাকতে পারো?

—ক্ষমতার অধিকারী বলে তোমরা, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করে যাবে? ভুল জেনেও ভুল করছো? ভুলকে সংশোধন করে নিয়ে সঠিক পথে চলবে না?

—আমাদের চলাটাতো মিথ্যে নয়?

—কি প্রয়োজন অমন চলার?

—তবু তো চলছি।

—কিন্তু কাদের জন্যে তোমরা চলছো?

—কাদের জন্যে অর্থে?

—কাদের কথা তোমরা উঠতে বসতে বলছো? কাদের দুর্গতি মোচনের প্রতিজ্ঞা নিচ্ছ বার বার?

বন্ধু একটু নীরবে চিন্তা করেছিল। গম্ভীর মুখটা ক্রমশঃ প্রশান্ত

আকার ধারণ করেছিল। মৃদু হাসিমুখে বলেছিল, সত্যব্রত, তুমি আমার শুধু সহকর্মী ছিলে না, বন্ধুও ছিলে, তাই না ?

—একদিন তাইতো মনে হত। বলেছিলেন তিনি।

—আজও কি তুমি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করো ?

—করি।

—তাহলে তোমাকে আমি সত্য কথাটা বলতে পারি ?

অবাক সত্যব্রত জানতে চেয়েছিলেন, সত্য কথা বলবে ?

—সত্য কথা বলতে, সত্য কথা। সেখানে মিথ্যা নেই। মনের কথা অথবা গোপন কথাও বলতে পারো। মুচকি হেসেছিল বন্ধু। বলেছিল, যদিও নিজের স্ত্রীকেও এসব কথা বলা যায় না। মন্ত্রগুপ্তির শপথ পাঠের মর্যাদা লঙ্ঘন করা মহা অপরাধ। তবু, তুমি শুধুমাত্র বন্ধু বলেই একথা বলছি।

—আমাকে সাবধান করে দেওয়া ?

—আরে না-না। হেসেছিল বন্ধু। বলেছিল, সাবধান করে দেওয়াটা শুধু তোমার ভালর জন্যেই। আমার তরফে তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই। কার্যক্ষেত্রে আমরা দুজনে দুদিকে চলে গেছি সত্য, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বকে কেমন করে অস্বীকার করবো ? তোমার অন্যায়ের শাস্তি আমার পক্ষে দেওয়া কি সম্ভব ? বন্ধু কখনো বন্ধুকে শাস্তি দিতে পারে ?

—কিন্তু···

বাধা দিয়েছিল বন্ধু। হেসে বলেছিল, বুঝতে পারছি তোমার কথা। আমি পারবো না, আমি যদি তুমি হতে, যদি কোন অপরাধ করে তোমার কাছে হাজির হতাম, তুমিও পারতে না।

—না, অপরাধ করে কোন সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা আমি কোনদিনই করবো না।

—আমি জানি সে কথা। হেসেছিল সে। বলেছিল, আমি

বিশ্বাস করি তুমি কোন অন্যায় করতে পার না। কিন্তু আমাদের করতে হয়।

বিস্মিত সতব্রত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। স্খলিত কণ্ঠে বলেছিলেন, এসব তুমি কি বলছো?

—খুব সত্যি কথা। সম্মানের শিখরে আরোহণ করা বলে একটা কথা আছে না, সেই শিখরে আরোহণ করেছি। আর সেইজন্যেই, বলতে পারো প্রয়োজনে মিথ্যালাপে অভ্যস্ত হতে হয়েছে।

—কেন?

—না হলে যে পপাত ধরণীতলে। অসম্মানের আবর্তে হাবুডুবু খেতে হবে। সেটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—তাই বলে...। কথাটা শেষ করতে পারেন নি তিনি। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল তাঁর।

—হ্যাঁ বন্ধু, তাই। দিনে সাত থেকে সতেরো বার যদি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করে দেশের মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে হয়, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে হয়, করতে হবে। করতে হবে এইজন্যে, এটা আমার ডিউটি।

—এসব কি বলছো তুমি?

—সত্য কথা।

—তাহলে দেশের মানুষ?

—থাকবে।

—দরিদ্র?

—তাও থাকবে।

—দেশ?

—কিছু মাটি, বাকীটা জল।

—তোমরা কাদের জন্যে?

—মানুষ নিজের জন্যেই সত্যব্রত। অবশ্য ··

—কি?

—তোমার থিয়োরীতে নাও হতে পারে।

সত্যব্রত অনেকক্ষণ স্থির নিস্পন্দ পাষাণের মত চুপ করে বসেছিলেন। তারপর অবসাদগ্রস্থ শরীরটাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

বাধা দিয়ে বন্ধু বলেছিল, চললে কোথায়, তোমার কাজটা যে হল না।

দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে ম্লান একটু হাসি ফুটেছিল তাঁর ওষ্ঠে। বলেছিলেন, কাজ আমার হয়ে গেছে।

—সেকি! অবাক হয়েছিল বন্ধু।

—হ্যাঁ। দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন তিনি, তোমার জবাব আমি পেয়েছি।

--কি?

—ক্ষয় রোগরোধ যাতে হয়, নিঃসম্বল দরিদ্র মানুষটা যাতে নিজে বেঁচে বাঁচাতে পারে তার সংসারকে, সেইজন্যেই আমার তোমার কাছে ছুটে আসা। ফ্রি-বেডে একটা মানুষকে বাঁচার সুযোগ হয়তো তুমি আমাকে করে দেবে, সে ক্ষমতা তোমার আছে। কিন্তু ক্ষয়রোগের দুরারোগ্য ব্যাধিটাকে তো দূর করবে না। সেইজন্যেই চলে যাচ্ছি। একটা মানুষকে মিথ্যা বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

—কিন্তু সে যখন জানতে চাইবে .....

বাধা দিয়ে তিনি বলেছিলেন, বলবো, তোর মরাই ভাল।

—সত্যব্রত!

—মৃত্যুর জুয়ায় যখন মেতেছ, তখন মিথ্যে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি বল? গরীবের বাঁচার অধিকার কোথায়?

বন্ধু ডেকেছিল, সত্যব্রত!

চলে এসেছিলেন সত্যব্রত। যার জন্যে গিয়েছিলেন, সেও বাঁচেনি। হয়তো সে বাঁচতো না।

রোগে ভুগে একজন মরেছে। মরছে একজন-একজন করে।

কিন্তু অনাহারে মরছে কতজন ? অর্দ্ধাহারে কতজনের দিন কাটছে ? অশিক্ষার অন্ধকারে কতজন মাথা খুঁড়ছে ?

আর যারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, তারা ?

শিক্ষা নাকি জীবনকে প্রস্তুতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষা মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। অন্ধ মানুষ আর মূর্খ মানুষ দুই-ই সমান। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় ?

শিক্ষার নামে যে অশিক্ষার অন্ধকারে ছাত্রদের ডুবিয়ে রাখা হয়েছে তার মূল্য কতটা ? কতটা লাভবান হবে আগামী দিনের ভাবী নাগরিকরা ? সমাজ এবং রাষ্ট্র কী পাবে তাদের কাছ থেকে ?

সত্যব্রতর চায়ের দোকানে অল্প-বিস্তর আলোচনা সব বিষয়েই হয়। রাজনীতি থেকে সাহিত্যচর্চা, সিনেমা থিয়েটার সব কিছুই। কখনো তিনি নীরব শ্রোতা হন। কখনো বা দু-একটি কথা বলেন।

তর্ক বেঁধেছিল শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে। দু'জনের একজনও কম যান না। একজন বলেছিলেন, আজ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার একমাত্র কারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি। ছাত্রদের কোন দোষ নেই।

—তা থাকবে কেন ? দ্বিতীয়জন বলেছিলেন, ছেলেরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আড্ডা দেবে, সিনেমা দেখবে, মস্তানী করবে, রাজনীতি করবে। তারপর পরীক্ষার সময় এসে গেলেই কিছু ছেলে বইপত্তর ওল্‌টাবে, কিছু না উল্‌টেই পরীক্ষা দিতে যাবে। পরীক্ষায় বসে বই দেখে লিখবে। লিখতে না দিলেই চেয়ার টেবিল ভাঙা হবে, বোমা ফাটানো হবে, ছাত্র ইউনিয়নের সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে স্কুল, বন্ধ করে দেওয়া হবে কলেজ।

-- এইটাই কি কারণ ?

—নিশ্চই।

—না, এটাই একমাত্র কারণ নয়। তার কারণ, তুমি শুধুমাত্র

বাইরে থেকে বিচার করেই ক্ষান্ত হয়েছ। মূল কারণ অত সামান্য নয়।

—অসামান্য কারণ তাহলে কিছু আছে?

—নিশ্চই আছে। শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্রটিই হল তার মধ্যে প্রধান। আমাদের দেশটা নাকি গরীব। মানুষগুলোও স্বচ্ছল অবস্থার অধিকারী নয়। কিন্তু একটি ছেলেকে পড়ুয়া শিক্ষিত করতে কি খরচ তার হিসাব রাখ? পাঠ্যপুস্তক গন্ধমাদন সাদৃশ! মান উচ্চগামী। কারণ হিসাবে, আমেরিকা রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ওইভাবেই নাকি ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলা হয়। শিক্ষামন্ত্রী নিজে ভ্রমণে বেরিয়ে দেখে এসেছেন। যা সয় তাই রয়। যা সইবে না, তাই রাখার চেষ্টা। বিশৃঙ্খলা বল, বা অরাজকতা বল, তার আরো অনেক কারণ আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকেছে দুর্নীতি, ঢুকেছে কালোবাজারী।

—তাহলে ছাত্রদের কোন দোষ নেই?

—আর ঢুকেছে ব্যাপক রাজনীতি।

—সেটাও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত নাকি?

—না, সেটা আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের উপহার।

—ছাত্ররা তাহলে কোন দোষেই দোষী নয়?

—ছাত্রদের দোষ, তারা অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যায়, তারা ছাত্র। কিন্তু কেন এই অবস্থার উদ্ভব, সেটা ভেবেও দেখতে হবে।

—তার অর্থ, তুমি বলতে চাইছো, একমাত্র দোষে দোষী গভর্ণমেণ্ট?

—দোষী তো নিশ্চই। তার কারণ, গভর্ণমেণ্টের সুষ্ঠ শিক্ষা নীতির অভাব। সেই সঙ্গে অভিযোগ করা যায়, স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অরাজকতার সৃষ্টি করেছে, তাঁবেদারের দলে শিক্ষাক্ষেত্রকে পূর্ণ করে তুলে। স্বাধীন কোন মতামত আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষা সংস্কারের নামে শিক্ষা সংহার করা হয়েছে। শিক্ষাকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কালোবাজারী।

—একটা নতুন কথা শোনালে।

—শিক্ষাক্ষেত্রে কালোবাজারী কথাটা তোমার কাছে নতুন হলেও যারা কালোবাজারী করছে তারা কিন্তু বেশ পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। শিক্ষা যদি শুধুমাত্র পরীক্ষা পাশ হয় তাহলে খুব একটা পড়াশুনা করার প্রয়োজন নেই।

—না পড়লে পাশ করবে কেমন করে?

হেসেছিলেন ভদ্রলোক, ওইখানেই তো আসল রহস্য বন্ধু। ভানুমতীর খেল।

—গুল মারছো।

—তা অবশ্য মনে করতে পারো। বয়েস কত হল?

—কার?

—আমার নিশ্চই নয়।

—এখানে বয়েস্রের কি সম্পর্ক?

—বলনা, শুনে রাখি।

—বাহান্ন হল প্রায়।

—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। বি, এ পাশ করেছিলে বোধহয় বছর তিরিশ আগে?.

অবাক ভদ্রলোক কিছু বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, তা হয়তো।

—এম, এ-টা দেবে?

আঁতকে উঠেছিলেন তিনি, এই বয়েসে?

—লেখাপড়া করার কোন বয়েস আছে নাকি। ছাত্রকাল কি কখনো শেষ হয়, না জ্ঞান লাভের কোন সীমা পরিসীমা আছে? তুমি যে-কোন বয়েসে, যে-কোন সময় পড়াশুনা সুরু করতে পারো।

—সেই সময়টাই যে নেই ভাই। সংসার সমুদ্রে এখন রীতিমত হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। পড়াশুনাটা করবো কখন?

—কেন অফিস যাওয়ার সময় ট্রেনের কামরায়।

—তুমি কি জোক্ করছো?

—রীতিমত সিরিয়াস আমি। শুধুমাত্র পরীক্ষায় বসতে পারলেই হল। পাশ করা কোন্ শালা আটকায় তোমার। জীবনের শেষ প্রান্তে পোঁছে এম এ. পাশ করবে তুমি। যদি তেমন তেমন জান, তাহলে কাগজে খবর বেরুবে, চাই কি ছবিও ছাপা হতে পারে। কি রাজি ?

—কিন্তু···

—কোন কিন্তু নয় ব্রাদার, শুধুমাত্র তুমি রাজি কিনা তাই জানাও। সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। সব দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি হাসি মুখে। তোমাকে আমি একচান্সে পাশ করিয়ে দেবো।

—কিন্তু কি করে করাবে তা একটু বলবে কি ?

—তুমি রাজি থাকলে দেখতেও পাবে। শুধু কিছু পয়সা খরচা হবে।

— কত ?

—পাঁচ সাত শো, হাজারও হতে পারে।

—বল কি ?

—আঁতকে উঠলে যে ? পড়বে না অথচ পাশ করবে। তার ওপর পয়সাও খরচ করবে না, তাকি হয় নাকি ?

—কিন্তু অত পয়সা লাগবে কেন ?

—লাগবে এই জন্যে, কোচিং ক্লাসে ছাত্র হয়ে নাম লেখাতে হবে। তবে পড়তে তোমাকে হবে না। শুধু মাঝে মধ্যে গিয়ে দেখা করতে হবে। পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র নিয়ে আসতে হবে। ব্যাস।

—এসব হয় নাকি ?

—হয় মানে, রীতিমত হচ্ছে। ঢাক পিটিয়ে হচ্ছে। সব পয়সার খেল্ ভাই। পয়সা ফেললেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এমন কি ডক্টরেট উপাধিও পাওয়া যায়। ডঃ গোবর্দ্ধন হাজরা ! যদি ডক্টরেট

হতে চাও, তোমার গবেষণার বিষয় আমি ঠিক করে দেব। গৃহিণীর রন্ধন শিল্পটির সঙ্গে তোমার তো পরিচয় আছে।

শুনেছেন সত্যব্রত। যদিও ভদ্রলোক দুজন অধিকাংশ সময় নিজেদের মধ্যে রসালাপ করেছেন, কিন্তু সত্যের কিছু চিত্রও ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। তাঁর মনে পড়েছে একজনের কথা। একটি মানুষ একদা বলেছিলেন, "বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি শুধু কেরানী সৃষ্টির নিখুঁত একটি যন্ত্র বিশেষ। আমাদের গুরুমহাশয়েরা ছেলেদের তোতা পাখী করিয়া তুলিয়াছেন। রাশি রাশি বিষয় ঢুকাইয়া তাহাদের কোমল মস্তিষ্কগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। হা ভগবান! গ্র্যাজুয়েট হইবার জন্য আজ কি হুড়াহুড়ি, কি উন্মাদনা। তারপর স্নাতকোত্তর কালে দেখা যায় যে অন্ন সংস্থানের জোগ্যতাটুকু অর্জন করা হয় নাই। এইরূপ উচ্চশিক্ষার কি সার্থকতা? ইহা লোপ পাইলেও কিছু যায় আসে না। এই ধরণের শিক্ষা অপেক্ষা খানিকটা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে অনেক ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে চাকুরীর প্রত্যাশায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া যে কেহ সহজেই কাজের যোগাড় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারিত। কেহ কতকগুলি পরীক্ষা পাশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে পারিলেই তাহাকে তোমরা শিক্ষিত মনে কর? যাহা জনসাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপকরণ যোগাইতে সহায়তা করে না, তাহাদের মধ্যে চরিত্রবল, লোকহিতৈষনা এবং সিংহের মত সাহসে উদ্বুদ্ধ করেনা, তাহা কি আর শিক্ষা? স্কুল কলেজে যে শিক্ষা তোমরা আজকাল পাইতেছ তাহা শুধু অজীর্ণ রোগগ্রস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। তোমরা শুধু যন্ত্রের মত কাজ করিয়া চলিয়াছ, আর জীবন যাপন করিতেছ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো। শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি, যথার্থ কার্যকরী জ্ঞান অর্জন; বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেশন করে, তাহা নহে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্রগঠন হয়, মনের

বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে।”

স্বামী বিবেকানন্দের কথাগুলি আজকের নয়, দীর্ঘদিন আগে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের সব থেকে বড় অভিযোগ বোধ হয়, তারা আমাদের মেরুদণ্ডহীন করে গোলামে পরিণত করেছিল। তাদের কাজের সুবিধার জন্যে, তাদেরই দাসত্বের খাতায় দাসখত লিখে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমরা।

আজ তারা নেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু কোনো স্বাধীন চিন্তাধারার জন্মলাভ কি আমাদের মধ্যে ঘটেছে?

আজ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হয়েছে। টেকনিক্যাল স্কুলের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু সবই তো সেই দাসত্ব করার জন্যে। শিক্ষা আজ দাসত্বের মাপকাঠি। বিদ্যালয় দাসত্বালয়। হ য ব র ল-এর ব্যাপক কারবার চলেছে সেখানে। দশ বছরের ছাত্রের মাথায় একুনে বত্রিশ খানা বইয়ের বোঝা। শিক্ষা থাকছে অসম্পূর্ণ।

শিক্ষাবিদের দল নীরব দর্শক। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তাঁদের সাধ্য কি পরিবর্তন ঘটান। সরকারী শিক্ষা দপ্তরের রথী মহারথীর ক্ষমতা যে অসীম। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা কিছু বুঝুন অথবা না-ই বুঝুন, ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তাঁরাই। অতএব…

স্বাধীনের দেহটা পুড়ছে। আর ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক পরে ওর জীবনের অস্তিত্বটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাবে। একটা পরিবারের মধ্যে স্মৃতি হয়ে থাকবে শুধু ওর নামটা। সন্তানহারা ওর মা হয়তো ওর নামটুকুও মুখে আনতে চাইবেন না। বুকের মধ্যে শুধু আগুন জ্বলবে তাঁর। দুঃখের আগুনে নিয়ত দগ্ধ হবেন তিনি।

মধ্যরাত্রি। আকাশের তারাগুলো ক্লান্ত, ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু

আগে কটা শিয়াল ডেকে উঠলো পরপর। শ্মশান ঘিরে বট অশত্থের ডালে ডালে ডানা ঝাপটালো কটা পাখি। শকুনের বাচ্চাটার আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

স্বাধীনের কাকা সত্যব্রতর কাছে এসে দাঁড়াল। ম্লান কণ্ঠে বলল, সত্যদা একটু চলুন।

সত্যব্রত ওর মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, কোথায় ?

—একটু রাস্তার দিকে। বলল স্বাধীনের কাকা, একটু চা টা···

—না, আমি চা খাব না। তোমরা কিছু খেয়ে এসো।

—কিন্তু আপনিও তো সেই সকাল থেকেই···

—তাতে কি। বললেন, তোমরা যাও।

স্বাধীনের কাকা কর্তব্য করতে চাইছে। অথবা তার নিজেরও ভুলে থাকা ক্ষুধা তৃষ্ণাটা মনে পড়েছে। সত্যব্রতর নিজেরও মনে পড়েছিল একসময়। একটু খেতে ইচ্ছা করেছিল তাঁর। কিন্তু এখন সে ইচ্ছাটা আর অবশিষ্ট নেই। এখন তিনি শুধু একটু একা থাকতে চান।

স্বাধীনের কাকা বলল, বাবু চল্।

স্বাধীনের ভাই বলল, না।

—কিছু না খেলে অসুখ করবে।

—আমার খিদে নেই।

—তবু কিছু খাবি চল্।

—না কাকা, তোমরা যাও।

স্বাধীনের ভাই গেল না। গেল না ও রবাবা। গেলেন না আরো কজন। ওর বন্ধুদের একরকম জোর করে নিয়ে গেল কাকা।

ওরা চলে যাবার পর কিশোর ছেলেটাকে সত্যব্রত বললেন, কাকার সঙ্গে গিয়ে কিছু খেয়ে এলে ভাল করতে বাবু।

—কেন ?

—তোমার কাকা ঠিকই বলেছেন, কিছু না খেলে শরীর খারাপ হতে পারে।

স্বাধীনের ভাই তাঁর মুখের দিকে চাইলো। তাঁকে দেখল। বলল, উপোস করা তো এই আমার প্রথম নয়। আমরা বাড়ির সবাই আগে কতদিন তো উপোষ করেছি।

সত্যব্রত ছেলেটার মুখের দিকে চাইলেন।

ও মৃদুকণ্ঠে বলল, একবার বাবার অসুখের সময়, কাকার কারখানায় ষ্ট্রাইক চলছে; সে সময় আমরা কতদিন একবেলা খেয়েছি, কতদিন কিছুই খাইনি।

—ওঃ, বলে চুপ করে রইলেন সত্যব্রত।

ছেলেটা কিন্তু চুপ করলো না। বলল, জানেন, কাকীমাকে সেই সময় কাকীমার বাবা নিয়ে যেতে এসেছিলেন। কাকীমা যায়নি। কাকার ছেলে পিণ্টুকে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন। কাকীমা তাও পাঠান নি।

—কেন? অন্যমনস্ক সত্যব্রত জানতে চাইলেন। প্রশ্নটা বেরুবার পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন, এটা তাঁর ঠিক হল না।

স্বাধীনের ভাই বলল, বারে, আমরা না খেয়ে থাকবো আর কাকীমার ছেলে তার মামার বাড়ি গিয়ে থাকবে তা কখনও হয় নাকি? সেইজন্যেই কাকীমা পাঠায়নি। প্রায় মাস তিনেক কোন-দিন একবেলা, কোনদিন সামান্য কিছু খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে। একদিন বাবা ভাল হয়ে অফিস বেরিয়েছে। প্রায় সাত আট মাস পরে কাকার কারখানা খুলেছে।

সত্যব্রত চুপ করে রইলেন। ছেলেটাও কথা বলল না আর।

আট মাস পরে সেসময় স্বাধীনের কাকা অজিতের কারখানা খুলেছিল। তাঁর কাছে কিছু ধার পড়েছিল ওর। একদিন লজ্জায় দোকানে চা খেতে যাওয়া বন্ধ করেছিল।

প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি তিনি। মনে করেছিলেন কোন

কারণে হয়তো আসতে পারে না। একদিন রাস্তায় দেখা হতে জানতে চেয়েছিলেন সেকথা।

সত্য কথাই বলেছিল অজিত, কারখানা খোলার কোন আশা আর নেই। মিথ্যে ধার বাড়িয়ে লাভ কি?

বলেছিল, কারখানা যদি কোনদিন খোলেও আমরা কতটা লাভবান হবো তা একমাত্র ভগবান জানেন। তবু আমাদের জিততে হবে। ধর্মঘট করে দিনের পর দিন আমরা জিতছি, কিন্তু লাভবান কতটা হলাম? আজ থেকে বছর এগারো আগে একশো কুড়ি টাকা মাইনেতে কাজে ঢুকেছিলাম, আজ মাইনে পাই প্রায় দুশো সত্তর আশি টাকার মত। কিন্তু আজ ডাঁয়ে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

—কেন? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—কেন কুলোবে বলুন, কি করে কুলোবে? বাজারের অবস্থাটা দিনের পর দিন কেমন হচ্ছে। নেই-নেই তো লেগেই আছে। যাও আছে তা গলাকাটা দর। আমাদের মাইনে বাড়ছে আর সেইসঙ্গে জিনিষ পত্তরের দরও চড়ছে। আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 'মাইনে বাড়াও' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। একবারও ভাবছি না, শুধু মাইনে বাড়লে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

—তাহলে তোমরা আন্দোলন করতে নামছো কেন?

—না নেমে উপায় কি বলুন। নামা-না-নামার মালিক আমরা নাকি? আমাদের নেতার দল কি করতে আছেন। আমরা যদি আমাদের ইচ্ছা মত চলতে চাই তাহলে তাঁরা কি ঘাস কাটতে আছেন? আমাদের বাঁচা মরার সব দায়িত্ব তো ইউনিয়নের। ইউনিয়নের নেতারাই সব।

—তাহলে তোমার কি মনে হয় তাঁরা ভুল করছেন? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—ভুল করছেন, এটুকু বলার দুঃসাহস অথবা জ্ঞান আমার নেই।

তবে···ম্লান একটু হেসে বলেছিল, আমি আমার কথাটা আপনার কাছে বলতে পারি।

—আমার কাছে কেন ?

—তাহলে কাকে বলবো, আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারীকে ?

—বলতে তো পারো।

—তাহলে আমার চামড়া থাকবে ?

—তার মানে ?

—প্রথমে আমি হবো বুর্জোয়া, মালিক পক্ষের দালাল। আমার ডেডবডি হয়তো বন্ধ কারখানার গেটে লটকে দেবে।

—কেন ?

--আজকাল এমনি হাওয়া বইছে। যুক্তি-টুক্তির ধার এখন ধারে না। ওসব পুরানো হয়ে গেছে। আমাদের নেতার দল মাইনে বাড়াবার আন্দোলনে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিন্তু দ্রব্য মূল্য যাতে কমে তেমন আন্দোলনের দিকে ভুলেও পা বাড়াবেন না। কারণ, মাইনে বাড়লে আমাদের নগদ প্রাপ্তি যোগ ঘটে, আমরা আনন্দে আত্মহারা হই, বিজয় উৎসব পালন করি। কিন্তু যদি সত্য সত্যই আন্দোলনের মাধ্যমে দ্রব্য মূল্যের দাম কমানো সম্ভব হয়, নগদটা তো আমাদের হাতে আসবে না। আমরা জয়ী হলাম কিনা বুঝবো কেমন করে বলুন ?

সত্যব্রত চুপ করেছিলেন। স্বাধীনের কাকা বলেছিল, এখন আমি যদি এসব কথাগুলো আমাদের নেতাদের বলতে যাই, তাঁরা হয়তো বলবেন, আমরা কিছু বুঝিনা, যত বোঝ তুমি ? তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—এভাবে কি বাঁচা যাবে ? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

হেসেছিল স্বাধীনের কাকা। বলেছিল, সেটাতো ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

—আর বর্তমানে ?

—আমাদের বাঁচার লড়াই।

—সেটা কি?

—মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন, ধর্মঘট। আমরা আন্দোলনের নামে চিৎকার করবো, মালিক-শ্রমিক বৈঠক হবে ঘন ঘন। নেতারা একবার করে মালিকের সঙ্গে বৈঠক করে এসে আমাদের সামনে গলার শিরা উপশিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে বুঝিয়ে বলবেন, ভাইসব, শ্রমিকের রক্তচোষা বুর্জোয়া জানোয়ার বলছে, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনার থেকে বেশিই তারা দিচ্ছে। আমরা যদি আমাদের সংগ্রামকে আরো জোরদার করে তাদের মুনাফার ভাগে থাবা বসাবার চেষ্টা করি তাহলে তারা তাদের ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গ থেকে তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু, আমরা,···তাদের হুমকির কাছে মাথা নত করিনি। আমরা আমাদের দাবীতে অনড় অটল। যদি জীবন যায় তাও আমরা সহ্য করবো, তবু আমাদের সংগ্রামের পথ থেকে এতটুকু সরে আসবো না। মজুরী বৃদ্ধির দাবী আমাদের ন্যায্য দাবী। এ আমাদের জেহাদ। এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে। আমরা জিতবোও। বল ভাইসব, শ্রমিক ঐক্য···আমাদের ধ্বনি, জিন্দাবাদ।

—তারপর? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—তারপর? ম্লান একটু হাসি ফুটেছিল স্বাধীনের কাকার ওষ্ঠে। আমাদের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কখনো মালিক লে অফ, ক্লোজারের নোটিশ টাঙায়; আবার কখনো বা আমরা ধর্মঘটের পথে নামি। গ্লাস ফ্যাক্টরীর চুল্লি একদিন নেভে। যে চুল্লি আবার নতুন করে না বসিয়ে কোন উপায় থাকেনা। আমাদের সংগ্রামের দিন এগিয়ে চলে। দুই থেকে পাঁচ, পনেরো-বিশ, মাস শেষ হয়। বউয়ের গয়না বাঁধা দিই প্রথম মাসে। দ্বিতীয় মাসে কারবারীর হাতে পায়ে ধরে, চেয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করি। তারপর ঘটি বাটি, ঘরের একটা একটা করে জিনিসগুলো। শুরু হয় অর্দ্ধাহার থেকে অনাহার। শুরু হয় অশান্তি। আমরা কখনো

বা 'আধুনিক ভিক্ষায়' বেরুই। অবশেষে একদিন ধর্মঘট মেটে। কুড়ি টাকা মাইনে বাড়ে আমাদের। নেতার দল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, আমাদের জয়। আমরা ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলি। তারপর…

—তারপরও আছে?

—থাকবে না? হেসেছিল স্বাধীনের কাকা। বলেছিল, মালিক তার অতি মুনাফার ভাগ থেকে আমাদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে, পরের বছরে আগের বছরের তুলনায় কয়েক লক্ষ্য টাকা বেশি লাভ করে।

—বল কি?

—তাইতো হচ্ছে।

— কি করে হচ্ছে সেটা?

—কেন হবে না! ব্যবসায় সে লোকসান দেবার জন্যে ব্যবসা করতে নামেনি। সে চায় লাভ। অতি লাভের দিকে তার সব সময় লক্ষ্য। আমাদের সংগ্রাম তাকে অতি লাভের মুনাফা লোঠার সুযোগ করে দেয়। পণ্যের দাম বাড়ায় সে। যে গ্লাসের দাম ছিল চল্লিশ পয়সা, আমাদের কুড়ি টাকা বাড়ার পর কুড়ি পয়সা গ্লাস প্রতি দাম বেড়ে হয় ষাট পয়সা। আর কুড়ি পয়সার দায়টা পড়ে আপনাদের ঘাড়ে। আর যখন আমরা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে পাই তখন বাজারের জনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে। অতএব আবার লড়াইয়ের প্রস্তুতি।

এই প্রকৃত চিত্র আজ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের। শ্রমিক আন্দোলন, শিল্পে অশান্তি এখানেই নাকি বেশি। ঘেরাও, ধর্মঘট, ক্লোজার, লে-অফ এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই সঙ্গে নিত্য দিনের পণ্যের দর বাড়া। যেন এ-এক হট্টমেলার দেশে পরিণত হয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থায় ভারপ্রাপ্তদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করা ভিন্ন আর যেন তাঁদের কাজ নেই তেমন। বে-আইনী ফাটকায় জোচ্চুরি জালিয়াতিতে দেশটা যে-

নরকে নেমে যাচ্ছে, তা দেখবার দায়িত্ব তাঁদের হলেও, দেখেও দেখেন না তাঁরা। কারণ কি একটা, অসংখ্য কারণ। অন্যতম কারণ, বোধহয় তাঁদের পূজার কোন ত্রুটি হয় না।

ফাটকাবাজের দল অবাঙালী সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাগ্যবিধাতা আজ তারাই। তারা ব্যবসা করে দরাজভাবে। দরাজ গলায় চালায় ফাটকার লেন-দেন। তারা জানে, বাংলার প্রাণের মধুতে তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতে হলে ন্যায় নীতি বিসর্জন দিতে হবে। সেইজন্যেই তারা কাকডাকা ভোরে গঙ্গাস্নানে যায়, গরম জিলিপি ভাজিয়ে গো-মাতার সেবা করে, নগদ থাপ্পড়ে বন্ধ করে প্রতিবাদী মুখ। আর নগণ্য জনসাধারণ? তারা তো সৎ সোনার ছেলে! মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ করবে না, অথবা বয়কট করবে না—নগদ মূল্যে পকেট উজাড় করে ঘরে ফিরে গবেষণা করবে, বীরত্বের প্রকাশ ঘটাবে ভাল মানুষ গৃহিণীর উপর। তিনি রাঁধেন বলেই না তাকে বেশি দামে জিনিস কিনতে হয়! অতএব দোষ তাঁর। গিন্নী বলেন, ভালরে ভাল, রাঁধি আমি, কড়া-খুন্তি-হাতা পড়ে পড়ে জং ধরছে তাই না রাঁধতে হয়! কড়া-খুন্তি বলে, বাঃ বেশ তো, (কড়া-খুন্তি রূপকথার যুগে নিশ্চই কথা বলতো। আজ পশ্চিমবঙ্গও এক রূপকথার জগৎ।) যত দোষ আমার! কিন্তু দোষটা আমার কোথায় শুনি? শেষে সব দোষ গিয়ে পড়ে বেচারী উনানওয়ালার ঘাড়ে। সে বলে, সব দোষ যদি আমার হয়, আমি দোষী। উনান তৈরি করি পেটের জন্যে। কারণ, পেটের জ্বালা বন্ধ করতে হলে উনান তৈরি না করা ছাড়া আমার গতি কোথায়? পেটটা নিয়েই যে জন্মেছি!

তাহলে সব দোষের দোষী পেট! ক্ষুধার জন্যেই সব! একদল ক্ষুধাকে অবলম্বন করে সম্পদের পাহাড় জমাচ্ছে। অসংখ্য মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই অন্যায় সুযোগকে ন্যায় পথে পরিচালিত করার জন্যে যে প্রশাসন ব্যবস্থার

সৃষ্টি, সেই প্রশাসনের যোগ্য প্রশাসকের দল নীরব দর্শক—কালো-বাজারী, মুনাফা শিকারীদের সমর্থক।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে আজ কৃষি উন্নয়ন সমিতির অভাব নেই। দরিদ্র সহায় সম্বলহীন কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্যের জন্যে সরকারী ঋণের ব্যবস্থা আছে। কৃষকরা বীজ পাবে, সার পাবে, পাবে চাষের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা। কিন্তু কজন দুস্থ কৃষক সময়মত সব পাচ্ছে? কজন কৃষকের হাতে পৌঁছাচ্ছে সরকারী সাহায্য?

কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলির সেক্রেটারীদের অসীম ক্ষমতা। অনেক দায়িত্বভার তাঁদের উপর। এবং সে দায়িত্ব তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকেন!

বন্ধকী জমি নিলামের নোটিশের আওতায় আসে। ঋণ নিয়েছে কৃষক কিন্তু পরিশোধ করেনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। অতএব আইনানুযায়ী নিলাম করার অধিকার এসেছে Assistant Ragistrar of Co-operative Societies-এর।

ছুটে আসে কৃষক। জনে জনে জিজ্ঞাসা করে খোঁজ করে লোন-বাবুর। সুরু করে কান্নাকাটি।

কান্না থামিয়ে জানতে চাওয়া হয় ব্যাপার। নিলাম রদ করতে ছুটে এসেছে সে।

—কিন্তু নিলাম বন্ধ তো হবে না। টাকা শোধ দেবার সময় অনেক দিন পার হয়ে যাবার পর তুমি তোমার ধারের টাকা শোধ দাওনি। বলেন কেউ।

অবাক সে। বলে, না বাবু, টাকা আমি শোধ দিয়ে দিইচি তো!

—শোধ যদি দিয়েই দাও তাহলে নিলাম হবে কেন বল? টাকা তুমি দাওনি।

—বিশ্বাস করুন বাবুরা, টাকা আমি ঠিক দিয়ে দিইচি। তিনশো টাকা নিয়ে পাঁচশো টাকা দিইচি। হারুবাবুর হাতে আমি নিজে যেয়ে—যেয়ে দিয়ে এইচি।

—সেকি, তুমি তিনশো টাকা নিয়ে পাঁচশো টাকা দিয়েছো ?

—হ্যাঁ বাবু, টাকা নেবার আগে একটা বকনা বেচে আরো পঁচিশটে টাকা হারুবাবুকে দিতে হইচে।

—কেন ?

—তিনি যে বললেন নাগবে। নেকা-নেকি করতে হবে। বি. ডি. ও. সাহেবকে একটা মাছ কিনে দিতে হবে। আরো সব কি আছে না ?

—আর কি আছে ?

—আমি কি করে জানবো বাবু। আমি মুখ্যু-সুক্ষু নোক। নেকা-নেকির কি বুঝি। হারুবাবু যা বলছে করেচি। জমির দলিলটা দিয়েছি। আর কটা টিপ-ছাপ দিয়েছি। টাকা পেয়েছি তিনশো মোটে। হারুবাবুকে দিয়েছি পাঁচশো। সব যখন দিয়েই দিইচি তখন আমার জমি নিলাম হবে কেন ?

হবে এই জন্যে, গরীব মুখ্যু কৃষকের সরলতার সুযোগ নিয়েছেন কৃষি উন্নয়ন সমিতির হারাধন রায়। তিনি ওই সমিতির সেক্রেটারী। তবে সব টাকা আত্মসাতের ক্ষমতা তাঁর একার নেই। পাঁচ ছয় ঘাট ঘুরে তবে কৃষকের হাতে গিয়ে পৌঁছায় ঋণের টাকা। সময়ে টাকা পাওয়ার জন্যে কিছু খরচ না করলে চলে ? না হলে তো টাকা মিলবে ফসল ওঠার সময়, কোন কোন ক্ষেত্রে পরের বছর।

প্রতিকার ?

হরি-হরি, প্রায় সব শিয়ালেরই এক রা। প্রতিকার করবেন কে ? সরকারী কো-অপারেটিভ এর কর্তাব্যক্তির দলও সমাজ সেবার পুরস্কার হিসাবে নিরামিশ যাননা। অভিযোগের তদন্ত হলেও দোষী সাব্যস্ত করার কোন প্রয়াস মেলেনা। যদিও বা মেলে তাও প্রকাশ হয়না। কারণ, সেই ঘরের ছেলের অন্যায় পড়শীকে জানতে দিলে ছিঃ ছিঃ করবে যে তারা। বলবে, কেমন বাপ মা গো, ছেলের একটু

দোষ মেনে নিতে পারলে না। কোন লজ্জায় পাঁচ জনকে জানিয়ে ঢাক পেটায় ? বলি, অমন বেটা ওরা বেয়ায় কেন ?

রিক্সা এসোশিয়েশনও লোন নেয়। সরকারী কো-অপারেটিভ অনেক ক্ষেত্রেই লোন দেয়। নিলামের নোটিশ পাওয়া কৃষক কোথাও এসে কান্নাকাটি করে। আবার কখনো বুক ফুলিয়ে এসে টেবিল চাপড়ে বলে, নিলাম করবেন বললেই হল ? একি মগের মুলুক পেয়েছেন নাকি ?

—কিন্তু টাকা না দিলে নিলাম না করে উপায় কি ? আপনি তো একবারও টাকা দেননি ?

—দোবটা কি করে শুনি। প্রতি বছর জল ছেড়ে বন্যা করবেন আপনারা। বাঁধ দিয়েছেন গঙ্গা মাটি দিয়ে, ইঁট গেঁথে। ক্যানেল কেটেছেন মাঝে মাঝে ষোল ফুটের গর্ত কেটে—বাকি কেটেছেন চার ফুট। ফিতে ফেলে-ফেলে বেবাক দেখিয়ে দিয়েছেন ষোল ফুট। জল ছাড়া বাবুরা জল ছাড়ছেন ষোল ফুটের হিসেবে। বড় মুখে বলছেন, আমাদের জল ছাড়ায় বন্যা হয়নি। তাহলে বন্যাটা হচ্ছে কি করে শুনি ?

—কিন্তু আপনার টাকার সঙ্গে এসব কথার··

—ওই হল। ওই কান টানলে যেমন মাথা আসে, এও তাই।

—কিন্তু জলতো আমরা ছাড়ছি না, বাঁধও আমরা বাঁধিনি।

—কিন্তু টাকা দিয়েছেন আপনারা।

—দিয়েছি।

—তাহলে সেই টাকা আমাদের জলে যাচ্ছে কেন ? কেন বাঁধ ফাটছে। আমাদের পরিশ্রমের ফসল কেন নষ্ট হচ্ছে সেটা ভেবে দেখুন।

—কিন্তু টাকাটা তো দিতে হবে ?

—দোবনা তো বলছি না, দোব। সময় হলেই দোব।

—সময় তো অনেক দিন পার হয়ে গেছে ?

—গেছে তো কি হবে ? আরো কিছুদিন সবুর করুন।

—কতদিন ?

—সেটা আপনারাই জানেন। আর যদি না সবুর করতে পারেন নিলাম করুন। জমিতো আমারই থাকবে।

আবার কেউ এসে বলে, টাকা দোব না। যা ইচ্ছে করতে পারোগা।

আবার কেউ না-খেয়ে সময় মত টাকা মিটিয়ে দেয়। হিসেব করে দেখে লাভ কি হল। লাভের হিসাব সে খুঁজে পায় না। লাভ খেয়ে নিয়েছে সাহায্যকারী বাবুর দল।

কিন্তু দুস্থ কৃষকের কজনের ভাগ্যে জোটে সরকারী সাহায্য ? যাদের জোটে না তাদের অপরাধ কি ?

সমিতির সম্পাদক মশাই ঋণ দানের প্রকৃত কর্তা। যদিও তিনি কৃষকদের ভোটেই নির্বাচিত হন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে সব কৃষক সমান নয়, প্রতিটি কৃষকের প্রয়োজন, প্রয়োজন নয়। দলের দলী তিনি। নিরপেক্ষতার দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হলেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কাছে মানুষ অথবা প্রয়োজনটাই বড় নয়, দলই হল সব। দলের জন্যেই তাঁর পরোপকারের ব্রত, পণ্ডশ্রম। দলে এসো সাহায্য পাবে, না এলে আমার কিছু করার নেই।

আবার, কৃষি ঋণের প্রয়োজন যাদের নেই, চড়া সুদে যারা টাকা খাটায়, তারাই আগে পায় কৃষি ঋণ। কারণ, ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা তাদের আছে। ইচ্ছা করলেই তারা যে কোন মুহূর্তে ঋণ শোধ করে দিতে পারবে।

দুস্থ মানুষগুলোর বুকে জ্বালা ধরে। দলে নাম লেখায় বাধ্য হয়ে। বঞ্চিতের দল অবিচারে রোষে ক্ষোভে নিস্ফল আক্রোশে গজরায়। পথ সন্ধান করে। সে পথ ··

ওরা ফিরে এল। স্বাধীনের কাকা সামনে এসে দাঁড়াল। ওঁদের দেখল। সত্যব্রতও দেখেলেন ওকে। কথা বললেন না। ও এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়াল। অনেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন স্বাধীনের দেহটা নিঃশেষ হওয়ার। ঘরে ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন সকলে। হয়তো কয়েক দিন পরে, অথবা কয়েক মাস বা দু-এক বছরের ব্যবধানে আজকের এই শ্মশান যাত্রার স্মৃতিটুকুও অনেকের মন থেকে মুছে যাবে !

হয়তো সত্যব্রত নিজেও ভুলে যাবেন ওর কথা। একটা রোগা রোগা শরীরের শ্যামলা ছেলে, একটু বেশি লম্বা, মুখটাও ছিল একটু লম্বা, চাপা নাক, শুধু দুটো আয়ত চোখ আর একমাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পোষাকের দিকে আজকের ছেলেদের মত নজর ছিল না। কখনো বাবার কাপড় পরতো, কখনো বা কাকার প্যাণ্ট সার্ট। প্যাণ্ট একটু ছোট হোত, সার্ট ঢিলে।

চায়ের দোকানে বসে সত্যব্রত রোজই দেখতেন ওকে। দেখতে পান পাড়ার প্রায় প্রতিটি মানুষকে। রোজ সকলকে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। পরিচিত মানুষগুলোর মধ্যে নতুনত্ব অথবা বিসদৃশ্য তাঁর নজরে পড়তো না।

ওর বন্ধুর দল কিন্তু প্রায়ই ওর মধ্যে নতুনত্ব আবিষ্কার করতো। চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিটায় বসে হয়তো আড্ডা দিচ্ছে তারা। পাড়ার ছেলেদের বসতে দিতে আপত্তি নেই সত্যব্রতর। সিগারেট খাও, গল্প কর, শুধু অশ্লীল আলোচনা বা মেয়েদের দিকে কু-দৃষ্টি দিওনা। তা যদি কর, সত্যব্রত দোকান তুলে দেবেন। লাভের তাঁর প্রয়োজন নেই।

ছেলেগুলো তাঁকে মানে। তাঁর সব কথা মেনে না চললেও

বেশির ভাগ মানার চেষ্টা করে। তাই তিনিও ওদের দোকানের সামনে বসতে দিতে আপত্তি করেন না। তাছাড়া ওরা সন্ধ্যের পরই বসে। দোকান বন্ধ করে দেবার পরও বসে থাকে। বাড়ি যাবার সময় ধরাধরি করে বেঞ্চিটা তুলে দিয়ে যায় পাশের কাপড়ের দোকানের রকে।

স্বাধীন টিউশনি সেরে ফিরছে। বন্ধুরা ডাকে। ও এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বলে, এই ভাল হবে না বলছি। শুনে যা একবার। ভীষণ দরকার আছে তোকে।

স্বাধীন এসে দাঁড়ায়। বন্ধুদের মুখে কথা নেই। সবাই ওকে দেখতে ব্যস্ত।

ও বলে, দেখছিস কি, কাকার প্যাণ্ট পরেছি। কি বলবি বল।

কেউ বলে, না, তুই যা।

—তাহলে ডাকলি কেন?

—তোকে দেখবো বলে। দেখছি, তুই ঠিক এক রকমই রইলি।

—পেটে ছুঁচোর ডন, পোষাকে বাবু হলে কি আর প্রকৃত অবস্থাটা চাপা দেওয়া যায়?

—কিন্তু তুই তো বেটা সকার।

—তা বলতে পারিস। হাসে ও। তিরিশ টাকা পাড়য়ে পাই। দুটো বোনের পড়ার খরচে যায় আঠাশ টাকা। সকার বৈকি!

—তাহলে তোর সিগারেট খরচ চলে কি করে?

—কিনে খেলে চলতো না নিশ্চই।

—তাহলে?

—তোদের নিয়ে খাই। মাঝে মধ্যে কিনি।

—তুই যা…

—কি করবো বল? হাসে ও। বাপের পয়সায় টেরিলিন পরিস, মায়ের কাছ থেকে হাত খরচ নিয়ে সিগারেট চা খাস। দু একটা খাওয়ালে কমবে না। বামুনের ছেলে আশীর্বাদ করি রোজই।

—তুই যা...

—চামার নইরে। চলি। হাসতে হাসতে চলে যায় ও।

ও চলে যেতে বন্ধুরা চুপ চাপ থাকে। কলরব বন্ধ হয়ে যায়। কৌতুক অনুভব করেন সত্যব্রত। বলেন, কিরে তোদের মাছের হাট বন্ধ হয়ে গেল কেন?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কেউ বলে, সামলে নিচ্ছি।

—খুব জোর তোদের তাহলে বসিয়ে দিয়ে গেল?

—ওইটুকুই তো আনন্দ আমাদের।

অবাক হন তিনি। বলেন, সেকি রে?

—হ্যাঁ দাদা, স্বীকার করে বন্ধুরা, স্বাধীন মনে আর মুখে এক। ধীর স্থির শান্ত দেখতে হলে কি হবে, কথাগুলো ওর ছুরির ফলা। ওকে লজ্জা দিতে চাইলে নিজেদেরই লজ্জা পেতে হয়।

—ওর মত কেউ নোস তাহলে তোরা?

—বোকা হতে আমরা রাজি নই। সত্যি কথা বললে কি হবে, বোকামী ওর কম নেই।

সে গল্পও শুনেছিলেন সত্যব্রত। ওর কাকা একটা চাকরীর ঠিক করেছিল। চাকরীটা হয়েও গিয়েছিল প্রায়। হল না শুধু ওর বোকামীর জন্যে।

ওর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তুমি কোনো দল কর?

ওর উত্তর, না।

—গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছো?

—দিয়েছি।

—কাকে দিয়েছো?

—অমুক কে।

—ওদের পার্টি একটা জঘন্য পার্টি। ওরা কিছুই করতে পারবে না। মুখে শুধু ওদের বড় বড় কথা।

—তা জানি না। তবে, অমুককে আমি চিনি। অনেকের

কাছে শুনেছি সৎ লোক। প্রয়োজন হলে সাধ্যমত কাজ করে দেন। সেই জন্যেই দিয়েছি।

—তুমি তাহলে কোনো পার্টিকে তোমার ভোট দাওনি ?

—তা দেবনা কেন ? উনি তো 'এই' পার্টির হয়ে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—তুমিতো ব্যক্তি বিশেষকে ভোট দিয়েছো ?

—তা কি করবো বলুন ? আমি ওনাকে চিনি, অনেকের কাছেই শুনেছি উনি সৎ লোক, সাধ্যমত সকলের উপকার করেন ; সেই জন্যেই ভোট দিয়েছি।

প্রশ্নকর্তা একটু গুম হয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তোমার কাকার কাছে শুনেছি তুমি বি, কম পাশ করেছো। শিক্ষিত তুমি। তোমার কাছ থেকে তো এমন ধারণা আশা করা যায়না। শুধুমাত্র লোক দেখে তুমি ভোট দেবে এ আমি চিন্তা করতে পারছি না।

অবাক হয়েছিল ও নিজেও। বলেছিল, তাহলে ?

ভদ্রলোক ওকে দেখেছিলেন। কি বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। বলেছিলেন, ভোট দিতে হবে পার্টিকে। তুমি যখনই ভোট দেবে তখনই পার্টির কথা চিন্তা করবে। ভেবে দেখবে, এই দল কতটা শক্তিমান। শাসন ক্ষমতা হাতে পেলে দেশের এবং মানুষের কতটা মঙ্গল সাধন করতে পারে।

ইতস্ততঃ করেছিল ও। বলেছিল, কিন্তু···

তিনি বলেছিলেন, বল।

—কিছু মনে করবেন না। আপনি বলছেন, ব্যক্তিভাবে কাউকে বিচার না করে, পার্টিগতভাবে ভোট দেওয়া উচিৎ। মনে করুন, পার্টি যদি একজন অক্ষম অযোগ্য অথবা অসাধু লোককে দাঁড় করায়, তাহলেও কি পার্টিকে ভোট দিতে হবে ?

—নিশ্চই।

—কিছু মনে করবেন না। আপনার যুক্তি আমি মেনে নিতে পারলাম না।

—কেন? গম্ভীর হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

—মনে করুন, পার্টির ব্যানারে, সেই অযোগ্য এবং অসাধু লোকটি ইলেকটেড হলেন। হাতে ক্ষমতা এল তাঁর। এখন ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ব হতে কি করবেন তিনি? দেশ এবং দশের উপকার করবেন, না অসাধুতার চূড়ান্ত করবেন?

ভদ্রলোক ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, কোন্ দল করো তুমি?

—কোন দলই আমি করি না।

—কিন্তু তোমার কথাগুলো শুনে তাতো মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, তুমি অনেক শিখেছো, অনেক জেনেছো?

—আপনি বিশ্বাস করুন, আমি কোন দল করি না। আপনি জানতে চাইলেন বলেই বললাম।

—জানতে চেয়ে তাহলে ভালই করেছি, কি বল?

স্বাধীন আশ্চর্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন?

ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, তোমাকে আমার জানা হয়ে গেল।

—কিন্তু......। কিছু বলতে চেয়েছিল স্বাধীন।

ভদ্রলোক তার কোন কথা শোনেন নি। রূঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, তোমাকে দেখলে খুব নিরীহ শান্ত বলেই মনে হয়, তোমার কাকাও বলেছিল, তুমি ছেলেটি খুবই ভাল; কিন্তু তোমার মত ভাল ছেলের উপকার করে তো কোন লাভ নেই। তোমার উপকার করলে, তুমি তো যে কোনদিন, যে কোনরকম অপকার করতে পারো।

—কিন্তু বিশ্বাস করুন ··

ভদ্রলোক বলেছিলেন, তোমার চাকরীর একটা বিশেষ দরকার।

—সত্যি। নাহলে……

—কিন্তু তোমার উপকার করে লাভ কি? তুমি তো আমাদের পার্টিকে সমর্থন কর না। অথচ তোমার কাকা বলেছিল, তুমি আমাদের পার্টির উগ্র সমর্থক।

স্বাধীনের কাকা তাই শিখিয়ে দিয়েছিল তাকে। বলেছিল, যদি পার্টি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেন বলবি, আপনাদের পার্টির সমর্থক আমি।

অবাক হয়ে সে জানতে চেয়েছিল, কেন?

—না বললে চাকরী তোর হবে না।

—তুমি যে বললে, তুমি বলেছ? ভদ্রলোক রাজি হয়েছেন?

হেসেছিল কাকা। বলেছিল, আমার বলাটাই তো সব নয়। তোকেও তো বলতে হবে।

—মিথ্যে বলবো? অবাক হয়েছিল সে।

—একটু মিথ্যে না বলে উপায় কি বল।

চুপ করেছিল সে।

কাকা বলেছিল, সুযোগ ছাড়িস নি। ভাগ্য ভাল তাই অনেক কষ্টে রাজি করাতে পেরেছি। একটু যদি মনোমত হতে পারিস, তাহলে ভাল চান্স পেয়ে যাবি। অনেক ক্ষমতা ওঁর। অনেকগুলি ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত। অনেকগুলি ছেলেকে উনি ভাল ভাল জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

কাকার কথায় নীরব ছিল স্বাধীন। ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব ও দিতে পারেনি। বলতে পারেনি, সত্য সত্যই আমি আপনাদের পার্টিকে সমর্থন করি। আমি আগে যা বলেছি, তা সত্যি নয়।

বললে হয়তো চাকরীটা হয়ে যেত তার। ভদ্রলোক সে সুযোগও তাকে দিয়েছিলেন। হাসি মুখে জানতে চেয়েছিলেন, মনে কর, আমি যদি তোমার উপকার করি, তুমি কি তোমার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারবে?

স্বাধীন কোন জবাব দিতে পারেনি।

—তুমি এখন এসো। বলেছিলেন তিনি। তোমার জন্যে কি করতে পারি, তা তোমার কাকাকে জানাবো।

চলে এসেছিল সে।

কদিন পরে কাকা ডেকে বলেছিল, অত করে তোকে বলেছিলাম, তবু তুই কটা মিথ্যেকথা বলতে পারলি না? তুই যা নয়, তাই হতে তোকে বলিনি আমি। তোর মত অনেক ছেলে যা নয় তাই বলে ওঁর কাছ থেকে চাকরী আদায় করে নিয়েছে। অথচ তুই শুধু পারলি না। যদি পারতিস, আমাকে বলেছিলেন, একটা ভাল চাকরী হাতে ছিল। কোন ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারকে বলেও রেখেছিলেন। ম্যানেজারের লোক হয়েই ঢুকতিস।

স্বাধীন কথা বলতে পারেনি। নীরবে শুনেছিল কাকার কথাগুলো।

হাল ছেড়ে দিয়ে কাকা বলেছিল, যতদিন কপালে দুর্ভোগ আছে ভোগ করে নে।

স্বাধীন তবু কোন জবাব দেয়নি।

কাকা বলেছিল, যা, যেখানে যাচ্ছিস।

স্বাধীন পড়াতে চলে গিয়েছিল। চাকরী তার হয়নি। জীবনে সুযোগ এসেছিল। নিতে পারেনি। মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিতে পারেনি।

সত্যব্রত ওকে জেনেছিলেন। অনেক ছেলের মধ্যে ওকে ভিন্ন বলে মনে হয়েছিল তাঁর। ওর মনের কথা কিছু কিছু জেনেছিলেন। স্পর্শ পেয়েছিলেন ওর উত্তপ্ত হৃদয়টার। অথচ ওকে দেখলে কখনোই মনে হত না, ওর বুকে জ্বালা আছে। ওর শান্তশিষ্ট নিরীহ, কিছুটা

রুগ্ন চেহারাটা দেখলে কারোরই মনে হত না, ওই ছেলেটার, স্বাধীন নামের ছেলেটার, চব্বিশ বছরের যৌবনটা প্রতিনিয়ত জ্বলছে, দগ্ধ হচ্ছে, বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইছে, সন্ধান করছে পথের। বাঁচতে চাইছে আকুল ভাবে!

শুধু স্বাধীনই বা কেন, ওর বন্ধুরা; যে ছেলেগুলো দিনের পর দিন বসে বসে সময় কাটাচ্ছে, চাকরীর চেষ্টা করেও পাচ্ছে না, হৈ-হৈ করছে, আড্ডা দিচ্ছে, সিনেমা দেখছে, তাদের বুকেও কি আগুন নেই? তারা কি জ্বলছে না? দগ্ধ হচ্ছে না ব্যর্থতা, হতাশা, আক্রোশে, যন্ত্রণায়?

তারা সুখী, দুঃখী ছিল একমাত্র স্বাধীন, শুধু যন্ত্রণা ছিল তারই বুকটায়? কুঁকড়ে দুমড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল শুধু সেই? সেই শুধু জর্জরিত হচ্ছিল দিনের পর দিন?

মনে হয়না তা। শুধুমাত্র স্বাধীন নয়, ওই ছেলেগুলো, স্বাধীনের বন্ধুর দল, যে ছেলেগুলো তাঁর দোকানের সামনের বেঞ্চটায় কোন কাজ না থাকলে বসে থাকে, নিজেদের মধ্যে তর্ক করে, গল্প করে, স্বাধীনকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতো, সিগারেটের পর সিগারেট খায়, ওই ছেলেগুলোর জ্বালাও কম নয়! দুঃখে হতাশায় ওদের বুকটাও ভেঙে যায়। অভিভাবকের দল গঞ্জনা দিলে, ওরা চুপ করে বেরিয়ে আসে, ফেটে পড়ে বন্ধুদের কাছে।

কেউ বলে, জানিস, বেঁচে থেকে আর কোন লাভ নেই। মিথ্যে জঞ্জাল ভিন্ন আর কিছু নেই।

অন্যজন প্রশ্ন করে, কেন কিছু হয়েছে নাকি বাড়িতে?

—বাড়িতে তো রোজই হয়।

—তাহলে ওকথা বললি কেন?

—অযোগ্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে, সেইজন্যে। আমার যোগ্যতা বলে কোন পদার্থ আর অবশিষ্ট নেই।

—কেন?

—বাবা বলেছেন মাকে। মা সকালে চা দিয়েই আমাকে কথাটা জানিয়ে দিলেন। মাস তিনেক আগে বাবার অফিসে সেই যে ইণ্টারভিউটা দিয়েছিলাম না, সেই চাকরীটা বাবাদের সেক্‌সনের বেয়ারার ভাইটা পেয়েছে। একজন ক্লার্কের ছেলে চাকরী না পেয়ে একজন বেয়ারার ভাই যেখানে চাকরী পায়, সেখানে ক্লার্কের ছেলের নিশ্চই যোগ্যতা বলে কিছু নেই?

—একথা তোর বাবা তোকে বলেছে?

—আমাকে বলেন নি, বলেছেন মাকে। বাবাকে বলেছেন, বাবাদের বড়বাবু। তিনি নাকি আমার এবং বেয়ারার ভাই দুজনের জন্যেই সাহেবকে বলেছিলেন।

একজন বলেছিল, তোর বাবা তাহলে চাকরীটার জন্যে বড়বাবুকে খুব ধরেছিলেন?

—হ্যাঁরে। সাহেবের খুব প্রিয়পাত্র বড়বাবু। চাকরীটা আমারই হবে, বাবা একথা আমাকে কতদিন বলেছেন। বড়বাবুও নাকি বাবাকে বলেছিলেন। ইণ্টারভিউও আমি ভাল দিয়েছিলাম। অথচ আমি সেকেণ্ড ডিভিসনে বি. এ. পাশ করা ক্যাণ্ডিডেট, চাকরী পেলাম না, কম্পার্টমেণ্টালে স্কুল ফাইনাল পাশ করা ছেলেটা চাকরীটা দিব্যি পেয়ে গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আফশোস করছিস?

—না ভাবছি। ভাবছি, সত্যি সত্যিই আমার যোগ্যতা নেই।

একজন বলেছিল, সবই লাকের ব্যাপার। তোর লাক যদি ফেভার করতো তুইই চাকরীটা পেতিস। অবশ্য সেই সঙ্গে তোর বাবার অ-ভক্তি কিছুটা দায়ী।

—সেটা কি?

—তোর বাবা বড়বাবুর পূজা দেয়নি নিশ্চই।

—মানুষের পূজা?

—হ্যাঁ ব্রাদার, মানুষের পূজা। কারণ এটা বিজ্ঞানের যুগ।

এযুগে মানুষই প্রধান। অবশ্য দেবতাদের আমি অস্বীকার করিনা। দেবতার স্থান গণ্ডীবদ্ধ সংসারের মাঝে, বিশাল কর্মক্ষেত্রে দেবতার স্থানে মানুষ। তাঁরা ছোটবাবু, মেজোবাবু, বড়বাবু, সাহেব, ম্যানেজার, ইউনিয়নের সেক্রেটারীর পদে দেবতা বিশেষ হয়ে বসে আছেন। কিছু পেতে গেলে, কিছু তাঁদের দিতে হবে বৈকি! নাহলে তাঁরা তুষ্ট হবেন কেন? সুযোগ যখন এসেছিল, তখন তোর বাবার বড়বাবুকে তুষ্ট করা উচিৎ ছিল।

—কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি বড়বাবু খুবই ভাল লোক।

—সজ্জন কিনা জানিস না নিশ্চই?

—তাহলে বলছিস···

—রিয়েল ব্যাপারে বলাবলি চলে না। খাওয়া-খাওয়ি হয়। অবশ্য তোর বাবার অসুবিধাও অনেক ছিল। তবে একটু সাহস করে যদি কেস করতে পারতেন, তাহলে চাকরীটা তোরই নিশ্চই হত। হলনা তোর বাবার মিথ্যা ভক্তির জন্যে। আরে এযুগে খারাপ কে, সবাই তো সাচ্চা!

তবুও স্বাধীনের বন্ধু, সেই ছেলেটার জমাট অভিমানটা দূর হয়নি। বন্ধুদের কথায় হতাশা কাটেনি তার। তার বুকে কাঁটার মত খচ খচ করেছিল বাবার বলা কথাগুলো।

অযোগ্য। অযোগ্যতাই তার নিশ্চিত চাকরীটায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। যোগ্য হলে নিশ্চই সে চাকরীটা পেত।

কোনটা ঠিক? অযোগ্যতা না অন্য কিছু? চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। ওদের অনেক কথাই তাঁকে চিন্তিত করে। তিনি ভাবেন। ভেবে পান না অনেক কিছুই।

একদিন ওরা, স্বাধীনের কজন বন্ধু, তাঁকে প্রশ্ন করেছিল। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ। যদিও পরিহাস ছলে ওরা কথা বলেছিল তাঁর সঙ্গে, তিনিও সেই ভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন; তবুও শুধুমাত্র পরিহাস বলে মনে হয়নি তাঁর। ওদের পরিহাসের

অন্তরালে লুকিয়ে ছিল নির্মম সত্য। ওরা যেন বাধ্য হয়েই নির্মম নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছিল নিজেদের নিয়ে। ওরা আঘাত করেছিল, চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলতে চেয়েছিল নিজেদের। ক্ষোভে, উত্তেজনায় ওদের কণ্ঠ কখনো উচ্চে উঠেছিল, কখনো বা দুরন্ত অথচ চাপা কান্নায় ভেঙে পড়তে চেয়েছিল। অবশেষে, নিজেরা নিজেদের ব্যঙ্গ করে, হয়তো বা মুহূর্তের দুর্বলতা, লজ্জা ঢাকতে উচ্চগ্রামে হেসে উঠেছিল। হেসে প্রমাণ করতে চেয়েছিল, পরিহাসে কত পটু ওরা। ওরা কত সহজ!

স্বাধীনের কজন বন্ধু। শীত শেষের একটা দুপুর। অন্যান্য দিনের মত যথারীতি দুপুরের খাওয়া সেরে দোকানে এসে ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন সত্যব্রত। এমন সময় ওরা এসে দোকানে ঢুকেছিল।

সত্যব্রত যথারীতি প্রশ্ন করেছিলেন, দুপুরে পল্টন সুদ্ধু কোথা থেকে ফিরলি সব?

—সিনেমা থেকে। জবাব দিয়েছিল একজন।

—এর মধ্যেই সিনেমা শেষ হয়ে গেল? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—সিনেমা শেষ হয়নি, তবে আমাদের আজকের মত দেখার আশা শেষ করে এসেছি।

—বলিস কিরে? এত সহজে আশা ছেড়ে এলি?

—কি করবো বলুন। বলেছিল একজন, ধর্মের ষাঁড়গুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, মাঝে মধ্যে লোভনীয় এটা ওটা বে-আইনী ভাবে মুখে টেনে নেয়। মার খায়। ধর্মের ষাঁড় মার খেয়ে দিব্যি হেলতে দুলতে মুখের জিনিষটা চিবুতে চিবুতে এগিয়ে চলে। আর আমরা? এই ভরদুপুরের বেকার সংঘ, গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে সিনেমা দেখবো বলে গেলুম, গিয়ে লাইনে দাঁড়ালুম, বিরাট লাইন। সুরু হল আমাদের প্রতীক্ষা। হঠাৎ একটু চাঞ্চল্য। কিছু

বোঝবার আগেই পটকা ফাটার শব্দ। সুরু হয়ে গেছে মারামারি। কিছু না দেখেই সময় থাকতে কেটে পড়লুম।

—সেকি রে?

—হ্যাঁ দাদা।

—মারামারি করলি না?

—কি হবে মিথ্যে মারামারি করে? বইটা তো আর আজই শেষ হয়ে যাচ্ছে না?

— কিন্তু কালও যে মারামারি হবেনা, সেটা জানলি কেমন করে?

—কালও যদি মারামারি হয় কালও দেখবো না।

একটু নীরব ছিলেন সত্যব্রত। মুচকি হেসে বলেছিলেন, তোদের দ্বারা দেখছি কিছু হবেনা। তোরা ভীতু হয়ে পড়েছিস। ভবিষ্যৎ অন্ধকার তোদের।

—সেতো আমরা জানি।

—বলিস কিরে? অবাক হয়েছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, এই জন্যেই বাঙালীর কিছু হচ্ছে না। বলছিস, চাকরী পাচ্ছিস না। কেউ তোদের কাজ দিচ্ছেনা। কাজের জন্যে এগিয়ে গেছিস কখনো?

ওরা বুঝতে পেরেছিল তিনি ওদের সঙ্গে কৌতুক করছেন। বলেছিল, ঠাট্টা করছেন?

—না রে ঠাট্টা নয়। রীতিমত গম্ভীর হয়েছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, তোদের অবস্থার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু সিনেমা দেখার সঙ্গে চাকরীর কি সম্পর্ক?

—বেকারের দলই তো সিনেমায় ভিড় বাড়ায়। তোদের দলই তো মারামারি করছে, পটকা ফাটাচ্ছে। শুধু তোরা কজনই মারের ভয়ে পালিয়ে এলি?

—কি হবে মিথ্যে মারামারি করে?

—মারামারি যদি নাই করিস, তাহলে তোরা যে বেঁচে আছিস, সেটা প্রমাণ করবি কি করে?

সত্যব্রতর কথাটা ওদের আঘাত করেছিল। ওরা চুপ করেছিল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল পরস্পরের। তারপর এক সময় একজন বলেছিল, দেখুন সত্যদা, আপনি যে কথা বললেন সেটা হয়তো খুব একটা মিথ্যে নয়। কিন্তু আমরা কি করবো সেটা বলতে পারেন ?

সত্যব্রতর কাছে জানতে চেয়েছিল ওরা। তিনি ওদের বর্তমান অবস্থাটাকে নিয়ে কথা বলছেন, ভবিষ্যৎটা কি তিনি জানেন? জানেন না। বাংলার অসংখ্য বেকার ছেলেদের ভবিষ্যৎ সত্যব্রত জানেন না। জানেন না অনেকেই। তবু বেকারদের নিয়ে কথা বলেন, সমালোচনা করেন, নীতি কথা শোনান; বাঙালী যুবকের দল ফুরিয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, অলস অকর্মণ্যে পরিণত হচ্ছে। উশৃঙ্খলতা অবলম্বন করছে, সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে, হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠছে, ভুল পথে ছুটছে, বাঙালী নামে কলঙ্ক লেপন করছে।

কেন? বাঙালী যুবকদের কেন আজ এই পরিণতি? কেন তারা বহুজনের মনোমত হয়ে থাকতে পারছে না? ধ্বংস করছে নিজেদের! অথবা শেষ হয়ে যাচ্ছে!

বাঙালী বেকার যুবকের দল ধ্বংস করছে নিজেদের, অথবা শেষ হয়ে যাচ্ছে, নাকি তাদের বাঁচাবার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি? কোনটা সত্য? বাঙালী যুবকদের দিন যাপনের গ্লানি কেন বহন করতে হচ্ছে আজ? বাংলা কেন আজ শ্মশানের রূপ নিয়েছে?

বাঙালী বহু দোষে দোষী। বাঙালীর সবচেয়ে বড় দোষ, একতা-বদ্ধতার অভাব। চরম বিপদের মুহূর্তেও বাঙালী এক হতে জানে না। আপন স্বার্থ চিন্তা থেকে বিরত থাকে।

সত্যিই কি তাই?

ভারতবর্ষের আদর্শ এবং লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। একটা অর্থনৈতিক মতবাদকে স্বাধীন ভারতবর্ষের নেতার দল সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের

সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, আমরা চাই যে, আমাদের খামার, ফ্যাক্টরী ও কারখানার থেকে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর কাছে সম্পদ প্রবাহিত হোক, যেন আমাদের স্বপ্ন সফল হতে পারে।

কিন্তু কতটুকু হয়েছে? কেন হয়নি? হল না কেন?

কেন আজ দারিদ্র, অনাহার, অশিক্ষা, বেকারী, ব্যাধি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে আলোর চেয়ে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? কেন মানুষ বাঁচার পথ পাচ্ছে না?

দুর্বল অর্থনীতি ক্রটিপূর্ণ পরিকল্পনা, শ্রেষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, দুর্নীতি, ব্যক্তি স্বার্থ আর নীতিহীনতাই তার অনেকগুলি কারণ। দেশ এবং জাতির স্বার্থরক্ষার চেয়ে দলগত রাজনীতি তাঁদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ একটি রাষ্ট্র কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে মৈত্রী-বন্ধন সম্ভব হয়নি। একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি! বিপদে যথাযথ সাহায্য করেনি।

আর পশ্চিমবঙ্গের নেতার দল?

ক্ষমতার অধিকারী নেতার দল বহু সময় স্বপ্ন-সুখ উপভোগ করেছেন। বাস্তব চিন্তাধারার সুষ্ঠ প্রয়োগ থেকে দূরে থেকেছেন। খাদ্যবস্তুতে ঘাটতি অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি যাতে দূর হয়, কেন্দ্র অথবা অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে যাতে না হয়, তার চেষ্টা করা উচিৎ, উচিৎ সর্বশক্তি খাদ্য উৎপাদনে নিয়োগ করা। কিন্তু উচিৎ হলেও, উচিৎ কর্তব্য পালন করা হয়নি। হল না কেন?

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, কেন্দ্রও ভারতীয় অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার জন্যে সুস্থ খাদ্যনীতি গ্রহণ করেনি। ভারতীয় পণ্ডিত ও নেতার দল, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন ঘাটতিই যে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান সমস্যা, একথা মেনে নেননি।

"India's food crisis and steps to meet it" এপ্রিল,

১৯৫৯ সালে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট। রিপোর্টের মর্ম :

(১) খাদ্য ঘাটতিই এখন ভারতীয় অর্থনীতির প্রথম ও প্রধান সমস্যা আর সেটা দূর করাই সরকারী উদ্যোগে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিৎ!

(২) ঘাটতি পূরণের জন্যে ভারত যদি আমদানীর ওপর নির্ভর করে বসে থাকে তাহলে ১৯৫৫-৫৬ সাল নাগাদ এ দেশকে ঘোর বিপদে পড়তে হবে। কারণ, ওই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ এত বেশি হবে যে, পৃথিবীর কোনখান থেকেই অত বেশি খাদ্য আমদানী করা সম্ভব হবে না।

ভবিষ্যতের খাদ্যসংকট এড়াতে ভারতীয় নেতার দল কি কোন পথ সন্ধান করেন নি? নিশ্চই করেছিলেন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার অনেক আগে, ১৯৫৭ সালে অশোক মেহেতার নেতৃত্বাধীন Food Grains Enquiry Committee, রিপোর্টে ভারতের স্থায়ী খাদ্য ঘাটতির সত্যতাকে স্বীকার করে নিয়েও অম্লান বদনে সুপারিশ করেছিল যে, ঘাটতি পূরণের জন্যে আমদানীর ওপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে। মিথ্যে চাষবাস করে ঝামেলার দরকার নেই! তাছাড়া ঘাটতি পূরণের জন্যে আমদানীর ওপর নির্ভর করাই বেশি সুবিধাজনক।

তারপর ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সেই মহা সংকট। ভারত জোড়া হাহাকার। কেন্দ্রীয় নেতাদের আমেরিকা সফর। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে তাঁর বৈদেশিক সাহায্য-সূচী সংক্রান্ত বক্তৃতা।

"ভারত যেন খাদ্য সাহায্যের ওপর আর নির্ভর না করে, খাদ্যের যদি দরকার থাকে সে যেন পয়সা ফেলে কিনে নেয়।"

আর পশ্চিমবঙ্গ?

মহাপ্রভুদের লীলাভূমি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালী জাতির মত নিষ্ঠাবান ভক্ত বুঝি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও নেই। ভক্তিরসে আপ্লুত বাঙালীর হৃদয় প্রভুর মাহাত্মই শুধু দেখে, প্রভুর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। প্রভুই সব। প্রভু যা করেন, যেমন রাখেন, যেমন বলেন, মেনে নেয় অন্ধ বিশ্বাসে। হয়তো বা প্রভুর প্রভুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ, প্রভুপদে বরণ করে নিয়েছে যে ভক্তদল। অস্বীকার করার পথ কোথায়?

প্রভুপদে বিত্ত প্রভুর দলও শিষ্যদের জন্যে কিছু কম করেন নি। অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগে (ক্ষমতা লাভ করে) দেশটাকে কি সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন! কেমন চতুর্দিকে কেবল নেই-নেই রব। যা ছিল তাও কেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যাচ্ছে। যা ছিল না তাও কেমন নেই-নেই অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। তার একটি, খাদ্য ঘাটতি। খাদ্য ঘাটতির মধ্যে প্রধান চাল, ডাল, আলু, সর্ষে, মাছ। এবং যত দিন যাচ্ছে, ঘাটতির পরিমাণ শুধু বেড়েই চলেছে। রেশনিং ব্যবস্থা দিনের পর দিন চলেছে এবং চলবে। কর্ডনিং জোরদার হবে। চোরাই চালান, কালোবাজারী চলবে অবাধ-গতিতে।

তার কারণ, কৃষি উৎপাদনের ওপর আমাদের প্রভুর দল পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আশ্চর্য সুন্দর ভাবে জোর দিয়ে রাজ্যটাকে সুন্দর ঘাটতি-রাজ্য করে রেখেছেন। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট খরচের হিসাব ঃ—

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—১৯৫১-৫৬
(কোটি টাকার অঙ্কে)

প্রধান খাতে	বরাদ্দ	শতকরা হার
১। কৃষি ঃ—	৮.৪৩	১১.৬৭
(ক) কৃষি উৎপাদন	৩.২৫	৪.৫০
(খ) ক্ষুদ্র সেচ	২.৩৮	৩.২৯
(গ) ভূমি সংরক্ষণ	০.০৫	০.০৭
(ঘ) অন্যান্য	২.৭৫	৩.৮১
২। সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় ঃ—	০.০৯	০.১২
৩। সেচ ও শক্তি ঃ—	১৫.৮০	২১.৮৭
(ক) সেচ	১৪.৮৪	২০.৫৪
(খ) শক্তি ও অন্যান্য	০.৯৬	১.৩৩
৪। শিল্প (দুর্গাপুর শিল্প প্রকল্প সহ)	১.১৫	১.৫৯
৫। যোগাযোগ ও পরিবহণ ঃ—	১৫.৫৪	২১.৫১
(ক) সড়ক	১৩.৮৩	১৯.১৪
৬। সমাজ সেবা ঃ—		
(ক) শিক্ষা	১১.১৮	১৫.৪৮
(খ) স্বাস্থ্য	১৫.৭৬	২১.৮১
(গ) অন্যান্য	৪.৩০	৫.৯৫

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—১৯৫৬-৬০

প্রধান খাতে	বরাদ্দ	শতকরা হার
১। কৃষি ঃ—	১৭.৮৬	১১.৩৩
(ক) কৃষি উৎপাদন	৫.২৩	৩.৩২
(খ) ক্ষুদ্র সেচ	২.৯৩	১.৮৬
(গ) ভূমি সংরক্ষণ	০.৮৩	০.৫৩
(ঘ) অন্যান্য	৮.৮৭	৫.৬২
২। সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়	১৬.৬৩	১০.৫৫

প্রধান খাতে	বরাদ্দ	শতকরা হার
৩। সেচ ও শক্তি	৩০·৭৪	১৯·৫০
(ক) সেচ	৭·৭১	৪·৮৯
(খ) শক্তি ও অন্যান্য	২৩·০৩	১৪·৬১
৪। শিল্প (দুর্গাপুর শিল্প প্রকল্প সহ)	১৪·৯৪	৯·৪৭
৫। যোগাযোগ ও পরিবহণ :—	১৯·৪৭	১২·৩৫
(ক) সড়ক	১৭·৪৮	১১·০৯
৬। সমাজ সেবা :—	৫৫·৩৪	৩৫·১০
(ক) শিক্ষা	২২·১৭	১৪·০৬
(খ) স্বাস্থ্য	২০·৫৯	১৩·০৬
(গ) অন্যান্য	১২·৫৮	৭·৯৮
৭। বিবিধ	২·৬৯	১·৭০

তৃতীয় পরিকল্পনা—১৯৫১-৫৬

১। কৃষি :—	৫৪·৩৪	১৮·৫৪
(ক) কৃষি উৎপাদন	১৭·৭৭	৬·০৬
(খ) ক্ষুদ্র সেচ	১৬·৩২	৫·৫৭
(গ) ভূমি সংরক্ষণ	৪·৭১	১·৬১
(ঘ) অন্যান্য	১৫·৫৪	৫·৩০
২। সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়	১৬·৮১	৫·৭৩
৩। সেচ ও শক্তি	৬৩·৮৫	২৩·৭৮
(ক) সেচ	১১·৮০	৪·০২
(খ) শক্তি ও অন্যান্য	৫১·০৫	১৭·৭৬
৪। শিল্প (দুর্গাপুর শিল্প প্রকল্প সহ)	৩২·৭৪	১১·১৭
৫। যোগাযোগ ও পরিবহণ :—	২৬·৫০	৯·০৪
(ক) সড়ক	২৫·০০	৮·৫৩

প্রধান খাতে	বরাদ্দ	শতকরা হার
৬। সমাজ সেবা :—	৮৪.৫২	২৮.৮৩
(ক) শিক্ষা	৩৬.৮৫	১২.৫৭
(খ) স্বাস্থ্য	১৯.৮০	৬.৭৬
(গ) অন্যান্য	২৭.৮৭	৯.৫০
৭। বিবিধ :—	১৪.৩৯	৪.৯১

কৃষি উৎপাদনের ওপর পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃপক্ষ কতটা দৃষ্টি দিয়েছেন তা এইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এবং তাঁদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনা অন্যায় হবে কি, তাঁদের অন্যায় এবং অবিমিশ্রকারিতার ফলেই আজ বাংলার ঘরে ঘরে নিদারুণ অভিশাপ, খাদ্যবস্তু নিয়ে ফাটকাবাজ, কালোবাজারীদের মুনাফার সুযোগ ঘটেছে ?

এবং কৃষি খাতে বরাদ্দের হার অপেক্ষা ব্যয় কতটা হয়েছিল ?

প্রথম পরিকল্পনা—১৯৫১-৫৪

শতকরা হার

খাতে :—

কৃষি	৮৯.০	সড়ক	৯৬.৭
শিক্ষা	১০৫.৫	স্বাস্থ্য	৯২.০

দ্বিতীয় পরিকল্পনা—১৯৫৪-৫৬

কৃষি	৮৭.৮	সড়ক	৮৩.৬
শিক্ষা	১৩৭.৮	স্বাস্থ্য	৬১.৪

তৃতীয় পরিকল্পনা—১৯৫৬-৫৯ (তিন বছর)

কৃষি	৫১.০	সড়ক	৪২.৯
শিক্ষা	৭৭.৫	স্বাস্থ্য	৬২.১

পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনায় বরাদ্দ ও প্রকৃত আয় (কোটি টাকার অঙ্কে)

প্রথম পরিকল্পনা—৫১-৫৪

খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
কৃষি উৎপাদন	৩.২৫	৩.৪১

খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
ক্ষুদ্র সেচ	২·৩৮	২·২৩
ভূমি সংরক্ষণ	০·০৫	০·০২
দ্বিতীয় পরিকল্পনা—৫৪-৫৬		
কৃষি উৎপাদন	৬২৩	৩৭২
ক্ষুদ্র সেচ	২·৯৩	১·৮৩
ভূমি সংরক্ষণ	০·৮৩	০·৪৬
তৃতীয় পরিকল্পনা—১৯৫৬-৫৯ (ব্যয় ৫৬-৫৯)		
কৃষি উৎপাদন	১৭·৭৭	৪·১৭
ক্ষুদ্র সেচ	১৬·৩১	৪·১৬
ভূমি সংরক্ষণ	৪·৭১	০·৭৬

তিনটি পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে। তিনটি পরিকল্পনার কোনটিতেই কৃষির বরাদ্দ টাকা খরচ করে ওঠা সম্ভব হয়নি। কৃষি উৎপাদন বিষয়টি অবহেলিত থেকেছে। কিন্তু কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে তার জন্যে তিনটি পরিকল্পনার সময়েই গবেষণা কিছু কম হয়নি। বিদেশী বিশেষজ্ঞের দল এসে সরকারী আতিথ্যে জনগণের পয়সায় দিনের পর দিন গবেষণা চালিয়ে গেছেন। স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণীতে কৃষি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু ফলটা কি পাওয়া গেছে ?

হাতে হাতে অনেক ফলই লাভ করেছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। জীবনের সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা অথবা প্রায়শ্চিত্ত, দিনের পর দিন, স্বাধীনতার সর্বসুখ অনুভব করা। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে খাদ্যের অবসান যে কত মহৎ তা জানার সুযোগ। রেশনের দোকানে অখাদ্য গ্রহণ, খোলা বাজারে নেই-নেই-নেই এর ঐক্যতান।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শুধু অবহেলিত। তিনটি পরিকল্পনায় কৃষির বরাদ্দ টাকাই শুধু খরচ হয়ে ওঠেনি। বাকি সব টাকাই সুষ্ঠভাবে খরচ হয়ে গেছে। বিশেষ করে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়ের বরাদ্দ।

পশ্চিমবঙ্গের তিনটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দের সমস্ত অর্থই কি সুষ্ঠভাবে ব্যয় করা হয়েছে? স্বাধীনতার হকদার পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী নেতার দল মানুষের প্রভূত উপকার যাতে হয় তার জন্যে কতটুকু চেষ্টা করেছেন?

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রধান কাণ্ডারীর ভূমিকায় বাংলার দুই মহান 'নেতা' তাঁদের জীবনের কর্তব্য কর্ম করেছেন। তাঁদের সময়ে দেশের উন্নতি যে কিছু হয়নি এমন কথা অতি বড় শত্রুরও বলার সুযোগ নেই। কিন্তু এই দুই মহান নেতার কর্মময় সময়ে অবনতি তো কিছু কম হয়নি। হিসাব করে দেখলে তাঁদের সময়ে বাংলার যেটুকু সর্বনাশ হবার সেটুকু বেশ ভালভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছে। বাঙালীর আজকের এই চরম সর্বনাশ তাঁরাই তো করেছেন।

শুধু দুটি মানুষ! দুটি মানুষ কেমন করে বাংলাদেশটাকে নিঃস্ব রিক্ত পঙ্গু করে দিল? কেমন করে তা সম্ভব?

নিশ্চই সম্ভব নয়। সাধ্য কি দুটি মানুষের পক্ষে একটা গোটা দেশ, অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ করা?

সর্বনাশ শুধু তাঁরা দুজনেই করেননি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সহকর্মীর দল। ছিল মাথাভারী প্রশাসনের হাজার দু' হাজারী মনসবদারদা। আর ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

মানুষ শুধু আশায় আশায় দিন কাটিয়েছে। স্বপ্ন দেখেছে ভবিষ্যতের। বর্তমানের চরম সর্বনাশটা প্রত্যক্ষ করেই চুপ করে থেকেছে। মানুষ জাগেনি, ভাবেনি, চিন্তা করেনি, চিনতে পারেনি স্বাধীনতার সত্বভোগী বাংলার নেতার দলকে। সরকারী বর্মে, মানুষের অর্থে তাঁরা শুধু আতিথ্য গ্রহণ করে গেছেন। বহু অন্যায় করেছেন, বহু অন্যায় মেনে নিয়েছেন, চিন্তা করেছেন দেশ অথবা মানুষ নয়, দল বজায় রাখার কথা। শোভা বর্দ্ধন করেছেন সভার, মুখে ছুটিয়েছেন মিথ্যার ফুলঝুরি।

একদিন চোখ মেলেছে মানুষ। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন।

তাহলে? চিন্তা করেছে মানুষ। আফশোষ জেগেছে, দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়তে চেয়েছে।

বড় দেরি হয়ে গেছে!

সেদিন সেই শীতের দুপুরে, স্বাধীনের বেকার বন্ধুর দল সিনেমা দেখতে না পেয়ে তাঁর কাছে এসে হাজির হয়েছিল, খদ্দেরহীন দোকানটায় অনেকক্ষণ বসেছিল ওরা। সেই বিকাল পর্যন্ত। চা খেয়েছিল, গল্প করেছিল। আফশোষ করেছিল কেউ কেউ। আফশোষটা ওদের সিনেমা দেখতে না পাওয়ার জন্যে। তাই নিয়ে তিনি পরিহাস করেছিলেন। বলেছিলেন, বেশ আছিস কিন্তু তোরা, দায়দায়িত্ব নেই, চিন্তা ভাবনা নেই, খাচ্ছিস দাচ্ছিস, টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, সিনেমা থিয়েটার দেখছিস, কি বল?

কথাটা শোনবার পর ওরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তাঁকে দেখেছিল। ওদের মধ্যে একজন, এক সময় খুব আস্তে, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের দেখলে সেইরকমই মনে হয়, তাই না সত্যদা?

সত্যব্রত উত্তর দিতে পারেন নি। বলতে পারেন নি সেকথা।

একজন বলেছিল, সত্যিই আমরা বেশ আছি। আনন্দের মধ্যে আছি। সুখে আছি।

সত্যব্রত তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কি যেন খুঁজে-ছিলেন সে মুখে, পাননি। কোথায় আনন্দ? ওদের মুখের রেখায় রেখায় হতাশা আর আত্মগ্লানির ছাপ। সুখের চিহ্ন মাত্র নেই।

তাঁকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওরা প্রশ্ন করেছিল, কি দেখছেন?

—তোদের। জবাব দিয়েছিলেন তিনি।

—আমাদের মুখ?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে স্বীকার করেছিলেন তিনি। অস্বীকার করার উপায় তাঁর ছিল না।

ওরা জানতে চেয়েছিল, খুঁজে পেলেন?

চমকে উঠে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, কী?

—আনন্দের চিহ্ন?

—তোরা……

কথাটা শেষ করতে পারেন নি তিনি। ওরা হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতে বলেছিল, আনন্দ আমাদের মুখের রেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ আমাদের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, গল্প করি, সিনেমা দেখি আনন্দের সন্ধানে। সত্যদা, আমাদের জীবনটাই শুধু আনন্দের।

—সেটা কি?

—আমরা আনন্দের সন্ধান করে ফিরি। না হলে যে পাগল হয়ে যাব। আর এই আনন্দ-সন্ধান বড় বিচিত্র, আপনাদের চোখে অনেক সময় বিসদৃশ লাগে। আমাদের প্রকাশ কখনো কোমল, কঠোর, রুদ্র, করুণরসে ভরা। সমাজকে অসুস্থ করে তুলছি বোধহয় আমরাই। কিন্তু কি করবো, সেটা বলুন?

সত্যব্রত নীরব ছিলেন। উত্তর তাঁর জানা নেই।

ওদের একজন বলেছিল, সমাজ, সংসার, দেশের প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য আছে, একটা দায়িত্ব আছে। আমরাও অস্বীকার করি না সে কথা। কর্তব্য আর দায়িত্ব পালন করতে আমরা সব সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু সেই সুযোগ কোথায়, পথ রুদ্ধ কেন, আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র জন্মদাতার ওপরই বর্তাবে কেন?

একজন বলেছিল, এ সমস্যা কিন্তু চিরদিন থাকবে না।

—কিন্তু সমস্যাটা কমার পরিবর্তে বাড়ছে কেন দিনের পর দিন?

—চেষ্টা চলছে সমস্যা সমাধানের।

—সেতো আমার জন্মের আগে, আমার বাবার সময় থেকে সুরু হয়েছে।

আশাবাদী কণ্ঠ বলেছিল, নারে, বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা সত্যি সত্যিই হচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট দুহাতে পয়সা ঢেলে দেশের উন্নতি করছে। ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা বড় বড় শিল্প বানাচ্ছে। সবই তো আমাদের জন্যেই?

—তা আর বলতে!

—তাহলে মিথ্যে মন খারাপ করে লাভ কি বল? এইতো ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হল। তারপর রাজন্যভাতা বিলোপ হতে হতেও থেমে আছে বটে, তবে রাজন্যভাতা বিলোপ হবেই। তখন কত পয়সা বাঁচবে বল দেখি?

—আর সেই পয়সা দেশের মানুষের উপকারে লাগবে। দেশের দারিদ্র দূর করা হবে।

—কারা করবে রে?

—কেন, দেশের দায়িত্ব যাঁদের ওপর তাঁরাই করবেন।

—দারিদ্র যে কি তাকি তাঁরা জানেন, দারিদ্র কাকে বলে তার পরিচয় কি তাঁরা কখনো পেয়েছেন?

—কেন জানবেন না। জানেন বলেই-না তাঁরা ও কথা বলতে পারেন।

—বটে-বটে।

—ইয়ার্কি করছিস তুই?

—তোর সঙ্গে? ক্ষেপেছিস। তুই আমার বন্ধু, তোকে আমি জানি, চিনি, তোর সঙ্গে আমি ইয়ার্কি করতে পারি?

—তাহলে এটা কি হচ্ছে?

—জোক। এই রকম জোক করে এসেছেন আমাদের নেতার দল। এখনো করছেন।

—তার অর্থ?

—অর্থ? একটু চুপ করেছিল সে। এক সময় বলেছিল, আজ চব্বিশটা বছর তো দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাদের এল না কেন? ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থে মানুষ দু মুঠো মুখের গ্রাস যাতে পায় তেমন পথ আজও পেল না কেন?

—আমরা কি না খেয়ে আছি?

—আমরা হয়তো না খেয়ে নেই। আমাদের বাবা দাদা যেমন করেই হোক জীবের আহার জোগাড় করছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্তে, বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষ কি খেতে পাচ্ছে? প্রতিটি শিশু কি তার খাদ্য পাচ্ছে? পাচ্ছে না। কেন পাচ্ছে না জানিস, আমাদের দেশের স্বাধীনতার সত্বভোগী নেতার দলের জন্যে। দেশকে অগ্রগতির পথে তাঁরা পরিচালিত করতে চাননি। তাঁরা চেয়েছেন স্বাধীনতার সত্ব ভোগ করতে; নিজেদের জীবনকে বিলাস ব্যসনে, আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে দিতে। দেশের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতাও তাঁদের ছিলনা, সে চেষ্টাও তাঁরা মনে প্রাণে করেন নি।

—এসব বলছিস কি তুই?

—বলছি না, ইতিহাসের সত্য উদ্ধার করছি। আচ্ছা, ১৯৪৭ সালের কংগ্রেস কেন রাতারাতি মুসলিম লীগের সঙ্গে সব সম্পর্কচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলতে পারিস?

—কেন?

—মুসলিম লীগের অর্থমন্ত্রী ব্যবসাদারদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। তার ফল নাকি, দেশের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যেত। কিন্তু সাধারণ মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হত?

—নিশ্চই হত। বলেছিল প্রতিবাদী। আজ কি হচ্ছে

দেখছিস না, ব্যবসাদারদের ওপর কর বাড়লেই, ব্যবসাদাররাও জিনিষের দাম বাড়িয়ে কেমন আরো বেশি লাভ বাড়িয়ে নেয়। সেদিনও নিশ্চই আজকের মত অবস্থাই হত। ভারতবর্ষের জনগণকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের নেতার দল ব্যবসাদারদের বাঁচাবার চেষ্টা করে ঠিকই করেছিলেন।

—কিন্তু আজ আমরা বাঁচছি না কেন?

—আজ? প্রতিবাদী একটু চিন্তা করে বলেছিল, আজ বোধহয় দিন পাল্টেছে। তাছাড়া ব্যবসাদাররা যদি সম্পদশালী হয়ে ওঠে তাতে তো দেশের মানুষেরই লাভ। সেই টাকায় তারা নতুন শিল্প তৈরি করবে দেশের মানুষের জন্যে। সেই শিল্প থেকে আবার লাভ করবে তারা। সেই টাকায় আবার শিল্প গড়বে। তাদের সম্পদ হিমালয়ের মত হয়ে উঠবে। সেই হিমালয় প্রমাণ সম্পদ তারা দেশের মানুষের উপকারে লাগাবে।

—কিন্তু ততোদিন কি আর মানুষ মানুষ থাকবে?

—তাহলে?

—রহস্য অন্য। জেলের কলসী! স্বাধীনতা নামক কলসীর ভেতরে ছিল ব্যবসাদার নামক দৈত্যের দল। পরাধীনতার জন্যেই আত্মপ্রকাশে অসুবিধা ঘটছিল তাদের। স্বাধীনতা পেল কংগ্রেস নামক জেলের সাহায্যে। তবে জেলের কলসীর অকৃতজ্ঞ দৈত্যের মত মুক্তিদাতাদের মারার ইচ্ছা তাদের জাগলো না। মুক্তিদাতাদের সাহায্যে তারা দৃষ্টি দিল অসংখ্য মানুষের দিকে। আর সেই জন্যেই, আপন প্রাণ বাঁচানো নেতার দল তাদের বন্দী করতে চাইলো না। দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে।

—তার মানে তুই বলতে চাইছিস...

—ধীরে বন্ধু ধীরে, কথাটা শেষ হোক আগে। এখন প্রশ্ন, ভারতবর্ষে অভাব, অনটন, দারিদ্র, মহামারী, বেকারী, অশিক্ষা বলে কি কিছুই ছিল না?

—নিশ্চই ছিল। সেই জন্যেই তো স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল বেশি।

—তার অর্থ এইগুলোর হাত থেকে মুক্তি।

—নিশ্চই।

—তাহলে এগুলো দূর হলনা কেন? হলেও কতটুকু হয়েছে?

—হয়নি?

—হয়েছে, কিন্তু তা না হওয়ারই সামিল। কারণ, কিছু কিছু না করলে, অথবা কিছু না করার ভান করলে, সম্বন্ধ যে থাকে না। আর ফিরিস্তি তৈরি হয়েছে সাফল্যের। প্রচার চলেছে সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু সত্যিকারের কাজ কতটুকু হয়েছে?

—হয়নি?

—হবেটা কি করে? করবে কারা? দারিদ্রের জ্বালায় জ্বললে তবেই না দারিদ্রকে বোঝা যায়। গরীব দেশের গরীবের মতই চলা উচিৎ। কিন্তু তাকি হয়! নামে আমাদের নেতারা ভারতীয় কিন্তু ভাবধারা বজায় রাখা হয়েছে পাশ্চাত্যের। ইংরেজ চলে গেছে কিন্তু তার সব কিছুই বজায় রাখা হয়েছে। ভারতীয় চিন্তা ধারার স্থান কোথাও হয়নি। দেশের মানুষ দু-মুঠো পেট ভরে ক্ষুধার অন্ন পায়না কিন্তু সরকারী নেতার দল বাদশাহী ঠাট-বাট ঠিকই বজায় রাখেন। রাখার অসুবিধাটাই বা কোথায়? অর্থের জোগানদার তো নিরন্ন ভারতের অসংখ্য মানুষ। তাঁরা শুধু ভোগের অধিকারী। দল বজায় রেখে ভোগ করে যাবেন। বাড়ি গাড়ি অর্থের কোন অসুবিধা তাঁদের হয়না। শুধু অসুবিধা হয়, কি করেছেন আর কি করেন নি তার হিসাব দিতে। কিন্তু তাও তাঁরা দেন। সরকারী হিসাবে মিথ্যা পায় সত্যের রূপ। বন্যা বইয়ে দেন প্রতিশ্রুতির। গরীবের আপন হয়ে বলেন 'গরীবি হটাও'-এর কথা। আর···

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল সে। সত্যব্রত বলেছিলেন, বেশ তো বলছিলি, থামলি কেন?

—লজ্জা করছে।

—লজ্জা করছে?

—হ্যাঁ দাদা, নেতার দল মিথ্যা বলেন তার কারণ একটা আছে। মিথ্যা না বললে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দিলে, নেতা-গিরি বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কিন্তু মিথ্যে আমি বকে মরি কেন?

—জ্বালায়!

—জ্বালা? অবাক হয়েছিল সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিল, না দাদা।

—তবে?

—আনন্দে।

চমকে ছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, আনন্দে নেতাদের সমালোচনা করিস?

—হ্যাঁ সত্যদা। কিছু তো একটা করতে হবে?

—ব্যাস?

—আর জ্বালায় অস্থির হয়ে পথ খুঁজি। পেয়েছি বলে মনেও হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, সকলেই চায় রাজা হতে। বড় হতে চায় সকলেই। শুরু করে ক্ষমতার লড়াই। কিছুক্ষণ নীরব ছিল সে। তারপর একসময় ম্লান কণ্ঠে বলেছিল, এক এক সময় বড় উতলা হয়ে পড়ি। অস্থির বোধ করি। আতঙ্কে ভরে ওঠে মনটা। ভয় করে। মনে হয়, এইভাবেই বোধহয় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। বেকার অবস্থাটা কোনদিন হয়তো শেষ হবেনা। হয়তো সেদিন বেকার অবস্থাটা শেষ হবে, সেদিন হয়তো আজকের আমি আর 'আমি' থাকবো না। বুড়ো হয়ে যাবো। আবার একটু চুপ করেছিল সে। করুণ কণ্ঠটা শোনা গিয়েছিল তার, একটা কাজ, যে-কোন কাজ একটা কি পাওয়া যায়না, যার বিনিময়ে বাঁচতে পারি?

যে কোন একটা কাজ চায় স্বাধীনের বন্ধ., চেয়েছিল স্বাধান, চায় বুঝি বাংলার প্রতিটি যুবক। শ্রমিক, কেরাণী। শুধু কাজ হলেই হল। কাজের বিচারের দিন আর নেই।

ছিল নাকি কোনদিন ?

ছিল। একদিন এমন দিন ছিল, যেদিন শ্রমিকের কাজকে ঘৃণা করতো বাঙালী। সেদিন বাংলার শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতো বহিরাগতের দল। অবাঙালী শ্রমিকের দল বাংলার শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

বাঙালী যুবকের দল ইংরাজি শিক্ষার গুণে কেরাণী হয়েছিল। বাবু হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল! কিন্তু বাবু হয়ে বেঁচে থাকার দিন যখন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যেতে লাগল তখন দৃষ্টি ফেরাল অন্যদিকে। আজ বাঙালীর আত্মাভিমান, গর্বের দিন শেষ হয়ে গেছে, শিক্ষাকে কর্মের মাপ কাঠি নয়, জীবনের প্রয়োজন বলে গ্রহণ করেছে, তবু বাঙালীর কর্মের দুয়ার রুদ্ধ। বাঙালী আপন ঘরে পরবাসী।

কেন ? বাঙালীর কর্মের জগতে কেন নেই নিরাপত্তা ? বাঙালী যুবকের দল কেন সামান্য একটা কাজের জন্যে লালায়িত ?

অক্ষমতা ? বাঙালী যুবকদের অক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ ?

মনে হয় না।

বাঙালী রাজনীতি করে, দল পাকায়। বাঙালীকে কাজে নিলে শুরু হয় অশান্তি। স্পষ্ট অভিযোগ অবাঙালী মালিক শ্রেণীর। বাঙালী দৈহিক পরিশ্রমে অনুপযুক্ত। বাঙালী কাজের অনুপাতে গ্রহণ করে অধিক পারিশ্রমিক।

বহু অভিযোগ বাঙালীর নামে। অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু

অভিযোগগুলি কি সত্য? সত্য সত্যই কি বাঙালী তার ন্যায্য প্রাপ্তির থেকে বেশি দাবী করে, ফাঁকি দেয়, দল পাকায়? বাঙালী কাজ করে না; করতে চায়না?

করেনা, করতে চায় না; না, করতে দেওয়া হয় না? বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত? কোনটা সত্য?

আজ ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীদের অগ্রাধিকার স্বীকৃত। চাকরীর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষিত হয়েছে। বাংলাই শুধু ব্যতিক্রম। এখানে ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের মানুষের অধিকার রক্ষিত, অধিকার নেই একমাত্র বাঙালীর!

তার প্রধান কারণ, অবাঙালী শিল্প-মালিকগণ প্রথমে নিজ নিজ প্রদেশের মানুষের স্বার্থরক্ষা করে তারপর বাঙালীকে গ্রহণ করে; অবশ্য তার জন্যে বাঙালী দল পাকায় না; দাবী তোলে না, বাধ্য করে না অবাঙালী মালিকদের বাঙালীদের নিয়োগ করতে।

বাঙালী নেতার দল আন্দোলন করেন দাবী আদায়ের জন্যে। ফলভোগী হয় বাঙালী-অবাঙালী কর্মীর দল। দল পাকানোর দোষে দোষী হয় শুধু বাঙালী।

বাঙালীদের নিয়ে চক্রান্ত শুধু বাংলায় নয়, সর্বভারতে। বাঙালীর যোগ্যতার কোন মূল্য নেই। সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রে বাঙালী কেরাণী হয়ে বেঁচে থাকবে। কাজ করবে।

ইংরেজের সময় থেকে সামরিক বিভাগে 'বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট' গঠনের দাবী। সঙ্গত (!) কারণে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সে দাবী বারবার অস্বীকার করেছে। স্বাধীন ভারতেও সে দাবী স্থান পায়নি। গঠিত হয়নি শুধুমাত্র বাঙালীদের নিয়ে গড়া সৈন্যদল। (এক প্রবীণ ভদ্রলোককে এক সময় আক্ষেপ করে বলতে শুনেছিলাম, ইংরেজ বাঙালীর অনেক উপকার করেছে, বাঙালীকে শিক্ষিত বুদ্ধিমান জাতির সম্মান দিয়েছে, কিন্তু কিছু না করে যদি বাঙালীর সৈন্যদল গঠন

করার দাবী মেনে নিয়ে 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' গঠন করতে দিত, তাহলে বোধ হয় স্বাধীন ভারতে বাঙালীর ঘরে উদ্বাস্তু সমস্যাটা সমস্যা হয়ে থাকতো না, পাঞ্জাবের মতো বাংলারও লোক বিনিময়, সম্পত্তি বিনিময় হয়ে যেত।)

আর চলেছে সুভাষচন্দ্রকে মুছে ফেলার চেষ্টা। কারণ, সুভাষচন্দ্র নাকি দেশের জন্যে কিছুই করেননি! তাঁর নাম উচ্চারণ করাও একদিন হয়তো মহা অপরাধে পরিণত হবে! কারণ হিসাবে এইটুকুই হয়তো যথেষ্ট, সুভাষচন্দ্র সর্বভারতীয় ছিলেন না, বাঙালী ছিলেন। সর্বভারতীয় সুবিধাবাদী নেতাদের শত্রু ছিলেন তিনি। গোষ্ঠী স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর স্বার্থকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নেহেরু, প্যাটেল, পাতিলের দল জাতির জনককে হাত করে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে নেমে পড়েছিলেন। একজন বাঙালী ছিল তাঁদের তাসের ঘরের স্বপ্ন দেখার মহাশত্রু। তাঁরা মহাশত্রু নিপাত করে অসংখ্য মানুষের গঙ্গাযাত্রা পাকা করেছিলেন। হাত মিলিয়েছিলেন অন্যায়ের সঙ্গে। আপোষ-নীতিতে অধিকার করেছিলেন ক্ষমতা।

তার পরিণতি আজকের ভারত। পাকিস্তান সৃষ্টি আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। নেহেরু, প্যাটেল কি পরিণতির কথাটা সেদিন জানতেন না? জানতেন, তবু তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের দাবী।

আর বাংলার দাবী?

বাঙালী চীৎকার করবে, দাবী জানাবে, আন্দোলন করবে। কিন্তু তার দাবী কখনও মেনে নেওয়া হবে না। সমাধান করা হবে না সমস্যার। বাংলা তথা বাঙালীকে সমস্যা পীড়িত, অথর্ব পঙ্গু করে রাখা হবে। কারণ বাঙালী যে সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে ওস্তাদ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালীর কণ্ঠই যে আগে গর্জে ওঠে।

কিন্তু আপন ঘরে বাঙালীর কণ্ঠ গর্জে ওঠেনি। প্রতিবাদ করেনি।

দাবী জানায় নি, বাংলায় বাঙালীর কর্মসংস্থান আগে করতে হবে। দিতে হবে বাঙালীকে অগ্রাধিকার।

কারণ, বাঙালী নেতার দল সর্বভারতীয়। সর্ব ভারতের সংগ্রামী মানুষের কথাই তাঁরা চিন্তা করেন। স্বপ্ন দেখেন দুনিয়ার মজদুরের।

তাই ১৯৫৬ সালে যেখানে বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪২·৭০%, ১৯৫৭ সালে ৪১·৪০%, ১৯৫৮ সালে ৪০·৩১%; বাকি স্থানীয় লোক এবং স্থানীয়দের মধ্যে এখানে বসবাসকারী অবাঙালী শ্রমিকরাও আছে। যত দিন যাচ্ছে এরাজ্যে বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে বাঙালী বেকারের সংখ্যা।

গত ১৯৫১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কেবলমাত্র কলকাতাতেই দু লক্ষ একানব্বই হাজার চাকরী প্রার্থী, এবং এদের মধ্যে বত্রিশ হাজারেরও কিছু বেশি জনের কারিগরী ডিগ্রী-ডিপ্লোমা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন শিল্পে চাকরী পেল বহিরাগতের দল—কাপড় কলে ৫৪%, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৪৯%, লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ৫৪%, জুট মিলে ৭৯%, কাগজ কলে ৭৩%, বাকি স্থানীয় লোক।

আজও এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে। যোগ্যতারও কোন মূল্য দেওয়া হবেনা। দাবী জানালেও লাভ নেই। দাবী জানাবার লোকই বা কোথায়! অসংখ্য রাজনৈতিক দল, সমস্ত দলেরই মূল কথা, বাঙালীর উপকার। কিন্তু ন্যায্য দাবীটাও যে তাঁরা জানাবেন তা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তাতে প্রাদেশিকতা বোধ প্রকাশ পাবে। বাংলার উন্নতি চান তাঁরা সর্ব ভারতীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে। বাঙালী কাজ পাবে নিশ্চই, কাজ পাবে বহিরাগতদের পরে। কারণ, বহিরাগতরা বাংলার অতিথি!

এই বহিরাগতরা বাংলার কর্মক্ষেত্রে কতটুকু অধিকার করে আছে তার সামান্য নমুনা ঃ—

রাজ্য—দেশ	১৯৫৬ সাল
পশ্চিমবঙ্গ	৪২·৭০
উড়িষ্যা	৬·৬১
বিহার	২৭·৫২
মধ্যপ্রদেশ	১·২৭
উত্তরপ্রদেশ	১৭·৬৫
পূর্ববঙ্গ	০·০৭
অন্যান্য রাজ্য	৪·১৮
রাজ্য—দেশ	১৯৫৭ সাল
পশ্চিমবঙ্গ	৪১·৪০
উড়িষ্যা	৬·৩২
বিহার	২৭ ৭১
মধ্যপ্রদেশ	১·৪১
উত্তরপ্রদেশ	১৫·৫১
পূর্ববঙ্গ	০·০৫
অন্যান্য রাজ্য	৪·৬০
রাজ্য—দেশ	১৯৫৮ সাল
পশ্চিমবঙ্গ	৪০·৩১
উড়িষ্যা	৬·২৭
বিহার	২৮·২৬
মধ্যপ্রদেশ	১·৫৬
উত্তরপ্রদেশ	১৮·৯৯
পূর্ববঙ্গ	০·০৪
অন্যান্য রাজ্য	৪·৫৭

১৯৫৯-৬০ সাল বাংলা দেশের শিল্পে অশান্তির চূড়ান্ত পর্ব। বহু কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ছাঁটাই হয়েছে অনেক।

কিন্তু তারই মধ্যে যেটুকু কর্মসংস্থান হয়েছে তাতে বাঙালী চাকরী-প্রার্থী কতটুকু সুযোগ পেয়েছে? প্রতিকারই বা হচ্ছে না কেন?

হলদিয়ায় নাকি এক লক্ষ বাঙালীর চাকরী হবে (সংবাদ)। মুখের কথা হলেও আশার (?) কথা, কিন্তু সত্যি-সত্যিই এক লক্ষ বাঙালীর চাকরী হবে তো? যদি হয় কোথায় হবে, হবেই বা কেমন করে? বর্তমানে নাকি পাঁচ-ছ হাজারের বেশি চাকরী হওয়ার কোন উপায় নেই। ইতিমধ্যে সেখানে যা লোক নেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই অবাঙালী, এবং তাদেরই অগ্রাধিকার। বাঙালী বেকারের দল এক লক্ষের স্বপ্ন দেখবে। স্বপ্ন দেখায় আপত্তি নেই। আপত্তি নেই নেতাদের মিথ্যা ভাষণে!

স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন। মাত্র কদিন আগে বলে গিয়েছিল সেকথা। হেসে বলেছিল, স্বপ্ন দেখতে দোষ কি সত্যদা?

সত্যব্রতর মনে পড়ল সে কথা। দিনটা রবিবার। একাই ছিলেন দোকানে। ছেলেটা খেয়ে তখনো ফেরেনি। স্বাধীন এসে দোকানে ঢুকেছিল। বলেছিল, এক কাপ চা দাও সত্যদা। বেশ গরম করে কিন্তু।

বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিল ওকে। সত্যব্রত চা করে দিয়েছিলেন। খুশির কারণ জানতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি ব্যাপারে, খুব খুশি-খুশি বলে মনে হচ্ছে আজ তোকে?

ছেলেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। জানতে চেয়েছিল, সত্যি বলছেন?

—হ্যাঁরে, সত্যি। তা ব্যাপারটা কি?

—পরীক্ষা দিয়ে এলুম।

—কোথায়?

—স্কুলে।

—রবিবার স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে এলি! কি আবোল-তাবোল বকছিস? কিসের পরীক্ষা দিয়ে এলি?

—চাকরীর।

—ইণ্টারভিউ ছিল আজ তোর?

—হ্যাঁ।

—কোন্ স্কুলে পরীক্ষা দিলি? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

কাছাকাছি একটা স্কুলের নাম বলেছিল ও।

তিনি বলেছিলেন, ওটা তো হয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল রে! বি. টি. না পড়ে তুই মাষ্টারী পাবি কেমন করে?

—মাষ্টারীর ইণ্টারভিউ তো দিইনি।

—তাহলে ক্লার্কের?

—ঝাড়ুদার দারোয়ানেরও নয়।

বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। ছেলেটা স্বল্পভাষী। কিন্তু যত কথা শুনছিলেন ততই অবাক হচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্কুলে গিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলি, তবু বলছিস স্কুলের চাকরী নয়, তাহলে কিসের পরীক্ষা দিয়ে এলি শুনি?

হেসেছিল ও। বলেছিল, চাকরীর, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়ে এলাম, শুধু আমি একা নই, শুনলাম আজ আমরা এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিলাম।

—তোর বন্ধুরা?

—ওরা কেউ দরখাস্ত করেনি।

—কেন?

—রেলওয়েতে যে পোষ্টগুলোতে লোক নেওয়া হবে তার একটাও ওদের পছন্দসই কাজ নয়।

—বলিস কি?

মুচকি হেসে ও বলেছিল, হ্যাঁ, ওরা ফালতু ছ-আট টাকা খরচ করতে রাজি হয় নি।

তিনি বলেছিলেন, তবু ওরা পরীক্ষাটা দিলে পারতো।

ও বলেছিল, ওরা এলে বলবেন সে কথা। বলবেন, সাড়ে তিনশোটা পোষ্ট ফেলনা নয়। লাগলেও লেগে যেতে পারে তো ওদের কারো না কারো।

তিনি বলেছিলেন, সাড়ে তিনশো পোষ্টের জন্যে একলক্ষ বিরানব্বই হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিল ?

—দেবেনা ? সাড়ে তিনশো চাকরী কি মুখের কথা আজকের দিনে ? মোট কত দরখাস্ত পড়েছিল জানেন ?

উত্তরোত্তর অবাক হচ্ছিলেন সত্যব্রত। জানতে চেয়েছিলেন, কত ?

—বিশ লক্ষ মাত্র।

বিশ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাত্র সাড়ে তিনশোটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিল, চিন্তা করতে পারেননি সত্যব্রত। বলেছিলেন, হ্যাঁরে, এসমস্ত কি বলছিস তুই ?

স্বাধীন গম্ভীর হয়েছিল। বলেছিল, যদিও আমার শোনা কথা, তবু আমার মনে হয়, সাড়ে তিনশো কেন, পঞ্চাশটা পোষ্টের জন্যেও বিশ লক্ষ আবেদন অসম্ভব নয়। আর এইরকম দু তিন মাস অন্তর যদি হয় তাহলে বাজার বেশ তেজী থাকবে।

কিছু বুঝতে না পেরে জানতে চেয়েছিলেন, কিসের বাজার ?

—প্রথম চাকরীর বাজার, দ্বিতীয় ফটোর বাজার। প্রচুর ফিল্ম বিক্রী হবে, ফটো প্রিন্টের কাগজ বিক্রী হবে। ফটোর দোকান গুলোয় বেশি বিক্রী হবে। আর আমরা বেকারের দল, বারবার ফটো তোলাবো আর নিজেদের চেহারার পরিবর্তন দেখে দেখে মুগ্ধ হবো। তিন মাস পরে প্রথম বসবে চোখের কোল, তারপর গাল, হাড়গুলো উঁচু হয়ে উঠবে, এক নজরে চিনিয়ে দেবে, আমরা বেকার।

আর বাড়ির অভিভাবকরা তিন মাস পরপর চাকরীর ইণ্টারভিউ দেওয়াতে একেবারে নিশ্চিন্ত বোধ করবেন। আশায় আশায় থাকবেন। পুত্র নামক বেড়ালটার ভাগ্যে একদিন নিশ্চই চাকরী নামক শিকেটি ছিঁড়বে।

ওর বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেছিলেন সত্যব্রত।

ও অবাক হয়ে বলেছিল, আপনি হাসছেন ?

—তুই যেভাবে কথাগুলো বলছিস তাতে হাসি না পেয়ে উপায় আছে ?

ও গম্ভীর ভাবে বলেছিল, এবার কিন্তু আমার চাকরীটা হচ্ছে। আপনি দেখবেন। পরীক্ষা দিতে গিয়ে যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে সকলকেই বলেছি আমি কথাটা।

—তোর চাকরী হলে আমিও খুশি হব। বলেছিলেন তিনি।

স্বাধীন হেসেছিল। বলেছিল, যাদের কথাগুলো বলেছি তারাও বলেছে তাদের খুশি হওয়ার কথা। অবশ্য সেই সঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ যে করেনি তাও নয়।

—সন্দেহ কিসের ?

—ওরা জানতে চেয়েছিল ভেতরে আমার জবরদস্ত কোন লোক আছে কিনা।

—তুই কি বললি ?

—বললাম, আছে। ওরা শুনে বললে, তাহলে চাকরীটা আমার নিশ্চই হচ্ছে। পরীক্ষার খাতায় কিছু না লিখে আঁকি-জুঁকি কেটে এলেও হবে। যোগ্যতার কোন স্থান নাকি নেই! শুধু চাই মামা মেশোর দল। কিন্তু ভগবান তেমন মামা বা মেশো আমাকে দেননি।

—তাহলে··· কথাটা শেষ না করেই চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি।

হেসেছিল স্বাধীন। ম্লান কণ্ঠে বলেছিল, যতদিন না খবর কিছু পাচ্ছি, ততদিন স্বপ্ন দেখায় দোষ কি?

সত্যব্রত কথা বলতে পারেন নি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করেছিলেন।

দোকানের ছেলেটা বাড়ি থেকে খেয়ে ফিরে এসেছিল। উঠে পড়েছিল স্বাধীন। হেসে বলেছিল, বাড়ি যাচ্ছি সত্যদা।

—আচ্ছা, আয়।

দোকান থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল ও। তিনি বসেছিলেন। চিন্তা করেছিলেন ওর কথা। ওর বন্ধুদের। সকলের কথা মনে পড়তে বিষণ্ণ বোধ করেছিলেন।

নিজের ছাত্রজীবনের ছবিটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। সেদিনের বন্ধুরা। সকলের মিলিত আলোচনা। তাঁরা কি স্বপ্ন কিছু কম দেখেছিলেন?

না, স্বপ্ন দেখায় বাধা নেই। যৌবন স্বপ্ন রচনা করে। ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনায় মনটাকে ভরিয়ে তোলে। আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা। যৌবন তার ধর্ম পালন করে। সেদিন করতো, আজ করে, আগামী দিনের ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু হিসাব মেলাবে কি দিয়ে? কি পেয়েছে, কি পাচ্ছে, কি পাবে, তাকি মিথ্যা? বঞ্চিত হওয়ার কারণ কি অনুসন্ধান করবে না? মিথ্যা আশ্বাসের মূল্য কি? ভাঙা গড়ায় তাদেরই তো অধিকার। মিথ্যাকে নিশ্চই তারা মেনে নেবেনা। ভাঙতে চাইবে, গড়ার স্বপ্ন দেখবে নতুন ভাবে। মুখোশের অন্তরালে জঘন্য কুৎসিত লোভী স্বার্থপর মুখ তারা নিশ্চই টেনে বার করবে। সেই হবে অপরাধ। যৌবন চাইবে··

—সত্যদা! স্বাধীন এসে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল।

—ফিরে এলি যে? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

হাসছিল ও। হাসতে হাসতে বলেছিল, চা খেলুম বসে, উঠে চলে গেলুম পয়সা না দিয়ে।

—আমি পয়সাটা চেয়ে নিইনি।

—আপনি চাইবেন কেন? লজ্জিত কণ্ঠে বলেছিল, বাড়ির কাছে গিয়ে খেয়াল হল। এই নিন।

পয়সাটা এগিয়ে দিয়েছিল ও। সত্যব্রত নেন নি। গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন, পয়সা না দিয়ে যখন চলে গেছিস, তখন আজ আর ও পয়সাটা নেব না। ওটা রেখে দে। আর একদিন দুপুরে এসে ওই পয়সা দিয়ে চা খেয়ে যাস।

অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল ও, কবে?

—যেদিন তোর ইচ্ছা হবে। হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সেদিন পয়সা দিতে তুই ভুললেও, আমি ভুলবো না। দেখিস ঠিক চেয়ে নেবো।

অবাক হয়েছিল ও। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল তাঁর মুখের দিকে!

আজ এখন, এই মুহূর্তে, বর্ষার রাত্রির তৃতীয় প্রহরে, শ্মশানের জ্বলন্ত চিতায় স্বাধীন নামের চব্বিশ বছরের যৌবনের অধিকারী ছেলেটার প্রাণহীন দেহটা যখন দগ্ধপ্রায়, তখন সত্যব্রত অনুভব করতে পারছেন, সেদিনের ওর অবাক চোখের দৃষ্টিটা! ও স্বপ্ন দেখবে বলে গিয়েছিল। তিনিও ওকে আর একদিন কাছে পেতে চেয়েছিলেন।

ওর স্বপ্ন দেখা কি শেষ হয়ে গিয়েছিল?

নিজের মনেই প্রশ্ন করলেন সত্যব্রত। উত্তর খুঁজলেন। পেলেন না।

তিনি এখন একা। কিশোর ছেলেটা টিনের শেডের পৈঠাতে

সকলের মাঝে গিয়ে বসেছে। সত্যব্রত দাঁড়িয়ে আছেন। একা একা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। দেখছেন। শ্মশান যাত্রী সত্যব্রত আজ বহুদিন পরে বারবার ফিরে যেতে চাইছেন ; বর্তমান জ্বালাময়, অতীতের স্মৃতিতে আশ্রয় সন্ধান করছেন।

আকাশে মেঘ জমছে। জমাট কালো নয়, ধূসর রঙের আকাশ। তারাগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকী মনে হচ্ছে। একটু পরে হয়তো তারাগুলোকে আর দেখা যাবে না।

অতীতটাকে দেখতে পাচ্ছেন সত্যব্রত। বিচিত্র বোধ হলেও সুখের নয়। আসলে বিচিত্র ছিল সেদিনের জীবন। স্বপ্ন সন্ধানে যাত্রা সুরু করেছিলেন। স্বপ্ন সফলের প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন। পরাধীনতার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন। চেয়েছিলেন স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বের অধিকার।

আর কিছু ?

না, আলাদাভাবে কিছু চাওয়ার সেদিন ছিলনা। একমাত্র কাম্য ছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এই ছিল সেদিনের বিশ্বাস। ইংরেজের কাছ থেকে পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত হলেই দেশকে নতুনভাবে গড়া যাবে, জাতিকে নব-নব চিন্তায় অনুপ্রাণিত করা যাবে। সুখের দিন আসবে। শান্তির বাণী প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠা হবে মানুষের আত্মমর্য্যাদা। প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের অধিকার বোধ। দাসত্বের শৃঙ্খল হত সব কিছুর অন্তরায়।

তাই মানুষ, পরাধীন ভারতবর্ষেব অসংখ্য মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল। চেয়েছিল মুক্তি। হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল দুঃখ যন্ত্রণা, পীড়ন লাঞ্ছনা। অত্যাচারী ইংরেজের শতসহস্র আঘাত ভারতবর্ষের মানুষের সংগ্রামকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেও, স্বাধীনতা লাভের দুর্বার আকাঙ্খাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

কিন্তু……

ভাবতে পারেন না সত্যব্রত। লজ্জা করে তাঁর। নিজেকেও একজন স্বার্থপর, মিথ্যাচারী বলে মনে হয়! পরিচয় দিতে লজ্জা করে, তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে। সংকোচবোধ করেন। অপরাধী, পাপী বলে মনে হয়।

অথচ, ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন অপরাধের অংশভাগী নন। স্বেচ্ছায় তিনি স্বাধীনতার সুফল ভোগের আহ্বানকে হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। না করে কোন উপায় ছিলনা তাঁর। বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন আঁকা ছিল অন্তরে। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা নামের সম্পত্তি ভাগাভাগি তিনি চাননি, তিনি চান নি শত্রুর মধ্যস্থতায় বেচা-কেনার হাটে সওদা গ্রহণ।

কিন্তু তাঁর চাওয়া, না-চাওয়ায় কি এসে যায়। তিনি কর্মী। তিনি তাঁর কর্ম করে গেছেন। নেতার দলের ইচ্ছার কাছে তাঁর অনিচ্ছার মূল্য কতটুকু! কি মূল্য ছিল দেশের মানুষের? মূল্য ছিল স্বাধীনতার! স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন নেতার দল।

সুরু হয়েছিল নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব। লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন পণ্ডিত নেহেরু আর সর্দার প্যাটেল। দুই নেতার দু' পাশে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি। সুরু হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই।

গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত, কংগ্রেস ভেঙে দেওয়ার। আশঙ্কা তাঁর, ক্ষমতার অপপ্রয়োগের। প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক দলিল। কংগ্রেসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

কিন্তু সে দলিল কার্যকরী করার অবকাশ তাঁর মেলেনি। কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে তিনি পারেন নি। গুপ্তঘাতকের আঘাত তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছিল ক্ষমতা।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ সালের সেই সন্ধ্যাটা! গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত ছুটে এসেছিল দিল্লী থেকে। ছড়িয়ে পড়েছিল

চতুর্দিকে। আঘাতের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন সত্যব্রত। শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়েছিলেন তিনি। কি দেখছিলেন, তিনি জানেন না। অন্তরের অন্তঃস্থলে একটি অতি সাধারণ দীন হীন চেহারার মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছিল বারবার। তাঁর আজানুলম্বিত বাহুর স্পর্শ অনুভব করতে পারছিলেন মস্তকে। জীবনে একবার মাত্র তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। স্পর্শ পেয়েছিলেন।

পাশে উপবিষ্ট বন্ধু তাঁকে ডেকেছিল। তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করতে চেয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সফল হলনা সত্যব্রত!

বন্ধুর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি।

বন্ধু ম্লান কণ্ঠে, চুপি চুপি বলেছিল, আমার অবিশ্বাসী মন বলছে, আজকের সিদ্ধান্তটুকু তিনি যদি দুদিন পরে নিতেন, হয়তো আরো দুদিন জীবিত থাকতেন তিনি।

সত্যব্রত আঁতকে কেঁপে উঠেছিলেন।

আঁতকে কেঁপে উঠেছেন তিনি বার বার। গান্ধী নীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেস, অহিংসা এবং সত্য যার ভিত্তি, সেই অহিংসা মন্ত্র, হিংসার আকার ধারণ করতে খুব বেশি দেরি হয়নি; সত্যের স্থান দখল করেছে অসত্য এবং মিথ্যাচার। জাতীয় স্বার্থের কাছে ব্যক্তি-স্বার্থ, শ্রেষ্ঠীস্বার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রতিবাদ, আন্দোলন মূল্যহীন বলে প্রতিপন্ন করেছে ক্ষমতাবলে। স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন স্বনামধন্য নেতার দল। দীন দরিদ্র, অসহায় মানুষের দল করুণ চোখে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছে। ভারতবর্ষ, অসংখ্য মানুষের নয়, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের।

আর পশ্চিমবঙ্গ?

খণ্ডিত বাংলার মূল্য কতটুকু ? বাঙালীর অধিকার কোথায় ?

নেই। বাংলায় বাঙালী অধিকারহারা।

কিন্তু কেন? কেন বাঙালী তার অধিকার হারাল? কেন বাঙালী হয়ে উঠলো করুণাপ্রার্থী? বাঙালীর সব থেকেও' কিছু নেই কেন?

চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। বাঙালী কি সত্য সত্যই অধিকার-হারা? কে তাকে অধিকারহারা করলো? কি করে করলো?

বাঙালীকে অধিকারহারা করেছে বাঙালী। বাংলার সর্বনাশের কারণ বাঙালী। বাঙালী বাংলার কথা ভাবেনি, বাঙালী বাঙালীকে আপন ভাবে না! বাঙালীর রক্তে-মাংসে, মজ্জায়-মজ্জায় রাজনীতি, বাঙালী দল গঠন করেছে। চার কোটি মানুষকে নিয়ে অসংখ্য দলের টানাটনি। সব দলের উদ্দেশ্য এক, মানুষের ভাল করা, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো। অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, পীড়ন, অত্যাচার বন্ধ করা; মুনাফাখোর কালোবাজারীদের দমন করা। দর্পী শাসক শ্রেণীর দম্ভ অহঙ্কার আর সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অবসান। নিঃস্ব রিক্ত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অসংখ্য দলের আন্দোলন।

ছোট বড় মাঝারী দল। কিন্তু নেতারা সেই হিসাবে ছোট বড় মাঝারী নন। ছোট বড় মাঝারী দলে, ছোট বড় মাঝারী নেতা। ছোট দলে বড় নেতার অভাব নেই। প্রতিটি দলেই অসংখ্য নেতা। তাঁরাই বহন করছেন দলীয় মতবাদ। মানুষ শুধু সমর্থক। মানুষ চাইছে দুঃসহ অবস্থার অবসান। মানুষ চাইছে মুক্তি। মানুষ চাইছে আহার আশ্রয়, নিরাপত্তা শান্তি। সব মানুষের চাওয়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সকলের চাওয়ার মধ্যেই রয়েছে অদ্ভুত মিল। মিল নেই শুধু নেতার দলে। তাঁরা সকলে বড় হতে চান। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হতে চান। সেই জন্যেই এক হতে পারেন না।

এক হতে দেন না মানুষকে। মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে দল বজায় রাখেন।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, আচ্ছা, আমার চাওয়া আপনার চাওয়ার মধ্যে কী তফাৎ আছে বলতে পারেন?

সত্যব্রত বলেছিলেন, একথা কেন জানতে চাইছেন?

—পরে বলছি। আগে বলুন আপনি কী চান? আমিই বা কী চাই? কী চায় অসংখ্য মানুষ?

সত্যব্রত বলেছিলেন, আপনিই বলুন।

—আমি বলবো, আপনি বলবেন, বলবে অসংখ্য মানুষ। আমরা কি বলছি না? বলছি। কিন্তু শুনছে কে? চুপ করেছিলেন ভদ্রলোক। সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করেছিলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, একটা সত্যি কথা বলবো সত্যবাবু?

—কি কথা? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—এই দেশটার সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে কংগ্রেস।

ম্লান একটু হাসি ফুটেছিল তাঁর মুখে। তিনি আহত হয়েছিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, এতো কোন নতুন কথা নয়। বহুবার একথা শুনেছি। আজও প্রায়ই শুনতে হয়।

—রাগ হয় না?

—রাগ করে লাভ কি বলুন?

হেসেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, রাগ করে লাভ কি? ঠিকই বলেছেন। রাগ করে কোন লাভ হয় না। প্রতিবাদ জানিয়েও কোন ফল হয় না। মিছিল করে, শ্লোগান দিয়ে, অনশন অথবা বিরাট বিপুল জন সমাবেশ ঘটিয়েও আজ কোন সমস্যার সমাধান হয় না। স্বাধীনতার সত্বভোগী কংগ্রেস, তার নেতার দল, যাঁরা এতদিন বাংলাকে শাসনের নামে রিক্ত নিঃস্ব করে দিয়েছেন; যাঁরা দিল্লীর মসনদে বসে দিনের পর দিন বাংলাকে শুধু শোষণ

করছেন, তাঁরা বাংলার কোন দাবী মেনে নেন না, বাংলার ভাল চান না, বাংলাকে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে চান, সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত করে তুলতে চান। বাংলার কোন প্রতিবাদ, বাঙালীর কোন দাবী তাঁরা মেনে নেন না। কেন?

—কেন?

—সেই কথাই তো জানতে চাইছি আপনার কাছে।

—আপনি জানেন না?

—জানি।

—বলুন, কেন?

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার ধারণাটা সত্যি নাও হতে পারে।

—তবু···

—আমার যা মনে হয়েছে, এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা সত্যবাবু, কিছু মনে করবেন না, কংগ্রেসের আন্দোলনই স্বাধীনতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ নয়।

—এ আপনি কি বলছেন?

—কথাটা শুনতে আপনার খুবই খারাপ লাগলো তো?

সত্যব্রত নীবর ছিলেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির একমাত্র কারণ হত, তাহলে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যেসব আন্দোলনগুলো স্বাধীন ভারতে হয়েছে, আজও হচ্ছে, সে আন্দোলনের দাবীগুলো মেনে নিয়ে গরীবের দুঃখ মোচনেই ব্রতী হতেন আমাদের জাতীয় নেতার দল। তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাকে ঘৃণা করতেন, শ্রেষ্ঠীস্বার্থকে পদদলিত করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। সে ক্ষমতা তাঁদের আছে। কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। দেশ ও দশের স্বার্থের চেয়ে আপন স্বার্থ তাঁদের কাছে বড়। ব-কলমে তাঁরা কালোবাজারী

করছেন, চোরা কারবার চালাচ্ছেন, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। শুনছে কে? শোনবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, ক্ষমতার অধিকারী যতক্ষণ, ভয় কি? সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার নামে পিটিয়ে শেষ করে দেবেন। যে সামরিক বাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার মহান দায়িত্বে গঠিত, সেই সামরিক বাহিনী দেশের মানুষকে রক্ষার পরিবর্তে হত্যার জন্যে প্রস্তুত। ছিঃ-ছিঃ।

ভদ্রলোক এলোমেলো বকেছিলেন। শুনেছিলেন সত্যব্রত। জবাব দেননি।

উত্তর কিছু শোনবার জন্যেও তিনি অপেক্ষা করেন নি। বলেছিলেন, নিজের ঘরে আগুন জ্বলছে যখন, তখন কি আপনি অপরের ঘরের আগুন আগে নেভাতে যাবেন? যাবেন না নিশ্চই। কিন্তু আমাদের ঘরের নেতার দল তাই করছেন। শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে গেছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীরের দখল করা ভূমি উদ্ধার করার কোন চেষ্টা করেন নি। ঘরের শান্তি নষ্ট করে বাইরে ছিটিয়েছেন শান্তিবারি। বিদেশী স্বার্থপর দলের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ঘরের ভার। ফল কি হল, আবার ১৯৫৫তে পাকিস্তান আক্রমণ করল কাশ্মীর। জওহরলাল থাকলে কি হত বলা যায়না, কিন্তু তিনি না থাকতেও তাই হল। ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তানের দখল করা জমি ছেড়ে চলে এল, পাকিস্তান কিন্তু দখল করে রইলো তার অধিকৃত কাশ্মীর ভূখণ্ড। সমস্যা যেমন ছিল তেমনিই রইল। ভারতের নেতার দল বিদেশের আজ্ঞাবাহী হয়ে রইলেন। আজ পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমনেও সেই বিদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সমস্যাটাকে জাতীয় সমস্যা বলে প্রচার করেও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন না। পশ্চিমবঙ্গের মাথায় সমস্যার পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে আজ যেন তাঁরা খুশি। কেন বলুন দেখি?

—কেন ?

—বাঙালীকে মার দেওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায় ?

—কিন্তু…

—এই সত্যি মশাই। যদিও আমার ধারণায়। দেখছেন না, জাতীয় সমস্যাটা কেমন সুন্দর ভাবে পালন করা হচ্ছে! ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে রাজি নয়। অবশ্য আপত্তির অনেক কারণ আছে। রাজ্য শ্রীহীন হবে। বাঙালীদের আশ্রয় দিলে শান্তি নষ্ট হবে। রাজ্যের উন্নতি ব্যহত হবে। অতএব পশ্চিমবঙ্গেই অসংখ্য মানুষ পশুর অধম হয়ে থাকবে, মৃত্যুর দিন গুণবে ভোগ করবে অত্যাচার। হট্টমেলার দেশ এখন এই পশ্চিমবঙ্গ। নির্বাচিত মন্ত্রীদের নিয়ে সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে। রামের পাদুকা রক্ষাকারী ভরত, ধাওয়ান সাহেব কেন্দ্রের পাদুকা পশ্চিমবঙ্গকে ফেলে রেখে চলে গেছেন। নতুন রাজ্যপাল, ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সরকারী কর্মচারীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। কাজে ফাঁকি অথবা গাফিলতি চলবে না। শুধু নির্বিঘ্নে পশ্চিমবঙ্গের আমলার দল পাচার করবেন উদ্বাস্তুদের ত্রাণসামগ্রী। আর ছত্রিশটা রাজনৈতিক দল ছত্রিশটা মতবাদের চুবড়ি কাঁধে সওদা চালাবে 'কে নিবি আয়' বলে। গরম গরম বক্তিমে দেবেন নেতার দল। কিন্তু কেউ ভুলেও উচ্চারণ করবেন না, বাঙালীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। বাঙালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখতে পথে নামবেন না কেউই। কেন জানেন ?

—কেন ?

—দলীয় ভাব মূর্তি নষ্ট হবে। প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হবার ভয় যে পদে পদে। সর্বভারতীয় নেতা হওয়ার সম্মান কি কম ? লক্ষ্য যে শুধু নেতার সম্মানটুকু বজায় রাখার দিকে। মানুষ তো অমর নয়। অতএব যে মরবার সে মরবেই।

মৃত্যু, ১৯৫৬ সাল। ছেলেটার জন্মের তারিখ জানেন না সত্যব্রত, বয়েস তখন ছিল সতেরো বছর। নামটা···নাম সুকুমার মণ্ডল। বিধবার একমাত্র সন্তান। মা দাসীবৃত্তি করত, এখনও করছে। মাঝে ছটা মাস শুধু ছেলের জন্যে রান্না করে অপেক্ষায় থাকত। ভোরবেলা কাজে যেত ছেলেটা। খেতে আসত বেলা বারোটায়।

মৃত্যুর তারিখটাও মনে নেই। তবে সেদিন বাংলা বন্‌ধ্‌ ছিল। চলছিল খাদ্য আন্দোলন। বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন। রাজ্যপালিকা পদ্মজা নাইডু।

সে বছর, ১৯৫৬ সালে বাংলা বন্‌ধ্‌ মনে হয় কবার-ই হয়েছিল। এক-আধ খানা ট্রেন চলেছিল রাইফেল পাহারায়। রেডিওতে খবর শোনা গিয়েছিল, কলকাতার অবস্থা স্বাভাবিক। পরদিন কাগজে ছিল বন্‌ধের ছবি।

হরতালের দিন। ১৯৫৬ সালের বাংলা বন্‌ধের দিন কিনা ঠিক মনে নেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের কথাগুলো কিছু কিছু মনে আছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সান্ধ্য বেতার ভাষণে বলেছিলেন, কলকাতা বন্ধ থাকলেও সব বন্‌ধ্‌ নয়। তার প্রমাণ, তিনি রাজ্যপালিকাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দোকান থেকে শাড়ি কিনেছেন। মিষ্টিও কিনেছেন। অবশ্য কাগজে পরদিন বন্‌ধের ছবিই বেরিয়েছিল।

আর মনে আছে সুকুমার মণ্ডলের মৃত্যুর দিনটাকে। সত্যব্রত তাঁর দোকান খোলেন নি। অবশ্য দোকান খুলতে তাঁকে বলা হয়েছিল। জানানো হয়েছিল, তাঁর কোন ভয় নেই।

ক' বছর পরে আজও হরতাল হলে তাঁকে দোকান খুলতে বলা হয়। চায়ের দোকান তাঁর। তিনি যদি দোকান বন্ধ রাখেন, পাড়ার ছেলেগুলো যায় কোথায়?

কিন্তু বন্ধ রাখেন তিনি। পরদিন শুনতে হয় অনুযোগ, দোকানটা খুলে রাখলেই পারতেন আপনি, আমরা তো বলেছিলাম খুলে রাখতে।

হাসেন তিনি। হাসতে হাসতে বলেন, কাগজে আর রেডিওতে হরতালের আওতা থেকে চায়ের দোকানকে তো ছাড় দেওয়া হয়নি ?

কিন্তু চায়ের দোকান ছাড় পায়। দোকান বন্ধ রেখে দোকানের সামনে বসানো হয় নতুন দোকান। রাস্তা জুড়ে বেঞ্চি পেতে চলে বেচা-কেনা। হরতালের পক্ষে, বিপক্ষে উভয় দলই চা খায়। রাজনীতির আসর জমায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্থায়ী চায়ের দোকান থেকেই সুরু হয় গণ্ডগোল।

গণ্ডগোল সুরু হয় কারখানার গেটে। কাজে যোগদানকারী স্থানীয় কর্মীকে বাধা দেয় একদল।

বলে, কাজে যাওয়া চলবে না।

—কাজে আমাদের যেতেই হবে।

—আমরা যেতে দেব না।

—তাহলে পয়সা দাও , কাজ না করলে পয়সা পাবনা।

—ওসব শুনতে চাই না। যেতে দেব না বলাছ, যাবে না। গেলে খারাপ হবে।

রুখে ওঠে অন্যদল, কি খারাপ হবে শুনি ?

—গিয়ে দেখো আগে।

—শালা, মাসে চারটে করে হরতাল ডাকবে, কাজে না গিয়ে শুকিয়ে মরবো ? কাজ গেলে দিতে পারবে কাজ ?

—এই মুখ সামলে।

—কেন ভয়ে নাকি ?

—হ্যাঁ, ভয়েই। হরতাল যখন, কাজ বন্ধ। যাও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, একি মগের মুলুক নাকি? হরতাল করে ধান্দাবাজি চলবে না। আমরা কাজে যাবই।

—আজ কাজ বন্ধ।

—পেট শুনবে?

—ওসব পেট-ফেট জানি না। পেট-পেট করলে দেব ফাঁসিয়ে পেট।

—দে দেখি কেমন পারিস? শালা চোট্টা পার্টি। কিছু হল কি না হল, অমনি বন্‌ধ্।

—এই চোপ্। ফের পার্টি-পার্টি করলে বুঝতে পারবি। শালা দালাল পার্টির লোক। তোদের জন্যেই তো আজ এই অবস্থা। শালা বেইমানকা বাচ্চা! আমরা তোদের……

আর কিছু বলা অথবা শোনার অবসর হয়না উভয় দলেরই। প্রথমে ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি; ছুরি চলে তারই মাঝে। কারখানা কিন্তু বন্ধ হয় না।

সুকুমারদের কারখানাও সেদিন বন্ধ ছিল না। বাইরে থেকে যারা আসে, ট্রেন, বাস বন্ধ থাকার জন্যে তারা আসেনি। যায়নি অনেক স্থানীয় লোক। সুকুমারকে যেতে হয়েছিল।

পাড়ার ছেলেরা ওকে আটকেছিল, এই সুকু চললি কোথায়?

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ও। ভয়ে বলতে পারেনি কোথায় যাচ্ছে।

—কিরে, চুপ করে রইলি যে বড়?

ঢোঁক গিলেছিল ও। বলেছিল, কাজে।

—কাজে! রুখে উঠেছিল ছেলেরা, কাজে যাচ্ছিস, আজ হরতাল জানিস না?

—জানি।

—তাহলে কাজে যাচ্ছিস? যা, বাড়ি চলে যা। আজ কাজ বন্‌ধ্।

—কিন্তু…

—এর মধ্যে আবার কিন্তু কিরে?

—আমাদের কারখানা তো খোলা থাকবে।

—তাতে কি হয়েছে? খোলা থাকুক কারখানা। তুই যাবি না।

—কিন্তু আমি না গেলে আমার চাকরী চলে যাবে যে।

—চাকরী চলে যাবে? হেসেছিল পাড়ার ছেলেরা। একদিন কাজে না গেলে কারো চাকরী যায়?

—হয়তো যায় না। কিন্তু আমার যাবে।

—গুল মারছিস?

—সত্যি বলছি। মাস চারেক আগে যে হরতালটা হল তাতে, আমার সঙ্গে ঢুকেছিল একটা ছেলে, তার চাকরী গেছে। আমরা টেম্পরারী, কামাই করলেই আমাদের চাকরী যাবে। ম্যানেজার বিনয় হালদার ভীষণ বদলোক। বুঝবে না, কেন যেতে পারলুম না।

—তোর ম্যানেজার থাকে কোথায়?

—কারখানার কাছেই কোয়ার্টারে। গতকাল বলেও দিয়েছে, হরতাল-ফরতাল বুঝিনা, সকলকে আসতে হবে। আমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী আমাকে ডেকে কামাই করতে বারণ করেছেন।

—ওঃ, আচ্ছা যা।

পাড়ার ছেলেরা ছেড়ে দিয়েছিল সুকুমারকে। পরে তারা বলেছিল, সেদিন সুকুমারকে তারা যদি কাজে যেতে না দিত তাহলে হয়তো ওর চাকরীটা যেত, কিন্তু প্রাণটা যেত না।

কিন্তু ওকে তারা আটকায় নি। আটকায় নি ওর অবস্থাটার কথা চিন্তা করেই। ছোটবেলায় বাবা মরেছে। অনেক কষ্টে দাসীবৃত্তি করে ওর মা ওকে মানুষ করেছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে পাঁচজনকে ধরাধরি করার পর অনেক কষ্টে কারখানার সামান্য কাজটা জোগাড় করেছিল ও। সেই কাজটুকু

পাড়ার ছেলেদের জন্যে যাবে, তা চায়নি বলেই ওকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা।

কাজ সেদিন ওদের কারখানায় হয়নি। কাজ করবে কে? মেসিনের সঙ্গে মানুষেরও প্রয়োজন। তার ওপর বাইরে গেটে জমেছিল কিছু মানুষ। দাবী জানিয়েছিল কারখানা বন্ধের। ম্যানেজার কারখানা বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ঘড়িতে তখন দশটা বেজে কয়েক মিনিট।

ছেষট্টির সেই হরতালের দিনটা অশান্ত। বাংলা দেশের বেশ কিছু জায়গায় গুলি চলেছিল। চলন্ত ট্রেনে পড়েছিল বোমা। রাস্তায় রাস্তায় সৃষ্টি করা হয়েছিল অবরোধ। মিলিটারী, পুলিশের উদ্যত রাইফেল রক্ত ক্ষুধায় ছিল সব সময় সতর্ক।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে মাইল দেড়েকের পথ সুকুমারের কারখানা। কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে রাস্তা ধরেই হেঁটে আসছিল ও। হাতে টিফিন বাক্স। সে খাবারও খায়নি। কারখানা বন্ধ না হলে সেই খাবার খেয়েই দিনটা কাটিয়ে দিত।

ফাঁকা রাস্তা। একা একা হাঁটছিল ও।

হঠাৎ দুখানা পুলিশের গাড়ি পর পর ফাঁকা রাস্তা ধরে বেরিয়ে গিয়েছিল। ও দেখেছিল উদ্যত রাইফেলে প্রস্তুত ওরা। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

জোরে পা চালিয়েছিল ও। বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল।

কিন্তু বাড়ি ফেরা ওর হয়ে ওঠেনি।

একটু এগিয়েই দেখতে পেয়েছিল দুখানা ভ্যান পর পর দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা ইঁট, গাছের গুঁড়ি আর ভাঙা ড্রাম দিয়ে রাস্তা অবরোধ করা। পাশ দিয়ে ভ্যান দুটো যাওয়ার পথ আছে। কিন্তু ভ্যান দুটো দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করছে আশ-পাশের বাড়িগুলো। যে কোন মুহূর্তে গুলি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ওরা।

ভয়ে ভয়ে এগিয়েছিল সুকুমার। ভ্যান দুটো অবরোধের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পটকা ফাটার শব্দ।

খানিক এগিয়ে থেমে গিয়েছিল ভ্যান দুটো। নেমে পড়েছিল রাইফেল হাতে পুলিশের দল।

পাশে একটু পড়ো জমি। বাড়ির পাশ দিয়ে সরু গলি। ছুটেছিল সুকুমার। সামনে পুকুর। নীচু পাড়। ভয়ে নেমে পড়েছিল পুকুর ধারে।

হঠাৎ গুলির শব্দ। কানের পাশ দিয়ে আগুনের গরম হল্‌কা। মনে পড়েছিল একটা কথা।

দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়েছিল সুকুমার। বাঁচতে চেয়েছিল!

বাঁচতে পারেনি। মাথায় বুকে, অনেকগুলো গুলি ছুটে গিয়ে ওর শররীটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। ওর দেহটা গড়িয়ে পড়েছিল পুকুরের জলে। রক্তে কিছুটা জল লাল হয়ে গিয়েছিল।

ছেষট্টির শহীদ হয়েছিল সুকুমার মণ্ডল নামে, হরতালের দিন কাজে যোগদানকারী একটা ছেলে। কংগ্রেসের অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলা বন্‌ধ্‌ ডেকেছিল বামপন্থী দল। সুকুমার ছিল অন্যায়কারীদের সমর্থক! তবু ওর শহীদ বেদী তৈরী হয়েছিল। আজও রয়েছে।

তারপর···

১৯৬৭ সাল। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন। সৃষ্টি হল নতুন ইতিহাস। সংগ্রামী মানুষের ইতিহাস। কংগ্রেসের বিপক্ষে গেল জনগণের রায়। বাঁচতে চাইলো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

নির্বাচনের আগে যাঁরা একহতে পারেন নি, নির্বাচনের ফলাফল

দেখে তাঁরা এক হবার কথা ভাবলেন, বুঝলেন, এক তাঁদের হতেই হবে। কাজ করতে হবে মানুষের জন্যে। পশ্চিম বাংলার মানুষ কাজ করার জন্যেই তাঁদের নির্বাচিত করেছে।

সত্যব্রতর মনে আছে সে সব দিনগুলোকে। মাত্র কটা বছর আগেকার ঘটনা। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জেগে উঠেছে। এক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষ। এক হয়েছে বাঙালী।

শিশু-বালক, কিশোর-যুবক, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ। মেয়েরাও পেছিয়ে থাকেনি। ছেলের দল জয়ধ্বনি তুলেছিল, মেয়েরা শাঁখ বাজিয়েছিল, উলুধ্বনি দিয়েছিল। তৈরি হয়েছিল তোরণ। রাস্তার ধারের লাইট পোষ্টগুলো লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, হঠাৎ চড়া বাজার কত নরম হয়েছিল। মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার আগেই দাম কমেছিল জিনিসের।

রাজ্যপালিকা পদ্মজা নাইডু মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে ছিলেন বাংলা দেশের প্রথম বামপন্থী সরকারের মন্ত্রীদের। পাড়ার উৎসাহী যুবকের দল উৎসব শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছিল। ঘরে ফেরার আগে এসে ঢুকেছিল তাঁর দোকানে।

—সত্যদা জলদী ছটা চা।

—দিচ্ছি ভাই। জবাব দিয়েছিলেন সত্যব্রত। ছেলেগুলোকে দেখেছিলেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মূর্তিগুলিকে বড় তাজা আর সতেজ বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তারুণ্যের দীপ্তি ফুটে উঠেছিল ওদের চোখে-মুখে। আশা উৎসাহ উদ্দীপনার জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন এক একটি।

—বুঝলি, আমি একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলুম। ইচ্ছে করলে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পর্যন্ত পারতুম।

—ছুঁলিনা কেন? ভয় করছিল?

—দূর, ভয় করবে কেন। নিজের লোককে ছোঁব, তাতে ভয়ের কি আছে?

—সত্যি ভাবা যায়না !

—সত্যি !

—এবার আমরা বাঁচবো, জানিস। ভয়ে ভয়ে দিন কাটানোর দিন শেষ হবে এবার।

—পুলিশগুলোর অবস্থা দেখলি না ?

—বেচারীদের খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। কোলা ব্যাঙের মত চোখ করে কেমন তাকিয়েছিল, বলতো ? খুব মায়া লাগছিল দেখে। আহা বেচারা !

—লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাসের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হলে কার না মন খারাপ হয় বল ?

—সত্যি, খুব আফশোষ।

—আফশোষ বলে আফশোষ ! শুধু নিরীহ মানুষকে পেটাবার জন্যেই যে পুলিশ, এ ধারণা এবার পালটে যাবে। জমানা বদল গিয়া।

—সত্যদা চা। চিৎকার করে উঠেছিল একজন।

—দিচ্ছি ভাই। উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

একজন মন্তব্য করেছিল, সত্যদার মন খারাপ হয়ে গেছে।

—কেন-কেন ?

—কংগ্রেস হেরেছে। বাংলা দেশে কংগ্রেসের কবর।

—এই কি হচ্ছে ?

—সত্যি কথা বলছি।

—ছিঃ, পাগলামী করিস না।

—ঠিক আছে, সত্যদাকে জিজ্ঞাসা কর ?

—আবার। ধমকে উঠেছিল একজন।

ছেলেটা চা দিয়েছিল। চায়ের কাপ মুখে তুলেছিল ওরা কজন। সত্যব্রত মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, তোদের কথাই ঠিক। সত্যি সত্যিই আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।

হাতের কাপ আর মুখে ওঠেনি। ওরা বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কোন কথা বলতে পারেনি।

—কি হল তোদের? চা খা।

ওরা চায়ের কাপ মুখে তুলেছিল, আপনাকে কিন্তু আমরা অন্যভাবে ভাবতুম।

মৃদু হেসেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, তোদের মত আনন্দ করবো আমিও?

—না, তা নয়। তবে······

আবার হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তোদের আনন্দ দেখে আমারও যে আনন্দ হচ্ছে না তা নয়, নিশ্চই আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখবোধটাও খচ খচ করছে মনের মধ্যে।

ওরা গম্ভীর হয়েছিল। চিন্তা করেছিল। বলেছিল, আপনি তো······

হেসেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, আমি শুধু ভাবছি কেন এমন হল?

কেন যে হয়েছিল জানতেন বৈকি তিনি। দেখেছেন অনেক কিছুই। একদিন অথবা দুদিন নয়, দিনের পর দিন, অন্যায় আর অবিচার, মানুষের মূল্যবোধ অস্বীকৃত হয়েছে, লাঞ্ছিত নিপীড়িত হয়েছে। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে, উপকারের জন্যে যাঁদের ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে, তাঁরা দায়িত্ব পালন করেননি, উপকারের পরিবর্তে করেছেন অপকার। দেশসেবার সুযোগে সম্পদ বাড়িয়েছেন, আত্মীয় পোষণ করেছেন, কালোবাজারী মুনাফাখোরদের দিয়েছেন অবাধ ছাড়পত্র। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে করেছেন ছিনিমিনি খেলা। প্রতিবাদ করেছেন অগ্রাহ্য, বিচারের পরিবর্তে জুটেছে লাঞ্ছনা।

বাসের পারমিট দিয়ে হাজার হাজার টাকা লুটেছেন, সমবায় ভাণ্ডারগুলিকে করে তুলেছেন শয়তানের আড়ৎ, বাংলা দেশে বাঙালীর

স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা অবাঙালীর স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে বেশি। বাঙালী নিম্নবিত্তের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বাঙালী তরুণের দল পথে পথে ঘুরছে। অনাহারে মরেছে অসংখ্য মানুষ।

বাঙালী বাঁচতে চেয়ে বাঁচতে পায়নি। বাঙালী প্রতিবাদ জানিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে। বাঙালী মরার আগে বাঁচতে চেয়েছে!

সত্য হয়েছে বাঙালীর বাঁচার চেষ্টা। শেষ চেষ্টা করেছে মানুষ।

ওরা বলেছিল, সত্যদা আমরা আমাদের কথা বলছি, কোন রাজনীতির কথা নয়, বাংলা দেশে কংগ্রেসী নেতার দল রাজনীতি করছিলেন। মানুষের কোন মূল্য ছিল না তাঁদের কাছে। আমরা বাঁচতে চাই।

—সেই বাঁচার মন্ত্র আমরা খুঁজে পেয়েছি।

—আমরা সার্থক হয়েছি।

—পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের বাঁচাবেন। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ মরবে না আর। অনাহার দূর হবে, দূর হবে শাসক শ্রেণীর শান্তি শৃঙ্খলার নামে অন্যায় অত্যাচার।

—সত্যদা, মানুষ আজ বাঁচতে চায়।

—শান্তি চায়।

—চায় শোষণের অবসান। জনগণের সরকার পশ্চিম বাংলার মানুষের জীবনকে নিশ্চই নতুন দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনায় মূর্ত করে তুলবেন। বাঙালীর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সফল হবে।

সফল হল না। সফল হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ…। কারণ কি একটা, অসংখ্য কারণ। কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা গোপনে। মাত্র কটা মাস পরেই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটলো।

কেন যুক্তফ্রন্ট টিকলো না? কারণ কি?

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সৃষ্ট আমলাদের শয়তানী!

ব্যবসাদারদের বদমায়েসী!

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র!

দলীয় রাজনীতি!

ঘেরাও। জমি দখলের লড়াই!

পণ্য (এম. এল. এ) কেনা-বেচা!

কেন্দ্রের দুশমনী!

আর...

আর? আরো আছে। অগুণতি কারণ। শুধু একটি কারণ যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে যাওয়ার মধ্যে নেই, পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মানুষের 'যুক্তফ্রণ্ট নিপাত যাক' বলে সোচ্চার দাবী!

তবু রাজ্যপাল নামের কেন্দ্রের এক বড় চাকুরে ধর্মবীর অধর্ম করে চুপি চুপি এক বিশ্বাসঘাতককে সকলের অগোচরে শপথবাক্য পাঠ করিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাথায় বসিয়ে দিলেন। অতীতের মুখ্যমন্ত্রীত্ব কেড়ে নেওয়া একটা মানুষ সব লাজ লজ্জা বিসর্জন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসলেন।

কেন বসলেন? কোন আশায়? কিসের প্রলোভনে?

প্রলোভন নয়, গান্ধীনীতির মূল মন্ত্র অহিংসার মর্মবাণীটি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে ছিলেন। শান্তিরক্ষকদের ঢালাও হুকুম দিয়েছিলেন হত্যার। তাঁর সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। ক-মাসের উপোসী শান্তি রক্ষকদের দল অহিংস ক্ষুধা নিয়ে সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষের ওপর। লাঞ্ছিত করেছিল নারীর ইজ্জত। রক্ততৃষা মিটিয়েছিল বুলেটের আঘাতে।

আবার ওদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়েছিল।

—প্রফুল্ল ঘোষ কি গান্ধীবাদী নেতা ?

— ওটা জহ্লাদ !

—ওটা পাষণ্ড, মানুষ নামের অযোগ্য !

—অথচ ওই লোকটা, বুড়ো শকুন, যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রী হয়ে, কালোবাজারী দমন করতে গামছা মাথায় তেলের কলে ঢুঁ মেরেছে। মানুষের কত আপন হয়ে, মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছে !

—ভুলে যাচ্ছিস কেন, মন্ত্রী হলে মানুষ থাকে না।

—সেতো শয়তানটার কাজেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

—লোভী, স্বার্থপর।

—কিন্তু কিসের জন্যে ? তিন কূলে তো কেউ নেই ?

—বুকের জ্বালাটা যাবে কোথায় ?

—কেন-কেন ?

—অতুল্য ঘোষ একদিন বিল্বিপত্র শুঁকিয়েছিল। রামচন্দ্রের মত আঠারো বছর বনবাসে কাটিয়ে আবার সিংহাসনে বসেছে।

—রামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসে গিয়েছিল।

—সেটা ত্রেতা যুগের ব্যাপার। ত্রেতায় রামচন্দ্রের চোদ্দ বছর, কলিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আঠারো বছর। আর সেই জন্যেই অগ্নিপরীক্ষার আয়োজনটা একটু ব্যাপক।

—বুঝলাম না।

—বুঝবি। এইতো সবে সুরু। বাঁচলুম বলেছিলি, এবার মরা কাকে বলে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাবি। বাংলা দেশটাকে জ্বালিয়ে তবে ছাড়বে।

—জ্বলতে কি বাকি আছে ?

—জ্বলেছে কিন্তু জ্বালাটা যে কি তাতো আর ভালভাবে বুঝিস নি।

শুনেছেন সত্যব্রত। ওদের আলোচনা তাঁর কানে এসেছে। একটি প্রশ্ন বার বার গুমরে উঠেছে তাঁর বুকের মধ্যে, এ কি হচ্ছে ? কেন হচ্ছে ? এর কি শেষ নেই ?

না, শেষ হয়নি। সেই সুরু। কংগ্রেসের সমর্থনে পি, ডি, এফ মন্ত্রীসভা টেঁকেনি। ঐতিহাসিক রুলিং দিয়েছেন বিধানসভার স্পিকার। সুরু হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন। শক্ত মানুষ ধর্মবীর হয়েছেন পশ্চিম বাংলার মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মবীরের ক্ষমতার একাধিপত্যের অন্যতম কারণ নাকি যুক্তফ্রণ্টের ব্যর্থতা। খাদ্যসংকট পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। মানুষের সামনে নেমে এসেছিল অনাহারের কালোছায়া।

কিন্তু কেন এই খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল? কারণ কি?

কারণ, পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি অঞ্চল। প্রতিবছর পশ্চিবঙ্গের খাদ্যের ঘাটতি মেটায় কেন্দ্র। এবং পশ্চিমবঙ্গের ন্যূনতম চাহিদা মত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা, আভ্যন্তরীণ সূত্রে সম্ভব না হলে আমদানী করা, কেন্দ্রের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ, পশ্চিমবঙ্গই প্রতি বছর বেশ কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে তুলে দেয় রপ্তানী বাণিজ্য থেকে। কিন্তু কেন্দ্র কোনদিনই সে দায়িত্ব পালন করে নি।

যুক্তফ্রণ্টের শাসন সুরু হওয়ার আগে হঠাৎ বাজার নেমে গিয়েছিল অস্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চড়তে লাগলো বাজার। সুরু হল চালের চোরা কারবার। চাল হয়ে উঠলো দুষ্প্রাপ্য।

খাদ্যের জন্যে কেন্দ্রের দরবারে ছুটলেন যুক্ত ফ্রণ্টের মন্ত্রীরা। তাঁদের অনুরোধ, কেন্দ্র তার প্রতিশ্রুতি পালন করুক। আগের বছর প্রফুল্ল সেনের সময়ের চেয়ে এবছর যুক্তফ্রণ্টের সময়ে খাদ্যের বরাদ্দ কমিয়েছে কমাক, কিন্তু যা দেবে বলেছে, দিক। কেন্দ্রের

সহযোগিতা ভিন্ন বাংলা দেশের খাদ্যসংকট কাটানো যুক্তফ্রন্টের পক্ষে সম্ভব নয়!

কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম উল্টো গাইলেন। দোষারোপ করলেন যুক্তফ্রন্টের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য সংকটের জন্যে দায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকার। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ। অতএব, যা দিয়েছি অনেক দিয়েছি, যেমন ভাবে দিচ্ছি ঠিকই দিচ্ছি, যেমন দেব তেমনি নিতে হবে। চালাতে না পারো, ছেড়ে দাও।

কেন্দ্রের সাফ জবাব। জোর জুলুমের সাধ্য কোথায় সেখানে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের? পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টকে বাঁচাবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ না খেতে পেয়ে মরলে ক্ষতি কি?

ভারতবর্ষের একদিকে বাংলা, অন্যদিকে পাঞ্জাব। বাংলার মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল পাঞ্জাব। সম্মতি দিয়েছিল কেন্দ্র। ব্যক্তিগত ভাবে চেষ্টা করে যুক্তফ্রন্টের একজন মন্ত্রী বাংলার মানুষের জন্যে যোগাড় করেছিলেন পনেরো শত টন খুদ আর আড়াই হাজার টন গম।

সেই খুদ আর গম বোঝাই হয়েছিল গাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গে আসবে। অনাহারের জ্বালা সামান্য কিছুটা দূর হবে বাঙালীর!

কিন্তু তা হলনা। বাংলার পথে যাত্রা করতে পারল না খুদ আর গম বোঝাই গাড়ি।

কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী টেলিফোন করলেন পাঞ্জাব সরকারকে।

—হ্যালো, আমি কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী বলছি।

—ইয়েস, বলুন।

—পশ্চিমবঙ্গের জন্যে খুদ আর গম কি গাড়ি বোঝাই হয়ে গেছে?

—নিশ্চই।

—গাড়ি কবে রওয়ানা হবে?

দার্জিলিংয়ে। ৮ই অক্টোবর বিমানে তিনি জলপাইগুড়ি দর্শন করলেন (বন্যার খবরটা নাকি তিনি কাছে থেকেও একটু দেরিতে পেয়েছিলেন !)। ১০ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোরারজী দেশাই বাংলা দেশের বিপদে ছুটে এলেন। এলেন জলপাইগুড়িতে। পা দিলেন পুতিগন্ধময় জলপাইগুড়ির মাটিতে। দাদার পাশে পাশে বাংলার রাজ্যপালও জলপাইগুড়ির মাটি স্পর্শ করলেন। সমস্ত উত্তরবঙ্গ তখন নরক কুণ্ড। চারিদিকে মৃতদেহ ছড়ানো। ধ্বংস স্তূপের মধ্যে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মানুষের মৃত্যু যন্ত্রণা। প্রশাসনের অস্তিত্ব নেই। দু-তিন হাজার আমলা মহাপ্রভুরা তখন নিশ্চিন্তে আরাম খাচ্ছেন। শ্বাসরোধী উত্তরবঙ্গকে বাঁচাবার ক্ষমতা সেনাবাহিনী ভিন্ন আর কারো ছিলনা। কিন্তু মোরারজী দেশাই বলেছিলেন, সেনা বাহিনী কোথায় পাব ! (বটেই তো, মানুষকে বাঁচাবার জন্যে সেনা বাহিনী পাওয়া সত্যিই মুস্কিলের। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পেটানোর জন্যে সেনা বাহিনীর অভাব হয়না ! বিগত ১৯৫৫ সালের পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধের সময়ও সীমান্ত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে এত সেনা সমাবেশ ঘটেনি !)

চরম দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে সেদিন মোরারজী দেশাই, ধর্মবীর, কিছু সংসদ সদস্য নিয়ে যেমন উড়ে এসেছিলেন, তেমনি উড়ে চলে গিয়েছিলেন। শিলিগুড়ির কাছাকাছি একটি আর্মি মেসে ওঁদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্ষুধার্ত জলপাইগুড়ির মানুষের কথা চিন্তা করে ওঁদের মুখে আহার রোচেনি। যতবারই মুখে গ্রাস তুলতে গেছেন, চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ক্ষুধার্ত শিশুর মুখ। তবু সেদিন অতিকষ্টে চোখের জল চেপে যে খাদ্য পানীয় তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তা হচ্ছে, পোলাও, সাদাভাত, মটন্ রোগান জোস্, সালাড, মাছ ভাজা, চিকেন কারি, মটর-পনির, দই-রায়তা, আলু-কপির তরকারী, পুরী, আলুর কাটলেট, অড়হর ডাল ; ফলের মধ্যে ছিল আপেল, কমলালেবু, কলা ; পানীয় সফ্‌ট্ এবং হার্ড দুই-ই ছিল।

কিন্তু রাজ্যপাল ধর্মবীর কি কিছুই করেন নি বন্যাপীড়িত উত্তরবঙ্গের জন্যে ?

নিশ্চই করেছেন। অনেক করেছেন তিনি।

উত্তর বঙ্গের বন্যায় রাজ্যপাল ত্রাণ কার্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। চিত্রতারকা, জনপ্রিয় সংগীত শিল্পীদের সঙ্গে সাহায্যানুষ্ঠানের শোভা বর্দ্ধন করেছেন (অবশ্য তিনি একজন ডি. আই. জি -র গৃহে রাতের খানাপিনা, গানবাজনাও করেছেন)। বান্ধবীদের সমাজ সেবার সখ মেটাতে বিশেষ চার্টার্ড প্লেনে উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছেন। অবশ্য তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে কিছু টাকা আর কিছু কম্বল দিতেও ভোলেন নি। এবং তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে মাত্র বারো বেল কম্বল এবং চল্লিশ টিন বিস্কুট পাঠানো হয়েছিল জলপাইগুড়ি ডেপুটি কমিশনারের কাছে। কর্মবীর ডেপুটি কমিশনার সেগুলি দার্জিলিংএ প্রাক্তন কংগ্রেসী এম. পি. শ্রীমতী অমুকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ, বন্যার ব্যাপারে শহরবাসীকে হুঁসিয়ারী জানাতে ব্যর্থতার যে অভিযোগ ডেপুটি কমিশনার সহ বিভিন্ন আমলার বিরুদ্ধে উঠেছিল, সে সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন শ্রীমতীর স্বামী। কাজেই...(১২ বেল কম্বলের দাম তো কম নয় !)

সে সময় ধ্বস-বিধ্বস্ত দার্জিলিংএ জ্বালানিও পেট্রোলের তীব্র অভাবের দরুন বিশেষ পারমিট ছাড়া পেট্রোল দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পারমিট দেওয়া হচ্ছিল শুধুমাত্র অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, মিলিটারী ও রিলিফের গাড়িগুলিকে। সেই দুর্দিনে পেট্রোলের বিশেষ পারমিট নিয়ে দার্জিলিং থেকে একটা গাড়ি শিলিগুড়ি গিয়েছিল। নিশ্চই রিলিফের জিনিস নিয়ে ? তা আর বলতে। রাজভবন থেকে দুটি কুকুর নিয়ে !

ধর্মবীর তাঁর শাসন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বহুক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যোগ্যতায় পশ্চিমবঙ্গে শান্তি এসেছে, বন্ধ হয়েছে দুর্নীতি !

১৯৫৭-৫৮ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের বাজেটের সঙ্গে ১৯৫৮-৫৯ সালে রাজ্যপাল ধর্মবীরের বাজেটের তুলনা করলে দেখা যায়, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, কৃষিউন্নয়ন ও গবেষণা, মৎস্য, পশুপালন, শিল্প, শিল্পোন্নয়ন, কুটির-শিল্প, তপশীল জাতি, আদিবাসী কল্যাণ, সেচ, বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা, প্রত্যেক খাতেই ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্টের বরাদ্দ ছিল বেশি। রাজ্যপালের পক্ষে সম্ভব হয়নি বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্যের কারক যুক্তফ্রন্টের বাজেট বরাদ্দকে অতিক্রম করা। শুধুমাত্র একটি খাতে রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্টকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। সার বুঝেছিলেন তিনি। বুঝে-ছিলেন অশান্ত বাংলায় কি করে শান্তি ফিরবে। বাঙালীর মনের ভয় দূর হবে। সেই সারমর্ম উদ্ধারে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে জেল খাতে বরখাস্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের চেয়ে মাত্র আশি লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন। এবং ব্যয়বরাদ্দ একটু বেশি করে তিনি যে ভুল করেননি, তাঁর শাসন সময়ের মাত্র পাঁচ মাসের হিসাব অনুধাবন করলেই ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাজ্যপাল শাসনের প্রথম পাঁচ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ডাকাতি—

৪৬৪টি মাত্র।

" " কলকাতায় ছিনতাই—১০৭টি মাত্র।

দেশ বিভাগের পর যে কোন বছরের পাঁচ মাসের হিসাবে সর্বোচ্চ!

রাজ্যপাল ধর্মবীরের আরো একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি: তাঁর পুলিশবাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তম-মধ্যম দেওয়া।

যোগ্য প্রশাসক ধর্মবীর বাংলাদেশে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণে কোন ব্যাপারেই কার্পণ্য করেন নি। তাঁর দুর্ভাগ্য, বাঙালীরা তাঁকে চিনতে পারেনি। তাঁর বদনাম করেছে। বদনাম করেছে কেন্দ্রের। বদনাম করেছে কংগ্রেসের।

যে আশু ঘোষ প্রথম যুক্তফ্রন্ট ভাঙায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বঙ্গেশ্বরের নির্দেশ পালন করেছিলেন আদা-জল খেয়ে, সেই তিনি একদিন লিখিত বিবৃতিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, "তিনি (অতুল্য ঘোষ) কংগ্রেসের নামে, জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের নামে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস রিলিফ কমিটির নামে, এক পার্টি মুখপত্র 'জনসেবকে'র নামে অর্থসংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত অর্থের বেশ বড় একটা অংশকে নিজের অর্থে পরিণত করেছেন।"

বিধানচন্দ্র ছাত্রকল্যাণাবাসের অর্থ মেরে দেওয়ার ব্যাপারে আশু ঘোষ বলেছিলেন,—Shri Atulya Ghosh has misappropriated the above said sum of Rs. 2, 28,000.

কার অর্থ আত্মসাৎ করেছেন অতুল্য ঘোষ? কেন করেছেন? আর চুরি কি তিনি শুধু একলাই করেছেন? বাকি সবাই সাধু?

তারপর ১৯৫৯ সাল। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন রঙ্গ। রঙ্গ এই কারণে, সাতষট্টিতে হয়েছিল নির্বাচন; জবরদস্ত আমলা ধর্মবীর, বীরের মত গণেশ উল্টে দিয়ে নতুন গণেশ পূজার সূত্রপাত করলেন কংগ্রেসের সমর্থনে কিছু বিভীষণদের দিয়ে। নেতা 'দি গ্রেট বেঙ্গলী' অতীতের বাঙালীর সর্বনাশকারী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। জনগণেশের পূজা তিনি বেশ ভালভাবেই সমাধা করেছিলেন। তিনি যে কত কঠিন এবং কঠোর, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভাবাপন্ন, মানুষের উপকারী বন্ধু—তাঁর স্বল্পকালিন (মাত্র তিন মাস) বাংলার মসনদে বসার সময়েই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তার পরেই স্পিকার বিজয় বন্দোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রুলিং। ধর্মবীরের পশ্চিমবঙ্গ রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ।

তারপর আবার নির্বাচন। কারণ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী। জনগণের ইচ্ছাকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা এখানে চলবে না, চলতে পারে না। (যদিও নিরীহ নির্বিবাদী শান্তিপ্রিয় মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে অনেক কিছুই আশা করে, কিন্তু দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় মনে হয় নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ তথা নেতার দল শুধু নির্বাচন চান। কোন কারণে ক্ষমতা হাতছাড়া হলেই চিৎকার করে আকাশ ফাটান। গেল-গেল বলে রব তোলেন। ক্ষমতা হাতে এলে 'গেল'র দিকে ফিরে তাকাতেও ভুলে যান। সমস্যাকে জিইয়ে রেখেই যেন তাঁদের আনন্দ !)

নির্বাচন রঙ্গ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ অথবা কেরলে হয়নি, হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষে। এশিয়ার নবসূর্য (বর্তমানের শ্লোগান) শ্রদ্ধেয়া নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা খতম করে দিয়ে নির্বাচন করেছেন এবং সসম্মানে ও বিপুল সংখ্যাধিক্যে তাঁর দল বিজয়লাভ করেছে। কারণ তাঁর স্বপ্ন ও চিন্তাধারা প্রয়োগ করতে বারবার বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছিলেন। মাত্র একটি ভোটের জন্যে রাজন্য ভাতা বিলোপ বিল পাশ হয়নি (এখনও হয়নি)। তাই বাধ্য হয়েই তিনি নির্বাচনের পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন। আর লোকসভার নির্বাচনকে রঙ্গ বলা হচ্ছে এই কারণে, প্রথমতঃ দরিদ্র দেশে হাতি পোষা খরচে একটা নির্বাচন সম্পন্ন হয়। তার ওপর নিত্য নতুন অভিযোগ। টাকা নাকি হরির লুটের বাতাসার মত ছড়ানো হয়েছিল ! যদি সত্যিই ছড়ানো হয়ে থাকে, এলো কোথা থেকে টাকার পাহাড় ? নির্বাচনে টাকার অভাব হয়না, অভাব হয়না মন্ত্রী আমলাদের বিদেশ অথবা স্বদেশ ভ্রমণে, রাজকীয় খানা পিনায় !

আর টাকার অভাব হয়না বিদেশের খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের জন্যে প্রতিনিধি নামের অযোগ্য অকর্মণ্যদের পাঠাতে, যারা প্রিয়জনদের জন্যে বাজার করে, সারারাত ফূর্তি করে ঘুমজড়ানো

চোখে ক্রিকেটের ব্যাট ধরে ডাংগুলি খেলার ভঙ্গিতে। (যদিও নামী ব্যক্তিটি সরে যেতে এবং খেলাধূলায় রাজনীতির চর্চা একটু কমতে (?) এবারের ফল ভিন্নরকম।) ছোট ছেলেদের মত লেবুর বলে লাথি মারে রঙিন চোখে। পায়ের শিরে টানধরা প্রতিনিধি 'বাব্বা বাঁচলুম' বলে হাসি মুখে বিদেশিনীদের অটগ্রাফের তৃষ্ণা মেটায় নায়ক সুলভ ভঙ্গিতে।

টাকার অভাব হয়না। শুধু টাকার অভাব হয় কাজের মত কাজের ক্ষেত্রে। এটাই নাকি স্বাধীন ভারতবর্ষের চিরন্তন রীতি।

উনসত্তরের নির্বাচন। ভোটে জেতার পর যুক্তফ্রণ্ট নয়, ভোটের আগেই যুক্ত। বত্রিশ দফা কার্যসূচী। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দেবেন কেন ?

* পরিচ্ছন্ন ও সৎ প্রশাসন ব্যবস্থাব জন্য,
* জনগণের খাদ্য নীতির জন্য,
* আমূল ভূমি সংস্কারের জন্য,
* গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির জন্য,
* প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরীর জন্য,
* বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য,
* জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য। ইত্যাদি-ইত্যাদি।

মনে আছে সত্যব্রতর। আহ্বান এসেছিল তাঁর কাছে। প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তাঁর। একবার নয়, বার বার ওরা এসেছিল আর ফিরে গিয়েছিল। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

—প্লীজ সত্যদা, আপনি 'না' করবেন না। এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে।

উপকার! আশ্চর্য হননি তিনি। শুধু চিন্তা করেছেন 'এই উপকারের' প্রয়োজন কেন দেখা দিল? কেন তাঁর মত একজন অতি সামান্য লোকের প্রয়োজন দেখা দিল প্রাকনির্বাচন মুহূর্তে? জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাকে কি সত্য সত্যই আপনাদের প্রয়োজন ?

—নিশ্চই। হেসেছিলেন কংগ্রেসপ্রার্থী ভদ্রলোক। চুনোট করা ধূতি আর গিলে করা পাঞ্জাবী পরা অবস্থাতেই দোকানের চায়ের দাগধরা বেঞ্চিতে দ্বিধা না করেই বসে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, সত্যব্রতবাবু, সত্যসত্যই আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। আপনি এদের বার বার ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেইজন্যে আমি নিজে এসেছি। আপনি আমাকে ফেরাবেন না।

—কিন্তু···

কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক তাঁর দুহাত চেপে ধরেছিলেন। বলেছিলেন, আপনার কোন কিন্তু আমি শুনবো না। আমার এ উপকার টুকু আপনাকে করতেই হবে।

ভদ্রলোকের কাতরতা দেখে কয়েক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করেছিলেন সত্যব্রত। বলেছিলেন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে ?

—আপনিই সব পারেন। আশার আলো-জ্বলা চোখে বলেছিলেন তিনি।

—কি করে ?

—আমি আপনার সঙ্গে এ এলাকার প্রতিটি বাড়ির, ডোর টু ডোর ঘুরতে চাই। আর···

—বলুন ?

—আমি এ কেন্দ্রে নতুন প্রার্থী। আমার আগের কেন্দ্রে এবার আমি ···থাকগে সে কথা। আমি আপনার সাহায্য চাই।

মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, আমি যে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো, এ ধারণা আপনার হল কি করে ?

—আপনাকে সকলেই চেনে।

—আপনাকে ?

—আমি এখানে নতুন। আমার কোন···

—বুঝেছি। বাধা দিয়েছিলেন তিনি। জানতে চেয়েছিলেন, কতদিন রাজনীতি করছেন আপনি ?

—তা বছর বারো। তুটো নির্বাচনে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। গত নির্বাচনেই শুধু···

—শুধুই রাজনীতি করেন ?

—না, না। হেসেছিলেন তিনি। আমাদের ব্যবসা আছে।

—সেই ব্যবসা করলেই ভাল করতেন না কি ?

বিস্মিত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, এ কি বলছেন আপনি ?

—আমি শুধু জানতে চাইছি।

হেসেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, ঠিকই বলেছেন আপনি। ব্যবসা কবাই আমার উচিৎ। ব্যবসা করলে আমি হয়তো অনেক নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবো। সামান্য একটা ভোটের জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে না। কিন্তু সত্যি বলছি সত্যব্রতবাবু, দেশের কথা, মানুষের কথা চিন্তা করলে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। মানুষের সেবা, তাদের সামান্য উপকার টুকু করার জন্যে মনটা লালায়িত হয়ে ওঠে। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভুলে যাই। আমি আমার জীবন দেশের সেবায় উৎসর্গ করেছি সত্যব্রতবাবু। এই সেবাব্রত ত্যাগ করে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবার অধিকার আমার নেই।

—সে তো আপনাকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে! তিনি কি বিদ্রূপ করে উঠেছিলেন ?

সত্যব্রত যাই করুন, ভদ্রলোক তাঁর কথাটাকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। বলেছিলেন, সত্যি বলছি সত্যব্রতবাবু, এবার নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। সাতষট্টির নির্বাচনে পরাজয়কে আমি আমার জীবনের গ্লানি বলেই মনে করি। স্থানীয় এলাকার মানুষের জন্যে আমি কিছু কম করিনি। আমার কাছে যে যখন যে সাহায্যের জন্যে গেছে, তাকে সেই সাহায্য

করেছি। নির্বাচনে অঢেল অর্থ ব্যয় করেছি। তবু আমাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

—কেন ?

—আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে তারা।

—এখানেও যে বেইমানী করবে না তার তো…

—সেই জন্যেই তো আপনার দ্বারস্থ হওয়া। আপনি আমাকে একবার সুযোগ দিন সত্যব্রতবাবু।

—কিন্তু আমি কি করে সুযোগ দেব আপনাকে ?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, আমাকে নির্বাচনে জয়ী হতে সাহায্য করা একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব। আমি শুনেছি আপনার কথা। আপনি যে এখানে কত জনপ্রিয় কে না জানে। এখানকার মানুষ আপনাকে চেনে, জানে। আপনার আবেদন তারা অস্বীকার করতে পারবে না। তাছাড়া সে সুযোগও রয়েছে। যুক্তফ্রন্ট শাসনের যন্ত্রণাময় দিনগুলো নিশ্চই মানুষ ভুলে যায়নি। যুক্তফ্রন্ট অনাহার এনেছে, বেকার বাড়িয়েছে, মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে, বাংলা দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্ছিল যুক্তফ্রন্ট।

—কিন্তু সত্যিই কি তাই ?

—কেন নয় ? কত প্রমাণ আপনি চান ? জানেন, যুক্তফ্রন্ট আর প্রফুল্ল ঘোষের বারো মাসে ৭৪৫৯২ জন শ্রমিক কর্মচ্যুতহয়েছে।

—তবে যে শুনি ১৯ ৬ সালে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রী থাকার সময়ে মাত্র এক বছরে ১২৭৫০১ জন শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিল।

—মিথ্যে—মিথ্যে, ডাহা মিথ্যে কথা। যুক্তফ্রন্টের অপপ্রচার।

—আরো শুনতে পাচ্ছি, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নাকি পশ্চিমবঙ্গেরই ভাগে কম টাকা পড়েছে ?

—মিথ্যে কথা। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তিনি।

সত্যব্রত কঠোর হয়েছিলেন। একটু কঠোর কণ্ঠেই বলেছিলেন,

আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন। মিথ্যে কথা বলে আপনার নামে ভোট চাইতে আমি পারবো না।

—মিথ্যে কথা বলবেন কেন ?

—সত্য কথাটা যে মর্মান্তিক হবে। দুবার তো নির্বাচনে জয়ী হয়ে পাঁচ বছর করে দেশ সেবা করেছেন। তাহলে আজ এ অবস্থা হল কেন ? দল নয় দেশ, বাংলার জন্যে বাঙালী হয়ে যদি কাজ করতেন তাহলে আজ এমন অবস্থা হত না।

—তাহলে আপনি বলছেন···

—আমাকে ক্ষমা করবেন।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন সত্যব্রতর মুখের দিকে। নিষ্ফল আক্রোশে ব্যর্থ কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

চলে গিয়েছিলেন তিনি। আর আসেন নি। ভদ্রলোকের রাজনীতির জীবনেও ইতি হয়েছিল।

সত্যব্রত ভেবেছেন দিনের পর দিন। খণ্ডিত বাংলা স্বাধীনতার সময় ছিল শিল্পে সমৃদ্ধ। বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে ছিল শীর্ষস্থানে। একমাত্র মহারাষ্ট্র আর গুজরাট মিলিতভাবে পাল্লা দিতে পারতো।

আর আজ ?

আজ বাংলা রিক্ত নিঃস্ব। বাংলার যা ছিল তাও অবলুপ্তির পথে।

কিন্তু কেন ?

সর্ব ভারতীয় নেতার দল প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করার জন্যে মাঠে ময়দানে গলাবাজি করেন, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি মৌখিক সদিচ্ছা প্রকাশ করে নিজ নিজ রাজ্যকে রাতারাতি সমৃদ্ধ করে তোলেন। প্রতিবাদ অথবা প্রতিকার ? ছিঃ ছিঃ, প্রাদেশিকতার শিকার নেতাদের হতে নেই। ভারতরাষ্ট্র এক এবং অভিন্ন। বাংলা শেষ হয়ে গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র যদি সমৃদ্ধ হয় তাতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। কারণ, উন্নতি তো ভারতবর্ষেরই হচ্ছে !

'১৯৫৯-৬০ সালে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে কি নিয়েছেন আর কি দিয়েছেন :

ট্যাক্সের নাম	পশ্চিমবঙ্গ থেকে আদায় করেন	দেন
এক্সাইজ ডিউটি	২১৮ কোটি টাকা	২৩ কোটি টাকা।
ইনকাম ট্যাক্স	৪৫ "	২৭ "
করপোরেশন অর্থাৎ যৌথ কোং কাছ থেকে পাওয়া ট্যাক্স	১২০ "	একটি পয়সাও নয়।
কাষ্টম্‌স ডিউটি	২১২ "	একটি পয়সাও নয়।

তাহলে কেন্দ্র নিলেন মাত্র ৫৭৭ কোটি টাকা আর নানা সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গকে দিলেন ৫০ কোটি টাকা (অদ্ভুত সুবিচার) এবং এইভাবেই কেন্দ্র নিচ্ছেন, দিচ্ছেন! এ ছাড়া আরো কিছু কেন্দ্র নেয়, সাকুল্যে প্রায় ছয় থেকে সাতশো কোটি টাকা মাত্র।

ছোট বড় শিল্পে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গকে 'এড হক' অর্থাৎ কাঁচা-মালের বরাদ্দ বেঁধে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থাও পাকা করেছেন। ক্ষুদ্র শিল্প সব প্রায় লাটে উঠেছে, বড়গুলোও উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও কেন্দ্র কেমন সুবিচার করেছেন :

রাজ্য	টাকা (কোটি টাকার অঙ্কে)
উত্তরপ্রদেশ	৯৬৫.০০
বিহার	৫৩১.১৮
গুজরাট	৪৫৫.০০
মহারাষ্ট্র	৮৯৮.১২
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪২০.২৫
তামিল নাড়ু	৫১৯.৩৬
মহীশূর	৩৫০.০০
পশ্চিমবঙ্গ	৩২২.৫০

পশ্চিমবঙ্গ শুধুমাত্র দোহন ক্ষেত্র। কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে দোহন

করছে, দোহন করছে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। বাংলা মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে। বাঙালী শুধু মার খাচ্ছে।

প্রতিকার কি নেই?

আছে। হয়তো আছে। কে প্রতিকার করবে? বাঙালী। সর্বভারতীয় নেতা সেজে নয়, ছত্রিশ দলের ছত্রিশ আদর্শ দিয়ে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে নয়, অন্যায়ের সঙ্গে, অবিচারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হলে দলীয় নেতাদের আগে বাঙালী হতে হবে, বাংলার কথা ভাবতে হবে, বাঙালীর কথা চিন্তা করতে হবে, বাংলাকে বাঁচাতে হবে। ঘরের শান্তি আগে।

কেমন করে? চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে মনে। উনসত্তরের নির্বাচন শেষ হবার পর বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের নেতাদের ক্ষমতার ভাগ-বাঁটোয়ারার নির্লজ্জ বেহায়াপনা দেখে তাঁর মনে একটা প্রশ্নই বারবার জেগে উঠেছিল, দেশ ও দশের সেবার জন্যে; কাজের জন্যে এঁরা, না ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যে?

নেতায় নেতায় খেয়োখেয়ি। ক্ষমতার দখল নিয়ে নির্লজ্জ বেহায়াপনা। চুলায় গেল দেশ অথবা মানুষের কথা ভাবা। বত্রিশ দফার প্রতিশ্রুতি। বাংলার 'মুজিবর' অজয় মুখোপাধ্যায়ের (অবশ্য নিজেকে মুজিবর বলে ঘোষণা করেছিলেন পরে) মুখ্যমন্ত্রীর গদী নেবার জন্যে এঁড়ে ছেলের বায়না। নাচের পুতুলটির দড়ি অবশ্য কয়েকটি হাতে ছিল। তিনি শুধু নেচে গেছেন।

শুধু সভা, সভা আর সভা। শুধু আলোচনা চলেছে। মীমাংসা হয়নি। দুর্যোধনদের (কয়েকজন নেতা বাদে) প্রতিজ্ঞা, বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।

জনগণ ? বাংলার মানুষ ? ছ্যা, ছ্যাঃ, নেতা সাজার পাট চুকলে আর কে পোঁছে ? সম্পর্ক তো শুধুমাত্র ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারপরই সব, দল ও দলীয় নেতাদের এক্তিয়ারে। সেখানে নেতার দল কি করছে না-করছে, তা দেখবার কোন দরকার নেই। দেখবেইবা কেন ? কোথায় সে অধিকার ?

তবু আশাবাদী মানুষ না দেখে পারেনি। নেতার দলের (ভদ্রবাবু বলেছিলেন, তিলিয়ে ওঠা) ক্ষমতার ভাগাভাগির লড়াই নীরবে সহ্য করতে পারেনি। নেতার দল মিটিং করছেন গোপনে। কোথায় গোপনতা ? মানুষ হাজির।

কি হল, আর কদিন লাগবে ?

কংগ্রেসের তবু চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা ছিল। মনের গোপন কোণে দীর্ঘদিন ধরে যে আশাই লুকিয়ে থাকনা কেন, দলের সুনামের কথাটা সব নির্বাচিত প্রতিনিধিই মনে রাখতেন। গোপনে চলতো তদ্বির তদারক, মন্ত্রীত্ব না জুটলে মনের দুঃখ মনে চেপে রাখতেন তাঁরা। মুখে হাসি বজায় থাকতো! মানুষ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতো না ক্ষমতা লাভের গোপন কথা।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট চোদ্দ দলের, অতএব বাংলার নগণ্য জনসাধারণকে তাঁদের দেশ সেবার প্রমাণ তো দিতে হবে! আর সেজন্যে চাই ক্ষমতার আসন। সামান্য পদ হলে চলবে না, চাই ভারী পদের দায়িত্ব। অতএব···

হাট বসলো মাছের। বত্রিশ দফার কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন, কি প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন। বাংলার মানুষ কেন তাঁদের ভোট দিয়েছে!

বাংলার মানুষ কেন ভোট দিয়েছিল যুক্তফ্রন্টকে ? কোন আশায় তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের মনের ক্ষোভ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিল ? মানুষ কাদের ভোট দিয়েছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে, না যুক্তফ্রন্ট নামের বাংলার মানুষের কল্যাণকামী ফ্রন্টকে ?

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মত, তাঁদের সোচ্চার ঘোষণা, বাংলার মানুষ যুক্তফ্রন্ট নামের সংযুক্ত শক্তিকে ভোট দেয়নি, তাঁদের দলকে ভোট দিয়েছে, তাঁদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছে। যুক্তফ্রণ্টের শরিক দল হলেও তাঁরা জিতেছেন তাঁদের দলীয় শক্তিবলে। অতএব তাঁরাই বড়, মানুষ তাঁদের চায়, মানুষের কল্যাণের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁদেরই পাওয়ার যোগ্যতা আছে।

সেই সময়, ১৯৬৯ সালের ভোটরঙ্গ মেটার পর, বিজয়গর্বে গর্বিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে খেয়োখেয়ির সময়, সেই ছেলেগুলো, যারা একদিন যুক্তফ্রণ্টের হয়ে উল্লসিত হয়েছিল, আনন্দে উচ্ছাসে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে স্বপ্ন দেখেছিল; ভবিষ্যতের নিরাপত্তায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল; সেই ছেলেগুলো, শঙ্কা কাঁপা চোখে অসহায় বোধে অস্থির হয়ে এসে বসেছিল একদিন সত্যব্রতর দোকানে।

ওদের নীরব কণ্ঠ, ম্লান মুখ, ওরা যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। লজ্জা যেন জড়িয়ে ধরেছিল ওদের।

ব্যথিত হয়েছিলেন সত্যব্রত। ওদের কি বলবেন তিনি ভেবে পাননি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিরে তোদের চা দেবো?

চা! ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল পরস্পরের! বলেছিল, না, চা খাব না।

—কেন চায়ে অরুচি হয়েছে?

—না তা নয়।

—তবে?

ওরা তাঁর সে প্রশ্নের জবাব দেয়নি। যেন শুনতে পায়নি এমন ভান করেছিল।

কেন যে চা খাবেনা সে কথা বলতে পারেনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ওদের মনের কথাটা। ওরা লজ্জিত, হয়তো বা ক্ষুব্ধ, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। কোন্ লজ্জায় ওরা নেতাদের

নির্লজ্জ বেহায়াপনা নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠবে! ওদের লজ্জা করছিল।

সত্যব্রত নীরব থাকেন নি। বলেছিলেন, তোদের কারো পকেটেই তাহলে চা খাওয়ার মত পয়সা নেই?

—না-না, তা নয়।

—তাহলে চা খাবিনা কেন?

—আমরা···কি যেন বলতে গিয়েও ওরা চুপ করে গিয়েছিল।

মৃদু হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, বেশ আমিই তাহলে আজ তোদের চা খাওয়াচ্ছি।

—আপনি! ওরা কিছুটা বিস্মিত।

—হ্যাঁ। হেসেছিলেন সত্যব্রত। রোজই তোরা আমাকে পয়সা দিয়ে চা খাস, আজ আমিই তোদের খাওয়াব।

—কেন? জানতে চেয়েছিল ওরা।

—বললাম তো কেন খাওয়াব। সহজ কণ্ঠেই বলেছিলেন তিনি।

ওরা কিন্তু সহজভাবে নিতে পারেনি তাঁর প্রস্তাবটা। প্রশ্ন করেছিল, সেটাই কি সত্যি?

—মিথ্যেটা কোথায় দেখলি বল?

—আপনি আনন্দে চা খাওয়াতে চাইছেন আমাদের!

—রোজই তো তোদের খাইয়ে আনন্দ পাই।

—আপনি খুশি হয়েছেন।

—আজ কিন্তু তোদের মুখগুলো দেখে খুশি হবার কোন কারণ নেই। তোদের সকলকার মুখ-চোখই শুকনো। বাড়িতে কোন গোলমাল হলে, সকলের একসঙ্গে হবেনা। কোথাও মারামারি করে এসেছিস নাকি বলতো?

—না।

—তাহলে তোদের মুখ চোখ অমন শুকনো কেন?

—সেটাতো আপনিও বেশ ভাল রকমই জানেন, আর সেই জন্যেই তো আপনার আনন্দ।

—নারে, সত্যি আমি কিছু জানি না।

—মিথ্যে কথা বলবেন না।

তিনি আঘাত পেয়েছিলেন। পাড়ার ছেলেগুলো তাঁকে মিথ্যেবাদী বলেছিল। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তোরা আমাকে মিথ্যেবাদী বললি ?

ওরাও বুঝতে পেরেছিল সে কথা। কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে লজ্জিত হয়েছিল, এ তারা কি করলো! মাথা নীচু করেছিল ওরা। অনেকক্ষণ বসেছিল নীরবে। এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, সত্যদা, আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন।

তিনি উত্তরে কথা বলেন নি।

ওরা বলেছিল, আপনি বিশ্বাস করুন, ও কথাটা আপনাকে আমরা বলতে চাইনি।

তবুও কথা বলেননি তিনি।

—আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন, সত্যদা। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল।

কথা বলেছিলেন সত্যব্রত। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চা খাবি না ?

—চা ? ওরা অসহায় দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—হ্যাঁ। হাসি ফুটিয়ে ছিলেন মুখে। বলেছিলেন, বোস, চা খেয়ে যা। আমি খদ্দের নষ্ট করতে চাইনা।

—কিন্তু···

—বল।

—আমরা ও কথাটা আপনাকে বলতে চাইনি। আমরা জানি···

—ওসব কথা ছেড়ে দে। বাধা দিয়ে বলেছিলেন তিনি।

—আমাদের মাথার ঠিক নেই সত্যদা। আমরা ভাবতে পারছি না···

সত্যব্রত নীরবে চেয়েছিলেন ওদের মুখের দিকে।

—একি হচ্ছে সত্যদা ?

সত্যব্রত উত্তর দেননি।

—যুক্তফ্রণ্টের নেতার দল একি করছেন ? এমন করছেন কেন তাঁরা ? মন্ত্রীত্বের পদগুলোই কি আসল ? মানুষকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জিৎলেন, তার কি কোন মূল্য নেই ? তাঁরা যদি ক্ষমতার দখল নিয়েই কামড়া কামড়ি করেন, তাহলে মানুষের জন্যে কাজ তাঁরা করবেন কেমন করে ? কোন্ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা তাঁদের বিশ্বাস করবো ?

সত্যব্রত উত্তর দেননি। উত্তর তাঁর জানা থাকলেও সে উত্তরে ছেলেগুলোকে তিনি শুধু আঘাতই দিতেন।

কিন্তু আঘাত কি ওরা পেল না ?

পেল। আঘাত পেল সমস্ত বাংলার মানুষ। ভাগাভাগি হল মন্ত্রীত্ব। মুখে হাসি ফুটিয়ে ওঁরা এক হলেন। এক হলেন বললে হয়তো ভুল বলা হয়, এক হতে বাধ্য হলেন নেতার দল। হয়তো সেদিন এক না হয়েও তাঁদের উপায় ছিল না। জাগ্রত বাংলা সেদিন হয়তো ক্ষমতার দখলদার নেতাদের ক্ষমা করতো না।

কিন্তু এক হয়ে কি হল ? কতটা লাভবান হল বাংলা। বাঙালী পেল কি বাঁচার পথ ?

পেল না। দেশ অথবা মানুষ নয়, দল। দলবাজির দেশ বাংলায় বত্রিশ দফার মালিকরা চূড়ান্ত পর্যায়ে দলবাজি সুরু করলেন। বড় হতে চাইলেন। অন্যায় আপোষ, দুর্নীতি, শরিকী সংঘর্ষ। ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দলের স্বার্থে চলল তাঁদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। পরিচ্ছন্ন ও সৎ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিণত হল ঠাট্টায়। গণতান্ত্রিক শিক্ষা নীতির মূলে কেন্দ্রীয় শাসক কুল তাদের বাদশাহী

হুকুমে উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা চাপিয়ে প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের শিক্ষামন্ত্রী দ্বাদশ ক্লাশের হুকুমনামার চেষ্টা করলেন। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিদ্যার জাহাজ তৈরির পরিকল্পনায় মেতে উঠলেন। মন্ত্রীর দল মেতে উঠলেন খেউড়ে। তরজা গানের আসর বসলো গোটা পশ্চিমবঙ্গে। শ্রোতা জনগণ। তাঁরা যা করেছেন সবই জনগণের জন্যে!

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সাল থেকে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীর দল কি বাবদ কত টাকা (সরকারী তহবিল থেকে) খরচ করেছেন, ৬ই মার্চ ১৯৬০ সালে অর্থদপ্তরের মন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় বিধান সভায় তার বিবরণ দেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় —	পেট্রোল	৪১০৯ টাকা
	টেলিফোন	১৭৮৩ টাকা
	ভাতা ও রাহা	৪৫৮৫ টাকা
শ্রীজ্যোতি বসু—	পেট্রোল	৪১২৯ টাকা
	টেলিফোন	২৭৪০ টাকা
	রাহা ও ভাতা	৩৬৬২ টাকা
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—	পেট্রোল	৮০৩৯.৬০ টাকা
	টেলিফোন	৮৬৩৩.৭৫ টাকা
শ্রীশম্ভু চরণ ঘোষ—	ভাতা ও রাহা	৫৯৭৫.৫০ টাকা
শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়—	কোন রাহা খরচ নেননি, দৈনিক ভ্রমণ ভাতা বাবদ মোট	৯০ টাকা
আবদুল রেজ্জাক খান—	পেট্রোল	২৫৬১ টাকা
	টেলিফোন	২১২৫ টাকা
	রাহা ও ভাতা	৮৯১ টাকা
শ্রীপ্রতিভা মুখোপাধ্যায়—	রাহা খরচ	৭২০ টাকা
শ্রীভবতোষ সোরেন—	পেট্রোল	২৮০৯ টাকা
	টেলিফোন	২১৫৫ টাকা

	ভাতা ও রাহা	২৪৬৫ টাকা
শ্রীভক্তি ভূষণ মণ্ডল—	পেট্রোল	৩৫৪৬ টাকা
	টেলিফোন	৩৯৭৪ টাকা
	ভাতা ও রাহা	৮৪৬০ টাকা
শ্রীচারু মিহির সরকার—	পেট্রোল	৬১৩৯ টাকা
	টেলিফোন	২৯৯৫ টাকা
	ভাতা ও রাহা	৩৭৮১ টাকা
শ্রবিভূতি দাশগুপ্ত----	পেট্রোল	২৪৬০ টাকা
	টেলিফোন	৪৫৮১ টাকা
	ভাতা ও রাহা	১৩২৬ টাকা
শ্রীদেও প্রকাশ রাই—	পেট্রোল	৩০৮৫ টাকা
	টেলিফোন	৫১১০ টাকা
	ভাতা ও রাহা	৫৪৪৬ টাকা
গোলাম ইয়াজদানি—	পেট্রোল	২৫৪৯ টাকা
	টেলিফোন	২৯৭৮ টাকা
	ভাতা ও রাহা	২৪৫১ টাকা

সমস্ত মন্ত্রী মিলে পেট্রোল খরচ করেছেন মাত্র একলক্ষ তিন হাজার আটশ পনের টাকা। টেলিফোন বিল, বিরাশী হাজার পাঁচশ পঁচাশি টাকা। এছাড়া ভাতা ও রাহা খরচ আছে।

যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীর দল পশ্চিমবঙ্গের জণগণের সেবার (?) জন্যে খরচ খরচা কি কিছু কম করেছিলেন ? করেন নি। কিন্তু সত্যিকারের কাজ তাঁরা কতটা করেছিলেন ?

পরস্পরের নামে কুৎসা গেয়েছেন। দলীয় স্বার্থে খুন জখমের মহড়া চালিয়েছেন। যাকে পেয়েছেন, যেমন ভাবে পেয়েছেন, দল বাড়িয়েছেন। আপোষ করেছেন অন্যায়ের সঙ্গে।

ভদ্রবাবু একদিন বলেছিলেন, জানেন সত্যব্রতবাবু, কংগ্রেসকে আমরা খারাপ বলি, কংগ্রেস বড়লোকের পার্টি, গরীব মানুষের জন্যে

কিছুই করেনি। যারা একদিন রাজনীতি কি জিনিষ জানতো না, ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামকে বানচাল করার চেষ্টা করতো সাধ্যমতো, দেশ স্বাধীন হবার পর তারাই রাতারাতি নেতা সেজে বসলো। যেসব আমলা আর পুলিশের বড় ছোট মেজ কর্তার দল ইংরেজ রাজত্বের স্বার্থরক্ষাকারী ছিল, তারাই হয়ে উঠলো প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বেসর্বা। কংগ্রেসের মধ্যপন্থী নেতার দল (এডমানড্ বার্কের মতে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ তিনভাগে বিভক্ত—নরমপন্থী, মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী। নরমপন্থীরা দুর্বল হৃদয়। মধ্যপন্থীরা সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থী, এবং চরমপন্থীরা তাঁদের আদর্শ রূপায়ণে বদ্ধ পরিকর।) আপোষ করে খণ্ড স্বাধীনতা নিয়ে গদি আঁকড়ে থাকার জন্যে দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী প্রভৃতি সকলের সঙ্গে আপোষ করে ছলে বলে কৌশলে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। সেই মধ্যপন্থী দলেই কংগ্রেস ভরে আছে, সেইসঙ্গে মিশেছে কিছু দক্ষিণপন্থী। কিন্তু বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও দেখছি সুবিধাবাদীর ভিড় কম নয়। সুবিধার স্বার্থে কি-না করেছে।

ভদ্রলোকের বলার ধরণে হেসে ফেলেছিলেন সত্যব্রত।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, আপনি হাসছেন?

বিব্রত সত্যব্রত বলেছিলেন, না, না···

—না-না কি, আমি দেখছি আপনি হাসছেন। তার মানে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। আজ বড় ঘেন্নায় বলছি, যুক্তফ্রন্টের ছত্রিশটা দল বাংলা দেশটাকে ডুবিয়ে দিলে। সব মিরজাফরের দল।

—আর কংগ্রেস? সকৌতুকে জানতে চেয়েছিল চা-পানরত একটি ছেলে।

—শয়তানের বাবা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

—তাহলে ভাল কে দাদু?

—আমরা। তুমি আমি, তোমার বাপ ঠাকুরদা।

—তুজনেই মারা গেছেন।

—কিন্তু যারা আছে? যারা অল্প কথায় তুষ্ট হচ্ছে। বিচার করছে না, শুধু কথা শুনেই বিশ্বাস করছে।

—তাই কি?

—নয় কেন বল?

— মানুষকে আপনি বোকা বলছেন?

—বোকা বলছি না, বিচার ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গেছে। সমস্যার মধ্যে জিইয়ে রেখে দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে। কারণটা কি জানো, পেট। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। পেট ভরলেই চোখ খোলে। তার আগে আমরা সবাই হাত তোলার দলে। হাত তো তুললাম কিন্তু হলটা কি?

—কি হচ্ছে সেটাতো বলবেন?

—হচ্ছেনা-টা কি শুনি? কংগ্রেস বাসের পারমিট নিয়ে জুয়াচুরি করতো। যুক্তফ্রন্টের কোন-কোন মন্ত্রী করছে না?

- কে বললে?

—যারা পারমিট নিচ্ছে তারাই বলছে।

—প্রমাণ দিতে পারেন?

—আসল কথাটাই এতক্ষণে বলেছো। প্রমাণ কোথায়? অভিযোগ প্রমাণিত হবে কি করে? টাটা বিড়লার ঘুষের প্রমাণ চাই! প্রমাণ চাই সবকিছু কুকীর্তির। কিন্তু ভাই, তুর্নীতি যারা করছে তারা কি তোমার আমার জন্যে প্রমাণ রেখে করছে? সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে কি তুর্নীতি হয়?

— তাহলে যুক্তফ্রন্টের নামে মিথ্যা অভিযোগ করছেন কেন?

—সত্যি বলেই বলছি।

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। যাবার আগে বলেছিল, যুক্তফ্রন্ট ঠিকমত কাজ করতে পারছে না ঠিক কথা, কিন্তু কেন পারছে না সেটা

সুস্থ মাথায় চিন্তা করে দেখুন। মন্ত্রীদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পোষা কুকুরবদ আমলার দল আর কেন্দ্রপতি কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। না হলে মন্ত্রীরা ঠিকই কাজ করতেন।

—কতটা সত্যি?

—সবটা। আর···

—আর কি?

—কোন দলের ব্যাপারে মুখটাকে একটু সামলে চলবেন। বয়েস যখন হয়েছে, তখন নিশ্চই জানেন, হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ছুঁড়ে দিলে তা আর ফেরৎ আসে না।

ছেলেটা দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ছেলেটার গমন পথের দিকে তাকিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ছেলেটা কে বলুন তো?

—এখানেই বাড়ি, তবে, এখন থাকে না।

—কোথায় থাকে?

—তা জানি না, তবে বছর কয়েক আগে একটা খুনের ব্যাপারে জেল হয়েছিল।

—এঁ্যা!

—হ্যাঁ। হেসেছিলেন সত্যব্রত। ঠাট্টা করার লোভটা সামলাতে পারেন নি। বলেছিলেন, না না, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই। ছেলেটা এখন আর খুনী নয়।

—কি আবোল তাবোল বকছেন আপনি?

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সত্যি কথা বলছি। ছেলেটা এখন রাজনৈতিক কর্মী। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছে।

—তার মানে গুণ্ডামীতে?

—তা কি করে বলবো বলুন। মাঝে মধ্যে আসে, চা খায়, ব্যাস।

—ব্যাস! যেন ভেংচে উঠেছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, এইসব খুনে গুণ্ডা বদমায়েসের দল যদি রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে ছাড়পত্র পায় তাহলে বাংলা দেশটার অবস্থা কি হবে একবার চিন্তা করেছেন? বাঙালী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত?

—সেটা কি ওদের দোষ?

মাথা নেড়েছিলেন ভদ্রলোক। বলেছিলেন, বাঙালী শেষ হয়ে যাবে!

বাঙালী শেষ হয়ে যাবে। কথাটা যতবার চিন্তা করেছেন ততবারই সত্যব্রতর বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা গুমরে উঠেছে। বাঙালী বাঁচতে চায়। বাঙালী চায় আপন অধিকার। কিন্তু অন্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে নয়। বাঙালী বাঁচতে চায় তার অধিকারের সীমার মধ্যে।

কিন্তু সেই অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, ষড়যন্ত্র চলেছে। বাঙালীকে মারার ষড়যন্ত্র, শেষ করার ষড়যন্ত্র। পূর্বে-পশ্চিমে। বাঙালীর ন্যায়ের প্রতীক্ষা নিস্ফল হয়েছে।

অবশেষে।

পশ্চিমে বাঙালী অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে দায়িত্বভার তুলে দিয়েছে যুক্তফ্রণ্টের হাতে। কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট করেছে রাজনীতি। বাংলার স্বার্থ তাঁরা দেখেননি, দেখেননি বাঙালীর স্বার্থ। ক্ষমতা লাভ করে নেতার দল আরো বেশি ক্ষমতার জন্যে লালায়িত হয়েছেন। দলকে বাড়াতে চেয়েছেন। ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছেন। বাঙালী হয়ে, বাংলাদেশ এবং মানুষের কাজে এগিয়ে আসতে তাঁরা পারেন নি। অথচ বারবার

মুখে বলেছেন তাঁরা, কেন্দ্রের অন্যায় নীতি বাংলাকে নিঃশেষ করছে। বাংলাকে শোষণ করছে কেন্দ্র।

পূর্ব বাংলাকেও শোষণ করেছে কেন্দ্র। পূর্বের সম্পদে বেড়েছে পশ্চিমের সম্পদ। নিঃস্ব রিক্ত হয়েছে বাংলা। কেড়ে নিতে চেয়েছে বাঙালীর সমস্ত অধিকার, বাঙালীর মুখের ভাষা। চাপিয়ে দিয়েছে অন্যায় শাসন। শেষ করতে চেয়েছে বাঙালীকে।

কিন্তু শেষ হয়নি বাঙালী। কারণ···

বাঙালী সেখানে বাঙালী হয়েই বাঁচতে চেয়েছে। সেখানকার নেতার দল জাতীয়তাবাদের নামে ধাপ্পার আশ্রয় নেননি। দেশ এবং মানুষের কথাই চিন্তা করেছেন তাঁরা।

মুজিবর রহমান জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি আগে বাঙালী। বাংলার স্বার্থ তিনি আগে দেখেছেন। তিনি তাঁর ছয় দফা দাবীতে বলেছেন,—

প্রথম: লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে। (১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হয়েছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়েছিলেন। এবং এই লাহোর প্রস্তাব জিন্নাসহ সকল মুসলিম নেতার নির্বাচনী প্রচার। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে সাতানব্বইটি যে একুশ দফার পক্ষে এসেছিল, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসন রচনাই ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান দাবী। তখন কুখ্যাত মুসলিম লীগ কেন্দ্র ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে তারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেছিল। লাহোর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান

ধ্বংস হবে এই ছিল তাদের প্রধান যুক্তি। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ সে কথায় ভোলেনি। একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।)

দ্বিতীয়ঃ ফেডারেশন সরকারের এক্তিয়ারে কেবলাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ষ্টেটসমূহের হাতে থাকিবে। [১৯৪৬ সালে বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন যে প্ল্যান দিয়েছিলেন তা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করেছিল। তাতে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকি সব বিষয় প্রদেশের হাতে দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের নত এই যে, তিনটিমাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তিভঙ্গ করলে ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয় (কংগ্রেস কেন যে চুক্তিভঙ্গ করেছিল তা আজ আর না বোঝার কিছু নেই।)]

তৃতীয়ঃ (ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহরে বিনিময় যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। (ক্যাবিনেট প্ল্যানে লিখিত ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করে ব্রিটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করেছিল, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয়

না করেও কেন্দ্র চলতে পারে। রাষ্ট্রীয় অর্থ বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ায় বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ষ্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দপ্তর নেই। শুধু প্রাদেশিক সরকারে অর্থমন্ত্রী ও অর্থ দপ্তর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী দফতর দিয়েই মিটে থাকে।...একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব বাংলাকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নেই। কারণ, সারা পাকিস্তানে একই মুদ্রা হওয়ায়, দুই অঞ্চলের মুদ্রার কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোন বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসেব নেই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকায় অতি সহজে পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়। সরকারী, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনশিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলেছে। সরকারী ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সহ সব ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায়।... শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেলই নয়, মুদ্রাস্ফীতি হেতু পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দুর্মূল্যতা, জনগণের, বিশেষতঃ পাট-চাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। মুদ্রা পাচার বন্ধ করতে না পারলে পূর্ব

প্যাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে একপা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। কারণ এ অবস্থায় মূলধন গড়ে উঠতে পারে না।)

চতুর্থ : সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা করধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে। (মুজিবের কথায়, আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশি চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চই পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।·· কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চই আছে। তবু যে তাঁরা এসব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার।)

পঞ্চম : (১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিয়ারে থাকিবে।

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্দ্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রপ্তানী চলিবে।

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী রপ্তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে। (ছয় দফা দাবীতে কেন একথা বলা হয়েছে তা পাকিস্তানের আঠারো বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যাবেঃ (ক) পুর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হয়েছে। (খ) পুর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না ওঠায় পুর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পুর্ব পাকিস্তানের নেই, এই অজুহাতে পুর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। এইভাবে পুর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হতে পারেনি। (গ) পুর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করতে পারে না। পুর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রপ্তানী করে, আমদানী করে সাধারণতঃ তার অর্দ্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম অনুসারেই পুর্ব পাকিস্তানে ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লেগেই আছে। তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বেশি। বিদেশ থেকে আমদানী করা একই জিনিষের পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দামের তুলনা করলেই বোঝা যায়। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে থাকার ফলেই পুর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুর্দশা। (ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী

মুদ্রার তিনভাগের তুই ভাগই অর্জিত হয় পাট থেকে। অথচ পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য তো দূরের কথা, আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে, পাট-চাষীদের ভাগ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিষে পরিণত হয়েছে। পুর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন ; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি তুনিয়ায় আর কোন দেশে নেই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলে যাওয়ার সাথে সাথে দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষীটি চিরকাল দেখে এসেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করে পাট রপ্তানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোন প্রতিকার নেই, (ঙ) পুর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হচ্ছে তা নয়, যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু সে লোনের স্থদ বহন করতে হচ্ছে পুর্ব পাকিস্তানকেই।)

ষষ্ঠ : এই দফায় আমি পুর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবী অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবীতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছিলাম। তাহা করা হয় নাই, বরঞ্চ পুর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই-পি-আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পুর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবী, একুশ দফার দাবী। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবীও পুরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবী করিতে

হইবে কেন? সরকার নিজ হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পুর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসন কর্তারা বলেন কোন মুখে?...

পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে কি দিয়েছে সে সম্বন্ধে মুজিবর বলেছিলেন ঃ

(১) প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশ; আর আপনাদের ছিল আঠাশ। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশ রক্ষার সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তাহা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের চুয়াল্লিশটা আসনের মধ্যে ছয়টাতে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তাহা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবী করিয়া ছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পুর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা বোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যাগুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যাসাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্থানের মধ্যে বাংলা দেশের স্বায়ত্ব শাসনের ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করেছিল আন্তরিকতার সঙ্গেই। বাঙালী বাঁচতে চেয়েছিল।

বিশ্বাস করেছিল নেতাকে। সাড়া দিয়েছিল আহ্বানে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশায় সমর্থন জানিয়েছিল আওয়ামী লীগকে।

কিন্তু কি হল?

বাঙালীর অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো অবাঙালী পশুর দল। লক্ষ-লক্ষ হিন্দু হল বাস্তুহারা, পথের ভিখারী। আরেক বাংলার দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়াল তারা।

পুর্ব পাকিস্তান আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আজ স্বাধীন বাংলা দেশ! অদূর ভবিষ্যতে হয়তো অধিকার স্বীকৃত হবে তার; হিন্দু মুসলান দুটি সম্প্রদায় একসঙ্গে বাঁচার অধিকার পাবেতো? যদি না পায় বাঙালীর মৃত্যু ঘটবে! বাঙালী বাঁচতে পারবে না। বাঙালী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে।

চিন্তা, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা! সত্যব্রতর মনের কোণে জমে উঠেছে একটা অস্থির ভাব। সংবাদের সত্যতা যাচাই করা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু যা শুনেছেন তাতেই তিনি মর্মাহত। সংখ্যা হয়তো অল্প, কিন্তু অস্বীকার করতে পারেন নি অতীতটাকে। অতীতের কলঙ্ক তো লোভ লালসা স্বার্থের জন্যে! হিন্দু মুসলমান প্রশ্নে দাঙ্গা বেঁধেছে। বাঙালী হয়ে বাঁচতে চায়নি বাঙালী।

আজও সেই ঘটনারই অশুভ ইঙ্গিত। প্রাণের মায়ায় বাঙালীর মনে আবার দেখা দিয়েছে হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন। আর সেইজন্যেই ব্যাপক হারে পালিয়ে আসছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। বিশ্বাস-ঘাতকতার পুরস্কারকে ঠেলে দেওয়া তো সহজ নয়!

তবু বাঙালী জেগেছিল, বাঙালী জেগেছে, বাঙালী দেহের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু ঢেলে দিয়েছে অধিকার অর্জনের সংগ্রামে। বাঙালী যুদ্ধ করছে, বাঙালী মরছে, বাঙালী বাঁচতে চায়।

বাঙালী বাঁচবে, বাঙালীর জাগরণকে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা পশু শক্তির নেই। কারণ বাঙালী যে বুঝেছে, বাঁচতে গেলে মরতে হবে। মরতে মরতে নয়, মেরে বাঁচবে বাঙালী। মরে বেঁচে থাকা জীবনের কলঙ্ক।

তাই হিন্দু মুসলমান, ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, অভিনেতা, কৃষক, আর বালক-বৃদ্ধ-যুবকের দল হাতে তুলে নিয়েছে বাঁচার মন্ত্র। পশু শক্তির সঙ্গে আপোষ নয়, সংগ্রাম। যুদ্ধ চলছে, জয় সুনিশ্চিত। বাঙালীর বাঁচার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির হবেনা।

বাংলাদেশ যে ঃ

আমি একটা দেশ নই
যে তুমি আমাকে জ্বালিয়ে তছ্‌নছ্‌ করে দেবে
আমি একটা দেওয়াল নই
যে আমাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো কববে
একটা সীমান্ত রেখা,—আমি তা'ও নই
যে তুমি আমাকে মুছে ফেলে দেবে

দুনিয়ার পুরানো একটা নক্সা
তুমি টেবিলে পেতে রেখেছ
এর মধ্যে কিছুই নেই
জট পাকানো কয়েকটা আঁকি বুঁকি ছাড়া
বৃথাই তুমি আমাকে সেখানে খুঁজে মরছো

আমি উদ্বুদ্ধ মানুষের আকাঙ্খা
নিপীড়িতদের মরণ জয়ী স্বপ্ন
মানুষ যখন মানুষকে শুষে রক্তপান শুরু করে

লুঠতরাজ যখন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়
দমন-নির্যাতন যখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গড়ায়
অদৃশ্য থেকে তখন যেন হঠাৎ আমি বেরিয়ে পড়ি
রক্তধারা হৃদয়ের ভেতর থেকে আমি জেগে উঠি

এর আগেও হয়তো তুমি আমাকে দেখেছ
কখনো পূবে, কখনো বা পশ্চিমে
শহরের সড়কে অথবা মেঠো-গাঁয়ে
মানুষজনের মধ্যে কখনো, আবার
এমন কি হয়তো বনে জঙ্গলে

আমার রয়েছে একটা ইতিহাস, আর
ইতিহাসই একমাত্র আমার
কিন্তু ভূগোল ? না, মোটেই তা নেই।
আমার ইতিহাস, ঠিক পাখি-পড়া ক'রে
শেখানো যায় না
কিন্তু, মানুষ—তবু গোপনেই
এই সব শিখে নেয়

কখনো কখনো আমি প্রবলভাবে জয়ী
কখনো কখনো বা নির্জিৎ
কখনো আমিই চড়াই কষাইদের শূলে
কখনো বা নিজেই হই ক্রুশ বিদ্ধ
ফারাকটা শুধু এই—
আমাকে যারা মারে, নিজেদেরই তাদের মরতে হয়
আমি, না
আমার মৃত্যু নেই

তুমি কী বেয়াকুব
পিষে ফেলতে চাও আমাকে ট্যাঙ্কের তলায়
ভিক্ষেয় যা জুটিয়েছো
আমার ওপর ফেলতে থাকো নাপাম বোমা; দিনে-রাতে,
এতে একমাত্র নিজেকেই তুমি ফুরিয়ে ফেলবে
আমার কোন্ হাতটা তুমি শেকলে বাঁধতে চাও ?
চোদ্দ কোটি হাত রয়েছে !
আমার কোন্ মাথাটা ধড় থেকে নামাতে চাও ?
রয়েছে সাত কোটি মাথা !

অসংখ্য মানুষের একটি আকাঙ্খা, স্বাধীনতা-মুক্তি ! অন্যায় শাসন-অবিচার বন্ধ করতে চেয়েছে। চেয়েছে মানুষের অধিকার। বাঙালীর অধিকারে বাঁচতে চেয়েছে পুর্বের মানুষ !

আর পশ্চিমবঙ্গের ?

পশ্চিমবঙ্গের মানুষও বাঁচতে চেয়েছে। চেয়েছে শোষণ আর শাসনের অবসান। নিরাপত্তা, শান্তি কামনা করেছে। নিজ বাসভূমে পরবাসী বাঙালী চেয়েছে ন্যায্য অধিকার।

কে দেবে ? কংগ্রেস ?

দেয়নি। নেতার দল মানুষকে দিনের পর দিন ঠকিয়েছে। দল বজায় রেখে বাঙালীকে বঞ্চিত করেছে। মানুষের ন্যূনতম বাঁচার অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়েছে।

নেতাদের কণ্ঠ বারবার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করেছে, কিন্তু প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধে নীরব থেকেছেন তাঁরা। তাই বাঙালী সর্বভারতে ঠাঁই পায়নি। বাংলায় হয়েছে সর্বভারতীয়ের স্থান। বাংলাদেশে বাঙালী তার বাঁচার অধিকার দিনে দিনে হারিয়েছে।

এসেছে যুক্তফ্রন্ট। রঙের গোলাম নেতার দল। মানুষের চেয়ে দলই তাঁদের কাছে বড়। দল বজায় রাখতে, দলের শক্তি বাড়াতে আত্মকলহে মত্ত হয়ে উঠেছেন তাঁরা। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, বঞ্চিত করেছেন। আওয়াজ তুলেছেন বাঁচার লড়াইয়ের। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে মানুষ একে অপরকে মেরেছে। দলীয় স্বার্থ বজায় রাখতে হাত রাঙা হয়েছে খুনে।

শেষ হয়েছে উনসত্তরের যুক্তফ্রন্ট। যাঁরা মানুষের কল্যাণের শপথে এক হয়েছিলেন, দলের স্বার্থে দূরে সরে গেছেন। শত্রু হয়েছেন পরস্পরের। রাজনীতির অন্ধত্বে শত্রু হয়ে উঠেছে মানুষ।

বাঙালী বাঁচতে গিয়েও বাঁচতে পারেনি !

আর আজ ?

আজ ? চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। বাঙালীর মৃত্যু না মুক্তি ? বাঙালী ধ্বংসের হীন জঘন্য ষড়যন্ত্র ! রাজনীতির নামে বাঙালীকে শেষ করার অভিযান।

রাজনীতির বেড়াজালে একে অপরকে মারছে। শান্তি রক্ষকের দল প্রতি ক্ষেত্রেই অপরাধীকে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে। মারছে পুলিশ। কাকে মারছে, কেন মারছে ? তার কোন কৈফিয়ত নেই। রাজনীতি কে করছে বা না করছে, প্রকৃত অপরাধী, কি অপরাধী নয়, তা দেখারও প্রয়োজন নেই। বাঙালী যুবক, অতএব অপরাধী, সমাজবিরোধী। বাঁচার অধিকার হারিয়েছে।

বাঁচার অধিকার হারিয়েছিল কাশীপুর আর বরানগরের অসংখ্য প্রাণ। হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। বিশিষ্ট একজন কর্মী নিহত হয়েছিলেন। শোকের ছায়া নেমেছিল।

তারই মাঝে রাতের অন্ধকারে বসেছিল গোপন সভা। বিশিষ্ট নেতার উপস্থিতিতে রচিত হয়েছিল কর্মসূচী। অপরাধীর শাস্তি বিধান নয়, ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফর্মূলা। খুন্‌কা বদলা খুন !

লরির পর লরি ভর্তি হয়ে এসেছিল কর্মীর দল। ঘিরে ফেলা

হয়েছিল কাশীপুর আর বরানগর। জ্বলে উঠেছিল আগুন। সুরু হয়েছিল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। দোষী অথবা নির্দোষীর বিচার নয়, খুনের নেশায় মাতাল, নেশাগ্রস্থ কর্মীর দল শান্তি সেনার মিলিত শক্তিতে পৈশাচিক উল্লাসে হাত রাঙিয়ে ছিল কিশোর-যুবকের রক্তে! শুধুমাত্র রাতের অন্ধকারে নয়, দিনের আলোতেও চলেছিল হত্যালীলা। পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী মিলিটারী, পুলিশ আর সি. আর. পি. বাহিনী সংবাদ পায়নি হত্যাকাণ্ডের!

আশ্চর্য! শুধু আশ্চর্য নয়, বিচিত্র!

বিচিত্র আজ পশ্চিমবঙ্গ। শুধু মৃত্যু, মৃত্যু আর মৃত্যু। জীবন এখানে মূল্যহীন। কোন দাম নেই মানুষের। বাঙালী শেষ হয়ে গেছে। শুধু স্বার্থের কারবার।

সে স্বার্থ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নয়, রাজনীতির। রাজনীতির নামে চলেছে ব্যাভিচার। চলেছে ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার ষড়যন্ত্র। চলেছে বাঙালীর অস্তিত্ব লোপের ষড়যন্ত্র।

বাঙালী শেষ হয়ে যাক!

বাঙালীকে বাঁচতে দেওয়া হবেনা।

বাঙালীর চির বিদ্রোহী আত্মা ধ্বংসের আগুনে জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক; অথবা বাঙালীর যৌবন পরিণত হোক অথর্ব পঙ্গু জড় পদার্থে!

স্বাধীনের চিতা নিভে গেছে। শেষ হয়ে এসেছে বর্ষার রাত্রিটা। চব্বিশ বছরের জীবনটা এইমাত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল! যতক্ষণ চিতার আগুনটা জ্বলছিল ততক্ষণ ও যেন ছিল।

এখন ও নেই। ও মুছে গেছে! শুধু কয়েকটি মনে হতাশায়

হাহাকারে ওর স্মৃতি অনুরণিত হবে। বিশেষ একটি দিনে ওর নামটা কাঁদাবে কটা মনকে!

সত্যব্রত?

না,…কি জানি; একটা মানুষ পাথরে গড়া নয়। যৌবনের অপচয় পাপ, চলেছে ধ্বংস, বাঙালীর যৌবন নিঃশেষিত হচ্ছে। স্বাধীনকে হত্যা করা হয়েছিল।

ওর বন্ধুটা। ওই যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিভে যাওয়া চিতার দিকে চেয়ে অল্প অল্প ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা কথা বলেছিল সকালে। শুষ্ক ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর।

—সত্যদা, আমিও হয়তো কোনদিন…

—কী? থেমে যেতেই জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—আমার কেমন যেন ভয় করছে।

—বাড়ি যাবি?

—না, বাড়ি যাবার কথা বলছি না। আমার মনে হচ্ছে, এই এ্যাক্সিডেন্টটা তো আমারও হতে পারতো?

—তোর?

—হ্যাঁ, হয়তো আমি ছুটতাম না। যদি দাঁড়িয়ে থাকতাম তাহলেও কি…

—ওসব কথা থাক এখন।

—জানেন, স্বাধীনের খবরটা কাগজে বেরিয়েছে!

—কি খবর?

—স্বাধীনের মৃত্যুর খবরটা। আপনি ওকে ছুটতে দেখেছেন?

—শুনেছি।

—ও ছুটে পালাচ্ছিল!

—হ্যাঁ।

—ও পুলিশ ভ্যানে বোমা মেরেছিল।

—বোমা মেরেছিল?

—হ্যাঁ, বোমা মেরে ছুটে পালাচ্ছিল। অবশ্য বোমাটা ভ্যানে না লেগে একটা বাড়ির দেওয়ালে লাগে।

—কোন্ বাড়ির ?

—মোড়ের লাল বাড়িটার। কাল সকালে দু দলে বোমাবাজি চলার সময় বোমাটা ওই বাড়িটায় লেগেছিল।

—কিন্তু ও তো…

ম্লান একটু হাসি ফুটেছিল স্বাধীনের বন্ধুর ওষ্ঠে। বলেছিল, হলেইবা সন্ধ্যেবেলা, বোমাতো সত্যি সত্যিই মারা হয়েছিল। সেই জন্যেই বলছি আমিও হয়তো কোনদিন ··

সত্যব্রত চুপ করেছিলেন। স্বাধীনের মৃতদেহটা নেবার অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। কাগজ তিনি পড়েন নি। পড়েনওনা রোজ। ভাল লাগেনা কাগজ পড়তে। প্রতিদিন শুধু খুনের খাতিয়ান। হত্যা আর হত্যা। রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন। অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহ আবিষ্কার। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী উগ্রপন্থীদের সঙ্গে ওয়ার্ডবয়দের মারামারি। উগ্রপন্থীদের আক্রমণে নিজেদের রক্ষা করতে, বাধ্য হয়েছে তারা হত্যা করতে।

যেন ধ্বংস যজ্ঞ চলেছে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। আইন শৃংখলা কোনদিন ছিল বলে মনে হয় না। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ আজ সদাসর্বদা এক অস্থির আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে হয় মৃত্যু, না হলে লাঞ্ছনা। কখনো রাজনৈতিক দলের কাছে, কখনো পুলিশ নামধারী শান্তিরক্ষকদের কাছে।

অশান্তিময়, সমস্যা পীড়িত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধানে সর্বভারতীয় নেতার দলও আজ যত্নবান। একদিকে তাঁরা তাঁদের ভাষণে বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন করতে হবে, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আশু কর্তব্য, চাকরী দিতে হবে বাঙালী বেকার যুবকদের। অন্যদিকে চলেছে, শিল্প স্থাপনের পরিবর্তে শিল্প অপসারণ। প্রতিদিন

পশ্চিমবঙ্গের কারখানা থেকে যন্ত্রপাতি, মেসিন প্রভৃতি চলে যাচ্ছে বাইরে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি মদদ যোগাচ্ছে। জমি দিচ্ছে, দিচ্ছে ঋণ। কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে লাইসেন্স। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনের আবেদনে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না আজ কেন্দ্র। কিন্তু বেড়াতে এসে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ আর বাঙালীর জন্যে দরদের বন্যা বহাচ্ছেন! বাঙালী বেকার যুবকদের বেকার করে রাখার ষড়যন্ত্র প্রকট।

আর হত্যাকাণ্ড?

হ্যাঁ, হত্যাকাণ্ড। হত্যা করা হচ্ছে বাংলাকে, বাঙালীকে। এ খুনের শেষ বুঝি হবে না!

কদিন আগে। সত্যব্রত দেখেন নি, শুনেছেন। ভদ্রবাবু এসেছিলেন। চা খেতে খেতে বলেছিলেন, সত্যব্রতবাবু, আমরা এ কোন্ নরকে বাস করছি বলুন তো?

কিছু না বুঝতে পেরে সত্যব্রত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারলেন না?

সত্যব্রত তবু চুপ্ করেছিলেন।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, মানুষ ভুল করে, তাই না সত্যবাবু?

—তাইতো জানি।

—ভুলের শাস্তিও নিশ্চই পায়?

--হ্যাঁ, পায়।

কিন্তু যারা কোন ভুল করলো না, অপরাধে অপরাধী নয়, তারা কেন শাস্তি পাবে, নরক-যন্ত্রণা ভোগ করবে বলুন তো?

ভদ্রলোকের কথাটা বুঝতে না পেরে সত্যব্রত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

— পচা আর নোণ্টের নাম শুনেছেন?

নাম শুনেছেন সত্যব্রত। পরিচয়ও কিছু কিছু পেয়েছেন। কটা

পাড়ার পরেই ওদের এলাকা। ওরা ওয়াগন ভাঙতো, চুরি করতো। এখন রাজনৈতিক কর্মী। দলনেতা হয়ে দল চালায়। ছিনতাই করে। ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে। মানুষ মারে। মানুষ মেরে নাকি ওরা আনন্দ পায়।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, পচা-নোণ্টে আজ শেষ হয়ে গেল।

—মারা গেছে? জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—মরলে তো শান্তি পেত মানুষ, ওরাও মরে শান্তি পেত। কিন্তু মরার অধম হয়ে থাকবে ওরা। যদি বেঁচে যায় সমস্ত জীবন অথর্ব পঙ্গু হয়ে দিন কাটাবে। তা ওরা যেভাবেই দিন কাটাক তাতে কার কি! কিন্তু ওদের জন্যে মানুষকে কিছুক্ষণের জন্যেও নরক-যন্ত্রণা সহ্য করতে হল কেন?

—কি হয়েছে?

—ভোর বেলা পুলিশ এসেছিল ওদের ধরতে। সমস্ত পাড়াটাকে ঘিরেছিল পুলিশ। ওদের পালাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর ওদের ধরে রাস্তার মোড়ে নিয়ে এসেছিল। প্রতিটি বাড়িতে ডাক দিয়ে মানুষকে জড়ো করা হয়েছিল। তারপর স্বুরু হয়েছিল মার। সে মার ওরা সহ্য করেছিল। সহ্য না করে ওদের উপায় ছিল না, কারণ ওরা দোষী, অপরাধী, বহুদিনের অন্যায় পাপ আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল মাথা ফাটা রক্তে, হাত ভাঙা হাড়ের যন্ত্রণায় ককিয়ে চিৎকার করে উঠে। মারের চোটে একজনের চোখ গলে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর···

—তারপর? শিউরে উঠে জানতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত।

—পুলিশের দল ওদের নিয়ে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে চিৎকার করে বলেছিল, আপনারা সকলেই দেখলেন অপরাধের শাস্তি কাকে বলে। আজকের এই শাস্তিটার কথা নিশ্চই আপনাদের মনে থাকবে।

সত্যব্রত বলেছিলেন, এ আপনি কি বলছেন!

—যা সত্যি তাই বললাম। হেসেছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনতে কেমন লাগলো আপনার ?

তিনি কথা বলতে পারেন নি।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, পচা আর নোণ্টেকে কেন ওভাবে মারা হল জানেন ?

—কেন ?

—ওরা দল পাল্টাতে রাজি হয়নি।

—সেকি ?

—হ্যাঁ মশাই, আজ ওইসব গুণ্ডা বদমাসগুলোকেই তো বেশি প্রয়োজন। দলের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করার নির্ভরযোগ্য রক্ষক তো ওরাই।

—কোন দলের ?

—সব দলের।

—না-না।

—না নয় মশাই, হ্যাঁ। গুণ্ডা বদমাস যদি দলে না রইল সে দল দলই নয়। কিন্তু ওদের মারটা ওপাড়ার মানুষগুলোকে ডেকে দেখানো হল কেন জানেন ?

—কেন ?

—হুঁশিয়ার করে দিতে। ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে গেল শান্তি-রক্ষকদের দল। তবে সুখের কথা, শান্তিরক্ষকরা ওদের মারেনি, মেরেছে সঙ্গে আসা গুণ্ডারা।

—গুণ্ডা ?

—হ্যাঁ মশাই গুণ্ডা। পুলিশের সঙ্গে রক্ষক হয়ে চলেছে নামি দামী গুণ্ডার দল। কখনো রাজনৈতিক কর্মীদের পেটাচ্ছে, কখনো মারছে নীরিহ ছেলেগুলোকে।

—কেন ?

—জানেন না ?

—না।

হেসেছিলেন ভদ্রবাবু। বলেছিলেন, শান্তি আর শৃঙ্খলা বাংলা দেশে ভেঙে পড়েছে। সেই শান্তি এবং শৃঙ্খলাকে ফিরিয়ে আনতে হবে তো। তাই পুলিশ গুলি করে যাকে ইচ্ছা মারছে। কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোন বালাই নেই। কারণ, পুলিশের ওপর ঢালাও হুকুম, পুলিশ যখন যাকে ইচ্ছা মারতে পারবে। আর যে মরছে, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সমাজবিরোধী, দুর্বৃত্ত। কি সুন্দর আজ আমাদের অবস্থাটা বলুন তো?

সত্যব্রত নীরব। কথা বলেন নি।

ভদ্রবাবু বলেছিলেন, শ্রমিকের দল শ্লোগান দিচ্ছে, দুনিয়ার শ্রমিক এক হও, অথবা শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। পরক্ষণে শ্রমিক শ্রমিককে খুন করছে, সে সময় ঐক্যের কথা বুঝি মনেও থাকছে না। নেতার দল বলছেন, মানুষের সেবাই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। পরক্ষণে অতি বিশ্বাসী কর্মীকে পাঠাচ্ছেন খুনের আদেশ দিয়ে। পথের বাধা না সরালে চলে? আর আমরা, আমি আপনি, অসংখ্য মানুষ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি। নিজে বাঁচলুম বলে ভাবছি। কেন বলুন দেখি?

—কেন?

—আপনিই বলুন না।

—আমি?

চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। বহুদিন তিনি ভেবেছেন। আকুল ভাবে পথ সন্ধান করেছেন।

এর কি কোন প্রতিকার নেই?

আছে। কিন্তু কে করবে প্রতিকার?

বাঙালী রাজনীতি করছে। বাঙালী ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছে। বাঙালী ধর্মঘট করছে। বাঙালী বাংলা বন্ধের ডাক দিচ্ছে। বাঙালীর

মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে রাজনীতি। বাঙালী নিজে বাঁচতে, বাংলাকে বাঁচাতে কোন চেষ্টাই করছে না।

কেন?

কেন আজ এই পরিণতি? অধঃপতন।

অধঃপতন। চিন্তা করেছেন সত্যব্রত। দিনের পর দিন ভেবেছেন। দলীয় রাজনীতি বাঙালীকে এক হতে দিচ্ছে না। দল মতের উর্ধ্বে বাঙালী—বাঙালী হয়ে বাঁচতে চাইছে না।

কিন্তু কতদিন? কতদিন চলবে এই অবস্থা? বাঙালী কি বাঙালী হয়ে বাঁচতে চাইবে না কোনদিন? বাঙালী কি একদিন শেষ হয়ে যাবে?

না-না! কথাটা ভাবতে পারেন নি তিনি। ভয় হয়েছে তাঁর। বাঙালীর অবলুপ্তির কথাটা চিন্তা করে আতঙ্ক জেগেছে মনে। ভাবতে পারেননি রাজনীতির দাবা খেলায় আজকের হত্যালীলা। একি হচ্ছে আজ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে? রাজনীতির মোহে অন্ধ হয়ে একে অপরকে আঘাত হানছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে! লাভ? কি লাভ হচ্ছে? এই পথেই কি বাঙালী বাঁচবে?

কায়েমী স্বার্থ হাসছে। তালি বাজিয়ে বাহবা দিচ্ছে! বাঙালীর মারণযজ্ঞ দেখে আনন্দের সীমা নেই। রাজনৈতিক নেতার দল ভবিষ্যতের স্বপ্নে মসগুল। জীবনের অপচয়ে এতটুকু দুঃখিত বুঝি নন তাঁরা! যদি দুঃখিত হতেন, বাঙালীকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাইতেন, তাহলে রাজনীতির নোংরা আবর্তের চেয়ে জাতির স্বার্থকে তাঁরা বড় করে দেখতেন, মূল্য দিতেন মানুষের। নিশ্চই তাঁরা বলতেন ঃ

"এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা

দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম বাণী।

*　　*　　*

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*　　*　　*

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি আপনার কাজে!

*　　*　　*

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ!"
"তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ!"

কেউ বললেন না। কেউ ডাকলেন না, জাগাতে চাইলেন না দেশকে। কারণ ···

আজ সকলেই নেতা হতে চান। দল বজায় রাখতে চান। মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে রেখেই যেন তাঁদের আনন্দ, তাঁদের স্বার্থ পুরণের সাফল্য।

তাই, বাঙালী বঞ্চিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, মরছে, মার খাচ্ছে। আর তারই মাঝে বাঁচতে চাইছে। জাগতে চাইছে—জাগাতে চাইছে। কিন্তু জাগরণ আসছে না!

বাঙালী শত সহস্রকণ্ঠে একসঙ্গে বাঁচার দাবী তুলছে না। দুবার বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু বাঁচতে দেওয়া হয়নি। মানুষের চেয়ে দল

হয়েছিল বড়। দলের স্বার্থে মানুষের বাঁচার আকাঙ্খা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

আর আজ .....

স্বাধীনের বন্ধু বলেছিল, জানেন সত্যদা, আমার মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় করে। মনে হয় কোথাও চলে যাই।

সত্যব্রত ওর দিকে না তাকিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, কেন?

—কি জানি। ঠিক বুঝতে পারিনা। কমাস আগে মার কথা শুনে দিদির শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কদিন পরেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।

—চলে এলি?

—হ্যাঁ। দিদির বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ মনে হয়নি।

—কেন?

—ওখানেও ভয়। এখানে তবু বাইরে বেরুতে পারি কিন্তু ওখানে বদ্ধ অবস্থায় থাকা ছাড়া উপায় ছিলনা। শান্তি কোথায়?

নেই। শান্তি নেই।

সত্যিই নেই কি?

স্বাধীনের মৃতদেহ রাখা কাঁচের জানালা বসানো ঘরটার ছবি ভেসে উঠেছিল সত্যব্রতর চোখের সামনে। জানালায় উঁকি দিয়েছিলেন তিনি। দেখেছিলেন।

মেঝেতে, জমাট বাঁধা কালো রক্ত, নোংরা আর দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে আছে স্বাধীনের মৃতদেহটা। ওর পরনে ছিল ওর কাকার ফুলপ্যান্ট, কিন্তু আণ্ডার ওয়্যার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাননি তিনি। হয়তো ডোমেরা মৃতের শরীর থেকে প্যান্টটা খুলে নিয়ে থাকবে। প্যান্টের প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে। মৃতের লজ্জা বলে কিছু নেই।

সত্যব্রত দেখেছিলেন। সেই রক্ত, নোংরা আর দুর্গন্ধের মধ্যে

নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে আছে স্বাধীন নামের একটা চব্বিশ বছরের মৃত যৌবন। একসার লাল পিঁপড়ে নির্ভয়ে ওর চোখে নাকে ঢুকছে-বেরুচ্ছে। খাদ্য সংগ্রহ করছে।

দেখতে দেখতে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দৃশ্যটা অসহ্য বোধ হয়েছিল। ইচ্ছা করেছিল বদ্ধ কাঁচের দরজাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলেন। চিৎকার করে বলেন,···না, কিছু বলেননি তিনি। কিছুই করেননি। মাথাটা ঘুরছিল। সরে এসেছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন স্বাধীনের বাবাকে।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীনের বাবা। নীরব কটা মুহূর্ত। কত সহজ যেন তিনি। জানতে চেয়েছিলেন, কেমন দেখলেন সত্যদা?

সত্যব্রত ভয় পেয়েছিলেন। স্বাধীনের বাবার মুখের দিকে চাইতে পারেননি। বলতে পারেননি, কেমন দেখলেন।

স্বাধীনের বাবা বুঝি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মনের কথাটা। বলেছিলেন, বলবেন না?

কি বলবেন তিনি! সত্যব্রত স্থির নির্বাক পাষাণ।

—সত্যদা! ডেকেছিলেন স্বাধীনের বাবা।

—উঁ! যেন জেগে উঠেছিলেন সত্যব্রত।

—আমি একবার যাব? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

—কোথায়?

—একবার দেখে আসবো?

—কেন?

—বড় ইচ্ছা করছে দেখতে।

—কেন?

উত্তর দিতে পারেননি তিনি। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল। বলেছিলেন, ওর জন্যে মাঝে মাঝে আমার বড় দুঃখ হত।

বড় অবাধ্য ছিল ছেলেটা। ওকেই আমি সবচেয়ে বেশি ভাল বাসতাম। বড় বোকা ছিল স্বাধীন।

—বোকা!

—বোকা নয়? স্বাধীনের বাবার ঠোঁট দুটো কবার কেঁপে উঠেছিল। বলেছিল, মরলো কিন্তু মিথ্যে-মিথ্যে।

— মিথ্যে?

—নিশ্চই। ভাল হয়ে বাঁচতে চেয়েও পারল না। লাভটা কি হল?

উত্তর তিনি দিতে পারে নি।

স্বাধীনের বাবা বলেছিলেন, আমি হয়তো একদিন ওর কথাটা ভুলে যাব। কারণ, না ভুললে আমার চলবে না। আমার কাজ আছে, সংসারের দায়িত্ব আছে। কিন্তু ওর মা। ওর মা-টা হয়তো পাগল হয়ে যাবে। আমি এখন ওর মায়ের কথাটাই বেশি করে ভাবছি। যন্ত্রণাটা ওর মা-ই তো বেশি সহ্য করেছে। ওর জন্যে আমার কাছ থেকেও ওর মাকে কম কথা শুনতে হয়নি। আমি ওর সব দোষ চাপিয়েছি ওর মায়ের ওপর। কিন্তু এখন ভাবছি, গতকাল ও মারা যাওয়ার পর থেকে কেবলই আমার মনে হচ্ছে, সত্যিকারের দোষটা কার?

শ্মশানযাত্রীরা চলে যাচ্ছে। সত্যব্রত দাঁড়িয়ে আছেন, দেখছেন। তাঁকে ডাকছে ওরা। আহ্বান জানাচ্ছে। এবার ফিরতে হবে। ফিরে যাবেন নিত্যদিনের কর্মের কোলাহলে।

—সত্যদা! স্বাধীনের ভাই এসে কাছে দাঁড়িয়েছে।

সত্যব্রত ছেলেটার মুখের দিকে চাইলেন।

—বাড়ি যাবেন তো ?

—বাড়ি ? জানতে চাইলেন যেন তিনি।

—হ্যাঁ, চলুন। সকলে চলে যাচ্ছে।

—আমিও যাব।

—চলুন।

স্বাধীনের ভাইয়ের হাত ধরে চলে আসছিলেন সত্যব্রত। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—কি হল ? জানতে চাইল ছেলেটা।

—একটু দাঁড়া। ওর হাতটা ছেড়ে দিলেন তিনি। নিভে যাওয়া চিতাটার কাছে পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। পোড়া কাঠ, ছাই আর কিছু অঙ্গার। জল ঢেলে জ্বলন্ত চিতার আগুন নিভিয়ে দিয়ে গেছেন শ্মশান যাত্রীরা।

নিভে গেছে! ভাবলেন সত্যব্রত। চেয়ে চেয়ে দেখলেন। কি যেন খুঁজলেন ব্যস্ত চঞ্চলভাবে। পেলেন না। ব্যর্থ হলেন। আগুনের এতটুকু চিহ্নমাত্র কোথাও নেই।

নেই-নেই! কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রতর বুকের মধ্যেটা হাহাকার করে উঠলো। একটা জ্বালা অনুভব করলেন। অস্থির ভাবে হাত দিলেন জল ঢালা চিতার ছাইয়ের মধ্যে। উষ্ণ অনুভব। রয়েছে-রয়েছে!

স্বাধীনের ভাইয়ের কণ্ঠস্বর, সত্যদা!

—কে ? চমকে উঠেছিল সত্যব্রত।

—আমি। বলল ছেলেটা।

—ওঃ, তুই। ম্লান অবসন্ন কণ্ঠ তাঁর।

ভয় পাওয়া ছেলেটা অনেকক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাঁকে দেখল। চুপি চুপি ডাকলো, সত্যদা!

—চল বাড়ি যাই।

—চলুন।

সত্যব্রত হাত ধরলেন ওর। এগিয়ে চললেন।

ছেলেটা একসময় ডাকল, সত্যদা!

—উঁ।

—আপনি…

—কি?

—কি দেখছিলেন?

—কি দেখছিলাম?

—দাদার চিতায় আপনি কি খুঁজছিলেন, সত্যদা?

হাসলেন সত্যব্রত। নিঃশব্দ হাসিতে মুখটা ভরে উঠল তাঁর। জানতে চাইলেন, তুই কি খুঁজিসনি?

—আমি? অবাক হল ছেলেটা।

—হ্যাঁ।

—নাতো।

—কিছুই খুঁজিসনি?

ছেলেটা চুপ করে রইলো। চুপ করে রইলেন সত্যব্রতও।

দূরে শ্মশান যাত্রীদের দেখা গেল। ক্লান্ত অবসন্ন পা ফেলে সকলে এগিয়ে চলেছে। ফরসা হচ্ছে রাতের আকাশটা। একটা-দুটো পাখি ডাকছে।

স্বাধীনের ভাই সত্যব্রতর পাশে চলতে চলতে বলল, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল সত্যদা।

সত্যব্রত দাঁড়ালেন। বললেন, কি কথা?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, দাদা নেই, কান্না পাচ্ছে আমার। কিন্তু,…একটু চুপ করে থেকে বলল, তখন, যখন দাদার দেহটা পুড়ছিল, পুড়ে যতক্ষণ না শেষ হয়ে গেল; আমার বার বার মনে

হয়েছে—আমি অনেক চেষ্টা করেও ভাবতে পারিনি, আমার মনে হয়নি দাদা নেই! আর···

—কি?

—একটা পাগল কদিন আগে রাস্তায় বলতে বলতে যাচ্ছিল, বাঙালীর মুণ্ডু চাই। পাঁচ লক্ষ প্রাণ চাই।

—কেন?

—আমি জানি না। পাগলের কথা শুনে খুব হাসি পেয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল সবাই। তাই দেখে সে রেগে বলেছিল, হাসতে তোমাদের লজ্জা করে না?

সত্যব্রত নীরব। লজ্জা? লজ্জা করে কি? না। করে না। লজ্জা নেই, লজ্জা শেষ হয়ে গেছে।

কেন?

ভাবলেন সত্যব্রত। আজ শুধু নির্লজ্জ বেসাতি। হিংসা আর অপব্যয়। প্রাণ মূল্যহীন। রক্তের কোন মূল্য নেই। রক্তের কোন পার্থক্য নেই, মানুষে পশুতে। পশুর মত মরছে মানুষ। অথবা মারা হচ্ছে!

কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। হয়তো আছে। সত্যব্রত জানেন না। তিনি শুধু জানেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ত কখনো বিফলে যায় না। রক্তের মূল্য নিশ্চই আছে! একদিন ছিল। আগামী দিনের ইতিহাস নিশ্চই রক্তের ঋণ স্বীকার করবে। কিন্তু অযথা রক্তপাত, হিংসা দিয়ে হিংসার নিবৃত্তি হয় কি? অহেতুক হিংসা কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবে?

ছেলেটা ডাকল, সত্যদা!

সত্যব্রত ওর দিকে তাকালেন।

ও বলল, আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, দাদাকে কেন মারা হয়েছে আমি জানি!

'কেন' জানতে চাইলেন না সত্যব্রত। ছেলেটার দিকে চাইলেন না। আকাশটা দেখলেন।

শ্মশানযাত্রীরা এগিয়ে চলেছে!

রক্তাক্ত একুশে

একুশে ফেব্রুয়ারী। রক্তাক্ত একুশে। আমার দু হাতে রক্ত। শহীদের রক্ত। আমার বন্ধুর। মুখচোরা ভীরু ছেলেটির। যার ভয় পাওয়া স্বভাবটা ছিল আমাদের নিত্য দিনের আনন্দের খোরাক। আমরা তাকে ভয় দেখাতাম, ভয় দেখিয়ে আনন্দ পেতাম, তার ভয়কে নিয়ে ছিল আমাদের আনন্দ। অথচ সেই ছেলেটা, বিনা কারণে ভয় পাওয়া ছেলেটা, প্রকৃত ভয়ের সময়, যখন মানুষরূপী শয়তানের দল রাইফেল হাতে এগিয়ে এল, সে ধীর স্থির দৃঢ় অচঞ্চল —একটুও ভয় পেলনা, অমাদের মত অস্থির ভাবে ছোটাছুটি করল না। এক সময় দেখলাম সে দুহাতে বুকটা চেপে ধরল, পড়ে গেল। ছুটে গেলাম কাছে। তাকে তুললাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। সে হাসছে। তার দুচোখে অদ্ভুত দীপ্তি। সে হাসছে—হাসছে!

আমার দুহাতে রক্ত। একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্ত। আমার বন্ধু-শহীদের রক্ত। দীর্ঘ উনিশ বছর সেই রক্তের দাগ আমার দু হাতে ছিল। আজও রয়েছে। কোনদিন মুছে যাবে কি?

জানিনা মুছে যাবে কি না! বোধ হয় যাবে না। ইতিহাস কি মোছা যায়?

একুশে ফেব্রুয়ারী একটা জাতির জাগরণের দিন! রক্তাক্ত একুশে একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের আবর্তে আমিও ভেসে গিয়েছিলাম। চেয়েছিলাম দূরে সরে থাকতে। পারি নি। দূরে সরে থাকা সম্ভব হয়নি। ইতিহাস নাকি কাউকে রেহাই দেয়না। হয়তো তাই। তাই হয়তো আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম রক্তাক্ত স্মৃতির সেই দিনটাতে। কেমন করে যেন নির্ভিক হয়ে

উঠেছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের ব্যক্তিগত হিসাব নিকাশ। একটি লক্ষ্য, আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমরা বাংলা চাই। আমাদের মুখের ভাষা, বুকের ভাষা! মায়ের স্নেহ ভালবাসা দূরে সরে গিয়েছিল। মা'র ভয় পাওয়া মুখটাও যেন সেই মুহূর্তে হাস্যময়, গর্বিত, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সন্তান গর্বে। আমরা পরিণত হয়েছিলাম জননীর বীর সন্তানে। ভয় কী?

শান্তিরক্ষকের দল নিরস্ত্র আমাদের ওপর লাঠি চার্জ করছে! কাঁদুনে গ্যাসের সেলগুলো ফাটছে। গুলির চলল হঠাৎ।···বিধবা মায়ের করুণ মুখচ্ছবিটা মুহূর্তে ফুটে উঠেছিল বুকের গভীরে। আমার অভাগিনী দুঃখিনী জননী। একমাত্র সন্তান আমি তাঁর। তাঁর আশা-ভরসা অবলম্বনের একমাত্র আশ্রয়। ষোলটি বসন্তের উত্তরাধিকারী আমি; তাঁকে সন্ত্বনা দিয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য।

ভবিষ্যং। নিজের ভবিষ্যৎ। একটা সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ যদি শয়তানদের ষড়যন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সেখানে কেমন করে থাকতে পারে আমার একার ভবিষ্যৎ? পারে না। জাতির ভবিষ্যৎকে ডালি দিয়ে কেমন করে আমি নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলব? সম্ভব নয়। নিশ্চই আমার মা-ও তা চাইবেন না।

নির্ভিক হয়েছিলাম আমি। সংগ্রামে নিজেকে মনে প্রাণে যুক্ত করেছিলাম। কিন্তু ভয় পাওয়া ছেলেটার মত অত নির্ভিক হয়ে উঠতে পারি নি। আত্মরক্ষায় ছোটাছুটি করেছি। ও নির্ভয়ে হাসি মুখে আঘাত নিয়েছে বুকে।

শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু সত্য। ওর দেহটাকে সোজা করে তুলে বসিয়ে ছিলাম আমরা। ওর নাম ধরে ডেকে ছিলাম। ও চোখ মেলে চেয়েছিল এক সময়।

জিজ্ঞাসা করে ছিলাম, 'কষ্ট হচ্ছে তোর?'

ও আমার মুখের দিকে একবার চেয়েই চোখ বন্ধ করেছিল।

বুঝতে পেরে ছিলাম, সত্যই ওর কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। ওর নাম ধরে ডেকেছিলাম আবার।

'পানি!' অনেক কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করে ছিল ও।

কোথায় পাব জল নিয়ে আসবার পাত্র। পকেটে রুমাল ছিলনা। গায়ের জামাটা খুলে ভিজিয়ে এনেছিলাম। আঁজলা ভরে জল দিয়েছিলাম ওর মুখে।

জল খাবার পর একটু যেন সুস্থ হয়েছিল ও। অসহ্য কাঁপুনিটা বন্ধ হয়েছিল।

ওর নাম ধরে ডেকেছিলাম আবার, ডেকেছিল অনেকেই।

ও চোখ মেলেছিল। সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি!

'কষ্ট হচ্ছে?' আবার জানতে চেয়েছিলাম আমরা।

কথা বলতে পারেনিও। মাথা নেড়েছিল। জানিয়ে ছিল কষ্ট না হওয়ার কথা।

সত্যিই কি তাই? চিন্তা করেছি দিনের পর দিন। উত্তর পেয়েছি অবশেষে। পরদিন মৃত্যু হয়েছিল ওর। আমি হারিয়েছি একখানা পা। আমার ডান পাটা হাঁটুর ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে। এখন আমার কষ্ট হয়না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়, কিন্তু সে সময় কষ্ট বোধটা যে কি জিনিষ আমি বুঝতে পারিনি। সব কিছু বোঝবার মত চেতনা আমার ছিল না। আমার শুধু মনে হয়েছিল একটা উত্তরের জন্য প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল, পশ্চিমী পশুগুলোকে আমি শেষ করতে পেরেছি তো?

আমাদের জন্মভূমি আজ মুক্ত। স্বাধীন বাংলার আকাশে উড়ছে আজ বিজয় পতাকা। আমরা আজ প্রকৃত স্বাধীন—মুক্ত। আমাদের জন্মভূমি আজ স্বাধীন বাংলা দেশ।

বাংলা দেশ!

বাংলা।

অমরা বাংলা চাই।

মাতৃভাষা বাংলা চাই। আমাদের মুখের ভাষা—বুকের ভাষা। পেয়েছি।

প্রাণের মূল্যে, অনেক রক্ত দিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের ভাষা। ভাষা আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে আমাদের। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সুরু হয়েছে জাতীয় জাগরণ।

আমরা কি ঘুমিয়ে ছিলাম?

কঠিন প্রশ্ন? এ প্রশ্ন বহুদিন দেখা দিয়েছে আমার মনে। বহু ভাবে। অস্থির চিন্তায় আমি দিনের পর দিন নিজের মুখোমুখি হয়ে বসে ভেবেছি। অনেক সময় প্রশ্ন করেছি বহু জনকে। উত্তর চেয়েছি। কখনো উত্তর পেয়েছি—কখনো পাই নি। যা পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারি নি। অবশেষে একদিন উত্তর মিলেছে আমার নিজের কাছ থেকেই। জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়েছে যেন আমার। আমি যেন দীর্ঘকাল নিদ্রা শেষে জেগে উঠেছি। সত্য সত্যই আমি জেগে উঠেছিলাম।

প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মনে, আমি কী? মানুষ। আমার প্রথম পরিচয়, আমি মানুষ। আমি বাঙালী। তারপর আমি মুসলমান। অথচ প্রথমেই, আমরা বলতে, আমাদের দেশের নেতা, এবং কিছু বুদ্ধিজীবির দল দেশ বিভক্ত হওয়ার আগে, অখণ্ড ভারতবর্ষে খেলাফতের মাধ্যমে প্রথমে মুসলমান তারপর ভারতবাসী হওয়ার উংকট স্বপ্ন দেখে আন্দোলন সুরু করেছিলেন। জয়যুক্ত হয়েছিলেন। সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু সেই সৃষ্টি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে চোরাবালিতে গড়া প্রাসাদের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেন? কেন বাঙালী ধর্মের ভেক ছেড়ে বাঙালী হয়ে উঠতে চাইল? ধর্মের অপশাসন চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞা নিল বুকের রক্তে?

কেন ?

ইতিহাস কখনো ক্ষমা করে না। ইতিহাসকে অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের। যা সত্য তাই ইতিহাস। যদিও সত্যের নামে মিথ্যাকে ইতিহাস বলে অনেক ক্ষেত্রে চালানো হয়। সত্য মূল্য ক্ষুণ্ণ করা হয়। কিন্তু আগামী দিনের বিচার মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে দেরি হয়না। মিথ্যা কখনও ঐতিহাসিক মূল্য পেতে পারে না।

আজ পূর্ববাংলায় বাঙালীর প্রতি পশ্চিমী সংখ্যালঘু শাসকদের জঘন্য পশুত্বের প্রকাশ আগামী দিনের ইতিহাসে ঠাঁই পাবে। একদিন মানুষ ভুলে যাবে এই অত্যাচার যন্ত্রণা আর বেদনাময় করুণ কান্নার দিনগুলি, কিন্তু ইতিহাস ভুলবে না, ক্ষমা করবে না ওদের। যারা আজ ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে শক্তি মত্ততায় অত্যাচারের বন্যা বহাচ্ছে পৃথিবীর দেশে দেশে, যারা আপন স্বার্থে মানুষের সাজানো সংসার হিংস্র থাবায় চূর্ণ বিচূর্ণ করছে, তারা কি মানুষ? মানুষের সংজ্ঞা কি? মানুষের পরিচয় কিসে?

আমি শুধু আয়ুব, ভুট্টো, ইয়াহিয়ার দোষ দেব না। আয়ুব, ভুট্টো, ইয়াহিয়ার সাধ্য কতটুকু? তাহলে?

সুদূর পশ্চিমের পশুগুলোর এত দুঃসাহস হল কি করে? অন্তরালে কোন্ গোপন শক্তি তাদের এত ক্ষমতাশালী করে তুলল? এত দুঃসাহসী হতে বাধ্য করল কারা তাদের?

অপরাধী শুধু ওরাই নয়, অপরাধী, অন্তরালে ওদের উৎসাহদাতার দল, ওদের পশুশক্তিকে যারা মদত দিয়েছে তারাও। বিচার করতে হলে ওদের সঙ্গে তাদেরও বিচার করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।

হয়তো বলবে, এ আমার পাগলামী। আমার অভিযোগ যদি সত্যও হয়, তাহলে শাস্তি দেবে কে?

শাস্তি দেবে মানুষ। আজ না হয় আগামী দিনে। আমার বিশ্বাস, অপরাধী কখনো নিস্কৃতি পেতে পারে না। পাপের শাস্তি তাদের ভোগ করতেই হবে।

কিন্তু আমরা কেন শাস্তি পেলাম, অত্যাচার সহ্য করলাম? আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে কেন দিতে হল বুকের রক্ত, নারীর ইজ্জত, কত শত শান্ত সুন্দর সংসারের সুখ শান্তি? কেন?

বিশ্বমানব সংসারের আমরাও নিশ্চয়ই সমান অংশীদার? কিন্তু যখন পশ্চিমী পশুর দল আমাদের হত্যা করে, আমাদের মা বোনেদের ধর্ম কলঙ্কিত করে সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব নৃত্য করছিল তখন বিশ্বমানব কল্যাণ নিয়ে যাঁদের অহরহ চিন্তা করতে হয়, বিশ্বমানবের সেবায় যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, সেই তাঁদের মুখে কোন কথা ছিল না, ভণ্ড সন্ন্যাসীর মত একচোখ বুজে বিশ্বমানব কল্যাণের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে-ছিলেন তাঁরা! আমাদের অসহায় আর্তনাদ, হাহাকার তাঁদের কানে পৌঁছায়নি। পৌঁছালেও চোখ বুজেই ছিলেন তাঁরা। বাধ্য হয়েছিলেন চুপ করে থাকতে। কারণ, ভণ্ডামীর আখড়ায় তাঁদেরও যে স্বার্থের পদসেবা।

রাবেয়া, একটা কথাই এখন আমার বার বার মনে হয়। আমি চিন্তা করি। প্রশ্ন তুলি। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের কথা আমার মনে পড়ে। তাদের জীবনযাত্রার কথা। কি হিংস্র, কি বিভৎস ছিল তাদের জীবন, কিছুটা অসহায়ও বলতে পারা যায়। শিউরে উঠি তখন, যখন তাদের কাঁচা মাংস ভক্ষণের চিত্রটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জন্তু জানোয়ার শিকার করে তারা কাঁচা মাংসে ক্ষুধা নিবৃত্ত করত।

আর আজ?

আজ? আজ আমরা তাদের থেকে কি খুব দূরে সরে এসেছি? তাদের থেকে সভ্য হয়েছি? হয়েছি কি?

মনে হয় না। যদিও আমরা আজ নিজেদের সভ্য বলে পরিচিত করি। কিন্তু তাদের থেকে আমাদের তফাৎ কোথায়—কতটুকু?

তারা ছিল অর্দ্ধনগ্ন-অসভ্য-নোংরা। পশুর চেয়েও হিংস্র ছিল

তারা। প্রতি পদক্ষেপে বাহুবল ছিল তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন।

আর আমরা ?

বর্তমান যুগের, বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা পোষাকে আবরণে নিজেদের সাজিয়ে নগ্নতাকে ঢেকেছি। কিন্তু হিংস্রতা তো দূর হয়নি। সেদিনের উন্মুক্ত প্রকৃতির মানুষকে হিংস্র হতে বাধ্য হয়েছিল, জীবন রক্ষার তাগিদে, ক্ষুধার জন্যে পশুবধে বাধ্য ছিল তারা—আজ মানুষ মানুষকে মারছে কেন, কিসের জন্য ? কোন্ প্রয়োজনে ?

সেদিনের মানুষ ছিল অসভ্য বর্বর। আজ সভ্যতার মাঝে বর্বরতা দূর না হয়ে বরং বেড়েছে। একমাত্র কারণ স্বার্থ। ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থই একমাত্র সভ্যতা। স্বার্থের বেসাতিতে মানুষ বিকিয়ে গেছে। মানুষের পরিচয়ে আরো বেশি অমানুষ হয়ে উঠেছে। লোভ লালসা হিংসা মানুষকে করে তুলেছে আরো বেশি স্বার্থপর। মনুষ্যত্ব মূল্যহীন। তাই আমরা, পৃথিবীর দেশে দেশে যারা মানুষের অধিকারে বাঁচতে চেয়েছি তাদেরই বুকে নিতে হয়েছে অত্যাচারী পশুশক্তির আঘাত—আফ্রিকায়, ভিয়েৎনামে—যেখানেই বাঁচতে চেয়েছে মানুষ।

রাবেয়া, একটা অসহায় পঙ্গু মানুষের চিন্তা। পশুদের গুলির আঘাতে একটা পা আমার কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আমি আজ হয়তো কৃপার পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমি আজ অক্ষম। কিন্তু বুকে আমার আগুন। এ আগুন কবে নিভবে আমি জানি না। কোনদিন নিভবে কি ?

দিন রাত্রি এখন অখণ্ড অবসর। হাসপাতালটা ছোটই। একতলা। জানলার ধারে আমার শয্যা, ছোট লোহার খাট। দৃষ্টি ফেরালে আকাশ দেখা যায়। নারকেল সুপারী আম-জামের একটা বাগান। কটা বাতাবী লেবুর গাছও রয়েছে। এখন এই শীতে ফুল ফোটা, ফল ধরার সময় নয়, তবু গাছের এই গাঢ় সবুজ পাতাগুলো দেখতে

দেখতে নাকে আসে ফুলের গন্ধ। সাদা, ছোট ছোট, বাতাবী ফুল আমার বড় প্রিয়, তুমি জানো, ওই ফুল কতদিন আমি হাতে রেখেছি। নাকের কাছে তুলে ধরে বুক ভরে গন্ধ নিয়েছি।

পাকিস্তানের সীমানা মাত্র ক'মাইল তফাতে। আজ বাংলাদেশ। মুজিব ভাইয়ের জয়বাংলা! আমি এ বাংলার সীমান্তের ছোট হাসপাতালটার শয্যায় অসহায় পঙ্গু একজন মুক্তিযোদ্ধা—কিন্তু ও বাংলাকে এ বাংলায় বসে কোন নতুন নামে ডাকতে আমার ইচ্ছা করে না। আমার শুধু মনে হয়, জন্মেছি আমি অখণ্ড বাংলায়, খণ্ড হয়েছে স্বার্থের তাগিদে—আজ আমি যেন সেই অখণ্ড বাংলার এক হতভাগ্য সন্তান রাজা শশাঙ্কের মত, যিনি স্বপ্ন দেখছিলেন বৃহত্তর বাংলার। আমি বাঙালীর বাংলায়, জননী জন্মভূমি সোনার বাংলার কোলে শুয়ে আছি।

দুচোখে দেখছি প্রকৃতি। দুকান-ভরে শুনছি পাখীর গান। দেখছি, আমার জন্মস্থান কুমিল্লার ছোট্ট গ্রামের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। এ বাংলাও স্নিগ্ধ সবুজ, বিবর্ণ হয়ে যায়নি। পাখীর গান তেমনি মধুর সুন্দর।

তফাৎ কোথায়?

আমাদের মনে?

তাই কি?

বাঙালী কি আলাদা হয়ে গেছে? দুই বাংলার সীমারেখা বাঙালীকে ভিন্নধর্মী করে তুলেছে! পশ্চিমের বাঙালী—পুবের বাঙালী! আমরা পাকিস্তানী ছিলাম, (ছিলাম কি?) বাঙালী হয়ে উঠলাম! ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হল। পশ্চিমী পশু, পাঞ্জাবীর দল মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বাঙালীকে স্বীকার করল না কেন, কেন মেনে নিল না আমাদের অধিকার? আমরা বাঙালী বলেই কি?

আমার মনে হয় তাই।

এটাই সত্য। ধর্ম নয়—মানুষ। সবার ওপরে মানুষ সত্য।

মানুষের সত্য ধর্ম। ধর্ম মানুষের জন্য। ধর্মের জন্য মানুষ নয়। অথচ ওরা, ওই পশ্চিমী শাসক গোষ্ঠীর দল, ধর্মের ফতোয়া জাহির করেছে বারে বারে, ইসলামকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, নিজেদের রূপ ঢাকতে বারে বারে চিৎকার করে উঠেছে, ইসলাম বিপন্ন!

মানুষ নয়, ধর্ম। ধর্মের ধ্বজা তুলেছে ওরা। ধর্মের দোহাই দিয়ে পশুত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে। মানুষের খুনে হাত রাঙিয়েছে। নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। ওই ইসলাম সেবকের দল।

আমার আজ মনটা বেদনায় ভরে ওঠে, দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে একটা প্রশ্নই জানাতে ইচ্ছা হয় বার বার, ইসলামের নামে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জালিয়াতি, দুনিয়ার প্রকৃত ইসলাম সেবীর দল কেমন করে নীরবে সহ্য করলেন? ইসলামের নামে পশ্চিমী পশুদের গোলামী কেমন করে মেনে নিলেন তাঁরা?

রাবেয়া, আজ আমাদের ভুল ভেঙ্গেছে। অতীতের অন্যায় পাপের ফল ভোগ করেছি আমরা। আমরা আজ মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছি, আগে মানুষ তারপর ধর্ম। আমরা প্রথমে বাঙালী তারপর মুসলমান।

আমরা প্রকৃত বাঙালী হয়ে উঠেছি। ইসলাম ভূমি পাকিস্তান নয়, আমাদের জননী জন্মভূমি মা আজ বাংলাদেশে। আমরা বাংলার সন্তান!

ধর্মের নামে অন্ধ মোহ আমাদের দূর হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, ধর্মের মোহে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখে কি নিদারুণ সর্বনাশ ওরা করতে চেয়েছিল। ভুল করেছিলাম, মূল্য দিয়েছি। আজকের প্রতিজ্ঞা, আর যেন ভুল না করি। খোদা আমাদের দয়া করেন যেন। আমরা যেন মানুষের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সুরু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নয়, সুরু হয়েছে সেই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট, স্বাধীনতা

লাভের পর থেকেই। যদিও বিচ্ছিন্ন ছিল সে সংগ্রাম। পূর্ণতার পথে এগিয়ে গেছে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীর পর। ভাষার দাবিতে রক্ত ঝরেছে। শহীদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে মাটি।

অবশেষে ১৯৫৪-৫৫ সালে বাংলা ভাষা পেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। কিন্তু সংগ্রাম স্তব্ধ হলনা। বাঙালী জাতীয়-তাবাদের স্রোত ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল পরিপূর্ণ আত্ম প্রতিষ্ঠা— অর্থাৎ স্বায়ত্ব শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে। অবশেষে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে!

অথচ যুদ্ধ আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম বাঁচার অধিকার। আমাদের ন্যায্য দাবীকে ওরা মেনে নিল না। ওরা কুৎসা রটাল, আঘাত হানল, ওরা শেষ করে দিতে চাইল একটা গোটা দেশকে, বাঙালী জাতটাকে।

আমরা মরিনি, বেঁচে আছি। আমরা বাঁচতে চেয়েছি। আমরা মানুষের মত বাঁচব।

আমাদের বাঁচার সংগ্রাম শেষ হবে না। আমরা বাঁচতে চাই।

দেশের স্বাধীনতা আর জনগণের স্বাধীনতা কি একই জিনিষ? আমরা স্বাধীন হয়েছি, মুক্ত হয়েছে দেশ, কিন্তু আমরা অর্থাৎ জনগণ কি স্বাধীনতা পেয়েছি?

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ-ভারতের সর্বশেষ গভর্ণর লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন তাঁর রেবয়েদাদ ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার পর মুসলিম লীগের অল্প সংখ্যক বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে জুলাই মাসে ঢাকায় গণ-আজাদী লীগ নামে একটা ক্ষুদ্র সংগঠন গঠিত হয়। 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শ' নামে তাঁরা একটা ম্যানিফেষ্টো প্রকাশ করেন। নিজেদের আদর্শ ও কর্মসূচীর যৌক্তিকতা স্বরূপ তাঁরা ঘোষণা করেন—

দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের স্বাধীনতা দুইটি পৃথক জিনিস। বিদেশী শাসন হইতে একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, সেই দেশবাসীরা স্বাধীনতা পাইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই যদি সেই স্বাধীনতা জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়ন না করে, কারণ, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং, আমরা স্থির করিয়াছি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকিব।

গণ আজাদী লীগের 'আশু দাবী কর্মসূচী আদর্শের' মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ লক্ষিত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের নাগরিক অধিকার অব্যহত রাখা এবং সুদৃঢ় করার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টা শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী না হলেও প্রথম উদ্যোগ হিসাবে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা বলেন:

সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি। সুতরাং আমাদের এখন কর্তব্য এই নবীন পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুন্দর ভাবে গঠিত করা, এবং মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টি ভঙ্গি আনয়ন করা।

ঘোষণায় মাতৃভাষা, শিক্ষার মাধ্যম এবং রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বলেন:

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করিতে হইবে এবং বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর জিয়া উদ্দীন আহমদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে

অভিমত ব্যক্ত করেন। এই ব্যক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানগত ভাবে কোন প্রতিবাদ কেউ করেনি। মুসলিম লীগ মহল নীরব। কিন্তু জিয়া উদ্দীনের এই সুপারিশের অসারতা সম্পর্কে ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন ঃ

কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানর একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে।··· ইংরাজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোন প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্থান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন—পুষতু, বেলুচি, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা ; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা রূপে চালু নয়। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরাজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য।

তিনি আরও বলেন ঃ

বাংলা দেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডঃ জিয়া উদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশ সমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন আমি একজন শিক্ষাবিদ্ রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন ও আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।

১৭ই পৌষ ১৩৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন।

বাংলা সম্পর্কে বললেন ঃ

হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষনীয় ভাষা অবশ্যই বাংলা হবে। ইহা জ্যামিতির স্বীকৃতি বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতিত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাংলাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা।

আরবী সম্পর্কে তাঁর অভিমত ঃ

মাতৃভাষার পরই স্থান ধর্মভাষার, অন্ততঃ মুসলমানের দৃষ্টিতে।... এইজন্য আমি আমার প্রাণের সমস্ত জোর দিয়া বলিব, বাংলার ন্যায় আমরা আরবী চাই।...সেদিন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম সার্থক হইবে, যেদিন আরবী সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হইবে।...কিন্তু বর্তমানে আরবী পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি বৈকল্পিক ভাষা ভিন্ন একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের যথেষ্ট অন্তরায় আছে।

উর্দু সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের জনগণের মধ্যে যোগ স্থাপনের জন্য, যাঁহারা উচ্চ রাজকর্মচারী কিংবা রাজনীতিক হইবেন, তাঁহাদের জন্য একটি আন্তঃ প্রাদেশিক (inter-provincial) ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন। এই ভাষা উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য ইংরাজীই আছে। ইহা অনস্বীকার্য বাস্তব ব্যাপার (fact)। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ইহা চলে না। তজ্জন্য উর্দুর আবশ্যকতা আছে।...এইজন্য রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উচ্চ কর্মচারী ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী প্রত্যেক নাগরিকেরই উর্দু শিক্ষা করা কর্তব্য।

ইংরাজীর স্বপক্ষে তাঁর অভিমত ঃ

আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে দেখিতে চাই। তজ্জন্য ইংরাজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান বা রুশ ভাষাগুলির মধ্যে যে-কোন একটি ভাষা আমাদের উচ্চ শিক্ষার

পঠিতব্য ভাষারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে অবশ্য আমরা ইংরাজীকেই বাছিয়া লইব। ইহার কারণ দুইটি ঃ

১। ইংরাজী আমাদের উচ্চ শিক্ষিতদের নিকট সুপরিচিত।

২। ইংরাজী পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি ইংরাজীকেই বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে বজায় রাখিতে প্রস্তাব করি।

ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা বিষয়ক মন্তব্য এবং সুপারিশগুলির মধ্যে অনেক জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধিতা থাকলেও এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধী চিন্তা তাঁর মধ্যেই শুধু ছিল না। সমসাময়িক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং জনসাধারণের চিন্তার মধ্যেও এ জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধিতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

ছিল আমাদের মধ্যেও। ছিল একুশে ফেব্রুয়ারীর দিনটিতেও। আইন অমান্যের আগের মুহূর্তেও আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র সন্দেহের দোলায় দুলেছে। লাভ ক্ষতির হিসাব কষেছে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী ছিল আমাদের বাঁচার লড়াই। আমরা ছাত্ররাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জীবন পণ সংগ্রামে আমরা এগিয়ে গেছি। ফিরে আসার পথ থাকলেও আমরা ফিরে আসতে চাইনি। আমরা জানতাম, আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম, কাপুরুষ মরে শত বার, বীরের মৃত্যু নেই।

সত্যই মৃত্যু নেই, রাবেয়া। একুশের শহীদেরা মরেন নি। তাঁরা চির অমর। কবি বলেছেন,

> শীতল পৃথিবী, অবশ নগর
> আমার আকাশ, বাতাস নিথর,
> ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেণু কণা যত।

রোদগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে, বিছিয়ে রয়েছে ঘামের মতন,
পলাশ ফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোষ্টের উঁচু কোণটায়।
একুশে বিকেল।
মৃত্যু হয়েছে আজকে ওদের
বোবা পাখীগুলো পাখা ঝাপটায়।
একুশে রাতের আঁধার নামে সব শহরের গলি খুঁজিতে,
গাঁয়ের বাঁকা পথ গুলোতে,
রেল কলোনীতে, কেরানীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।
আজকে তাদের মৃত্যু হয়েছে তাই শুনে সব স্তব্ধ পাষাণ।
সব চুপ চাপ।
পাখীগুলো শুধু পাখা ঝাপটায়। ব্যথায় বোধ হয়।
সবাই শুধোয়। শিলাময়।
মন কথা কয়ে ওঠে ঃ
ওদের কি আর মৃত্যু হয়েছে ?
মৃত্যু হয়েছে ? মৃত্যু হয়েছে ?

হাসপাতালের গন্ধ বাতাস।
বাইরে প্রহরী। খবর কোথায় ?
সবাই শুধোয় রাস্তার দল, অফিসের লোক,
দোকানী, পষারী ও পাড়ার মুদী,
নৌকার মাঝি হাল ছেড়েছে,
কামারের ঘরে হাপর থেমেছে,
কাস্তে থেমেছে, কোদাল থেমেছে,
রেল ইঞ্জিনে সিটি থেমে গেছে।

ঘুম ভাঙা কোন কবর খানায় জলার ধারে
প্রহরী কুকুর ডেকে ডেকে কয় ঃ
শহরে কি আজ মিছিল ছিল ?
ফাল্গুনি রাত আঁধারে কাঁদে। একা ল্যাম্পপোষ্ট মিটি
মিটি জ্বলে।

শহরে সেদিন মিছিল ছিল
পৃথিবী সেদিন উল্টো ঘোরেনি, এগিয়ে গেছে।
সবাই শুন্‌লো ঃ খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেল।
মায়ের চোখের দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছে রমনার পথে।
ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে, সমুদ্র তাই উদ্বেল হল।
ইস্পাত-দৃঢ় কঠিন শপথ।
কাজ নয় আর কাজ নয়।
ফেরারী-বসন্ত কয়ে দিয়ে গেল নগরীর যত
শিবিরে শিবিরে ঃ
কাল শহরে মিছিল ছিল
কাজ নয় আর কাজ নয়।
সকালের রোদে খবর পেয়েছে
বাংলার ঘরে সব ভাই বোন
হত্যা হয়েছে কাল শহরে।
তাই কাজ নয় আর কাজ নয়।
মৃত্যুকে যারা ভয় করেনি,
মৃত্যু তাদের বরণ করেছে,
এ খবর গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছেছে
সবার মুখেই বজ্র শপথ ঃ
হাতুড়ী আমরা নামিয়ে নিলাম

কাস্তে-কোদাল থামিয়ে দিলাম
কাঁচা-শহীদের স্মৃতির ভারে।
পাড়ার মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টটাও অবনমিত
শ্রদ্ধাভরে।
বাংলার কোন দূরে দেশে গাঁয়ে।
সজ্‌নে তলায় মাটির ঘরে উঁচু দাওয়াটায়
প্রদীপ জ্বলে
জীবনের সব ভীরু পাখাগুলো জড়ো হয়ে আছে
মায়ের মনে।
একাকী মায়ের ফাঁকা বুকখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে
কিসের শোকে?
"মাগো, ভাবনা কিসের? আসছে ছুটিতে আবার
ফিরবো তোমার কোলেই।"

শহীদ ছেলের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায় একলা রাতে।
দুঃখিনী মায়ের আঁচলের ধন ফিরে আসবেই
রাত্রির শেষে। ছুটির শেষে।
আকাশের যত তারারা আজ্‌কে ভীড় করে সব মিছিল
করেছে।
সখিনা মায়ের অশ্রু ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে।

আর চুপ নয়,
মায়েরা সব গেয়ে ওঠো আজ
ধান ভান্‌তে ক্ষুদ্‌ কুড়াতে,
গমের শীষের খোসা ছাড়াতে
মায়েরা সব গেয়ে ওঠো—

আর চুপ নয়, এবার শুধু
শহীদের গান। বিজয়ের গান॥
শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে,
ফিরে আসছে, ফিরে আসছে,
হাজারে হাজারে মিছিল করে॥

আমার মায়ের কথা মনে পড়ে। দুঃখিনী মা। একাকিনী মা আমার। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। তাঁর আশার প্রদীপ—জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

ছুটির আগেই বাড়ি ফিরেছিলাম। কেমন আছি জানতে চেয়েছিলেন তিনি। প্রশ্ন করেছিলেন আমার অসময়ে ফেরার জন্য।

প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি কিছু শোন নি?'

মা জানিয়েছিলেন, সবই শুনেছেন তিনি। সবই জেনেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল……। তিনি তাঁর মনের কথাটা প্রকাশ করেন নি।

ষোল বছরের আমি হালকা সুরেই মায়ের মনে আতঙ্ক জাগাতে রঙ্গচ্ছলে বলেছিলাম, 'আম্মা, তুমি বোধ হয় ধরেই নিয়েছিলে তোমার কবীর শহীদ হয়েছে?'

মা আমার কথাটা শুনে এতটুকু চমকান নি। শুধু নীরব দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'না কবীর। কোন মা-ই সন্তানের মৃত্যু মেনে নিতে পারে না। তবু…।'

চুপ করে গিয়েছিলেন মা। কি যেন চিন্তা করেছিলেন। আমি জানতে চেয়ে ছিলাম, 'তবু কি মা?

মা আমাকে দেখেছিলেন। আমার ব্যাকুল প্রশ্নটার উত্তরে বলেছিলেন, 'মৃত্যুকে অস্বীকার করার উপায় আমাদের নেই। বীর সন্তানের মৃত্যুতে মা কাঁদেন, আবার গর্বে ভরে যায় তাঁর বুক।

নিজেকে সান্ত্বনা দেন, আবার মাতৃ হৃদয় মথিত করে হাহাকার জাগে কণ্ঠে। মনে পড়ে কত শত স্মৃতি, কত টুকরো ছবি। মায়ের মন কিছুতেই শান্ত হয়না।'

প্রশ্ন করে ছিলাম, 'কেন মা?'

'কেন?' মা আমার মাথায় একখানি হাত রেখেছিলেন। কান্না ঝরা গলায় বলেছিলেন, 'আমরা যে মা, কবীর। আমাদের যে মায়ের মন। তুই আমার কোলে ফিরে এসেছিস। কিন্তু যারা আসবে না আর কোনদিন তাদের জন্যে আমার বুকটাও ব্যথায় টন্‌টন করছে।'

'তুমি তাহলে বলছ ...।'

মা আমাকে বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'না, আমি তা বলছি না। তোরা ঠিকই করেছিস বাবা। যদি···যদি তুই শহীদ হতিস তাহলে আমি কাঁদতাম ঠিকই, আবার চোখের জল মুছে কখনো নিশ্চই ভাবতাম তোর বীরত্বের কথা। আমার সন্তানের কথা। আমার সন্তান অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে নি। আমার সন্তান জীবন দিয়েছে ন্যায়-সত্যের জন্য।'

সেদিন আর আমি কিছু জানতে চাই নি। প্রশ্ন তুলিনি। আমার মায়ের করুণ দৃপ্ত মূর্তিখানি শত শহীদের মায়ের মূর্তি নিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে জেগে উঠেছিল। শহীদের মাকে যেন আমি দেখতে পেয়েছিলাম। শহীদ সন্তানদের বীর জননীকে।

মনে পড়েছিল একটা কথা। জানি, জন্মেছি যখন, তখন একদিন না একদিন মৃত্যু হবেই। মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। জীবন নেওয়াও হয়তো সহজ, কিন্তু জীবন দিতে পারে কজন!

আমরা, ছাত্ররা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছিলাম। আমরা অন্যায় আদেশ মানতে চাই নি। একশো চুয়াল্লিশ ভাঙ্গার যে কি পরিণতি হতে পারে তাও আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই বলে তো আমরা থেমে থাকিনি। ওদের অন্যায় আদেশের কাছে মাথা

নত করি নি। ওদের স্বেচ্ছাচারিতার কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিই নি।

আমরা এগিয়ে গেছি দৃঢ় পদক্ষেপে। একের পর এক। ওরা আমাদের ধরে তুলেছে পুলিশ ভ্যানে। আইন অমান্যের শাস্তি পেতে হবে আমাদের। ওদের গুণ্ডাশাহীর আইনে হয়তো আমাদের দীর্ঘ দিনের কারাবাস ঘটবে। হয়তো কুখ্যাত বৃটিশ আইনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে জীবন নেবে। আমাদের ছাত্র জীবন শেষ। আমাদের ভবিষ্যৎ শেষ। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সধনার সমাপ্তি।

তবু আমরা ভয় পাইনি। ফিরতে চাইনি। আমরা ফিরতে পারি না। এগিয়ে গেছি শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপ। উপেক্ষা করেছি ওদের ভয় পাওয়ানোর সব কিছু আয়োজন।

অবশেষে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত আমাদের শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলাকে চুরমার করে দিতে চেয়েছে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত বহু অর্থে বিদেশ থেকে আমদানী করা টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়েছে। গুলি চালিয়েছে। লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

শহীদ হয়েছে অনেকে। রক্তে মাটি ভিজে গেছে। তবু আমরা ভয় পাই নি, এগিয়ে গেছি। কারণ, আমরা জানি ফেরা যায়না। যৌবনের যাত্রা কখনো ব্যর্থ হয়না। আমরাও ব্যর্থ হইনি। আমাদেরই বুকের রক্তে ভেজা মাটিতে দাঁড়িয়ে একটা জাতি শপথ নিয়েছে। সুরু হয়েছে নতুন দিনের, নতুন কালের জাগরণ।

মনে পড়ছে শহীদের মাকে। মনে পড়ে শহীদের মায়ের সেই প্রতীক্ষা। মনে পড়ে,

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজ্‌নে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,

আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি,—
খোকা তুই কবে আসবি !
কবে ছুটি ?”

চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

“মাগো, ওরা বলে,
সব কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুন্‌তে দেবে না।
বলো মা, তাই কি হয় ?
তাই তো আমার দেরী হচ্ছে।
তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো।
লক্ষ্মী মা রাগ ক'রো না,
মাত্র তো আর কটা দিন।”

“পাগল ছেলে”
মা পড়ে আর হাসে,
“তোর ওপরে রাগ করতে পারি !”
নারকেলের চিঁড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কি !
তার খোকা যে ফিরবে বাড়ী !
ক্লান্ত খোকা !

কুম্‌ড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝ'রে প'ড়েছে ডাঁটা,
পুঁই লতাটা নেতানো;—
"খোকা এলি ?"—
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় ব'সে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,
খোকা তার
কখন আসে! কখন আসে!
এখন,
মার চোখে শিশির ভোর
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে।

আমার মায়ের কথাটাই যেন ঠিক। মা ঠিকই বলেছিলেন। মায়েদের অন্তর যেন সমুদ্রের মত! মায়েদের হৃদয়-সমুদ্রের আলোড়নকে আমি অস্বীকার করতে পারি না।

একটা পা কেটে বাদ দেওয়া কবীর আজ হাসপাতালের শয্যায়

অসহায় ভাবে শুয়ে আছে, এই খবরটুকু যদি আমার মায়ের কানে গিয়ে পৌঁছাত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমার এই যন্ত্রণা নিজের বুকে অনুভব করতেন। তিনি হয়তো · ।

রাবেয়া, আমার মা নেই। তিনি কবরে গেছেন। মেহেরবান খোদা তাঁকে আমার এই অবস্থা হওয়ার আগেই টেনে নিয়েছেন। তিনি যদি থাকতেন, হ্যাঁ রাবেয়া, আমি এতটুকু চিন্তা না করেই বলতে পারি, তিনি আমার যন্ত্রণার কথা চিন্তা করে হয়তো চোখের পানিতে বুক ভাসাতেন, সেই সঙ্গে পুত্র গর্বে বুকটাও তাঁর নিশ্চই ভরে যেত। এ আমার অহঙ্কার নয়। আমি যে আমার মাকে জানি।

বাংলার শত সহস্র মাকে যে আমি চিনেছি। আমি যে মাতৃরূপ দেখেছি। বাংলার সন্তানদের কাছে জন্মদাত্রী মায়ের চেয়ে জন্মভূমি মা যেমন অনেক বড়, ঠিক তেমনি বাংলার মায়েদের কাছেও আপন সন্তানের মঙ্গলের চেয়ে দেশের মঙ্গল অনেক আগে। এই স্নেহ, মমতা, ত্যাগ, ভালবাসা, আত্মদান অথবা দেশ এবং দশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ একমাত্র বাংলা দেশেই সম্ভব। বাঙালীর কাছে আগে স্বার্থ নয়, আগে ত্যাগ। বাঙালী আগে আপন স্বার্থের কথাটা চিন্তা করতে পারে না বলেই অনেক সময় ন্যায্য অধিকার আদায় করতে অনেক মূল্য দিতে হয়।

অনেক মূল্য বাঙালী দিয়েছে। দেওয়ার শেষ আজও হয়নি। বাঙালীর বৃহত্তর চিন্তাধারা তাকে আপন প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। বাঙালী চেয়েছে সকলের সুখ শান্তি। বাঙালী কামনা করেছে সকলের মঙ্গল। আর তাই তাকে ঠকতে হয়েছে সকলের চেয়ে বেশি। তাই তাকে সহ্য করতে হয়েছে সকলের চেয়ে বেশি আঘাত।

তবু বাঙালীর চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। বাঙালী আত্ম সর্বস্ব সংকীর্ণমনা হয়ে উঠতে পারেনি।

কিন্তু....

সে কথা থাক। আমার কথা। একটা পঙ্গু অসহায় মানুষ…।

রাবেয়া, তোমার চিঠি পেলাম। দীর্ঘদিন পরে। কয়েক মাসের হিসাব—ক'টা বছর। ক'বছর পরে তোমার চিঠিটা যেন যুগের গন্ধ ভরা ফেলে আসা অতীত। তুমি আমি, আমরা সকলে। আমাদের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো ফিরে এসেছে যেন! তোমার সেই প্রথম প্রশ্নটা আমি শুনতে পাচ্ছি।

'একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাস্থলে আপনি ছিলেন?'

একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২। তুমি প্রশ্ন করেছিলে দীর্ঘ নয় বছর পরে। বি. এ পাশ করে ঘটনা চক্রে ক'বছর বিরতির পর আমি আবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম অর্থকরী শিক্ষাটাকে শেষ করার ইচ্ছায়। তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল!

আমাদের সামনে তখন এক লক্ষ্য—আমার বাংলা চাই। বাহান্নর সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে আমরা অকুতভয় সৈনিক। আমরা শুধু ছাত্ররা নই, আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। বাংলার মানুষ—বাঙালী। স্বেচ্ছাচারী সরকারের অন্যায় আদেশ না মানতে জেগে উঠেছিল সমগ্র পূর্ববাংলা, জেগে উঠেছিল বাঙালী। প্রকৃত জাগরণ শুরু হয়েছিল শহীদের রক্তঝরার পর। কিন্তু তার আগে সেই সাতচল্লিশ সাল থেকেই বাংলাকে জাগানোর চেষ্টা চলেছে। রাজনৈতিক কর্মীরা সমবেত হবার চেষ্টা করেছেন বার বার। গুণ্ডাশাহী বাধা দিয়েছে। প্রকাশ্য সভার অনুমতি দেয়নি। কখনো গুণ্ডা ছেড়ে দিয়ে সভা পণ্ড করেছে। ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়তে বাধা দিয়েছে। ছাত্রদের নামে অপপ্রচার চালিয়েছে। যুব শক্তিকে শেষ করে দিতে চেয়েছে।

অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কয়েদে আজম জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজ করেছেন, এখন যুবকদেরই এই দেশ

গড়তে হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মুসলিম লীগ সরকার বার বার বাধা দিয়েছে।

. তবু সব বাধা উপেক্ষা করে ৬ই-৭ই সেপ্টেম্বর যুবকর্মী সম্মেলন ঢাকায় খান আবুল হাসনাতের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে শামসুল হক সেদিন বলেন ঃ

পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী-সম্মেলনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী তৈয়ার করা এবং সারা দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যেই যুব সংগঠনের ইস্তাহার রচিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, নবজাত শিশু-পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সাহায্য করার জন্য দেশে বহু যুব প্রতিষ্ঠানই গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল যুবশক্তির মিলন না ঘটিলে কোন বৃহত্তর কাজই করা সম্ভব হইবে না। তাই যুব সংগঠনের ইস্তাহার যুবকদের অর্থনৈত্রিক, সামাজিক, বা নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি-সাধন ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সাধারণ ও গণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। কোন বিশেষ বিতর্কমূলক সমস্যা ও তাহার সমাধানের অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই এবং জনগণের মূল দাবীর সনদকেও সরাসরি যুব সংগঠনের ইস্তাহার বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

সম্মেলনে নির্বাচনী কমিটির প্রস্তাবগুলো সেদিন একে একে শান্তিপূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি প্রধানতঃ ছিল গণদাবীর সনদ, খাদ্য সমস্যা এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন সম্পর্কে।

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী-সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ

পূর্ব পাকিস্তান কর্মী-সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা-ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎ সম্পর্কে

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের ওপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক।

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পক্ষ থেকে যুব-ইস্তাহার নামে একটা আলাদা ঘোষণা এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। তাতে শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ

নিজের মাতৃভাষায় বিনাখরচে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পাওয়ার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ছেলেমেয়ের রহিয়াছে এবং ইহা তাহাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

যুবকদের সকল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার মূল নীতিকে সর্বদা প্রাধান্য দিতে হইবে এবং যুবকেরা কার্যে যাহাতে উত্তম সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য এবং ছবি উপভোগ করিতে ও বুঝিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতির মূল্যবোধ বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য এবং বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সুবিধা দান করিতে হইবে। এই প্রয়োজনে গড়িয়া উঠা যুব কেন্দ্র এবং যুব সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য দান করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের অধিনস্ত বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে সরকার স্বীকার করিয়া নিবেন, জীবন এবং সাংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে এইসব এলাকায় সকল ব্যাপারে স্বায়ত্ত শাসন মানিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক যুবলীগও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে গঠিত হয়েছিল সত্য কিন্তু শেষ হয়ে যেতেও দেরি হল না। অনেক কারণের মধ্যে কতকগুলি কারণ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ সম্পর্কে কোন সংবাদ তৎকালীন কোন সংবাদ পত্রেই ছাপা হয়নি। কারণ, সরকারী এবং সরকার-সমর্থিত বেসরকারী হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠনকে সংবাদ হয়ে উঠতে দেয়নি।

উপরন্তু ৩১শে আগষ্ট (১৯৪৭) বিকালে যখন ছাত্ররা দলে দলে উপস্থিত হয়েছিল সভা করতে তখন গুণ্ডার দল সুরু করে তাণ্ডব নৃত্য। সে গুণ্ডার দল ছাত্র নামধারী সুবিধাবাদীর দল। ছাত্র প্রতিষ্ঠান গড়তে দেওয়া হল বলেই তারা সেদিন দলে দলে এসে হাজির হয়েছিল মারপিঠ করে সভাপণ্ড করতে। অবশেষে ছাত্রদের হাতে মার খেয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। সভার কাজ বিলম্বে হলেও সুরু হয় কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সেদিন সম্ভব হয়নি।

গুণ্ডারা যে ট্রাকে চড়ে রণক্ষেত্রে এসেছিল, সে ট্রাকটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের। ভবিষ্যতের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন তখন বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী। ক'জন রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন। ঘটনাটা জানান।

দুঃখ প্রকাশ করে নুরুল আমীন বলেন, কোন কর্মচারীর ছেলে যদি ট্রাক নিয়ে থাকে তাহলে তাঁর কিছুই করার নেই।

ছাত্ররা বলেন, ট্রাকের নম্বর তাদের কাছে আছে। কাজেই, তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসে বার করতে পারেন, প্রকৃত পক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে কে জড়িত।

জড়িত কে তা তিনি অবশ্যই বার করতে পারতেন। কিন্তু সেদিন প্রকৃত অপরাধীদের বার করে শাস্তি বিধানের উপায় তাঁর ছিলনা। কারণ, তিনি নিজেই জড়িত ছিলেন সেই ঘটনার সঙ্গে। শাস্তি দিতে গেলে তাঁর নিজের লোকদেরই শাস্তি দিতে হয়।

তাকি সম্ভব?

না, সম্ভব নয়। অপরাধীর নিজের পক্ষে নিজের বিচার করা সম্ভব কেমন করে! তাই শেষ পর্যন্ত কিছুই করেননি পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক বিভাগের মন্ত্রী নুরুল আমীন।

ছাত্ররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃত দোষীর শাস্তি কোনদিনই পাকিস্তানে সম্ভব নয়। তাই হয়। দোষী নিষ্কৃতি পায়। অপরাধের দণ্ড ভোগ করে নিরপরাধী। তাদের বোধহয় একমাত্র অপরাধ, তারা অপরাধ করেনি।

গণতান্ত্রিক যুবলীগের সমসাময়িক তমদ্দুন মজলিশ। জন্ম :লা সেপ্টেম্বর। প্রতিষ্ঠাতারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র এবং অধ্যাপকরা। তমদ্দুন মজলিশ, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, না উর্দু—এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। ভাষা বিষয়ে তাঁরা বলেন ঃ

১। বাংলা ভাষাই হবে ঃ

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা।

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে দুটি—উর্দু ও বাংলা।

৩। (ক) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ'জনই শিক্ষা করবেন।

(খ) উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তাঁরাই শুধু এ-ভাষা শিক্ষা করবেন। এটি পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা পাঁচ থেকে দশজন শিক্ষা করলেই চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(গ) ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যাঁরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরি করবেন বা যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তাঁরাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারকরা একজনের চেয়ে বেশি হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিতে সেখানকার স্থানীয় ভাষা বা উর্দু

প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

৪। শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আপাততঃ কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কার্য চলবে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

প্রস্তাবটি লেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক এবং তমদ্দুন মজলিশের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাসেম। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে লেখায় তিনি বলেন, ইংরেজরা একসময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেইভাবে কেবলমাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্যবাদী অযৌক্তিক নীতিকেই অনুসরণ করা হবে।

সর্বশেষে তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে তিনি দাবী করেন ঃ

লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।

কাজী মোতাহের হোসেন তাঁর 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা' নামক প্রবন্ধে লেখেন ঃ

মোগল যুগে বিশেষ করে আরাকান রাজসভার আমাত্যগণ, বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। মুসলমান সভাকবি দৌলত কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা কবিতা লিখে অমর কীর্তি লাভ করেছেন। এঁদের ভাষা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু এঁরা জোর করে কোনো নির্দিষ্ট ভাষা থেকে বিকট বিকট শব্দ আমদানী করার চেষ্টা করেননি, তৎকালীন জন সমাজের নিত্য ব্যবহৃত বা সহজবোধ্য ভাষাতেই তাঁরা কাব্য রচনা করে গেছেন।

এসব কথা লেখার প্রয়োজন হয়েছিল, তার কারণ, এক শ্রেণীর লোকের ধারণা অনুসারে বাংলা হিন্দুদের ভাষা, কাজেই পরিত্যাজ্য এবং উর্দু ইসলামের ভাষা কাজেই গ্রহণীয়। এই সমস্যার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন ঃ

পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের আড়ষ্টতার আরও দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি, ধর্মীয় ভাষার সম্পর্কিত মনে করে উর্দুভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।

এর ফলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তা হল ঃ

বাঙালী মুসলমানের সত্যকার সভ্যতা বলতে যেন কোন জিনিসই নেই, পরের মুখের ভাষা বা পরের সেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তার আপন।

তাই তার উদাসীন ভাব, পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর, আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা। পশ্চিমাতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে, বৃহৎ পাগড়ী বেঁধে বাংলা দেশে এলেই এদের পীর হওয়া যায়, কমের কক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু' পয়সা রোজগারের যোগাড় হয়। শহুরে দোকানদার যেমন গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হতে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা! বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান বাঙাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।

বিকৃত ধর্মীয় সংস্কার কিভাবে মানুষকে বিপথগামী করে সে বিষয়ে তিনি বলেন ঃ

আমি উর্দুভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করিনা, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্য-সত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি, উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে

মাতোয়ারা, অথবা বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এইসব অবোধ ভক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নেই।

...এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলেছেন যে হিন্দুরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়াণী ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তো তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব মুখ্যতঃ মুসলমান সাহিত্যিক-দেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে, মুসলমান বিদ্বজন পুঁথি-সাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সাংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন, তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা যথার্থভাবে জন-সাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতাবোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে আমাদের কোনো কালেই যথার্থ লাভ হবে না।

তাঁর অধিকতর উল্লেখযোগ্য বক্তব্য :

দারিদ্র দূর করতে হলে সামাজিক বৈষম্য দূর করা, বৈদেশিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা, এবং জাতীয় সম্পদ যাই থাক, শিল্প বানিজ্যের সাহায্যে তার সুবিনিময়ের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। শুধু প্রভার কিছুটা খর্ব হলেই হবে না—ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য কোন প্রদেশীয় লোকে দখল করে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি করে নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জমাতে পারে, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণকে সজাগ করতে হবে।

কাজেই,

উর্দুকে শ্রেষ্ঠ ভাষা বা বনিয়াদী ভাষা বলে চালাবার চেষ্টার মধ্যে যে অহমিকা প্রচ্ছন্ন আছে তা আর চলবে না। নবজাগ্রত

জনগণ মুষ্টিমেয় চালিয়াত বা তথাকথিত বনিয়াদী গোষ্ঠীর চালাকিতে আর ভুলবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সরকারী চাকুরী করতে হলে প্রত্যেককে বাংলা ভাষায় মাধ্যমিক মান পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষানবিশী সময়ের পরে অযোগ্য এবং জনসাধারণের সঙ্গে সহানুভূতিহীন বলে এরূপ কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে।

কায়েমী স্বার্থবাদীদের সতর্ক করে তিনি বলেন :

আমাদের দেশেও, নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রে, জনগণ প্রমাণ করবে যে তারাই রাজা—উপাধিধারীদের জন-শোষণ আর বেশিদিন চলবে না। বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উপর রাষ্ট্রভাষা রূপে চালাবার চেষ্টা হয়, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ, ধূমায়িত অসন্তোষ বেশিদিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্বন্ধের অবসান হবার আশঙ্কা আছে। জনমতের দিকে লখ্য রেখে ন্যায়সঙ্গত এবং সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির সহায়ক নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করাই দূরদর্শী রাজনীতিকের কর্তব্য।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৭ সাল। সময় বেলা দুটো।

বাংলা ভাষার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম ছাত্র-সভা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ফরিদ আহমদ এই সভায় যে প্রস্তাবগুলি রাখেন তা হল :

১। বাংলাকে পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক।

২। রাষ্ট্রভাষা এবং লিংগুয়া ফ্রাংকা নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মূল উদ্দেশ্য, আসল সমস্যাকে ধামা চাপা দেওয়া এবং বাংলা ভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৩। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ফজলুল রহমান এবং প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার উর্দু ভাষার দাবীকে সমর্থন করার জন্যে সভা তাঁদের আচরণের তীব্র নিন্দা করছে।

৪। সভা 'মর্ণিং নিউজ'-এর বাঙালী বিরোধী প্রচারণার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যে পত্রিকাটিকে সাবধান করে দিচ্ছে।

এই সভা, করাচীর শিক্ষা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা বিমান বন্দরে করাচীর শিক্ষা সম্মেলন থেকে ফিরে সাংবাদিকদের কাছে যা বলেন পরদিন ৬ই ডিসেম্বরের 'মর্নিং নিউজে' তা প্রকাশিত হয়। ওধারে ৫ই ডিসেম্বর ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সর্ব শেষ বৈঠক বসে। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারী ভাষা করা হবে না।

প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকারী বাসভবন 'বর্ধমান হাউসে' বৈঠক চলা কালে বহু সংখ্যক ছাত্র এবং কয়েকজন শিক্ষক সেখানে উপস্থিত হয়ে বাংলাকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

কিন্তু করাচীর প্রভুর দল তখন অন্য চালে চলছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। সাহায্যে এগিয়ে এসেছে 'মর্নিং নিউজ'।

ফরিদ আহমদের প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়। একঘণ্টার মধ্যে শেষ হয় সভা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে মিছিল করে ছাত্ররা বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিল উপস্থিত হয় সেক্রেটারিয়েট ভবনে। সেখান থেকে নূরুল আমিনের বাস ভবনে।

'আমরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

'আমিও চাই'

'আমরা আমাদের দাবী যতদিন না পূরণ হচ্ছে, সংগ্রাম করব।'

'আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বাংলার জন্য সংগ্রাম করব। আর…'

'কী?'

'যদি এ কাজে ব্যর্থ হই তাহলে মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দেব।'

নুরুল আমিন তাঁর কথা রেখেছিলেন। বাংলা ভাষার জন্য সত্য সত্যই তিনি সংগ্রাম করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তার পরের দিনগুলিতে মানুষ থেকে শয়তানে রূপান্তরীত হয়েছিলেন, শহীদের খুনে সিক্ত করে তুলেছিলেন শ্যামল বাংলার মাটির বুক।

মিছিল গিয়েছিল প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে। তিনি তখন অসুস্থ। অক্ষমতা জানান ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাতের। লিখিত ভাবে তিনি বলেন শরীর সুস্থ হওয়ার পর তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং পার্লামেণ্টারী পার্টির মতামত না জানা পর্যন্ত তিনি ভাষার প্রশ্নে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করতে অক্ষম।

কিন্তু ছাত্ররা অটল। তারা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেই।

'প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে অসুস্থ শরীরে দেখা করা সম্ভব নয়। আপনারা ফিরে যান।'

'আমরা ফিরে যাব বলে আসিনি।'

'তিনি অসুস্থ।'

'আমরা জানি।'

'তবু আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'চাই।'

'তাঁর শারীরিক ক্ষতি হবে জেনেও?'

'হ্যাঁ, কারণ লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি মানুষের ক্ষতির কাছে তাঁর ক্ষতি কি খুবই বেশি?'

অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী এসে জানান মাত্র তিন জনের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী সাক্ষাৎ করতে রাজি হয়েছেন।

তিনজনেই সাক্ষাৎ করেন প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে। বিতর্কের সুরু হয়। অসুস্থ প্রধান মন্ত্রী তাঁর অসুস্থতার কথা ভুলে সেই বিতর্কে মেতে ওঠেন। কাটে কিছুক্ষণ। অবশেষে লিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করবেন।

তারপর ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' অফিসে স্থানায় প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভাষা সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিহার করার দাবী জানান।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্রদের প্রথম সভা এবং মিছিল।

তারপর?

অশান্ত হয়ে ওঠে ঢাকা। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে সংবাদ। সুরু হয় বাঙালী অবাঙালী দ্বন্দ্ব। ৭ই ডিসেম্বর রেল কর্মচারীদের সভায় ফজলুল হকের সভাপতিত্ব মানতে আপত্তি জানায় সমস্ত অবাঙালী কর্মচারীরা, ফজলুল হক সভাপতির আসন পরিত্যাগ করে চলে যান। সুরু হয় মারপিট। বাঙালী অবাঙালী সংঘর্ষে অবাঙালীদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর সুরু হয় সভা।

সুরু হয় অপপ্রচার। হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পিত কাহিনী। সুরু হয় গুণ্ডাদের দিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা।

'মর্নিং নিউজ' তার স্বভাব পরিবর্তন করেনা। লেখে:

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান প্রধান কথ্য ভাষা পুষতু, পাঞ্জাবী, ব্রাহমী ও সিন্ধী এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান কথ্য ভাষা বাংলা। প্রত্যেকটি গ্রুপই যদি নিজের ভাষাকে সরকারী ভাষা রূপে চালু

করার জন্য জোর দেয় তাহলে পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা, ভাবের আদান প্রদান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের অবসান ঘটবে। যার সামান্য কিছু বুদ্ধি আছে সে কখনই একথা বলতে পারে না যে একজন পাঠান অথবা পশ্চিম পাঞ্জাবী তার পরিবারের লোকজনের সাথে পাঞ্জাবীতে কথা না বলে উর্দুতে কথা বলবে। এই একই মন্তব্য সিন্ধী, বালুচ এবং বাঙালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঢাকায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের করাচীর গৃহীত সিদ্ধান্তকে এতো খারাপ ভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয়।

…আমাদের দেশের পূর্বতন শাসকদের ভাষা হিসাবে, ইংরাজীকে দেশের সমস্ত অংশের লোকেরা আলাপ আলোচনার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত করে। সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা এটা পূর্বেও ছিল এবং এখনও পর্যন্ত আছে। এই ভাষাতেই দাক্ষিণের লোক উত্তরের লোকের সাথে এবং পূর্বের লোক পশ্চিমের ভাইয়েদের সাথে চিঠিপত্র বিনিময় করে। এখানেই শেষ নয়। একই ভাষা-ভাষী দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সময় সাধারণতঃ ইংরাজীতেই কথা বলেন। আমাদের সংবাদ পত্র, আমাদের সাইনবোর্ড এবং আমাদের বিজ্ঞাপন সমূহ এখনো ইংরাজীতেই প্রকাশিত হয়। সর্বোপরি আমাদের নেতারা এখনো প্রেস কনফারেন্সে এবং প্রেসে বিবৃতি দেওয়ার সময় ইংরাজীতেই তা করে থাকেন। এই অবস্থা ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে যতদিন না আমরা বিদেশী আমলাতন্ত্র জোর পূর্বক আমাদের গলা দিয়ে যে পশ্চিমা ভাষাকে পার করেছে তার পরিবর্তে নিজেদের এমন একটি ভাষাকে ব্যবহার করতে শিখবো যার মধ্যে আমাদের চিন্তা, ঐতিহ্য সংস্কৃতির পরিচয় থাকে।

…এরকম একটা ভাষাই আমাদের হাতের কাছে আছে। সেটা হল উর্দু, যাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লোকেরা নাম

দিয়েছিলেন হিন্দুস্থানী। উপমহাদেশের অর্ধেকের বেশি লোক এই ভাষায় কথা বলে এবং সাধারণ ভাবে সকলেই তা বোঝে। এর থেকেও বেশি এই যে, পোর্ট সঈদ থেকে সাংহাই পর্যন্ত এই ভাষায় কথা বলা হয় এবং লোকে তা বোঝে ...।

উর্দু একটি আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং এটা হল দুই ডোমিনিয়নের লিংগুয়া ইণ্ডিকা যা আরবী এবং দেবনাগরী, দুই অক্ষরেই লেখা হয়। যদি তাঁরা ইংরাজীকে চালু রেখে তাকে হিন্দুস্থানী এবং পাকিস্তানীদের চিন্তার উপর রাজত্ব করতে না দেন, তাহলে উৎসাহী মাতৃ ভাষাওয়ালাদের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তঃডোমিনিয়ন সামাজিক, আধি মানসিক এবং বাণিজ্যিক লেনদেন এক অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের লোকদের সমস্যা দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দাসত্ব যথেষ্ট খারাপ কিন্তু বুদ্ধিগত দাসত্বের থেকে হীনতম ও নিম্নতম দাসত্ব আর কিছু নেই। বাঙালী পণ্ডিতদের মতে মুসলমাদের পৃষ্ঠ পোষকতায় বাংলাদেশ যে ভাষা লাভ করে, সেটাই হিন্দু মুসলমান কবি ও লেখকদের হাতে পুঁথি সাহিত্য হিসাবে বিকশিত হয়। ইংরেজদের আগমন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেওয়ানী দানের পর এ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যার ফলে এক শতাব্দীর স্বল্প পরিসরের মধ্যে শাসকরা উপনীত হয় নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায়। তাদের প্রভাবই যে শুধু বিনষ্ট হল তাই নয়, তারা আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলল। ইংরেজী জানা বুদ্ধিজীবিরা পাদ্রী এবং বৃটিশ আমলাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যে মিলের চাকা দ্রুততর ভাবে ঘোরানোর কাজে লিপ্ত হল, সেই মিলই তাদেরকে গুঁড়িয়ে দিল। বাংলা দেশের সাধারণ ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃত প্রভাবাচ্ছন্ন হল এবং মুসলমানেরা 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্যে সেই ভাষার বৈশিষ্টকে গ্রহণ করল। এখানেই শেষ নয়। নিজের ঐতিহ্যের সাথে তার

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়েও সে হয়ে দাঁড়াল দো-আঁশলা।

…সেই পূর্ব অবস্থা ফিরে পাওয়ার একটা সুযোগ এখন তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। নিজের মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার কথা কেউ তাকে বলছে না। করাচীতে তার যে সমস্ত শুভাকাঙ্খী মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা একটা দূরদর্শী পরামর্শ হিসাবে সমস্ত জড়তা মুছে ফেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বলেছেন। ইন্দোনেশিয়াকে বাদ দিলে পূর্ব বাংলাই পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানদের সব থেকে বড় একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। ইসলামের প্রতি সেই হিসাবে তার একটা কর্তব্য আছে। এ কাজ তার পক্ষে একা বিচ্ছিন্নভাবে থেকে বাংলার রসাস্বাদনের দ্বারা সম্ভব নয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের সিন্ধী, বালুচ, পাঞ্জাবী, পুষতু ভাষীপ্রভৃতি নাগরিকদেরমন তাদেরকে বোঝাতে হবে। সকলের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা ব্যতীত এ কাজ কিভাবে করা সম্ভব? আজ ইংরেজী সেই কাজ করছে। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত? পাকিস্তানের লোকেরা যদি সত্যই মুসলমান মতে কিছু করতে চায় তাহলে এখন থেকেই তাদেরকে সে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং নিজেদের রাষ্ট্রের জন্য একটি ভাষা নির্বাচন করতে হবে।…বাংলা ভাষায় ইসলাম এবং ইসলামী ইতিহাসের উপর কোনো বই-পুস্তক নেই বললেই চলে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে আজকের একজন বিক্ষুব্ধ যুবক, আগামী দিনে তার সন্তানরা যাতে আরও ভালো মুসলমান হয় সেটাই চায়। যুবকেরা যাতে তাদের ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ব বোধ করে সে ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজেদের দায়িত্ব যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সাথে পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়, তার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তার পক্ষে আরবীতে লিখিত তথ্যের সাথে পরিচিত হওয়া খুব অসুবিধা-জনক, ফারসী তর্জমাও তার পক্ষে বিরক্তিকর হবে। অন্য পক্ষে ইসলাম বিষয়ক এক বিশাল সাহিত্য উর্দুতে রয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানরা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই উর্দু বলতে এবং বুঝতে

পারে। তারা দিল্লী, আলীগড় অথবা লখনৌ-এর লোকেদের মত চমৎকার ভাবে উর্দুতে কথা বলতে না পারলেও প্রত্যেক মুসলমান শিশুই কোরাণের বর্ণমালার সাথে পরিচিত, কাজেই উর্দু শেখা তার পক্ষে সহজই হবে। করাচীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য এখানেই। এর মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমাদের মুক্তি এবং গৌরবময় ভবিষ্যৎ নিহিত।

রাবেয়া, তোমার প্রথম দিনের প্রশ্নটা আজও আমার মনে আছে। উত্তরের অপেক্ষায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে। কি দেখেছিলে আমি জানি না। পরে তোমাকে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছি। উত্তর পাই নি।

তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে একুশে ফেব্রুয়ারী গল্প! ঘটনার প্রত্যক্ষ্য বিবরণ।

একুশে ফেব্রুয়ারী একটা গোটা ইতিহাস। যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল বুকের উষ্ণ রক্তে! একটি দিনের ঘটনা। কিন্তু প্রস্তুতি বহুদিনের। দীর্ঘ দিন মাস বছরের হিসাবে তবেই তো একটা গোটা ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। একুশে ফেব্রুয়ারীও তো সেই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।

তুমি বলেছিলে, 'আমি একুশে ফেব্রুয়ারীর গল্প শুনতে চাই আপনার কাছে।'

'কেন।' জানতে চেয়েছিলাম আমি।

সহসা আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পার নি। কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর তুমি মৃদু কণ্ঠে বলেছিলে, 'আমার অনেক দিনের শোনার বড় ইচ্ছা।'

তোমার কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার রাগ হয়েছিল। বড়লোকের আদুরে কন্যার গরীবের গল্প শোনার আবদার যেন

তোমার। বিরক্তভাব বলেছিলাম, 'শুনলে মিথ্যে মন খারাপ হবে আপনার।'

তুমি বলেছিলে, 'মন আমার খারাপ হবে না '

'কষ্ট পাবেন না ?' জানতে চেয়ে ছিলাম আমি।

'আপনি বলেই দেখুন না।' আবার সেই অতুরে কণ্ঠস্বর।

'এর আগে শোনেন নি ?'

'শুনেছি।' স্বীকার করেছিলে তুমি।

'তাহলে ?'

'আমি আপনার মুখে শুনতে চাই।'

কঠিন হয়ে উঠেছিল আমার মনটা। কঠিন কণ্ঠেই বলেছিলাম, 'একুশের জন্যে যাদের প্রাণ কাঁদেনা তাদের আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি।'

কথাটা বলে আব একমুহূর্ত আমি দাঁড়াইনি। তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করি নি তোমার অথবা তোমার সঙ্গিনীদের মুখের দিকে। আমি তোমাদের আঘাত দিতে বা অপমান করতেও চাইনি, আমি আমার অন্তরের কথাটা, নির্মম সত্যের চাবুকটা তোমাদের মুখের ওপর বুলিয়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পার হয়ে পথে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেখান থেকেও তোমাদের দিকে তাকাই নি।

আর, তোমাকে সেদিন যে কথাটা বলেছিলাম, সেই কথাটা, তোমাকে বলা প্রথম এবং শেষ নয়। নিরুপায় আমি অনেককেই কথাটা বলতে বাধ্য হয়েছি অনেকবার।

একবার এক বৃদ্ধ, আমার বহুদূর সম্পর্কের চাচা হন, গ্রামে ফেরার পর একদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে তিনিই কাছে ডেকেছিলেন।

তাঁর কাছে যেতে তিনি প্রথমে আমার কুশল সংবাদ জেনে-

ছিলেন। বলেছিলেন, 'ক'দিনই ভাবছি তোমাদের বাড়ি একবার যাব। কিন্তু সময় হয়নি।'

বলেছিলাম, 'যাবেন একদিন।'

তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চই যাব। আর তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই যেতুম আমি '

বলেছিলাম, আমার সঙ্গে দেখা করবেন কেন?'

তিনি হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'বারে তুমি একজন কত নাম করা লোক হয়ে উঠেছ। তোমাকে দেখতেও ইচ্ছা করে!'

লজ্জা পেয়েছিলাম আমি। প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলাম তাঁর কথার।

তিনি জোরে হেসেছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, 'জান কবীব, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি। এ দুনিয়াটায় মানুষ বিনা স্বার্থে কিছু করে না। আর জোর করে কিছু করলে তার ফল ভাল হয়না। এ দুটো কথা সব সময় মনে রাখবে।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তার অর্থ?'

তিনি বলেছিলেন, 'চিন্তা করলেই অর্থ আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যবে।'

বলেছিলাম, 'আপনি যদি দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেন।'

বলেছিলেন, 'তুমি চিন্তা কর তাহলেই বুঝতে পারবে। শুধু একটা কথা মনে রেখ, এই যে তোমাকে আমি একটু আগে বলছিলাম, তোমাদের বাড়ি আমি যাব একদিন। কিন্তু খোদাতালা করেন নি তাই, হয়তো যাব-যাব না করে আমাকে ছুটে যেতে হত।

'কেন?' অবাক হয়েই জানতে চেয়েছিলাম আমি।

'তুমি শহীদ হলে আমি নিশ্চই কাজের জন্যে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। তোমার মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমাকে যেতেই হত।' বলেছিলেন তিনি। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায়

যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল। তবু কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলেছিলাম, 'আমার মাকে আপনি চেনেন ?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কেন চিনবো না। তোমার মাকে আমি জন্মের পর থেকেই দেখছি।'

তবু বলেছিলাম, 'আমার মাকে আপনি চেনেন না চাচা।'

তিনি যেন কিছুটা অবাক হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এ তুমি কী বলছ ?'

দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলাম 'আমি সত্যি কথাটাই বলছি। শিশুকাল থেকে আমার মাকে হয়তো আপনি দেখে আসতে পারেন, কিন্তু মাকে আপনি চিনতে পারেন নি।'

তিনি বিস্মিত ভাবে বলেছিলেন, 'সে কি !'

বলেছিলাম, 'যা বললাম খুবই সত্যি কথা।'

'কিন্তু তুমি যদি মারা যেতে তোমার মায়েরই যেত ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ?'

'আমার মা শোকে কাঁদতেন ঠিক কথা। আবার চোখ মুছে বুক বাঁধতেন নতুন করে, কারণ, শহীদ কখনো মরে না ! মৃত্যু হয়না বীরের।'

'তুমি কাব্য করছ ?'

বলেছিলাম, 'জীবনটাই একটা কাব্য চাচা। আমরা অন্ধ অথবা বধির, তাই জীবন কাব্যের সুর আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। আমরা জীবনকে অস্বীকার করতে গিয়ে পদে পদে বিভ্রান্ত হই। সত্যকে নির্মম হাতে গলা টিপে মারতে চাই। আমরা ভুলে যাই জীবনের ধর্ম, সত্যের সুন্দর রূপটা।'

'তোমরা ভেবেছ বাংলার জন্যে ক'টা জীবন দিলেই বাংলা পাবে ?'

'আমাদের চাওয়া যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চই পাব।'

'তোমরা পাগল।'

'আজকে স্বার্থের হিসাব হীন পাগলেরই বড় বেশি প্রয়োজন।'

'লাভ কি হবে?'

'ক্ষতির অঙ্কটা কষুন তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

'তোমরা ইসলামকে অস্বীকার করতে চাইছ।'

'ইসলাম আমাদের অন্তরে।'

'তোমরা ধর্মকে কলুষিত করার চক্রান্ত এঁটেছো।'

'ধর্ম যদি কলুষিত হয় তাহলে তা হবে আপনাদের জন্যে। কারণ, ধর্ম কখনো পন্য হয়ে বিকোতে পারে না। ধর্ম অনির্বাণ শিখার মত। যা নেভে না—নেভানো যায়না!'

'তোমরা অন্যায় করছ।'

'মানুষের ধর্ম কখনো অন্যায় করে না। অমানুষের স্বেচ্ছাচারীতা, শক্তির অহঙ্কারে।'

'তুমি আমাকে…'

তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন আমি জানি। বলেছিলাম, নিজের বুকে হাত দিন। অনুভব করুন হৃদয় কি বলে। স্বার্থের চিন্তাটা দূরে সরিয়ে দিন, দেখবেন উত্তর পেয়ে গেছেন।'

আমি আর দাঁড়াই নি। শুনতে চাই নি তাঁর কথা। কারণ, তাঁর বলার কথা একটাই। স্বার্থ। স্বার্থসর্বস্ব মানুষের প্রতি আমার মনটা ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছিল। কিন্তু সংসারে স্বার্থসর্বস্ব মানুষের সংখ্যা কম নয়, হয়তো বেশিই।

মানুষ প্রলোভনের দাস। তাকে ঘিরে অসংখ্য লোকের হাতছানি অক্টোপাসের মত ঘিরে আছে। ক্ষমতার লোভ, অর্থের প্রতি লালসা, সমাজের প্রতিষ্ঠা, বড় চাকুরীর মোহ—হাজারো প্রলোভন।

বাঙালী হয়ে, বাংলার জন্যে প্রাণ দিয়েছে কেউ, আবার লোভের ফাঁদে পা দিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারে উপনীত হবার জন্য চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েছে অনেকে। মানুষের ধর্মটুকু

পালন করার কথা চিন্তা করা প্রয়োজন বোধ করে নি। চিন্তা করে নি আগামী দিনের দুর্ভাগ্যের দিনগুলোকে।

রাবেয়া, আমার সেই ষোল বছরের দিনগুলোকে একটি একটি করে নিরীক্ষণ করেছি। ন'বছর পরে তোমার প্রশ্নটায় আমি ব্যথা পেয়েছিলাম, দুঃখ বোধ করেছিলাম, মনে হয়েছিল···

ক'দিন পরে একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছিলাম। একটি মেয়ের অনুরোধ। সে আমার সঙ্গে একাকী দেখা করতে চায়। নাম দেখেছিলাম, রাবেয়া।

পত্রবাহককে প্রশ্ন করে ছিলাম, 'রাবেয়া কে?'

সে বলেছিল, 'পরিচয় জানানো নিষেধ আছে।'

বলেছিলাম, 'দেখা করার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

সে বলেছিল, 'তোমার দেখা করা উচিৎ।'

'কেন?' জানতে চেয়েছিলাম আমি।

'মেয়েটি অনেক কথা বলবে তোমাকে, নাহলে অনেক কিছুই ভুল থেকে যাবে।'

তার কথাটায় অবাক হলেও বলেছিলাম, 'মিথ্যা ভুলের সংশোধন করে কোন লাভ নেই বলেই আমার মনে হয়।'

সে বলেছিল, 'ভুলটা সত্যও তো হতে পারে?'

আমার মনে চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তবু বলেছিলাম, 'একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে দেখা করাটা আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না।'

'কারণটা কি ব্যক্তিগত?' জানতে চেয়েছিল সে।

বলেছিলাম, 'তা নয়।'

'তাহলে?'

আমি তার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। পত্রবাহক আমার বন্ধুটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোন পরিচিত মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে তোমার আপত্তির কারণ থাকতে পারে না নিশ্চয়ই?'

বলেছিলাম, 'না। তবে, কেন তিনি দেখা করতে চান সেটাও আমার আগে জানা প্রয়োজন।'

বন্ধু বলেছিল, 'দেখ কবীর, আমি বলছি তুমি মেয়েটির সঙ্গে দেখা কর। না হলে তার সম্পর্কে তোমার মনে একটা মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকবে।'

'সে ধারণাটা কি?'

'সেটাও আমি ঠিক জানি না।'

'জেনেও বলবে না?'

হেসে ফেলেছিল বন্ধু। বলেছিল, 'আমার অনুরোধ, তুমি দেখা কর।'

বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তুমি এলে। অবশ্য আমার মনে হয়েছিল তুমিই আমাকে পত্র দিয়েছ। তবু, তুমিই যে পত্র দিয়েছ সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিলাম না।

কিন্তু তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না আমার মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তোমার সঙ্গে কথা বলার স্পৃহা আমার চলে গিয়েছিল।

তুমি এসে বললে, 'আমার সম্পর্কে আপনার মনে একটা মিথ্যা ধারণা থাকবে এটা আমি চাইনা বলেই চিঠি লিখে বাধ্য হয়েছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সহসা আমি কথা বলতে পারিনি। তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার মনের কথা জানবার চেষ্টা করেছিলাম।

তুমি বলেছিলে, 'আমি সেদিন ইচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে আঘাত দেওয়ার জন্যে কথাগুলো বলিনি।'

তবু আমি নীরব ছিলাম।

তুমি বলেছিলে, 'আমি কি চলে যাব?'

কথা বলেছিলাম আমি। জিজ্ঞসা করেছিলাম, 'কি জানতে চান আপনি?'

'সেদিনের কথা।'

'কেন?'

'তা ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না, কেন জানতে চাই। তবে, আপনি বিশ্বাস করুন, আমার এই জানার ইচ্ছাটা সত্য সত্যই আন্তরিক।'

বলেছিলাম, 'একুশের আগের দিনগুলোকে জানেন?'

বলেছিলে, সেইজন্যেই আপনার কাছে আসা আমার।'

আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

একুশের আগের দিনগুলি। প্রস্তুতি পর্ব! বাংলার গণজাগরণের উষাকাল যেন সে সব দিনগুলি! বিরুদ্ধবাদীরা সক্রিয়। অপপ্রচারের অন্ত নেই তাদের; স্বার্থের মোহে, ক্ষমতার লিপ্সায় তারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে বার বার। পাকিস্তান কায়েম হবার পর মুসলিম লীগের দরোজা বন্ধ হয়ে যায় জনগণের কাছে। পাঞ্জাব ভাগ হওয়া সত্ত্বেও সেখানের মুসলিম লীগ ভাঙ্গা হল না, কিন্তু বাংলা বাটোয়ারার অজুহাতে করাচী বাংলার মুসলিম লীগ ভেঙ্গে দিল। দ্বিতীয় অসাধুতা করল তারা এড-হক কমিটি গঠন করে নিজেদের বাধ্য অনুগত লোক দিয়ে। অগত্যা মুসলিগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্মী সম্মেলন করে নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের দরোজা খুলে দিতে দাবী করেন। কিন্তু নেতারা সে দাবীতে কর্ণপাত না করায় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আওয়ামী (জনগণের) মুসলিম লীগ।

তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগেই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবার পরই পাকিস্তান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল রহমান ঢাকা আসেন। তিনি উর্দুকে

রাষ্ট্রভাষা করা এবং আরবী হরফে বাংলা লেখার স্বপক্ষে প্রচার চালান।

ফজলুল রহমান ঢাকা আসবার পর সংগ্রাম পরিষদের পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার বিষয় থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা, ডাকটিকিট ইত্যাদিতে বাংলা ভাষা স্থান না পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা পরিণতি লাভ করে তুমুল বিতর্কে। বিতর্ককালে ফজলুল রহমান বলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটি একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়। নিতান্ত ভুল বশতঃই সেটা ঘটেছে। তিনি ভুল সংশোধনের আশ্বাস দেন সাগ্রাম পরিষদকে।

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদকীয়তে লেখে:

মিঃ ফজলুল রহমান হয়ত এগুলিকে ভুল বলিয়া চালাইবার প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু সব কয়টি ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষাকে 'ভুলে' বাদ দেওয়া হইয়াছে, একথা কে বিশ্বাস করিবে? বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক ও কর্মকর্তাদের পক্ষে এতবার একই ভুল করা কি করিয়াই বা সম্ভব। নিতান্ত 'ভুল' ও বারে বারে পুনরাবৃত্তি করিলে যে তাহারা শুদ্ধ হইয়া যায় সে খবর কি ফজলুল রহমান সাহেবের জানা নাই? পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার অস্তিত্বের কথা যাঁরা এইভাবে বারে বারে 'ভুলিয়া' যাইতে পারেন, তাঁদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানকে একদিন ভুলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়।

রাষ্ট্রভাষার সওয়ালটা শুধু রাজকার্যের মাধ্যমের সওয়াল নয়, এর সঙ্গে রাষ্ট্রের জনগণের উন্নতি, অবনতি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এইরূপ একটি নাজুক প্রশ্ন লইয়া ছেলেখেলা চলে না। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, সেই ছেলেখেলাই যেন চলিতেছে। পাকিস্তানের মেজরিটির মাতৃভাষার বিরুদ্ধে যেন ব্যুরোক্র্যাটিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

না নইলে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারীদের পক্ষে এমন 'ভুল' বার বার করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি 'ভুলই' হউক আর মতলবই হউক, এর পরিণতি রাষ্ট্রের পক্ষে সমান বিষময়। কারণ, রাষ্ট্রভাষার মত নাজুক প্রশ্নে বিচার করিতে গিয়া জনগণের সমষ্টিগত সুবিধা ও সেন্টিমেন্টকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শুধুমাত্র জনগণের মত লইয়াই এই প্রশ্নের সুষ্ঠ মিমাংসা হইতে পারে। গায়ের জোরে বা চালাকি করিয়া পাঁচ কোটি লোকের ঘাড়ে একটা ভাষা চাপানো যাইবে না। চাপাইতে গেলে তা একান্তই অস্বাভাবিক হইবে। বিংশ শতাব্দীর জটিল পরিবেশে জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার একমাত্র উপায় হইতেছে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সমান অধিকার দেওয়া।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এবং সায়েন্স এক যুক্ত বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমস্ত স্কুল কলেজে নিম্নতম থেকে আই, এ পর্যন্ত সকল ক্লাসেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হবে। তাঁরা ঠিক করেন ১৯৫০-৫১ সাল থেকে প্রস্তাব কার্যকরা করা হবে। সেই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে একটা পরিভাষা কামটিও গঠন করা হয়।

প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন কেবল মাত্র শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে তা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সিলেটে, কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়ে বাংলা ভাষাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান।

বাংলা ভাষা অন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকার জন্য বাংলা ভাষা বিরোধী সংবাদ পত্রগুলো সরব চিৎকারে অনেক

বাধা সৃষ্টি করে, অনেক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ করে, কিন্তু তমদ্দুন মজলিসের বাংলা ভাষা আন্দোলনকে সাংস্কৃতিক আলোচনা ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারটিকে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হিসাবে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাষার আন্দোলন ছাত্র এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একথাও সত্য যে, বহু ছাত্র এবং শিক্ষিত জনসাধারণ ছিলেন উর্দুর স্বপক্ষে। এই জাতীয় উর্দু সমর্থকরা গুণ্ডাদের সহায়তায় ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের ওপর বহুবার হামলা চালায়। কিন্তু আন্দোলন থামেনি। যত দিন গেছে আন্দোলন আরো জোরদার হয়েছে। বাঙালী ক্রমশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, বাংলা তার শুধু মুখের ভাষা নয়—বুকের ভাষাও।

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন সুরু হয়। এই অধিবেশনে বিরোধী-দলদুটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রথম ঃ বৎসরে অন্ততঃ একবার ঢাকায় পাকিস্তান গণ-পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় : ভাষা (এটিতে উর্দু এবং ইংরাজীর সাথে বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার দাবী উত্থাপন করা হয়)।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি ২৪শে ফেব্রুয়ারী আলোচিত হয়। তমিজুদ্দীন খান বিরোধিতা করার পর পরিষদ তা বাতিল করে দেয়।

ভাষা বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আলোচিত হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারী, অধিবেশনের তৃতীয় দিনে। এই আলোচনাকালে গণ-পরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী বলেন :

এখানে এ প্রশ্নটা তোলাই ভুল হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে একটি জীবন মরণ সমস্যা। আমি অত্যন্ত তীব্রভাবে এই সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করি এবং আশা করি যে এ ধরণের একটি সংশোধনী প্রস্তাবকে পরিষদ অগ্রাহ্য করবেন।

শুধু তাই নয়, প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব উত্থাপন করলে কংগ্রেস দলের সমস্ত সদস্যই তা সমর্থন করেছিলেন, কয়েকজন প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন) উদ্দেশ্যের সততার প্রতি কটাক্ষপাত করে তিনি আরও বলেন :

প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

লিয়াকত আলী খানের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য সম্ভব হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে, পরিষদে মুসলমান সদস্যরা সকলেই ছিলেন সরকারী মুসলিম লীগ দলভুক্ত এবং তাঁরা দলগতভাবে বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে সমস্বরে প্রস্তাবটির নিন্দা এবং বিরোধিতা করেছিলেন। অন্য পক্ষে প্রস্তাবটি যারা উত্থাপন এবং তার সমর্থন করেন তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং কংগ্রেস দলভুক্ত।

গণ-পরিষদে কংগ্রেস দলের সম্পাদক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী সংশোধনী প্রস্তাবটির সমর্থনে বলেন :

উর্দু পাকিস্তানের কোনো প্রদেশেরই কথ্য ভাষা নয়। তা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরতলার কিছুসংখ্যক মানুষের ভাষা। পূর্ব বাংলা এমনিতেই কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তার ওপর এখন তাদের ঘাড়ে একটা ভাষাও আবার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। একে গণতন্ত্র বলে না। আসলে এ হল অন্যান্যদের

ওপর উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। বাংলাকে আমরা দুই অংশের সাধারণ ভাষা করার জন্যে কোন চাপ দিচ্ছি না। আমরা শুধু চাই পরিষদের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার স্বীকৃতি। ইংরাজীকে যদি সে মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে বাংলা ভাষাও সে মর্যাদার অধিকারী।

মোহাজের এবং পুনর্বাসন মন্ত্রী গজনফর আলী খান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বলেন :

পাকিস্তানে একটি সাধারণ ভাষা থাকবে, সে ভাষা হচ্ছে উর্দু। আমি আশা করি অচিরেই সমস্ত পাকিস্তানী ভালভাবে উর্দু শিক্ষা করে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে।

উর্দু ভাষার সাথে ইসলামী সংস্কৃতির যোগ সম্পর্কে তিনি বলেন :

উর্দু কোন প্রদেশের ভাষা নয়, তা হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা। এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি।

পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত হিন্দু সদস্যদের প্রতি কটাক্ষপাত করে বলেন :

বাংলা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এই বিতর্কের তাৎপর্য যে উপলব্ধি করে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন এতে আমি খুশি হয়েছি।

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেন :

পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীরই এই মনোভাব যে, একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে ২৭শে ফেব্রুয়ারী 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদকীয়তে লেখে :

খাজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। আমাদের মতে, তাঁর উপরোক্ত উক্তি মোটেই সত্য নয়। আমরা

বিশ্বাস করি, গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে শতকরা নিরানব্বই ভোটের বড় কম হইবে না। এ অবস্থায় এমন গুরুতর ব্যাপারে তিনি এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থেরই ক্ষতি করেন নাই, এদেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকে এভাবে বিকাইয়া দেওয়া কি এতই সহজ ?

সেদিন কিন্তু অতি সহজেই খাজা নাজিমুদ্দিন সহ পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা জিন্নার অঙ্গুলি হেলন মেনে নিয়েছিলেন।

গণ-পরিষদে বাংলা ভাষা, বাঙালীর জন্যে একটি কথাও কেউ বলেন নি। বলেন নি সঙ্গত কারণেই। দেশের চেয়ে, মানুষের চেয়েও আপন আপন স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা। হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন কায়েদে আজমের প্রিয়পাত্র। স্বপ্ন দেখছিলেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

কিন্তু বাংলা ভাষাকে গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ছাত্র-শিক্ষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ উদ্যোগে ২রা মার্চ ফজলুল হক হলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটা সভা আহ্বান করা হয়। ভাষা অন্দোলনকে সুষ্ঠ রূপ দেওয়ার জন্যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটা সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয় এবং গণ আজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুব লীগ, তমদ্দুন মজলিস, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ইত্যাদি ছাত্রাবাস ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র লীগ—এদের প্রত্যেকটি থেকে দুজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। আহ্বায়ক হিসাবে মনোনীত হন শামসুল আলম।

সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের নাম আলোচনা কালে আবুল কাসেম প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানকারী অজিত গুহের নাম সদস্য হিসাবে রাখার বিরোধিতা করে বলেন, অজিতবাবু হিন্দু, কাজেই তাঁর অন্তর্ভুক্তি আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। প্রতিবাদ করেন অজিত গুহ। ভাষা আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। তবু অজিত গুহের স্থান হয় না।

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণের পর গণ-পরিষদে সরকারী ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৮ই মার্চ সিলেট তমদ্দুন মজলিস এবং সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে সিলেটের গোবিন্দ পার্কে এক জনসভার অয়োজন করা হয়। কিন্তু সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই গুণ্ডার দল চড়াও হয়ে সভাপণ্ড করে দেয়। শুরু হয় মারপিট। পুলিস নীরব দর্শক।

আসল সভাকারীদের বিতাড়িত করে গুণ্ডার দল সভা সুরু করে। জনসাধারণকে মিথ্যা ভাষণে উত্তেজিত করে তোলে। মুসলিম লীগের নেতার দল গুণ্ডা দিয়ে মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ও তমদ্দুন মজলিসের সদস্য মকমুদ আহমদকে প্রহার করায়। প্রহারের ফলে মুর্ছিত হয়ে পড়েন তিনি।

তবু বাংলা ভাষা আন্দোলনে সিলেটের জনসাধারণ, ছাত্র-শিক্ষক, মহিলারা ভয় না পেয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলেন। তাঁদের একটি মাত্র দাবি, বাংলা চাই।

এগিয়ে আসে ১১ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের দিন।

অবশেষে ১১ই মার্চ।

ছাত্ররা সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং শুরু করে। অফিসে আদালতে দোকানে বাজারে সর্বত্র মানুষকে ধর্মঘটে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। কোথাও সামান্য অনুরোধে সফল হয়। কোথাও বা চলে তর্কাতর্কি। নিগ্রহ জোটে। তবু তারা অচল অটল। যে উকিলরা আদতলে যাবেন বলে জেদ ধরেন, তাঁরাই আবার ছাত্রদের নির্যাতনের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন।

১১ই মার্চের ঘটনাবলী সম্পর্কে পূর্ববঙ্গ সরকারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ

বাংলাকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা না করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ আহুত সাধারণ ধর্মঘটকে কার্যকর করার জন্যে আজ ঢাকাতে কিছু সংখ্যক অন্তর্ঘাতক এবং একদল ছাত্র ধর্মঘট পালন করার চেষ্টা করে। শহরের সমস্ত মুসলিম এলাকা এবং অধিকাংশ অমুসলিম এলাকাগুলি ধর্মঘট পালন করতে অসম্মত হয়। শুধুমাত্র কিছু কিছু দেকানপাট বন্ধ থাকে। শহরের এবং অদালতের কাজকর্ম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। রমনা এলাকায় অবশ্য ধর্মঘটকারীরা কিছু কিছু অফিসের লোকেদের কাজে যোগদানে বাধা দেয়। পিকেটিং করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি দল সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কতকগুলি অফিসের সম্মুখে সমবেত হয়। এদের মধ্যে অনেককে স্থান ত্যাগ করতে সম্মত করা গেলেও অন্যান্যরা আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানে অবস্থিত পুলিশ ও অফিস যোগদানে ইচ্ছুক কিছু সংখ্যক লোকজনের উপর ইটপাটকেল ছোঁড়ে এবং অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। এর ফলে পুলিশ লাঠি চার্জ করতে বাধ্য হয় এবং পঁয়ষট্টি জনকে গ্রেপ্তার করে। একসময় দুবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ পর্যন্ত করতে হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পুলিশ তৎপরতার ফলে মোট চোদ্দ ব্যক্তি আহত হন এবং তাঁদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এঁদের মধ্যে কেউই গুরুতরভাবে অথবা গুলির আঘাতে আহত হননি।

খানাতল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা: ধর্মঘটী ছাত্রদের পিছনে একদল গুণ্ডাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি অফিসের সামনে পিকেটিংরত ছাত্রদের ভয় দেখায়। দোকান লুঠ করে। ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়।

শুধুমাত্র ঢাকা নয়, পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ধর্মঘাট পালন করা হয়। কোথাও আংশিক, কোথাও বা পূর্ণ ধর্মঘট।

১১ই মার্চের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে আহত ও পুলিশ কর্তৃক ধৃত ছাত্রদের হিসাব:

আহত—২০০ জন।

গুরুতরভাবে আহত—১৮ জন।

ধৃত—৯০০ জন (এদের মধ্যে পরে অনেককে ছেড়ে দেওয়া হয়)।

জেলবন্দী—৬৯ জন।

ছাত্ররা ভাষার জন্যে লড়ছে আর ভাষা আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা আপন স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ খুঁজছে। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের চুক্তির কথা আলোচনার ফাঁকে কিছু নেতা চাইছেন আপন স্বার্থসিদ্ধি। তাঁরা মন্ত্রী হতে চান। মন্ত্রী হয়ে শেষ করে দিতে চান ভাষা আন্দোলন।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে কিছু নেতা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আপোষ আলোচনায় ঘৃণা বোধ করলেন। সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন ১৫ই মার্চ।

১৫ই মার্চের ধর্মঘটে যোগ দিলেন সেক্রেটারিয়েট এবং রমনা এলাকার অন্যান্য অফিসের বাঙালী কর্মচারীরা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ধর্মঘটে যোগ দিলেন রেলকর্মচারীরা।

নাজিমুদ্দিন সংবাদ পাঠালেন, তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় রাজি। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য আবুল কাসেম, কমরুদ্দীন আহমদ, মহম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমদ, আজিজ আহমদ, নজরুল ইসলাম, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রভৃতি ফজলুল হক হলে পরিষদের জরুরী বৈঠকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শেষ করে চুক্তির শর্তগুলি ঠিক করে নিয়ে 'বর্ধমান হাউসে' উপস্থিত হলেন বেলা সাড়ে এগারোটায়।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে প্রথম থেকেই নাজিমুদ্দিনের তুমুল তর্ক বিতর্ক সুরু হয়। অবশেষে সদস্যদের অনমণীয় মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি। আদক দফা চুক্তির শেষ দফাটি নিজের হাতে লিখে দিলেন।

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিতে হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া একমাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দান করিবেন।

৩। ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী আলোচনার জন্যে যে দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণ-পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরাজী

উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণ ভাবে স্কুল কলেজগুলিতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দান করিতে হইবে।

৫। আন্দোলনে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ব বাংলার যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে আবুল কাসেম, কমরুদ্দিন আহমদ প্রভৃতি জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভাষা আন্দোলনে বন্দীদের চুক্তিপত্রটি দেখান। শামসুল হক, মুজিবর রহমান, আলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মহবুব প্রভৃতি চুক্তির শর্তগুলি দেখার পর তার প্রতি তাঁদের সমর্থন ও অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। তার পরে স্বাক্ষরিত হয় চুক্তিপত্র—সরকার পক্ষে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কমরুদ্দীন আহমদ।

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া সত্বেও ছাত্ররা শান্ত হয় না। তারা দাবি করে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে এসে বলে যেতে হবে সে কথা। কিন্তু নাজিমুদ্দিন উপস্থিত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকল। আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার জন্যে সংগ্রাম কমিটির নেতাদেরও পরদিন ১৬ই মার্চ পুনরায় সাধারণ-ধর্মটের ডাক দিতে হল।

ওধারে পরিষদ ভবনের অভ্যন্তরেও তুমুল বাকবিতণ্ডা সুরু হয়েছে, বাইরে ছাত্রদের বিক্ষোভ। জেনারেল আইয়ুব খান আর পীরজাদার পরামর্শ এবং সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী পরিষদের অধিবেশন মুলতবি রেখে বাড়ি চলে যান।

জেল গেটে দেখা দেয় এক নতুন সমস্যা। বন্দীদের উপস্থিত করার পর দেখা যায় সকলে মুক্তি পান নি। জাকির হোসেন, শওকত আলী, কাজী গোলাম মহবুবের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে অভিযোগ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন ছাড়াও অন্য মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল। রণেশ দাশগুপ্তকে নিয়েও সেই একই সমস্যা। মুক্তবন্দীরা এদের বাদ দিয়ে মুক্তি নিতে চাইলেন না। সুরু হল উত্তেজনা —হট্টগোল।

অবশেষে মহম্মদ তোয়াহা টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার পর নাজিমুদ্দিন সকলকেই মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। মুক্ত হলেন ভাষা আন্দোলনের বন্দীরা।

তার পরের দিনগুলো ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হৈ হট্টোগোলের দিন। ছাত্ররা বাংলা ভাষার জন্য সভা করেছে, মিছিল করেছে, ধর্মঘট করেছে। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও বিক্ষোভ বন্ধ হয়নি। উপরন্তু দাবী উঠেছে, নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পদত্যাগ। সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বুঝতে পেরেছেন, ভাষা আন্দোলন আর তাঁদের হাতে নেই। প্রধান মন্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন তাঁরা সে কথা।

ঠিক এমনি সময়, ১৯শে মার্চ বিকালবেলা কায়েদে আজম জিন্না পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলার তেজগাঁ বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলেন। হাজার হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে বিমান বন্দরে, রেসকোর্সের ময়দান থেকে তেজগাঁ পর্যন্ত পথের দুপাশে সমবেত, কিন্তু নীরব কণ্ঠ। কায়েদে আজমকে শুধু দেখতে এসেছে মানুষ।

মুসলিম লীগের নেতার দলে উৎসাহের অন্ত ছিলনা। পাকিস্তানের জন্মদাতার আগমন উপলক্ষে বিমান বন্দরের পথে, শহরের মধ্যে তোরণের পর তোরণ সাজিয়েছেন। শহরে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা করেছেন উৎসবের বাজি পোড়ানোর। খুশি করতে চেয়েছেন তাঁরা কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী জিন্নাকে।

তারপর ২১শে মার্চ।

স্থান রেসকোর্স ময়দান।

উদ্দেশ্য, কায়েদে আজমকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

আয়োজন করেছেন ঢাকার নাগরিকেরা।

কায়েদে আজম সভায় উপস্থিত হতে সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি মানপত্র পাঠ করেছেন। ভাষণ দিয়েছেন কায়েদে আজম।

ভাষা আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং আন্দোলনকারীদের চরিত্র সম্পর্কে সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সতর্ক করে দিয়ে কায়েদে আজম তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

•••কিন্তু আমি একথা আপনাদের বলতে চাই যে, আমাদের মধ্যে নানা বিদেশী এজেন্সীর সাহায্যপুষ্ট কিছু লোক আছে যারা আমাদের সংহতি বিনষ্ট করতে বদ্ধ-পরিকর। তাদের উদ্দেশ্য হল পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। আপনারা সাবধান হয়ে চলুন আমি তাই চাই; আমি চাই আপনারা সতর্ক থাকুন এবং আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হন। তারা বলছে যে পাকিস্তান ও পুর্ববাংলা সরকার সর্বতোভাবে আপনাদের ভাষাকে ধ্বংস করতে চায়। মানুষের পক্ষে এর থেকে বড় মিথ্যা ভাষণ আর কিছু হতে পারে না। সোজাসুজি ভাবে আমি একথা আপনাদেরকে বলতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কমিউনিষ্ট এবং বিদেশীদের সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্ট আছে এবং এদের সম্পর্কে সাবধান না হলে আপনারা বিপদগ্রস্থ হবেন। পূর্ব বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা তারা পরিত্যাগ করেনি এবং এখনো পর্যন্ত সেটাই তাদের লক্ষ্য।

তিনি আরো বলেন :

পাকিস্তান এবং বিশেষ করে আপনাদের প্রদেশ এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত বিপদের সম্মুখীন সে সম্পর্কে আবার আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করতে না পেরে, পরাজয়ের দ্বারা বাধাগ্রস্থ ও হতাশ হয়ে পাকিস্তানের শত্রুরা এখন পাকিস্তানী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রাদেশিকতার উস্কানী দানের মাধ্যমেই তাদের এই প্রচেষ্টাকে তারা অব্যাহৃত রেখেছে। যে পর্যন্ত না এই বিধকে আপনারা রাজনীতি বর্জন করছেন, সে পর্যন্ত আপনারা নিজেদেরকে একটা সত্যিকার জাতি হিসাবে গঠন করতে সক্ষম হবেন না। আমরা বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচী পাঠান ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। ইউনিট হিসাবে সেগুলির অবশ্য একটা অস্তিত্ব আছে। কিন্তু আপনাদের জিজ্ঞাসা করি ; চোদ্দশো বছর পূর্বে আমাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল আমরা কি তা ভুলে গেছি ? আমার মতো আপনারা সকলেই এখানে বহিরাগত। বাংলা দেশের আদি অধিবাসী কারা ? যারা এখন এদেশে বাস করছে তারা নয়। কাজেই, আমরা বাঙালী বা সিন্ধী বা পাঠান বা পাঞ্জাবী, এ কথা বলার প্রয়োজন কি ? না, আসলে আমরা সকলেই হলাম মুসলমান।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যে জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত একথা অস্বীকার করে তিনি বলেন :

একথা আমি পূর্বেই বলেছি যে, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভাষার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আপনাদের প্রধান মন্ত্রীও একটি সদ্য প্রকাশিত বিবৃতিতে যথার্থভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সরকার এদেশের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক অথবা তাদের এজেন্টদের যে কোন চেষ্টাকে কঠিন ভাবে দমন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। বাংলা এই

প্রদেশের সরকারী ভাষা হবে কিনা সেটা এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। আমার কোন সন্দেহ নেই যে যথা সময়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

উর্দু'কে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন ঃ
আমি সুস্পষ্ট ভাষায় আপনাদের জানাতে চাই যে, আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার নিয়ে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে, একথার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু আপনারা, এই প্রদেশের অধিবাসীরাই, চূড়ান্তভাবে স্থির করবেন এই প্রদেশের ভাষা কি হবে। কিন্তু একথা আপনাদেরকে পরিস্কার ভাবে বলে দেওয়া দরকার যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয় এব্যাপারে যদি কেউ আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে, সে হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু। একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোন জাতিই এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে কার্য নির্বাহ করতে পারে না। অন্য দেশের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখুন। অত এব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

সাবধানবাণী ঘোষণা করে তিনি বলেন ঃ

আমি আবার আপনাদেরকে বলছি, রাষ্ট্রের দুশমনদের ফাঁদে পড়বেন না। দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনাদের মধ্যে ঘরোয়া শত্রুরা আছে এবং আমাদের দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, তা বাইরের থেকে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত মুসলমান। কিন্তু তারা একটা মস্ত ভুল করেছে। আমরা ভবিষ্যতে অন্তর্ঘাতকদের আর কিছুতেই সহ্য করব না। আমরা আমাদের রাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতক ঘরোয়া শত্রুদেরকে সহ্য করব না। এখনও যদি বন্ধ করা না হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের সরকার এবং পাকিস্তান সরকার এই বিষাক্ত শক্তিকে নির্দয়ভাবে দমন করার জন্য কঠিনতম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

মুসলিম লীগের সমর্থনে তিনি বলেন ঃ

মুসলিম লীগ আপনাদের হাতে একটি পবিত্র আমানতের মতো। এই পবিত্র আমানতকে আমাদের দেশের ও জনগণের কল্যাণের জিম্মাদার হিসাবে আমরা রক্ষা করব—না রক্ষা করবো না? আমরা যা অর্জন করেছি তাকে ধ্বংস করা অথবা আমরা যা লাভ করেছি তা দখল করার উদ্দেশ্যে, যাদের অতীত সন্দেহাতীত নয় এ জাতীয় লোকেদের নেতৃত্বে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা রাজনৈতিক দল কি খাড়া করতে দেওয়া হবে? এই প্রশ্ন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি।

তিনি প্রশ্ন করেন শ্রোতাদের :

আপনারা কি পাকিস্তান বিশ্বাস করেন?

শ্রোতাদের উত্তর, হ্যাঁ-হ্যাঁ।

পাকিস্তান অর্জন করে কি আপনারা সুখী হয়েছেন?

উত্তর, হ্যাঁ-হ্যাঁ।

পূর্ববাংলা অথবা পাকিস্তানের অন্য কোনো অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে চলে যাক এটা কি আপনারা চান?

শ্রোতাদের চিৎকার, না-না।

কয়েক মুহূর্ত শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন, আপনারা যদি পাকিস্তানের খেদমত করতে চান, যদি আপনারা পাকিস্তানের সংস্কার করতে চান, তাহলে আমি বলব যে, প্রতিটি মুসলমানের সামনে একটি মাত্র সৎ পথই খোলা আছে—তা হল মুসলিম লীগে যোগদান করে নিজের সাধ্য মতো পাকিস্তানের খেদমত করা।

বিরাট জন সমুদ্র সেদিন কায়েদে আজমের বক্তৃতা শুনেছিল। সমর্থন-প্রতিবাদ, তবু সভা ছিল শান্ত কিন্তু বাঙালীর মন গিয়েছিল ভেঙে। বাঙালী নামের সুবিধাবাদীর দল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়েছিল তারাই।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা নির্বিঘ্নে তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন একসময়।

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কানে বেজেছিল আগামী দিনের অত্যাচারের পদধ্বনি। মুসলিম লীগ সরকারের করায়ত্ব শক্তি। তারই পূর্বাভাষ কায়েদে আজমের কণ্ঠে।

এগিয়ে আসছে অত্যাচারের দিন। কিন্তু ···

২৪শে মার্চের সকাল। কার্জন হল কায়েদে আজমের কণ্ঠস্বরে মুখর। নীরবে ছাত্ররা শুনচে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার ভাষণ। না শুনে উপায় নেই, কারণ তাঁর সম্মানেই সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন। বিশ্ববিদ্যাল'য়র ছাত্ররা তাই শুনছে কায়েদে আজমের অলিখিত বক্তৃতা। তিনি একের পর এক বলে চলেছেন নানান বিষয়ে।

হঠাৎ তিনি বললেন, ইদানিং আপনাদের প্রদেশের উপর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা—তুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে তাদের মধ্যে এখনো কিছু সংখ্যক মুসলমান আছে—তুর্বল করে এই প্রদেশকে পুনরায় ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সক্রিয়ভাবে প্রাদেশিকতার উস্কানী দিতে নিযুক্ত হয়েছে। যারা এই খেলা শুরু করেছে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু এ সত্বেও তারা তাদের চেষ্টা থেকে বিরত হবে না। এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের সংহতিকে খর্ব করে জনগণকে আইন ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করার জন্য প্রত্যহ মিথ্যা প্রচারণার বন্যা বইছে। আমি তুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে আপনাদের প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পরও আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ সাম্প্রতিক ভাষা বিতর্কের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন। অন্যান্য উপায়ের মতো, একটা প্রাদেশিকতার বিষয় এই প্রদেশের মধ্যে সযত্নে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা সূক্ষ্ম উপায় এটি। এটা কি আপনাদের কাছে বিসদৃশ

মনে হয়না যে, ভারতীয় প্রেসের এক অংশ, যাদের কাছে পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত একটা অভিশাপের মতো, তারাই ভাষার বিতর্কের প্রশ্নে আপনাদের 'যথার্থ অধিকার' আদায়ের জন্য আজ উঠে পড়ে লেগে গেছে। এটা কি তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে অতীতে যারা মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অথবা আপনাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে পাকিস্তনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তারাই আজ আকস্মিক ভাবে আপনাদের অধিকার রক্ষার নাম করে ভাষার প্রশ্নে আপনাদের সরকারের বিরোধিতা করার জন্যে উস্কানী দিচ্ছে ? এইসব পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি।

তার পরেই তিনি বলেন, আমি রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার বক্তব্য আবার বলছি। এই প্রদেশের সরকারী কাজের জন্য এই প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে কোন ভাষা ব্যবহার করতে পারে। যথাসময়ে এই প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছানুসারেই এই প্রশ্নের মিমাংসা হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসাবে একটি ভাষা থাকবে। এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু যা এই উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, যা পাকিস্তানের এক থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকলেই বোঝে এবং সর্বোপরি যার মধ্যে অন্য যে কোনো প্রাদেশিক ভাষার ইসলামী সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বাস্তবরূপ লাভ করেছে এবং যে ভাষা অন্যান্য ইসলামী দেশগুলিতে ব্যবহৃত ভাষার সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।

কিন্তু ছাত্ররা, কায়েদে আজমের উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে ঘোষণা মাত্র চিৎকার করে উঠল, না-না-না।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলেন কায়েদে আজম। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার তিনি বলতে সুরু করলেন, ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে উর্দুকে যে বিতাড়িত করা হয়েছে, এমনকি উর্দু বর্ণমালার সরকারী ব্যবহারও যে সেখানে বন্ধ করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ

তাৎপর্যহীন নয়। জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য যারা ভাষার বিতর্ককে ব্যবহার করেছে এসব ঘটনা তাদেরও অত্যন্ত ভালভাবে জানা আছে। আন্দোলনের কোন যুক্তিই এক্ষেত্রে ছিল না কিন্তু এটা স্বীকার করা তাদের মতলব হাসিলের পক্ষে সহায়ক হত না। এই বিতর্ককে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। বস্তুতঃ এ কাজের জন্য তারা খোলাখুলি ভাবেই অবাঙালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা উদ্রেকের যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। আপনাদের প্রধানমন্ত্রী করাচী থেকে ফিরে এসে ভাষা বিতর্কের উপর বিবৃতি মারফত এ প্রদেশের জনগণকে তাদের ইচ্ছানুসারে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে ব্যবহারের অধিকার দেওয়ার কথা বলার পর আন্দোলনের আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করলো। তারা এরপর বাংলাকে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানাল এবং একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হিসাবে উর্দুর স্বাভাবিক দাবী অনস্বীকার্য দেখে বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাকেই তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তুলল। এ সম্পর্কে কোন ভুল করা চলবে না। এই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশগুলি একত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আমার মতে একমাত্র উর্দুই হতে পারে সেই ভাষা।

ছাত্রদের প্রতিবাদে কায়েদে আজম তাঁর সুর পাল্টাতে বাধ্য হলেন। উর্দুর ঘোষণাকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মত বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু তা সত্বেও রাষ্ট্র-শত্রুদের উল্লেখ করে তিনি বললেন, রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা এবং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দুশমন কিছুসংখ্যক সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদ্‌রা যে কৌশল গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে সাবধান করার জন্যই আমি এ বিষয়ে এত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলাম। অপনাদের মধ্যে যারা জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন তাদের এ জাতীয় লোকজন

সম্পর্কে সাবধান থাকা প্রয়োজন। যাদেরকে এখনো কিছুদিন পড়াশুনা করতে হবে তাদের উচিত কোনো রাজনৈতিক পার্টি অথবা স্বার্থপর রাজনীতিকের দ্বারা নিজেদের ব্যবহৃত না হতে দেওয়া।

ছাত্রদের উদ্দেশে তাঁর সাবধান বাণী :—

প্রথমতঃ, আমাদের মধ্যে পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে সাবধান থাকুন।

দ্বিতীয়াতঃ, স্বার্থপর লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কারণ তারা নিজেরা সাঁতার কাটার জন্য আপনাদেরকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সত্যিকার নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ খাদেম, যারা সর্বতোভাবে জনগণকে সমর্থন করে এবং তাদের সেবা করতে ইচ্ছুক। তাদেরকে চিনতে শেখা দরকার।

চতুর্থতঃ, মুসলিম লীগ পার্টিকে শক্তিশালী করুন। কারণ, তা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থেকে এক মহৎ ও গৌরবময় পাকিস্তান গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

পঞ্চমতঃ, মুসলীম লীগ পাকিস্তান অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেই পবিত্র আমানতের হেফাজতকারী হিসাবে পাকিস্তানকে গড়ে তোলা মুসলিম লীগেরই কর্তব্য।

ষষ্ঠতঃ, আমাদের সংগ্রামের সময় যারা অনেকে নিজেদের কড়ে আঙ্গুলটি পর্যন্ত নাড়ে নি, এমনকি নানাভাবে আমাদের বিরুদ্ধতা করেছে এবং পদে পদে সবরকম বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করেছে এবং যাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের শত্রু শিবিরে আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারা এখন এগিয়ে এসে নানা আকর্ষণীয় শ্লোগান ও বুলি আওড়াতে পারে এবং আপনাদের সামনে নানাপ্রকার আদর্শ ও কর্মসূচী হাজির করতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এখনো নিজেদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হবে এবং মনের মধ্যে কেনো সত্যিকার পরিবর্তন এসেছে কিনা সেটা প্রমাণ করার জন্য ব্যাঙের মত নতুন নতুন পার্টি গঠন না করে মুসলিম লীগকে সমর্থন এবং তাতে যোগদান করতে হবে।

২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জিন্না। সাক্ষাতে ফলাফল, তিক্ততা। নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে চুক্তির আট দফাকে অস্বীকার করলেন তিনি। প্রথমে তর্ক, তারপর কলহে পরিণত হল আলোচনা। উভয়পক্ষের আলোচনায় সম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িক যুক্তিকে কর্ম পরিষদের প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক যুক্তি দিয়েই খণ্ডন করতে চাইলেন। স্মারকলিপি দিলেন কায়েদে আজমের হাতে। বিদায় নিলেন তিনি একসময়।

ছাত্রপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন কায়েদে আজম। প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে শুধুমাত্র কুশল প্রশ্ন বিনিময় করেই সাক্ষাৎকার শেষ করেন। কারণ, ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দুজন হিন্দু ছাত্রও তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিল। কিন্তু ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাতে যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করতে চান, তা হিন্দু ছাত্রদের সামনে আলোচনা করতে চাননি। তিনি শুধুমাত্র মুসলমান ছাত্রদের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, হিন্দু ছাত্রদের সঙ্গে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নির্বাচনে নির্বাচিত হিন্দুছাত্র প্রতিনিধিদের বাদ দিয়েই পরে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। আলোচনায় কায়েদে আজমের আবেদন, তিনি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিভেদের পরিবর্তে একতা চান। তিনি বলেন যে, আল্লাহ যদি পাকিস্তানকে রক্ষা না করতেন, তাহলে পাকিস্তানের জন্ম দিবসেই তার সমগ্র কাঠামো ভেঙ্গে পড়ত। পাকিস্তান একটি শিশুরাষ্ট্র কাজেই তাকে রক্ষা করতে হলে আভ্যন্তরীণ ঐক্য সব থেকে বড় প্রয়োজন। রাষ্ট্রগঠন করার জন্য ছাত্রদেরকে সব রকম আন্দোলন ও সংগঠনের সামনে থাকতে হবে এবং সে কাজ তাদেরকে করতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে।

এই সাক্ষাৎকার ২৩শে মার্চ। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে কায়েদে আজমের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের

প্রতিবাদ। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ। ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্রকে তিনি সুবিধাবাদী করে তুলতে সক্ষম হলেও সকলকে তাঁর অন্যায়ের সমর্থক করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বারুদের স্তুপের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। যতই চেষ্টা করুন না-কেন, নায্য দাবী থেকে ছাত্রদের টলানো কায়েদে আজম হলেও তাঁর পক্ষে স্রম্ভব নয়। বাংলার ছেলেরা অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবে না।

নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। রাগে-দুঃখে-হতাশায়-অপমানে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও উর্দুর ঘোষণাকে তিনি আর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার সাহস করেন নি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর ভুল হয়েছে। হিসাবের গণ্ডোগোলে ছাত্রদের তিনি চিনে উঠতে পারেননি। ধর্মের ভেদ সব জায়গায় চলে না।

২৫শে মার্চ চট্টগ্রাম চলে গেলেন তিনি। ফিরে এলেন ২৭শে মার্চ। আবার ডেকে পাঠালেন ছাত্র প্রতিনিধিদের। কিন্তু একদলের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন, আর একদলের সঙ্গে অস্বীকার করলেন সাক্ষাৎ করতে। শুধু তাঁর মিলিটারী সেক্রেটারী জানিয়ে দিলেন, 'আপনারা ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার জন্যে কায়েদে আজম দুঃখ প্রকাশ করেছেন'।

অবশেষে বিদায়।

বিদায় নেবার পূর্বে ২৮শে মার্চ বেতার মারফৎ পাকিস্তানের জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,

একশ্রেণীর লোকের মধ্যে নব অর্জিত স্বাধীনতাকে যথেচ্ছাচারের অধিকার হিসাবে দেখার একটা দুঃখজনক প্রবণতা আমি লক্ষ করছি। একথা সত্য যে, বিদেশী রাজত্বের অবশানের পর জনগণই এখন তাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রাতা। শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে-কোন সরকার বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। তার অর্থ আবার এই নয় যে, সাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের উপর এখন যে-কোন একদল লোক

নিজের ইচ্ছাকে বে-আইনীভাবে চাপিয়ে দিতে পারবে। সরকার এবং তার নীতি প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। শুধু তাই নয়, সরকারের পক্ষে একমুহূর্তের জন্য ঐ জাতীয় উশৃঙ্খল ও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের দলবদ্ধ গুণ্ডামী এবং রাজত্ব সহ্য না করে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই অবস্থার মোকাবেলা করা উচিত। এক্ষেত্রে আমি বিশেষভাবে ভাষার বিতর্কের কথা ভাবছি, যেটা এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অযথা অনেক উত্তেজনা ও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই আবস্থাকে আয়ত্বে না আনলে এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। এপ্রদেশের সরকারী ভাষা কি হওয়া উচিত সেটা আপনাদের প্রতিনিধিরাই স্থির করবেন। কিন্তু এই ভাষার বিতর্ক আসলে প্রাদেশিকতার বৃহত্তর বিতর্কের একটি দিক। আমি এবিষয়ে নিশ্চিত যে, আপনারা একথা নিশ্চই উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তানের মত একটা নবগঠিত রাষ্ট্র, যার দুই অংশ পরস্পর থেকে অনেকখানি দূরে, যেখানে সকল অংশের সকল নাগরিকের মধ্যেকার একতা এবং সংহতি, তার প্রগতি, এমনকি অস্তিত্বের জন্যেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুসলিম জাতির ঐক্যের মূর্ত রূপই হলো পাকিস্তান এবং সেইভাবেই তা বজায় থাকবে। মুসলমান হিসাবে সেই ঐক্যকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমরা যদি প্রথমে নিজেদেরকে বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী ইত্যাদি মনে করে শুধু প্রসঙ্গক্রমে নিজেদেরকে পাকিস্তানী মনে করি তাহলে পাকিস্তান ধ্বংস হতে বাধ্য। মনে করবেন না, এটা একটা দুর্বোধ্য কথা ঃ এই সম্ভবনা সম্পর্কে আমাদের শত্রুরা খুবই সচেতন এবং আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই যে, তারা ইতিমধ্যেই একাজে ব্যস্ত রয়েছে। আমি আপনাদেরকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করবো, যে-সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থা ও প্রেসের মুখপত্র সর্বতোভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করেছিল তারাই যখন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি তাদের বিবেকের সমর্থন জানাতে আসে তখন সেটাকে

আপনাদের কাছে একটা অশুভ ব্যাপার বলে কি মনে হয় না ? একথা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বোঝা যায় না যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে রোধ করতে অক্ষম হয়ে এই সমস্ত সংস্থাগুলি বর্তমানে প্রতারণাপূর্ণ প্রচারণার মাধ্যমে মুসলমান ভাইয়েদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে ভেতর থেকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে ? আমি চাই যাতে আপনারা প্রাদেশিকতার এই হলাহল, যা আমাদের শত্রুরা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে চায়, তার সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

কায়েদে আজম ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে কটা কাজ তিনি বেশ সুষ্ঠভাবেই করে গেলেন।

এক : মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টোরী পার্টিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের মোটামুটি অবসান ঘটিয়ে নাজিমুদ্দীন সরকারের শক্তি বৃদ্ধি।

দুই : উর্দু ও ইংরাজীর সাথে বাংলাকেও জাতীয় পরিষদের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করার ফলে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনেব ফলে প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হন যে, তাঁরা প্রাদেশিক পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এই চুক্তির ফলে ভাষা আন্দোলনের সাফল্য অনেকখানি নিশ্চিত মনে হওয়ায় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ্ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। কায়েদে আজম এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার মাত্র চারদিন পরে ঢাকা সফরে এসে প্রাদেশিক সরকারও রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের মধ্যেকার চুক্তিকে সম্পুর্ণভাবে অস্বীকার করে স্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, উর্দু ব্যতীত অন্য কোন ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করার অধিকার পাকিস্তানের কোন নাগরিকের নেই।

শুধু তাই নয়, সে দাবী কেউ উত্থাপন করলে একথা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া চলে যে, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রশত্রু, ভারতের পোষা গুপ্তচর এবং সেই হিসাবে নাগরিক অধিকারের অযোগ্য।

কিন্তু এর ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা কি ছাত্র, কি জনসাধারণের মধ্যে অনেকখানি কমে এল। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ শুধু রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবেই নয়, পাকিস্তান আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হিসাবেও পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশের গণতান্ত্রিক দাবী-দাওয়াকে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করবেন এই অশাই করেছিল।

কিন্তু মানুষের সে আশা সফল হল না।

নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয় কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্নার পক্ষে। বাংলার দাবীকে অগ্রাহ্য করে তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে গেলেন।

৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলাকে সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করলেন,

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং

(খ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে যথাসম্ভব বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।

৮ই এপ্রিল, বিরোধী দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারী প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন;

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হইবে;

(খ) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

২। এই পরিষদ আরও মনে করে যে, বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ; এবং—

৩। এই পরিষদ্ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে—

(ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা-পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোষ্টকার্ড, ফর্ম, বই ইত্যাদি ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, রেলওয়ে এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারী ও আধা-সরকারী ফর্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক ;

(খ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সকল প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা প্রবর্তন করিতে এবং

৪। এই পরিষদ সংবিধান সভার সকল সদস্যকে অনুরোধ জানাইতেছে এবং পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের নিকট বিশেষভাবে আবেদন করিতেছে যাহাতে তাঁহারা বাংলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে খুব বেশি দেরি হয় না। কেউ কেউ বলেন ওটি সংশোধনী প্রস্তাব নয়, নতুন প্রস্তাব। আবার কেউ বলেন, তিনি পরিষদের সময় নষ্ট করেছেন স্পিকার তাঁর প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন।

প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবটি নাকচ হতে দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন তিনি।

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাংলা প্রদেশের সরকারী ভাষা রূপে গৃহীত হইবে ;

(খ) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলা প্রবর্তনের জন্য আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাংলা।

২। এই পরিষদ্ পাকিস্তান সরকারের নিকট সুপারিশ করে যে—

(ক) সর্বপ্রকার নোট ও টাকা-পয়সা, টেলিগ্রাফ, পোষ্টকার্ড, ফর্ম, বই ইত্যাদি, ডাক সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস, রেলওয়ে টিকিট এবং পাকিস্তান সরকারের অন্য সর্বপ্রকার সরকারী ও আধা-সরকারী ফর্মে অবিলম্বে বাংলা প্রচলন করা হউক,

(ঘ) কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সকলপ্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যম এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা প্রবর্তন করা হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও খাজা নাজিমুদ্দীন প্রাদেশিক সরকারের এলাকার বাহিরে বলে বিবেচনার অযোগ্য বলে বর্ণনা করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তৃতীয় এবং শেষ সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন,

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে—

(ক) বাংলা পূর্ব বাংলা প্রদেশের ভাষারূপে গৃহীত হইবে।

(খ) দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাঙলা প্রবর্তনের আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার মাধ্যম হইবে বাঙলা।

ব্যবস্থাপক সভায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পর। একে একে বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী, আবদুলবারী চৌধুরী, প্রভাসচন্দ্র

লাহিড়ী, বসন্তকুমার দাস, যতীন্দ্রনাথ ভদ্র, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আহমদ আলী মৃধা, মনোরঞ্জন ধর, মুদাব্বের হোসেন চৌধুরী, শামসুদ্দীন আহমদ প্রভৃতি সংশোধনী প্রস্তাবের উপর অনেক বক্তৃতা দেন।

এরপর, স্বাস্থ্য মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার বাংলাভাষা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুদীর্ঘ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান তিনি কিন্তু ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবটিকে সযত্নে এড়িয়ে যান। কারণ, মন্ত্রীত্বের প্রতি দুর্বলতা। কিন্তু প্রদেশিক মন্ত্রীদের মধ্যে যে দু-তিনজন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা চিন্তা করতেন, তার মধ্যে তিনি একজন।

সংশোধনী প্রস্তাবের জবাব দিতে উঠে খাজা নাজিমুদ্দীন অদ্ভুত কৌশলে একের পর এক বিরোধীদলীয় সদস্যদের স্বপক্ষে নিয়ে এসে বিরোধীতা বন্ধ করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল,

(ক) পূর্ব বাংলা প্রদেশে ইংরাজীর স্থলে বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইবে; এবং যত শীঘ্র বাস্তব অসুবিধাগুলি দূর করা যায় তত শীঘ্র তাহা কার্যকর করা হইবে।

(খ) পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে 'যথাসম্ভব' বাংলা অথবা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশ স্কলারদের মাতৃভাষা।

পূর্ব বাংলায় নেমে এলো অশান্তির দিন। মার্চ মাসের ভাষা আন্দোলনের পর ছাত্রদের কর্মতৎপরতা কিছুদিনের জন্যে কমে এলেও পূর্ব বাংলার সামগ্রিক পরিস্থিতি নানাপ্রকার আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মতো ব্যাপক কোন ছাত্র বিক্ষোভ না ঘটলেও

ছাত্ররা নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে দিনের পর দিন।

ছাত্র আন্দোলন ছাড়াও এসময়ে সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট। ব্যাপক খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি নানা অসুবিধার তাড়নায় জনসাধারণ ও সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারী থেকে শুরু করে পুলিশ কনেষ্টবল পর্যন্ত সকলকেই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

কয়েকটি ঘটনা :

৮ই (১৯৪৮) এপ্রিল বিভিন্ন দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ঢাকাতে ধর্মঘট শুরু করেন। ধর্মঘট আঠারো দিন স্থায়ী হওয়ার পর প্রত্যাহার করে ২৬শে এপ্রিল কাজে যোগ দেন।

ঢাকার মেডিকেল ছাত্ররা কতকগুলি দাবী-দাওয়া কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কতৃপক্ষ সেগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করায় ছত্রিশজন ছাত্র ১৮ই এপ্রিল থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কতৃপক্ষ তাঁদের দাবী মেনে নেওয়ার পর ২৭শে এপ্রিল তারা ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

নতুন বিক্রয় কর ধার্যের বিরুদ্ধে ঢাকাতে ২৬শে এপ্রিল পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ৩০শে এপ্রিল সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ অফিসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অল্পকাল পূর্বে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর শহীদ সুহরাওয়ার্দী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং বাংলা থেকে সংখ্যালঘুদের প্রস্থান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা উপস্থিত হলে তাঁকে জননিরাপত্তা আইনের ১০ ধারা বলে ৩রা জুন অন্তরীণ করা হয়।

৩০শে জুন ঢাকা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নানা অব্যবস্থা এবং শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি স্মরকলিপিতে বলা হয় যে, উত্তরোত্তরভাবে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সব দিক দিয়ে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। স্মরক-লিপিতে অব্যবস্থার কারণসমূহ উল্লেখ করার পর প্রতিকার কল্পে যে-সব দাবী উত্থাপন করা হয় ঃ

১। বেতনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে, প্রারম্ভিক বেতন বর্তমানের ১৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫০ টাকা করিতে হইবে।

২। অধ্যাপকগণের প্রতি বাধ্যতামূলক অবসর লাভের বয়স বৃদ্ধি করিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ষাট বৎসর করিতে হইবে।

৩। নিয়োগ ও পদোন্নতির সময় পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা চলিবে না।

৪। অবিলম্বে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগ করিয়া বর্তমানের শূন্যপদ পূরণ করিতে হইবে।

৫। অধ্যাপকবৃন্দের অভাব-অভিযোগ অবিলম্বে পূরণ করিতে হইবে।

৬। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রাখিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

দেড়মাস বেতন না পাওয়ার ফলে বহু পুলিশ কনেষ্টবল ১৪ই জুলাই ধর্মঘট এবং সারা ঢাকা সহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সন্ধ্যার দিকে অবস্থা আয়ত্বে আনার জন্যে সরকার সামরিক বাহিনী তলব করে। পুলিশ ও সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি বিনিময়ের ফলে দু-জন পুলিশ নিহত ; নয় জন আহত হয়।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের কন্যা এলিজাবেথের পুত্রসন্তান প্রসব উপলক্ষে অন্যান্য সরকারী ভবনের সঙ্গে রাজশাহী কলেজেও পাকিস্তান পতাকার

সঙ্গে বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক উড়লে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তা নামিয়ে এনে নষ্ট করে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী পল্টন ময়দানে ২০শে নভেম্বর এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেন :

আপনারা কখনই মনে এ ধারণার স্থান দেবেন না যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ও সেখানকার জনসাধারণ আপনাদের প্রগতি সমৃদ্ধি ও হেফাজত সম্পর্কে উদাসীন। তাঁরা আপনাদের পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের খেদমতের জন্য সদা-সর্বদাই মনে-প্রাণে হাজির আছেন।

তার পরই তিনি বাঙালীদের প্রাদেশিকতার নিন্দা করে বলেন :

আজকাল নানা প্রকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পূর্বপাকিস্তানের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে উগ্র প্রাদেশিকতার মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রকৃত মুসলমান কখনো তার চিন্তাধারাকে প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখতে পারে না। ইসলামে ভেদাভেদের কোন স্থান নেই। আমরা পাঞ্জাবী, বিহারী, সিন্ধী কিংবা পেশোয়ারী যাই হই না-কেন আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা পাকিস্তানী।

এরপর, ১৫ই নভেম্বর ইডেন ও কমরুন্নেসা গার্লস স্কুল একত্রীভূত করার প্রতিবাদে প্রায় পাঁচশত ছাত্রী ধর্মঘট করার পর বেলা দুটোর সময় প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারপর তারা প্রধান মন্ত্রী নূরুল আমীনের বাসভবনের সামনে উপস্থিত হয়।

নূরুল আমীন চারজন ছাত্রী প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিকে পৃথক করার নতুন আদেশ তিনি দিতে পারেন না। তবে, বরখাস্ত শিক্ষয়ত্রীদের মধ্যে যাঁদের

উপযুক্ত যোগ্যতা আছে তাঁদের নতুন স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা হবে।

কিন্তু ছাত্রীরা তাদের দাবীতে অবিচল। শান্তিপূর্ণভাবেই তারা ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে। ছাত্রীদের ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে আসে ছাত্ররা।

কমরুন্নেসা ও ইডেন স্কুলের ছাত্রী ধর্মঘট চলাকালে ১৮ই নভেম্বর ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্ররাও তাদের নিজস্ব দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করার প্রস্তুতি নেয়। কলেজের ৫৭৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৫০০ জন ছাত্র ২৪শে নভেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ধর্মঘট শুরু করে।

ছাত্রদেব দাবী :—

১। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ বস্তি এলাকা হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের গৃহে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

২। কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নতি করিতে হইবে।

৩। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাণিজ্য বিভাগকে স্থায়ী করিতে হইবে।

৪। কলেজের ছাত্রাবাসের অসুস্থ ছাত্রগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনে ২৭শে নভেম্বর সাধারারণ ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং সারা সহরের ছাত্র-ছাত্রীরা বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে নিজেদের দাবী সম্পর্কে আলোচনা ও সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

যাইহোক, ছাত্রদের কতকগুলি দাবী-দাওয়া সরকার স্বীকার করে নেওয়ায় ৩০শে নভেম্বর দুপুব থেকে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়। সাতজন ছাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টা উপবাসের পর অনশন ভঙ্গ করে।

ছাত্র ধর্মঘটের অবসানের পরও কমরুন্নেসার ছাত্রীরা তাদের

ধর্মঘট ভঙ্গ করে না। তখন শিক্ষামন্ত্রী আবদুল হামিদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক বিবৃতিতে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তারে সরকার যে সব সময়ই প্রস্তুত সে কথা জানান। কর্তৃপক্ষও ছাত্রীদের দাবী আংশিক-ভাবে স্বীকার করে নেওয়ার পর ৬ই ডিসেম্বর ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদ ইডেন-কমরুন্নেসার প্রায় তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী ধর্মঘটের অবসান ঘোষণা করে।

এরপর, প্রাদেশিক স্বাস্থ্য মন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাবহারের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম একটি সাহিত্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় সভাপতি—হবিবুল্লাহ বাহার, অধ্যাপক অজিত গুহ ও সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদক মনোনীত হন।

৫ই ডিসেম্বর অভ্যর্থনা সমিতির সভায় স্থির হয় যে, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮ ও ১ লা জানুয়ারী ১৯৪৯ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলনের বিভিন্ন শাখা এবং শাখা সভাপতি সম্পর্কে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

অভ্যর্থনা—হাবিবুল্লাহ বাহার
মূল—ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ
কাব্য—জসিমুদ্দীন
শিশু সাহিত্য—বেগম শামসুন্নাহার
ভাষা বিজ্ঞান—আবুল হাসনাৎ
ইতিহাস—অধ্যক্ষ শরফুদ্দীন
পুঁথি সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী
বিজ্ঞান—ডক্টর এস, আর, খাস্তগীর
চিকিৎসা বিজ্ঞান—ডঃ আবদুল ওয়াহেদ
শিক্ষা—অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ

৭ই ডিসেম্বর অভ্যর্থনা সমিতির বৈঠকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন

১লা জানুয়ারী একটি তাহজীব অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির আয়োজনের জন্য কমিটি গঠিত হয়—হাবিবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আলী আহসান, নাজির আহমদ, শামসুল হুদা, আবদুল আহাদ, আমিরুজ্জামান, আব্বাস উদ্দীন আহমদ, বেদারুদ্দীন আহমদ, মমতাজ আলী খান, লায়লা আরজুমন্দ বানু, মোহম্মদ কাসেম, খায়রুল আহমদ, আবদুল কাইউম, ফতেহ লোহানী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মুজীবর রহমান খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, আমানুজ্জামান খাঁ, মোহম্মদ সোলায়মান এবং খায়রুল কবীরকে নিয়ে।

সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তুতি চলাকালে ঢাকা প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের একটি বৈঠকে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য বিরোধী এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও গণসাহিত্যের পরিপন্থী। অতএব লেখক সঙ্ঘের কোন সদস্য আসন্ন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে কোনপ্রকার সহযোগিতা করবে না।

এই ঘোষণায় লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক অজিত গুহ জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ গুহ নামে ভবানী সেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যিক বলে চিহ্নিত করেন। সেই হিসাবে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের রবীন্দ্র সাহিত্য বর্জন করা একটা বৈপ্লবিক দায়িত্ব এই মর্মেও অভিমত প্রকাশ করেন। এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাঙ্গলার সাহিত্যিক মহলেও দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুশোভন সরকার, গোপাল হালদার প্রভৃতি ভবানী সেনের রবীন্দ্রনাথ বর্জনের বিরোধিতা করে লেখালেখি করেন।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে বিতর্কের ঢেউ পূর্ব বাংলায়, বিশেষতঃ ঢাকাতে এসেও পৌঁছায়। লেখক সঙ্ঘ রবীন্দ্র বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। অজিত গুহের সঙ্গে বাধে বিরোধ। কারণ, রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিবিরোধী সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকার করতে অথবা তাঁকে বর্জন করতে তিনি সম্মত ছিলেন না।

সরকারী উদ্যোগে হলেও প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের অজিত গুহ পূর্ব বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে ডঃ শহীদুল্লাহ একসময় বলেন—

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কেবল আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষাতে বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপী-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।

এরই ফলে সৃষ্টি হয় বিতর্কের। ডঃ শহীদুল্লাহর ভাষণ শেষ হওয়া মাত্র পূর্ব বাঙলা সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী ফজলে আহমদ করিম ফজলী বক্তৃতা দিতে উঠে সভাপতির সমালোচনা করে আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেন। তিনি সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। শ্রোতারা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বাধ্য হয়ে বললে ভুল বলা হয়, একরকম জোর করে তাঁকে সভামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। ক্রুদ্ধ ফজলী সভা ত্যাগ করে চলে যান।

ডঃ শহীদুল্লাহর ভাষণকে কেন্দ্র করে পত্র-পত্রিকাতে সমালোচনা শুরু হয়। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

সভাপতি তাঁর ভাষণের একস্থানে বলিয়াছেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য—আমরা বাঙলী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে

দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নাই।"

অখণ্ড ভারতের যুক্ত বাঙলায় সাহিত্যিক অভিভাষণে এমন কথা অনেকেই বলিয়াছেন বটে; কিন্তু বিভক্ত ভারতের দ্বিখণ্ডিত বাংলায় পাকিস্তানী পরিবেশে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে হইবে, একথা ভাবা একটু কঠিন ছিল বৈকি। তাছাড়া কোন হিন্দু লেখক নয়, একেবারে স্বয়ং ডক্টর শহীদুল্লাহ "মা প্রকৃতির" এমন স্তব গাহিবেন, একথাই বা কে ভাবিতে পারিয়াছিল।

রাবেয়া, অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ-শংসয় কাটিয়ে আমরা একদিন বাঙালী হয়ে উঠলাম। আমরা পূর্ব বাংলার সমস্ত মানুষ, অথবা সমস্ত ছাত্ররা নয়। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, অমার অনুমান বাস্তব সত্যও বলতে পারো, আজও পূর্ব বাংলার আজকের—বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ বাঙালী হয়ে উঠতে পারেনি। তা যদি পারতো তাহলে কি সাধ্য ছিল পশ্চিমী কুত্তারা আমাদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করে, আমাদের সংসার নষ্ট করে, আমাদের মা-বোনের ইজ্জত নেয়, আমাদের সাড়ে-সাত কোটি মানুষকে ওরা শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে ওদের অধীন করে রাখে!

কেন পেরেছিল জানো, আমরা মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে উঠতে পারিনি বলেই।

আজও কি পেরেছি? আজ স্বাধীন বাংলায় সকলেই কি বাঙালী?

আমার মনে হয়, তা নয়। সুবিধাবাদীর দল বাঙালী সেজেছে। হয়তো একদিন......সেদিনের সুযোগ কোন দিন আসবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমরা রক্ত দিয়েছি। যদি প্রয়োজন হয় আরো দেব।

রাবেয়া, একদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। আমাদের চার বছরের জীবনের অসংখ্য টুকরো টুকরো স্মৃতি মাঝে মাঝে আমার মনে পড়েছে। চার বছরের জীবন বলি আমি এই কারণে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমি যেন উপলব্ধি করেছিলাম আমার নতুন জীবন। আমি লোভীর মত স্বপ্ন দেখেছিলাম। তুমি চলে যেতে আমার মনে হয়েছিল, একটা জীবন যেন শেষ হয়ে গেল। কিন্তু রেখে গেল—স্মৃতি। আমার আগামী দিনের পাথেয়। হয়তো সেই জন্যই আমি শেষ হলাম না।

জীবনকে আমি জেনেছি একথা বলার মত দুঃসাহ আমার নেই। জীবনকে আমি জানতে চেয়েছি এটুকু মিথ্যা নয়। আমি জীবনকে অস্বীকার করতে চাইছি। সত্যমূল্যে জীবনকে আমি দেখেছি—জানার চেষ্টা করেছি।

তুমি চলে যাওয়ার পর, জীবনটা অনেকখানি ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর সময়ের মূল্য আমি অনুভব করতে শিখেছিলাম।

এক বন্ধু আমাকে একদিন প্রশ্ন করেছিল, 'কবীর তুইকি রাবেয়াকে ভালবাসিস ?'

উত্তরে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

সে জানতে চেয়েছিল, 'তোরা কি সাদি করবি ?'

বলেছিলাম, 'ভালবাসি এইটুকুই শুধু জানি। সাদির কথা তো কোনদিন ভাবিনি।'

অবাক হয়েছিল বন্ধু। কিছুক্ষণ নিরুত্তরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলেছিল, 'তোর কথা আমি বুঝতে পারছি না কবীর।'

বলেছিলাম, 'ভাল যে বাসি এটাই সত্যি। কিন্তু ভালবাসলেই যে সাদি করতে হবে, এটা আমার জানা ছিল না।'

সে বলেছিল, 'রাবেয়া কিছু বলেনা ?'

বলেছিলাম, 'অনেক কথাই-তো বলে। ওদের বাড়িতে গিয়ে কতদিন-তো গল্প করি।'

বন্ধু বলেছিল, 'আমি সে গল্পের কথা বলছি না।'

'তবে ?' জানতে চেয়েছিলাম আমি।

'তোদের নিজেদের কথা কিছু হয় না ?' জিজ্ঞাসা করেছিল বন্ধু। বলেছিল, 'তোরা নিজেরা কি করবি সে কথা কিছু বলিস না দুজনে মিলে ?'

হেসে বলেছিলাম, 'আমরা যা বলি সবই-তো নিজেদের কথা। আমরা নিজেরা সকলের কথাই আলোচনা করি।'

হতাশ বন্ধু কপালে করাঘাত করে বলেছিল, 'নাঃ, তোর দ্বারা কিছু হবে না।'

বন্ধুকে সমর্থন করে বলেছিলাম, 'তুই ঠিকই বলছিস, রাবেয়াও সেই কথা বলে। আমি নাকি নিজের জন্যে কিছুই করতে পারব না কোনদিন।'

বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন ?'

বলেছিলাম, 'রাবেয়া বলে আমার বিষয়বুদ্ধি নাকি বেশ কিছুটা কম।'

জানিনা বন্ধু কি বুঝেছিল। কিন্তু সে আর আমাকে কিছু বলেনি। আমিও তোমার বিষয়ে তার সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করতে চাইনি।

তুমি চলে যাওয়ার পর আমি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি সে হিসাব কোন দিন মেলাতে বলিনি। শুধু মাঝে মাঝে নিজেকে বড় একা মনে হোত। চারিদিকে স্বার্থের নগ্ন রূপটা দেখে হাঁফিয়ে উঠতাম। তোমরে কথা মনে পড়তো। তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করতো আর কিছু নয়, তোমার স্পর্শে আমি নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতাম, আমার অনেক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারতাম আমি।

তুমি চলে যাওয়ার পর তোমার কথা আমার মনে পড়তো। অনেক টুকরো স্মৃতি। একদিনের কথা প্রায়ই আমার মনে পড়তো। মনে পড়তো সে দিনটাকে।

আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। অগ্রহায়ণের শেষ। সন্ধ্যার অন্ধকারটা তখন সবে মাত্র ঘনিয়ে আসছে। আমার বাসায় হঠাৎ তুমি এসে হাজির হলে। অবাক হয়ে ছিলাম। কারণ, এভাবে তুমি কখনো আসনা। অফিসে ফোন কর। নতুন চাকুরী পাওয়া ছেলেটার ঘন ঘন প্রায় প্রতিদিনই টেলিফোন আসায় অফিসের অনেকেই কৌতূহলি হয়।

আমার পাশের সহকর্মী প্রায় প্রৌঢ় মানুষটা, আমি ফোন করে ফিরে আসার পর জিজ্ঞাসা করেন, বাড়ি থেকে ফোন করছিল বুঝি ?

মিথ্যা বলতে পারি না। বলি—না বাড়ি থেকে নয়।

তাহলে ? জানতে চান তিনি।

একটা কলেজ থেকে।

কে ফোন করছিল, বোন ?

মিথ্যা বলতে গিয়েও পারি না। বলি—না, বোন নয়।

'ওঃ' বলে চুপ করে যান তিনি। কিন্তু টেলিফোন করে ফিরে এলেই প্রতিবারই একটা-না-একটা প্রশ্ন করেন। কৌতূহলি মানুষটা সব কিছু জানতে চান। কিন্তু সব জানানো কি সম্ভব ?

সেদিন সন্ধ্যায় তুমি এলে। এসে দেখলে আমি শুয়ে আছি। আমার পাশে বসলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি শরীর খারাপ নাকি ?

বলেছিলাম—না, এই অফিস থেকে ফিরছি।

বললে, তাহলে ওঠো। এখুনি বেরুতে হবে।

বললাম, এখুনি ?

হ্যাঁ। এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়।

কোথায় জানতে চাইনি। জানতাম জানতে চাইলেও উত্তর পাব না। বেরুতে হোল তোমার সঙ্গে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে

হাজির করলে এক অপরিচিত পরিবেশের মাঝে। সেখানে আমি বেমানান। সেই বে-মানান আমাকেই সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। একুশের একজনকে।

আমার লজ্জা করেছিল, কিন্তু সেদিকে তুমি ভ্রুক্ষেপ করোনি। তোমরা তোমাদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান শুরু করেছিলে এক সময়। সেখানে উপস্থিত আঠারো-বিশজন মেয়ের মধ্যে একমাত্র পুরুষ আমি (অবশ্য গৃহস্বামী ছিলেন)। সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপারটা যা লক্ষ্য করেছিলাম, তোমাদের গৃহস্বামীনির কন্যার জন্মদিনের অনুষ্ঠানের একমাত্র শ্রোতা আমি (গৃহস্বামী একটু পরেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন আর গৃহস্বামীনি তোমাদের জ্বালাতেই শেষ পর্যন্ত একখানি রবীন্দ্র সংগীত গাইতে বাধ্য হয়েছিলেন)।

তোমরা জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে অমন সুন্দর আর মনোরম করে তুলবে, এ আমি কখনো ভাবতে পারিনি। আমি ভাবতে পারিনি অমন বে-হিসাবীর মতো তুমি তোমার বান্ধবীর জন্মদিনে আমাকে নিয়ে যেতে পারো। অনধিকার প্রবেশের মত আমি যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বন্ধবীর জন্মদিনের আসরে ঢুকে পড়েছিলাম। যদিও আমাকে আপন জনের মতো সকলেই গ্রহণ করেছিলেন। গৃহকর্তা এগিয়ে এসে হাত ধরে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। গৃহকর্ত্রী প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তোমার বান্ধবী দেরিতে পৌঁছানোর জন্য অনুযোগ করেছিলেন। বিস্মিত বিমূঢ় আমি। অস্বস্তি বোধ করেছিলাম।

এক সময় তুমি আমার কাছে এসে কানে কানে বলেছিলে, আমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। তবু আমি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

রবীন্দ্র সংগীতের আসর বসেছিল। তারই মধ্যে একটি মেয়ে গেয়েছিল—

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।

ছেলে-হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী।
আমি কি ভুলিতে পারি॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা, জাগো কাল বোশেখীরা
শিশু-হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী॥

সেদিনো এমনি নীল গগনের বদনে শীতের শেষ
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে,
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকানন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো এক বুনো॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলী ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাঙলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে, বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বাল্‌বো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী, একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

মেয়েটি গান গাইছিল যখন, তখন যেন সকলে নীরব পাষাণে পরিণত হয়েছিল। আমি সকলের মুখ ভাল করে লক্ষ্য করেছি। সকলে যেন এক অজানা আতঙ্কের রাজত্বে গিয়ে প্রবেশ করেছিল।

গান থামতেই তন্দ্রামগ্ন গৃহস্বামী হঠাৎ নড়ে-চড়ে বসেছিলেন। মেয়েটিকে উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন—, জহর আর একখানা। আপত্তি করেনি মেয়েটি। একটু নতমুখে চিন্তা করে হারমনিয়ামে স্বর তুলেছিল, গান ধরেছিল,

ওরা আমার মুখের কথা
কাইরা নিতে চায়।
ওরা, কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায় ॥

কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্যকথা শোভা পায় ॥

সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান।

ঐ জানের বদলে রাখুম রে
বাপ দাদার জবানের মান।'

যে শুনাইছে আমার দেশের
গাঁও গেরামের গান
নানান রঙের নানান রসে
ভইরাছে তায় প্রাণ।

চপ কীর্তন ভাসান জারী
গাজীর গীত আর কবি সারী
আমার এই, বাংলাদেশের বয়াতিরা
নাইচা নাইচা কেমন গায়।

তারই তালে তালে হে
ঢোল করতাল বাজে ঐ
বাঁশী কাসি খঞ্জরী সানাই।
কও দেখি নাই এমন শোভা
কোথায় গেলে দেখতে পাই॥

পুবাল বায়ে বাদাম দিয়া
লাগলে ভাটির টান
গায়রে আমার দেশের মাঝি
ভাটিয়ালি গান।
তার ভাটিয়াল গানের সুরে
মনের দুস্কু যায় রে দূরে
বাজায় বাঁশী সেই না সুরে
রাখাল বনের ছায়॥

ওরা যদি না দেয় মান
আমার দেশের যতেক গান
আছে, তার সাথে মোর নাড়ীর যোগাযোগ
আপদে -বিপদে দুঃখে-কষ্টে
এগান আমায় ভুলায় শোক ।
টুং ; টাং টাং ; দোতারা আর
মন্দিরা বাজাইয়া
গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা করে
প্রেমের সারী গাইয়া !!

একতারা বাজায় বাউল
ঘুচায় মনের সকল আউশ
তারা মারফতি মুর্শিদী তত্ত্বে
পথের দিশা দিয়া যায় ।

ওরে আমার সোনার বাংলারে
তোর এই সোনার ভাণ্ডারে
আরো কত আছে যে রতন
মূল্য তাহার হয় না দিলেও
মণি-মুক্তা আর কাঞ্চন ॥

আর এক কথা মনে কইরা
আখি ঝইরা যায়
ঘুম পারাই না গাইতো যে গান
মোর দুখিনী মায় ।
ও মায়, সোনা মাণিক যাদু বলে
চুমা দিয়া লইতো কোলে

আরো আদর কইরা কইতো মোরে
আয় চান আমার বুকে আয়
আমার মায়ের মতন গান,
আমার মায়ের মত প্রাণ,
এই, বাংলা বিনে কারোর দেশে নাই
সেই, মায়ের মুখের মধুর বুলি
কেমন কইরা ভুলুমরে ভাই।
মরা গাঙে যাদের গানে
আইজো ডাকে বান
কেমন কইরা ভুলুমরে ভাই
তারার এমন দান।।

মুকুন্দ দাশ পাগল কানাই
হাসান মদন আর লালন খাই
ওরা, এদের মুখেও মারে লাথি
এই দুঃখ কি সওয়া যায়।
এই গুণীদের রাখতে মান
জীবন কেবা দিবা দান,
তোরা, দলে দলে আয়রে সবে ভাই
নইলে কিন্তু জন্মের মত
মুখে তোদের পরবে ছাই।।

ভুলিস নারে ওদের কথায়
ভাইরে করি মানা,
থাকতে জবান হইস না বোবা
চোখ থাকিতে কানা।

তোর, পিঠ চাপড়াইয়া কইয়া দাদা
তোরে, চায় করিতে ধোপার গাধা,
ওরা, এই বাসনায় সভায় সভায়
মিঠা বুলি কইয়া যায় ॥

তুইশ বছর ঘুমাইলি
আর কেনরে বাংগালি'
জাগরে এবার সময় যে আর নাই
অইজো কি তুই বুঝবি নারে
বাংলা বিনে গতি নাই ॥

উৎসবের রেশটুকু মন থেকে মুছে যায়নি। আমরা পথ হাঁটছিলাম। তুমি আমি। দীর্ঘপথ। তবু তুমিই প্রথম বলেছিলে পথ চলার কথা। রাজি হয়েছিলাম আমি।

রাবেয়া, সে রাত্রিটাকে তোমার মনে আছে? আমি ভুলতে পারিনি। অতীতের অনেক উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে একটি।

আমরা পথ হাঁটছিলাম। তুমি আমি। কর্মক্লান্ত সহর। রাত্রির প্রহরে বিশ্রামের আয়োজন। তুমি আমার পাশে পাশে হাঁটছিলে। গুণ গুণ করছিল কণ্ঠ। কোন সুদূরে হারিয়ে গিয়েছিলেন যেন।

আমি নীরবে তোমার পাশে পাশে হেঁটেছিলাম।

হঠাৎ তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলে। প্রশ্ন করেছিলে, 'চুপ করে কেন?'

বলেছিলাম, 'নীরবতা অনেক সময় মূল্যবান সম্পদের মতো।'

দাঁড়িয়ে পড়েছিলে তুমি। জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'কি ভাবছো?'

বলেছিলাম, 'চিন্তার কি শেষ আছে।'

কথা না বলে এগিয়েছিলে। চলতে চলতে অস্পষ্ট বলেছিলে, 'আমাকে বলবে না?'

বলেছিলাম, 'সকলকে-তো সব কথা বলা যায় না।'

তুমি কি মনে করেছিলে জানি না। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলে। হয়তো সেদিন আমার কথায় আঘত পেয়েছিলে তুমি। কিন্তু তোমাকে আঘাত দেবার জন্যে কথাটা বলিনি। কেন-যে বলেছিলাম সে-কথা পরে অনেকবার চিন্তা করেছি, কিন্তু উত্তর পাই নি।

তুমি বলেছিলে, 'কেমন লাগল তোমার?'

উত্তর দিয়েছিলাম, 'ভালই।'

'তুমি হয়তো রাগ করেছ', বলেছিলে তুমি। 'অপরাধটা আমার, নিমন্ত্রণের কথা তোমাকে আগে জানাই নি। কারণ, ভয় ছিল তুমি হয়তো যেতে রাজী হবেনা। ওরা সকলেই তোমাকে দেখতে চেয়েছিল।'

কেন? সেকথা জিজ্ঞাসা করিনি। কারণ, আমি জানতাম রাবেয়ার বন্ধুরা কেন আমাকে দেখতে চায়।

আমরা নীরবে পথ হেঁটেছিলাম।

এক সময় তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমাকে?'

বলেছিলাম, 'অজস্র কথাই-তো জিজ্ঞাসা করছ?'

হাসনি। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলে, 'আজ একটা কথাই শুধু তোমাকে জিজ্ঞাসা করব।'

বলেছিলাম, 'বল, যদি উত্তর আমার জানা থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।'

তুমি প্রশ্ন করেছিলে, 'তুমি কি বাঙালী?'

তোমার প্রশ্নটা শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম আমি। হাসতে গিয়েও পারিনি। আমার প্রথমটায় মনে হয়েছিল, তুমি বুঝি ঠাট্টা করছ আমার সঙ্গে। আলো-ছায়ায় তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তোমার মুখ গম্ভীর। উত্তরে বলেছিলাম, আমি জানি না তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কি-না, কিন্তু আমি মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে উঠতে চাই।

একটা হাত বাড়িয়ে তুমি আমার হাত ধরেছিলে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলে, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু ....'

আমি তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। শুনতে চেয়েছিলাম তোমার কথা।

আমরা হাঁটছিলাম পাশাপাশি, পায়ে পা মিলিয়ে।

এক সময় তোমার নাম ধরে ডেকেছিলাম আমি।

'বল।' কথা বলেছিলে তুমি।

বলেছিলাম, 'যে প্রশ্নটা তুমি আমাকে করলে, সেই প্রশ্নটা আমার মনেও বার বার জাগে। আমি অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠি। জ্বালা ধরে বুকে। ব্যর্থতা হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠে মন। স্বার্থের বেসাতী দেখে ঘৃণায় রি-রি করে ওঠে অন্তর। নিজেকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত বলে বোধ হয় সে সময়। মনে হয়...'

'কী?' জানতে চেয়েছিলে তুমি।

'আমার একটি প্রিয় কবিতা সে-সময় আমার মনে পড়ে।' বলেছিলাম আমি।

'কবিতা!'—তুমি যেন আশ্চর্য হয়েছিলে।

লজ্জা পেয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম, 'কেন জানিনা সেই কবিতাটি আমার মনে পড়ে। আমি নিজেকে ফিরে পাই। নিজের মধ্যে নিজে জেগে উঠি।'

'আমাকে শোনাবে না?' অনুরোধ তোমার কণ্ঠে।

বলেছিলাম, 'শোনাবার ক্ষমতা আমার নেই। বলতে পারি।'

বলেছিলে, 'তুমি বল। আমি শুনব।'
অনুরোধ এড়াতে পারি নি। বলেছিলাম—

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোন হীরার সকাল,
কোনদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।
আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো
আমার দুটি চোখ—
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা
দেখেছি বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো
কুয়াশা-ঢাকা দিন,
দেখেছি মোহম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাঁদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।

আর যেন না দেখি প্রিয়ার স্বপ্নজড়ানো নরম-সোনালি চুল,
কোনো শ্রাবণরাত্রির জানালায় [illegible]খা তার মুখের গভীরতা,
আর যেন আমার চোখের কিনারে
কেঁপে না ওঠে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ঢেউ, আমার দেশের নীরক্ত
শরীর॥

তারপরো আমার আত্মার স্বর বীক্ষণের প্রতিভা ছড়াবে
অমাবস্যা-নিমগ্ন প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে,
প্রমেথেউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চীৎকার
কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস,

কেটে চৌচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংক্সের স্থবিরতা,
খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য ।।
টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মত হৃদপিণ্ড,
যেমন কোনো পেশোয়ারী ফলওয়ালা তার ধারালো ছুরির
হিংস্রতায়
ফালি ফালি করে কেটে ফেলে তাজা, লাল টকটকে একটি
আপেল।
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উচ্ছল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃদপিণ্ড—
যে হৃদপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ়
ভালবাসা,
যে হৃদয়—
মা'র পবিত্র আশীর্বাদের মতো
বোনের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত দৃষ্টির মতো,
প্রিয়ার হৃদয়ের শব্দহীন গানের মতো
শান্তির জ্যোৎস্না চেয়েছিল পৃথিবীর আকাশের নিচে,
চৈত্রের তীব্রতায়, শ্রাবণের পূর্ণিমায়।

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতায়,
দোহাই ফ্যারাওয়ের ম্যক্মিগন্ধি বীভৎসতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার,
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও ।।

রাতের আকাশ। ঢাকার রাজপথ। তুমি আমার একটা হাত চেপে ধরেছিলে। মৃদুকণ্ঠে আমার কানে কানে বলেছিলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি কবীর।'

আমি বলেছিলাম, 'আমি জানি।'

তুমি বলেছিলে, 'তোমার ব্যথা আমি মনে-প্রাণে অনুভব করি। তবু তোমাকে যেন আমার কেমন মনে হয়। আজ বুঝতে পারলাম, কেন?'

আমি জানতে চাইনি সে কেন-র উত্তর। কারণ, তোমাকে আমি জেনেছিলাম। তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আমি সমুদ্রের গভীরতা দেখতে পেয়েছিলাম। আমি জেগে উঠেছিলাম।

রাবেয়া, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে আর একবার আমি জেগে উঠেছিলাম। সেই আমার প্রথম জাগরণ। একটা ষোল বছরের ছেলে জীবনে প্রথম মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করেছিল।

একুশের প্রস্তুতি ছিল না বললে ভুল বলা হয়। ৩০শে জানুয়ারী বিকালে বার লাইব্রেরী হলে ঢাকার ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কাজী গোলাম মোহবুব।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযারী ঢাকা সহরে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবার পর একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষ হতে আমরা পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী সুদীর্ঘ মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সারা সহর প্রদক্ষিণ

করি। বিকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে আবার একটা সভা হয়। সেই সভায় পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা মওলানা ভাসানী, আবুল হাসেম ও আরো অনেক রাজনৈতিক নেতা—ছাত্রনেতারা মুসলিম লীগ সরকারের জঘণ্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা দেন। বাংলাভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেন। ধর্মঘটের দিন স্থির হয়, ২১শে ফেব্রুয়ারী।

তারপর ?

তারপরের দিনগুলো আমার জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন কর্মের দিন। প্রাণশক্তিতে ভরপুর আমরা ফেব্রুয়ারীর চার তারিখ থেকে কুড়ি তারিখ পর্যন্ত শুধু প্রচার করেছি। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। আমরা নিরলস কর্মী হয়ে শুধু কাজ করে গেছি। নেতাদের হুকুম তামিল করেছি। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষকে বুঝিয়েছি, কেন এই ধর্মঘট। ধর্মঘট পূর্ব বাঙলার সমস্ত মানুষের।

একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সরকারের বাজেট অধিবেশন। দালালের দল সক্রিয়। গুণ্ডারা প্রস্তুত। নেতার দল তবু ভীত। তাই, গণশক্তির ভয়ে ভীত সরকার নিজেদের অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করে কুড়ি তারিখ রাত্রি থেকে একমাসের জন্যে ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করল।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ সভা ডাকল। আমরা একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গতে চাইলাম। কিন্তু ভোটাভুটিতে, নেতার দলের মধ্যে তর্কাতর্কি শেষে স্থির হল—একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গা হবেনা। কিন্তু আমরা—

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

আমরা ফিরে আসতে পারি না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ভয় পেলে আমাদের চলবে না। আমরা যে শুনেছি সেই মহা আহ্বান—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

আমাদের প্রশ্ন—

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রু ধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা!

স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের কাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ!
রাত্রির তপস্যা সে কি
আনিবেনা দিন!"

অস্থির জিজ্ঞাসা আমাদের মনের। কঠিন প্রতিজ্ঞা, আমাদের থামলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। অন্যায়ের সঙ্গে কোন আপোষ নয়। চিন্তা-ভাবনার দিন পার হয়ে এসেছি। এখন এগিয়ে যেতে

হবে। এগিয়ে যেতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত। আমরা এগিয়ে যাব। থামবো না। থামলে আমাদের চলবে না।

আমরা—ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল।
চল্ চল্ চল্॥

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যা চল।

নব জীবনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ,
বাহুতে নবীন বল।

চলরে নও জোয়ান,
শোনরে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান।
ভাঙরে ভাঙ্ আগল,
চল্‌রে চল্‌রে চল।
চল্ চল চল্

কারণ,

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি ॥

ওমা, ফাল্গুনে তোর আমের বনের ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে—
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর
হাসি ॥

কি শোভা, কি ছায়া গো, কি স্নেহ, কি মায়া গো—
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায়রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ওমা, আমি নয়নজলে
ভাসি ॥

২১শে ফেব্রুয়ারী। সকাল [illegible] দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেল। বেলা-বারোটার মধ্যে একে একে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা এসে জড়ো হলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

আবার সভা। সভাপতি। বক্তার দল।

কেউ একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গা-না-ভাঙ্গার দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিলেন। কেউ একশো চুয়াল্লিশ ধারা না ভেঙ্গে বেশ শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার উপদেশ দিলেন। আন্দোলন করব, কিন্তু শান্তিতে! তা কি হয়? পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছে এমন ঘটনা?

আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অটল। সভা ভঙ্গ হল। এগিয়ে গেল দশজনের মিছিল। একের পর এক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট

পার হওয়া মাত্র পুলিশের দল ধরছে আর ট্রাকে ভর্তি করছে। কিন্তু কত গ্রেপ্তার করবে। পুলিশের দল ক্ষিপ্ত-উদভ্রান্ত। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। উত্তেজনা-যন্ত্রণায় আমরা অস্থির। এম. এল. এ. আর মন্ত্রীর দল মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসছেন। আমরা মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছি। পুলিশের দল হানা দিচ্ছে বার বার। ভেঙে দিচ্ছে মিছিল। ওরা ঢুকে পড়ে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের মধ্যে। ওরা আক্রমণ করে আমাদের। কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে—লাঠি চালায়। আমরা হাতের কাছে যা পাই তাই ছুঁড়ি। ওরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি চালায়। শহীদের রক্ত ঝরে পড়ে মাটিতে। একুশের রক্ত।

তারপর ?

সরকারের দমন নীতি কোথায় ভেসে গেল। এগিয়ে এল মানুষ, সহরের মানুষ—গ্রামের মানুষ। শত-শত, হাজার-হাজার মানুষের স্রোতে জহ্লাদের আইন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জেগে উঠল মানুষ! হাজার-হাজার লক্ষ-কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

রক্ত শপথে আমরা আজিকে তোমারে স্মরণ করি
একুশে ফেব্রুয়ারী
দৃঢ় দুই হাতে রক্ত পতাকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরি
একুশে ফেব্রুয়ারী
তোমাকে স্মরণ করি ॥

তুমি হয়ে আছ আমাদের মাঝে চিরজ্যোতি অম্লান
তোমার বক্ষে কত-না শহীদ রক্তে করিল স্নান

কত বীর ভাই সেদিন জীবন করে গেল বলিদান
সেদিন প্রথম ভীরু কুয়াশার জাল গেল দূরে সরি ॥
সেদিন প্রথম ভয়ংকরের পথে শুরু অভিযান
সেদিন প্রথম লক্ষ কণ্ঠে জাগিল ঐক্যতান

সেদিন প্রথম ভীরু জনতার শিরদাঁড়া হল টান
সেদিন প্রথম দুঃশাসনের উঠিল টনক নড়ি ॥

রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল সেদিন মাটির বুক
আকাশের দিকে দৃঢ় হাত তুলে জনতারা উন্মুখ
দুঃশাসনের পেষণ রুখিতে হ'ল দৃঢ় উৎসুখ
লক্ষ জনতা একাকার হল মিছিলের পথ ধরি ॥

আজো ভুলি নাই সেদিনের সেই সংগ্রামী অভিযান
আজো ভুলি নাই সেদিনের সেই অমর শহীদ প্রাণ
আজো অলক্ষ্যে তাঁহারা জানায় উদাত্ত আহ্বান
তাই-তো আমরা সেই এক পথে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ি ॥

সংগ্রামের শুরু একুশে ফেব্রুয়ারী। বাঙালীর খুনে লাল হয়ে গেছে মাটীর বুক। নূরুল আমীনের পুলিশ অত্যাচারের বন্যা বাহিয়েছে, শেষ করে দিতে চেয়েছে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গণ-জাগরণ। মুসলিম লীগের কর্মধার বগুড়ার মহম্মদ আলী একদিন বাধ্য হয়েছেন বাংলার দাবীকে মেনে নিতে। ১৯৫৪ সালের ১৯শে এপ্রিল কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লি প্রস্তাব পাশ করে বাংলা আর উর্দু উভয়কেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আশা, বাঙালী সন্তুষ্ট হবে ভুলে যাবে পশ্চিমের শোষণের কথা। পশ্চিমের কাছে মাথা নত করে থাকবে চিরদিনের মত।

কিন্তু জাগরণের ঢেউ যেখানে লেগেছে, সেখানে ঘুমিয়ে থাকার অবকাশ কোথায়। জেগেছে বাংলার তরুণ প্রাণ। জেগে উঠেছে বাঙালী। বাংলার ঘরে ঘরে আগামী দিনের প্রস্তুতি।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার আগে আরবী হরফ প্রচলনের চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা চলছে পরেও। সরকার টাকা খরচ

করেছে দরাজ হাতে। সেই সঙ্গে হয়েছে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র।

গঠন হয়েছে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি'। কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে, কিন্তু সরকার সে রির্পোট জনগণের অবগতির জন্যে প্রকাশ করেনি। কারণ, কমিটি ভাষা-সংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে বহু প্রতিক্রিয়াশীল সুপারিশ পেশ এবং অনাবশ্যক প্রশ্নের অবতারণা সত্বেও তাঁরা আরবী প্রচলন ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃঢ়মত পোষণ করেছেন।

বগুড়ার মহম্মদ আলী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, পূর্ব বাংলায় তখন জনগণের সরকার। যদিও সে সরকার পশ্চিমের ষড়যন্ত্রে বেশীদিন স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কিন্তু মুসলিম লীগের ধর্মের মুখোশে-ঢাকা শয়তানের মুখটা দেখতে পেয়ে জনগণ যুক্তফ্রন্টের পাতাকা তলে সমবেত হয়েছিল। ছাত্ররা নিয়েছিল সবচেয়ে বড় ভূমিকা। আর দুজন, মওলানা ভাসানী এবং তরুণ মুজিবর রহমান। সঙ্গে ছিলেন ফজলুল হক, হোসেন শহীদ শোহ্‌রা ওয়ার্দী।

নগরে প্রান্তরে, হাটে-মাঠে ছুটে গেছেন নেতার দল। মানুষকে বুঝিয়েছেন। মুসলিম লীগের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। মুসলিম লীগ কাদের; কাদের স্বার্থ সংরক্ষিত মুসলিম লীগের দ্বারা।

অবুঝ হয়নি মানুষ। ভুল বোঝবার অবকাশ দেয়নি মানুষকে। মানুষ কথা দিয়েছে। কথা রেখেছে। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফাকে স্বাগত জানিয়ে ভোট দিয়েছে তারা। ভোট দিয়েছে সাধারণ মানুষ ভোট দিয়েছে খেটে-খাওয়া মানুষ। ভোট দিয়েছে দুর্গত নিরন্ন, অর্দ্ধভুক্ত, অত্যাচারিত-নিপীড়িত মানুষের দল। যুক্তফ্রণ্টকে আপন করে নিয়েছে তারা।

মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। ইসলামের ধুয়া তুলে মুসলিম লীগের অপপ্রচার তাদের সঙ্কল্প থেকে টলাতে পারেনি। ভোট দিয়েছে যুক্তফ্রণ্টকে।

ফলাফল শোচনীয়। মুসলিম লীগের অনেক সাধের স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক পটে যারা একদিন পাকিস্তান এনেছিল, জনগণের রায়ে, সেই মুসলিম লীগের বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রাদেশিক পরিষদে তিনশো দশটা আসনের মধ্যে মাত্র পেয়েছে নটা আসন।

আর প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন!

দুর্দ্ধর্ষ নূরুল আমীন। পূর্ব বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত নূরুল আমীন ছাত্রলীগের এক অখ্যাত নেতা খালেকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

গঠিত হল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল পশ্চিমের শয়তানী। দাঙ্গা বাধলো বাঙালী-অবাঙালীদের মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল পাকিস্তানে। বিরোধিতা করলেন মওলানা ভাসানী এবং ফজলুল হক। ফল যুক্তফ্রণ্টকে হত্যা। অশান্ত বাংলাকে শাসনে রাখার জন্যে বাংলায় এলেন সামরিক গভর্ণর ইস্কান্দার মির্জা।

ইস্কান্দার মির্জার পর এলেন আইয়ুব খান। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেন তিনি। ১৯৫২ সালে সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে (১৯৫৫) ছাত্র-শক্তি আয়ুবের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হল কিন্তু আয়ুবের সৃষ্ট বুনিয়াদী গণতন্ত্রের অভিশাপ মুছে ফেলা সম্ভব হল না।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ ছয় দফা সনদ ঘোষণা করল। এই সনদের দাবীর ভিত্তিতে ফেডারেল পার্লামেণ্টারী সরকার—

১। ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যকার ফেডারেশন রূপে গড়তে হবে। তাতে পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে এবং আইন সভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২। ফেডারেশন সরকারের এক্তিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রিয় ব্যাপার এই দুটো বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় ষ্টেটের হাতে থাকবে।

৩। তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক থাকবে। অথবা,

দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকবে। এ ব্যবস্থায় কারেন্সী মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এ অবস্থায় মুদ্রা শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং দুই অঞ্চলে দু'টি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে।

৪। সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হয়ে যাবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হবে।

৫। (ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আলাদা-আলাদা হিসাব রাখতে হবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এক্তিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এক্তিয়ারে থাকবে।

(গ) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দু অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারিভাবে আদায় হবে।

(ঘ) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলবে।

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড-মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের উপর ন্যস্ত করবার শাসনতান্ত্রিক বিধান করতে হবে।

৬। পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারা-মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ।

ছয় দফা সনদ প্রকাশের পর তাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে ছাত্রলীগ প্রচার অভিযানে নামে। ছয় দফার পক্ষে প্রচার শেখ মুজিবর রহমনকে কারাগারে নিয়ে গেল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে একনম্বর অভিযুক্ত হিসাবে জড়ানো হল।

ছয় দফার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের এগারো দফার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যেও আন্দোলন শুরু করল ছাত্ররা। এগারো দফা কর্মসূচীর দাবী—

১। (ক) প্রাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়গুলিকে পূর্ব মর্যাদায় পুনর্বাহাল করা ;

(খ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো ;

(গ) প্রাদেশিক মহাবিদ্যালয়গুলিতে রাতে পড়ানোর ব্যবস্থা ;

(ঘ) ছাত্র-বেতন অর্ধেক কমানো ;

(ঙ) ছাত্রাবাসের ব্যয় ৫০% সরকার কর্তৃক বহন ;

(চ) শিক্ষার ও অফিসের কাজের মাধ্যম হিসাবে বাংলার ব্যবহার ;

(ছ) শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো ;

(জ) অষ্টম মান পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা, চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনান্স বাতিল ;

(ঝ) পলিটেক্নিক ছাত্রদের জন্যে সংক্ষিপ্ত কোর্সের সুযোগ :

(ঞ) ট্রেন ও বাসে ছাত্রদের হ্রাসকৃত ভাড়া ;

(ট) চাকুরীর সুযোগের নিশ্চয়তা ;

(ঠ) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ;

(ড) জাতীয় শিক্ষা-কমিশন ও হামদুর রহমান রিপোর্ট বাতিল।

২। সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র।

৩। (ক) ফেডারেল সরকার ও সার্বভৌম বিধান সভা ;

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা ও মুদ্রা ব্যবস্থায় সীমিত রাখা।

৪। বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর প্রত্যেককে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন দিয়ে এগুলোর উপফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাঙ্ক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়-করণ।

৬। চাষীদের ওপর কর ও রাজস্বের হার হ্রাস।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস।

৮। পূর্ব পাকিস্তানে বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

৯। সকল জরুরী অবস্থাকালীন আইন, নিরপত্তা বিধি ও নিষেধাজ্ঞা সমূহ অপসারণ।

১০। সিয়াটো, সেণ্টো এবং পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তিসমূহ ত্যাগ। এবং

১১। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল ও সকল রাজবন্দীর মুক্তি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৮ সালের ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি। কিন্তু এগারো দফার আন্দোলন ছিল তড়িৎবাহী। ভাষা

আন্দোলনের সময় রাজনৈতিক অনেক নেতাই আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাঝে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের নেতা সেজে কয়েকজন আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজে-ছিলেন। মুসলিম লীগের দয়ায় ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। ছাত্রদের ফিরতে বলেছিলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে আন্দোলনকে ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন ওরা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হবে না। ওরা এগিয়ে যাবেই। ওরা এগিয়ে গিয়েছিল। দিয়েছিল বুকের রক্ত। ওদেরই বুকের রক্তে বাংলা ভাষা পেয়েছিল মর্যাদা।

১৯৫৮-তে ছাত্ররা আরো মরিয়া, উত্তাল। সমস্ত পূর্ব বাংলা অগ্নিগর্ভ। আইয়ুব খানের সামরিক চক্রের সাধ্য কি, জাগ্রত জনগণের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে মিথ্যা ভাঁওতায়। পশ্চিমেও আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভে অশান্ত মানুষ।

অবশেষে বিদায় নিল আইয়ুব খান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মিথ্যা শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হলেন মুজিবর। শাসন ক্ষমতার হাত ধরে পাকিস্তানের গদিতে এসে বসলেন পাঞ্জাবী সমর নায়ক ইয়াহিয়া খাঁ। গদিতে বসেই ঘোষণা করলেন, আমি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করব। গণপ্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেব ইসলামাবাদের ভবিষ্যৎ, আর তুলে দেবার জন্যেই আমার যাবতীয় ভূমিকা।

১৯৫৮ সালে পূর্ব বাংলায় সব চেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় ছাত্রলীগ। বাংলাদেশের ১৪০টি মহাবিদ্যালয়ের ১৯৫৮-৫৯ সালের নির্বাচনে ১৩০টিতে বিজয়ী হয় ছাত্র লীগ। ১৯৫৮ সালের এগারো দফা আন্দোলনে ছাত্রলীগের ভূমিকা নগন্য নয়। এগারো দফা আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের অনেক নেতাই ছাত্রলীগের। কয়েক জন নেতার মধ্যে রয়েছেন—

তোয়াফেল আহমেদ (সহঃ সভাপতি--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয়

ছাত্র ইউনিয়ন। পরে ইনি ছাত্রলীগের সভাপতি হন। ১৯৬০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন)

আবদুর রঊফ—(সভাপতি, ছাত্রলীগ)

সাইফুদ্দিন মাণিক—(সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন [মতিয়া])

শ্যামসুদ্দিন - (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন [মতিয়া])

মাহবুত উল্লাহ—(সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র ইউনিয়ন [মেনন])

মোস্তাফা জামাল হায়দার (সভাপতি, ছাত্র ইউনিয়ন [মেনন])।

ছাত্রদের এগার দফা আন্দোলন, এক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় গুলিবর্ষণের পর হঠাৎ তা গণআন্দোলনের দিকে মোড় নেয়। গুলিবর্ষণে আসাদ উল্লাহ (মেনন ছাত্র ইউনিয়ন সদস্য) মারা যান। ফলে, আইয়ুব খান প্রথমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পরে ক্ষমতা থেকে বিদায়।

ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামরিকশক্তি পরাজয় স্বীকার করে। ঢাকার সামরিক-শিবির থেকে মুক্তি লাভ করেন মুজিবর রহমন। তাঁকে ঢাকার ঘোড়দৌড় মাঠে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ছাত্ররাই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। উপাধিদান অনুষ্ঠানে ১৯৫৯ সালের গণআন্দোলনের নায়ক তোফায়েল আহমেদ ঘোষণা করেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি।

১৯৬০ সালে ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রলীগ। পরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে নির্বাচনে একমত হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচন বিজয়ের কৃতিত্বের একটা বড় অংশ ছাত্রলীগের প্রাপ্য। কারণ, ছাত্রলীগ ছাড়া আওয়ামী লীগের চেহারা অন্য রকম হত।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অনাহার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সত্বেও শতকরা আশী-জন মানুষ আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে বিশ্বাস করেছে, ছাত্র-যুবকর্মীদের কথা অবিশ্বাস করতে পারেনি। ভোট দিয়েছে আওয়ামী

লীগকে। জয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ। জয় হয়েছে মানুষের। বাঙালী লড়াই করে জিতেছে। সে লড়াই, মিথ্যার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে। তার চেয়েও বড়, মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে। বাঙালী জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে উপলব্ধি করেছে হিন্দু অথবা মুসলমান নয়, বাঙালী যদি ধর্মের গোঁড়ামী ত্যাগ না করতে পারে, তার মৃত্যু অবধারিত। .বাঁচার মন্ত্র ছিল আওয়ামী লীগের ছয়দফায়। মাঠে-ঘাটে নগরে-প্রান্তরে ঘুরে বাঁচার মন্ত্র শুনিয়েছিল ছাত্র আর যুবকর্মীর দল। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঁওতায় ভোলেনি সাধারণ মানুষ। তারা বাঁচতে চেয়েছে। তারা আলো চেয়েছে। ধর্মের শিকলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মরতে তারা চায়নি। বাঁচার মন্ত্রধ্বনিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে। তাঁর দেওয়া দায়িত্বভার কর্তব্যজ্ঞানে বহন করেছে ছাত্ররা।

কারণ. তারা যে ভুলতে পারেনি অতীতকে। রক্তাক্ত অতীত। বলতে ইচ্ছা করেছে—

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি-তো। যে ভিৎ কখনো কোন রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চার কোটি পরিবার॥

এ-কোন্ মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠে না কান্না, ঝরে না অশ্রু ?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন্ মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল ?
ইটের মিনার ভেঙ্গেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি
আমরা চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণ লেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর।।

দিশাহারা পশ্চিমা চক্র। মদতদারের অভাব নেই তার। শয়তানীতে পাকা মাথা কাছে-দূরে বুদ্ধি জোগায়। শুরু হয় আলোচনা। বেঠকের পর বৈঠক। মতৈক্য হয় ক'টি বিষয়ে—আবার হয়না ক'টিতে। ইয়াহিয়া-ভুট্টো আসে-যায়। স্বর্থপর ঘরের শয়তানরা উল্লসীত হয়। আলোচনা ভাঙ্গে-গড়ে। মুজিবর চান শান্তি। সম্মান বজায় রেখে

বাঙালীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। যোগ্য নেতার বিচক্ষণতায় তিনি মানুষের জীবনকে অনিশ্চিয়তার মাঝে ছেড়ে দিতে পারেন না। তিনি অটল-অচল, বাইরে ভেতরে সমালোচনা, এতটুকু অধৈর্য্য হওয়া তাঁর শোভা পায়না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দায়িত্ব যে তাঁর ওপর।

কিন্তু একদিন তাঁরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। তিনি বুঝতে পারেন, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন শয়তানের দল কখনো মানুষের অধিকারকে স্বীকার করে না। অসহযোগের ডাক দেন, আত্মরক্ষার আহ্বান জানান। কিন্তু, সেই সঙ্গে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখতেও ভোলেন না।

তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, অনেক রক্ত দিয়েছি, আরো রক্ত দেব। এদেশের মানুকে মুক্ত করে ছাড়ব।

শেখ মুজিবর রহমানের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় (২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ) ছাত্রলীগ, স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন, জনসাধারণকে স্বাধীনতা অন্দোলনে যোগদান করতে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে শত্রুসেনা বিবেচনা করতে ও পাকিস্তানী পতাকা জ্বালিয়ে দিতে আহ্বান জানিয়ে তিনখানি ইস্তাহার প্রকাশ করে। কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানখানি দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বেছে নেয়।

ছাত্রলীগের যে চারজন নেতা খোলাখুলি স্বাধীনতার আন্দোলন আরাম্ভ করেন, তাঁরা হলেন—

নূরে আলম সিদ্দিকী—(সভাপতি, ছাত্রলীগ)

শাহজাহান সিরাজ—(সাধারণ সম্পদক, ছাত্রলীগ)

আক্রাম আবদুর রব (সহ সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ) এবং

আবদুল কুদ্দুস মাখন (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন)।

২৩শে মার্চকে পাকিস্তান সরকার 'পাকিস্তান দিবস' ঘোষণা করে। স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করে। সারা বাংলাদেশে হাজার হাজার পাকিস্তানী পতাকা পোড়ানো হয় এবং আকাশে ওড়ে বাংলাদেশের নতুন পতাকা।

তারপর ?

২৫শে মার্চ।

আগামী দিনের পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় একটি দিন ১৯৫১ সালের ২৫শে মার্চ।

ইসলামের ধ্বজাধারী পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের জঙ্গী নায়কের দল শুধুমাত্র ইসলামকে রক্ষা করার জন্যে পঁচিশে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে নেকড়ের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঢাকার বুকে।

তারপর ?

রাবেয়া, আজ একটা কথা যত ভাবি ততই আশ্চর্য হয়ে যাই। একটা প্রশ্নের উত্তর আমি আজও পেলাম না। সে প্রশ্নটা, মানুষের প্রকৃত পরিচয় কি ?

পশ্চিমের শয়তানের দল বাঙালীর অস্তিত্বকে মুছে দিতে কম চেষ্টা করেনি। আজ ওরা আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের হাতে 'বন্দী। ওরা সৈনিকের মর্যাদা লাভ করেছে ভারতবর্ষের কাছে বন্দী হয়ে।

কিন্তু ওরা কি সত্য সত্যই সৈনিক ?

ওরা কি সৈনিকের ধর্মপালন করেছে ?

বন্দী হওয়ার পর যে মর্যাদা লাভ ওরা করেছে তা কি ওদের প্রাপ্য ?

দোষীকে ক্ষমা করা মানব ধর্ম, কিন্তু শয়তানকে ক্ষমা করা যায়

কি ? তুমি পার ? মানুষ পারে ? কিন্তু মানুষের সৃষ্ট আইনবলে ওরা বে-কসুর খালাস হবে। ওরা ফিরে যাবে পশ্চিমে। আবার হয়তো……

রাবেয়া, এই ছোট্ট হাসপাতালটার এক ডাক্তার—ডঃ চক্রবর্তী, প্রৌঢ় মানুষটি, হাশি-খুশি স্নেহময় মানুষটি আমাকে স্নেহ করেন। ওনার হাতেই নাকি আমার জীবন লাভ। সকালে নিজের কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসেন। খবরা-খবর নেন—গল্প করেন।

একদিন কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, 'জানো কবীর, আজকের একটা গোটা দেশ বা দেশের মানুষের জীবন রাজনীতি-নির্ভর।'

আমি তাঁর কথাটা বুঝতে না পেরে মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি জানতে চেয়েছিলেন,—'কী, বুঝতে পারলে না ?'

বলেছিলাম—'আপনি একটু খুলে বলুন।'

মৃদু হেসে আবার কাঁধে একখানা হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, 'রাজনীতি এমনই জিনিস যেটা খুলে বলার জিনিস নয় ভাই। বলতে পার, বলার নয় বোঝার।

আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু।

তিনি আমার কথা জানতে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন, 'কবীর, তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন ?'

'বলেছিলাম, 'দুনিয়ায় যেদিন এসেছিলাম সেদিন অনেকেই ছিলেন, আজ আমি একা।'

'একা বলতে ?' জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

ম্লান হেসে বলেছিলাম, 'অনেকের চেয়ে আমি সৌভাগ্যবান। সত্যিই আমার এ দুনিয়াতে কেউ নেই।'

তিনি বিশ্বাস করেছিলেন কি-না আমি জানি না। কিন্তু দেখেছি, যাদের সব ছিল, সকলে ছিল, তারাও বলেছে, সে একা, তার কেউ

নেই। সকলকে অস্বীকার করে দুঃস্বপ্নময় ভয়ঙ্কর স্মৃতির হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে । কেউ নেই, কেউ ছিলনা, আমি একা। আমি ছিলাম—আছি!

আমি সত্যি কথাই বলেছি, আমার কেউ নেই। সত্যই আমি একা।

তুমি?

তোমার কথা আমি ভুলিনি সত্যি কথা। তোমার স্মৃতি আমার অন্তরে সব সময় জেগেছিল। তোমার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়েছি, দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে সন্ধান পাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু·····

তোমার চিঠিটা অপ্রত্যাশিত। আমি কল্পনা করতে পারি নি। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না··না-না—তোমার হাতের লেখা ভুল হবার নয়। তুমিই চিঠি লিখেছ আমাকে। আমার শিক্ষকতাকালের ছাত্র মনজুর তোমার আত্মীয়। সেই তোমাকে আমার সংবাদ জানিয়েছে। আমরা একসঙ্গে হাতে রাইফেল নিয়ে লড়াই করেছি। সেদিন, সেই দুর্ঘটনার দিন সেও ছিল আমার পাশে।

আমার মনে আছে, শয়তানের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় সে কবার আমাকে সাবধান করেছিল। বলেছিল, 'স্যার, একটু সাবধানে!'

আমি তার নিষেধ শুনিনি। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। বিপদের আশঙ্কাকে মনে স্থান দিইনি। পশুগুলোকে লক্ষ্য করে শুধু ট্রিগারে চাপ দিয়েছি।

এক সময়···। জানি আমার কি হয়েছিল। উষ্ণ রক্তস্রোত আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রথম চোখ মেলে একদিনের ছাত্রটিকে আমার মুখের কাছে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলাম। সে ডেকেছিল, 'স্যার!'

চিনতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কে?'

'আমি মনজুর।' নাম বলেছিল সে, চিনতে পেরেছিলাম তাকে।

সে বলেছিল, 'আমরা যাচ্ছি স্যার।'

জানতে চেয়েছিলাম, 'কোথায়?'

উত্তর দেয়নি সে। ভালভাবে জ্ঞান ফিরতে উত্তর নিজেই পেয়েছিলাম। আর একদিন মাত্র ক-মিটিটের জন্যে সে এসেছিল। দেখেই চলে গিয়েছিল। সময় নেই। শুধু এসেছিল আমাকেএকবার দেখে যাবে বলে।

যাবার সময় বলে গিয়েছিল, 'আমি আবার আসব।'

মনজুর আর আসেনি। একদিন জানতে পারলাম সে যেখানে গেছে সেখান থেকে তার পক্ষে আর কোনদিন ফিরে আসা সম্ভব নয়। যুদ্ধ শেষ। মুক্ত বাংলা। বিশ্বাসঘাতকের হাতে জীবন দিয়েছে মনজুর।

বিশ্বাসঘাতকের দল ছড়িয়ে আছে দেশের অনেক ঘরেই। যারা ছিল শয়তান আজ নিশ্চই তারা সাধু সেজেছে। মহৎ হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু...

জানি না কি হবে। বাংলার মানুষ সেইসব বেইমানদের ক্ষমা করবে কিনা।

আর তুমি?

তোমার সুখের নীড় ভেঙে গেছে। পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে তোমার সাধের স্বপ্ন চূরমার। তুমি দূরে ছিলে। তুমি রেহাই পেয়েছ।

কিন্তু যারা পায়নি?

পশ্চিমী পশুগুলো আর সুবিধাবাধী শয়তানের দল, যাদের নারীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, যাদের গর্ভে এসেছে সন্তান—তারা?

রাবেয়া, যারা আজ বন্দী অবস্থায় সৈনিকের মর্যাদা লাভ করেছে,

সেই পশুগুলো কি সত্য সত্যই সৈনিকের মর্যাদা লাভের উপযুক্ত। নারীধর্ষণকারী ব্যাভিচারীর দল কোন শাস্তি পাবেনা? আইন আর আর রাজনীতির খেলায় তারা অপরাধ করেও রেহাই পাবে?

তাই পাবে। তাইতো দেখছি। অত্যাচারীর দল রেহাই পায়।

মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে হয়তো বলব, মানুষের কাঠগড়ায় ওদের রেহাই মিললেও খোদার দরবারে ওদের রেহাই মিলবে না। কিন্তু ওরা তো গায়েও আঘাত হেনেছে। অস্ত্রের আঘাত শুধু মানুষ খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, ওরা মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছে, মসজিদ ভেঙ্গেছে। কারা? না, সাচ্চা মুসলমানের দল। দুনিয়ার মুসলমানের একটা বিরাট অংশ যাদের সহায়।

কিন্তু প্রকৃত মুসলমান যদি হত তাহলে কি পারত?

আমার মনে হয় না।

আসলে কি জান, ধর্ম নয়—মানুষ। ধর্মের জন্যে ওরা মানুষকে নিয়ে শয়তানীর খেলা খেলতে চেয়েছিল। আমরা, মানুষের জন্য ধর্ম, এই সত্য উপলব্ধি করে এক হয়েছি। আমরা ভুলেছি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের সংস্কার। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ। আমরা বাঙালী।

আমরা বাঙালী হয়ে উঠেছিলাম বলেই ওই অবাঙালী শয়তানের দল আমাদের আঘাত হেনেছে। সে আঘাতে আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আমরা যেন আর ভুল না করি!

ডাক্তারবাবু একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, অনেক দিন আগে তিনি একবার একজন ফকিরের সঙ্গে এক হাজীসাহেবের দরগায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ফুল আর ধূপ নিয়ে গিয়েছিলেন। ফকির সাহেব হাজী সাহেবের সমাধিতে তাঁকেই দিতে বলেছিলেন ফুল, জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ধূপ। বসেছিলেন সমাধির পাশে। বড়

ভাল লেগেছিল সুন্দর পরিবেশটি। বলেছিলেন, মন্দিরে রইলো দেবতা—মানুষ অনেক দূরে। শিল্পী কল্পনায় রূপ দেয় দেবতার। ঈশ্বর এক। তাঁর নয়, আমাদের প্রয়োজনে তিনি বহু হয়েছেন। আমাদের ওলাবিবি-সত্যপীরের মত। পূজার অর্ঘ্য সাজাই ভক্তিতে। আমরা ঈশ্বরের সন্তান। মানুষ। মানুষের ছদ্মবেশে শয়তানের দল, স্বার্থের বেসাতিতে ভরা দুনিয়া। মানুষের চলার গতি রুদ্ধ হয়নি—হবে না।.

ডাক্তারবাবু বলছিলেন, 'বাঙালী লড়ছে—বাঙালী মরছে। এপারের বাঙালী যুবকের দল বাঁচার জন্যে মাথা কুটছে—আনন্দের পথ খুজছে। বাঙালীর বিপ্লবী সত্বা যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

সত্যিই কি তাই?

আবার তিনিই একদিন বলেছিলেন, বিপ্লবী সত্বা কখনো শেষ হয় না। বাঙালী জেগেছে, তার জাগরণের দিন আসছে, আসবে নিশ্চয়ই!

রাবেয়া, তুমি লিখেছ, তুমি আসছ। কবে আসবে জানি না! আমি প্রতীক্ষায় রইলাম।

একটা পঙ্গু মানুষ! আমরা বন্ধু। আগামী দিনের পথপরিক্রমায় তোমার হাত ধরে এগিয়ে যাব। আগামী দিনগুলি নতুনের। সেই নতুন দিনে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আমার দেশকে সাহায্য করতে। আমি বাঙালী। বাঙালীকে আজ নতুন শপথ নিয়ে পথ চলতে হবে। আর মনে রাখতে হবে সেই দিনটিকে। ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা বাঙ্গালীর জাগ্রত চেতনার সেই রক্তাক্ত দিনটিকে। সেই,

আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি

ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত-রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি।

বাঙালীকে বাঁচতে হলে ভুলনে চলবে না এই দিনটিকে। জাতির জীবনের নতুন ইতিহাসকে!

জরুরী অবস্থা

আজ দীর্ঘদিন আমি এখানে বসে আছি। সময়ের হিসাবে একটা যুগ। বারো বছর এখানে বসে আমি সূর্যোদয় দেখেছি—দেখেছি সূর্যাস্ত। আজ ভোরে ঘুম ভাঙার পর আমার অঙ্গহীন দেহটাকে টেনে এনে যখন বসেছি, তখন সবেমাত্র পূবের আকাশটায় লালের আলপনা আঁকা সুরু হচ্ছে। শহর কলকাতার এ অঞ্চলটা থেকে এখনও সবুজের সমারোহ মুছে যায়নি। পাখির ডাক এখনও শোনা যায় সকাল-সন্ধ্যায়।

আমি প্রতিদিন এই ঘেরা বারান্দায় বসে থাকি। ছোট—একতলা বাড়ি। সামনের রাস্তাটা একটু এগিয়ে বড় রাস্তায় মিলেছে। সেখানে ট্রাম বাস চলে। বারো বছর আগে এধারটা অনেক ফাঁকা ছিল। দেখতে দেখতে অনেক নতুন বাড়ি হয়েছে। বেড়েছে মানুষের সংখ্যা। পরিচয়ের গণ্ডি বড় হয়েছে। অনেকে শুধুই আমার পরিচিত। এ পথের পথচারীদের পরিচিত এই পঙ্গু বৃদ্ধ। অনেকে কুশল বিনিময় করে। কেউ-বা পরিচিতের হাসি হাসে। আবার কেউ নিদারুণ ব্যস্ততায় পার হয়ে চলে যায় সামনের রাস্তাটুকু।

এ চিত্র দীর্ঘদিনের। পঁয়ষট্টি সাল থেকে এখানে বসে আছি। আমার মেয়ে সরমা আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছিল। নিঃসঙ্গ বাবাকে সে হয়তো নিজের কাছে রেখে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল, হয়তো বা নিজেও পেতে চেয়েছিল। কারণ, আমার ছেলের মত তার স্বামীও তখন যুদ্ধক্ষেত্রে।

সেদিনগুলোর সব ছবি আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পঙ্গু দেহটাকে টেনে নিয়ে এখানে বসতাম। চেয়ে থাকতাম পথের দিকে। প্রতীক্ষা করতাম…

মনে পড়ত অতীতটাকে। আমার অতীত। একজন তরুণের ছবি ভেসে উঠত চোখের সামনে। যার বুকে ছিল অনেক আশা, স্বপ্ন। দেশকে স্বাধীন করার জন্যে সব ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জেলখানার অন্ধকারে কাটিয়েছে দিন। মেয়াদ শেষে বাইরে এসেছে। আবার গেছে।

এসেছে স্বাধীনতা। মুক্ত ভারত। খণ্ডিত ভারতভূমি। তবু মুক্তির আনন্দে মেতেছে মানুষ। উৎসব সজ্জায় সেজেছে গ্রাম নগর। স্থায়ী হয়নি

আনন্দোৎসব। শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই হানাহানির রক্তাক্ত অধ্যায়ে অঙ্গহানি ঘটেছে। রাত্রির অন্ধকারে আক্রান্ত হয়েছিলাম। স্ত্রী পুত্র কন্যাকে রক্ষা করার আগে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম শরীরে। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরবার পর দেখেছিলাম বাঁ পা-টা কাটা গেছে আমার। আর যাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম তারাই আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে রক্ষা করেছে। আমাকে হাসপাতালে দিয়েছে। সসম্মানে আমার কাছে পৌছে দিয়েছে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে। কিন্তু আমি স্বাধীনতার মূল্য স্বরূপ দিয়েছি আমার বাঁ পা-টা।

স্বাধীন ভারতবর্ষে দিন কেটেছে। বুকের মধ্যে যে স্বপ্নের ছবিটা এঁকে ছিলাম খুঁজেছি! মেয়ের বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলে একদিন যোগ দিয়েছে বিমান বাহিনীতে। আমি বাধা দিইনি।

দিন কেটেছে। আমি একা—নিঃসঙ্গ। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা। আমার স্বপ্নের ছবি ম্লান হতে ম্লানতর হয়েছে। বর্দ্ধমানের এক গ্রামের স্কুল শিক্ষক আমি আমার ছাত্রদের মুখের দিকে দিনের পর দিন চেয়ে চেয়ে দেখেছি। প্রশ্ন করেছি, 'বড় হয়ে কি হবে তুমি?' স্পষ্ট উত্তর পাইনি। কেউ কিছু বলতে চেয়েছে, কেউ বা আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকরা যেন স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছি আমি। কেন, এমন হল—কেন?

রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন,

"জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট—কিন্তু সকলের চেয়ে বড় তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্স-এর সাধনায় আত্ম-প্রবঞ্চনা ও পর-প্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি মিথ্যাকে সহায় করেননি। মিথ্যার উপাচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি কূট কৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁর এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড় দান।"

জওহরলাল সম্পর্কে বিশ্বকবির উক্তি এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। ভারতবর্ষের মতই বিশাল ছিল তাঁর হৃদয়। দেশ এবং মানুষ ছিল তাঁর বড় আপন।

দেশের উন্নতি, মানুষের মঙ্গল চিন্তা ছিল তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে। ভারতবর্ষের উন্নতি হোক, নিরন্ন মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো আহার, পরণের কাপড়, মাথা গোঁজার আচ্ছাদন লাভ করুক এই চিন্তা-কর্মে তিনি ছিলেন সদা ব্যস্ত। পরিবর্তে হিংসার অস্ত্র তৈরি করতে মন সায় দেয়নি তাঁর। ভারতবর্ষ শান্তির পূজারী—অহিংসা তার জীবনের মূলমন্ত্র।

কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ঝাঁপিয়ে পড়ল একদিন উন্মত্ত হিংসায়। শান্তির পূজারী ভারতবর্ষ হল পরাজিত। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল বুঝলেন, হিংসা বর্জন করলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন আছে। যদিও চীনের কাছে ভারতবর্ষের সেদিনের পরাজয়ের জন্য সর্বাংশে দায়ী তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেনন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর গাফিলতিতেই সেদিনের পরাজয়।

পঁয়ষট্টিতে আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে পাকিস্থান। বাষট্টির কলঙ্কের কালিমা মুছে ফেলেছে ভারত। পাকিস্থান সেদিন শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ভারতবর্ষ তার নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। পরাজিতের আর্তনাদে অস্ত্র সম্বরণ করেছে। শান্তির আবেদন গ্রহণ করেছে। পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতার আঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

সেই যুদ্ধের দিনে এক পড়ন্ত বিকালের আলোয় এখানে বসেই আমার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। সে সংবাদে আমি যেন পাষাণে পরিণত হয়েছিলাম। কোন ভাবান্তর ঘটেনি আমার মধ্যে। নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করেছিলাম পুত্রের মৃত্যু সংবাদ। আমার পুত্র ছাম্বের আকাশে বিমান যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিল। ক্যাপ্টেন রাহুল চট্টরাজ শত্রুর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। তার জন্যেই যুদ্ধের গতি পাল্টে গিয়েছিল।

এখানে বসেই একষট্টি সালে সরমার স্বামী ব্রিগেডিয়ার কল্যাণ চ্যাটার্জীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। এখানে বসেই বিগত ক'টা বছরকে উপলব্ধি করলাম। এখানে বসেই একদিন শুনলাম জরুরী অবস্থার কথা। রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণায় আমার মনের মধ্যে যেন তারুণ্যের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম।

২৫শে জুন, ১৯৫৫।

পরিচিত একজন মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' বললাম আমি।

'আপনি খুশি?'

আমি তাঁকে দেখলাম। প্রশ্ন করলাম, 'আপনি?'...

জরুরী অবস্থা কেন? স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় সত্যই কি জরুরী অবস্থার প্রয়োজন ছিল? জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরদিন ২৬শে জুন ১৯৭৫ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই কথাই বললেন, জরুরী অবস্থা কেন? কেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন?

তিনি বললেন, ভারতের রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন, এই ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কিছু নেই।

আমি নিশ্চিত আপনারা সকলেই সচেতন আছেন যে, আমি যে মুহূর্তে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি কর্মসূচী হাতে নিয়েছি; ঠিক তখনই এই সমস্ত কর্মসূচী ব্যর্থ করার জন্য চারিদিকে গভীর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। গণতন্ত্রের নাম নিয়ে তারা গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের পথে বাধা দিচ্ছেন, জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারকে ঠিকমত কাজ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমন কি কিছুসংখ্যক সদস্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। যাতে আইনসম্মত ভাবে গঠিত আইনসভা ভেঙে যায়। চারিদিকে বিক্ষোভ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে। আমার ক্যাবিনেট সদস্য বন্ধু শ্রী এল. এন. মিশ্রের নৃশংস হত্যায় সারা দেশ মর্মাহত। ভারতের প্রধান বিচারপতিকে আক্রমণে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত।

ভারতে কিছু সংখ্যক লোক, দেশের সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশবাহিনীকে তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ না মানার জন্যে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশবাহিনী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রকৃত দেশপ্রেমিক— তাই তাদের এই প্ররোচনায় তারা কান দেয়নি।

দেশের অসংহতি এবং বর্ণবৈষম্য মাথা চাড়া দিয়ে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে। তারা আমার বিরুদ্ধে নানারকম মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। ভারতের জনসাধারণ আমাকে শৈশবকাল থেকে জানেন। আমি সারা জীবন দেশের জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি। এটা আমার কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমি প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকব কি থাকব না এটা কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। প্রধানমন্ত্রীর পদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিকেরা চান এই পদের অবমাননা করা, এটা নিশ্চয়ই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নয়।

আমরা এই সব জিনিসের ক্রমাবনতি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বহুদিন হতে লক্ষ্য

করছি। কিন্তু বর্তমানে তাদের কর্মসূচীতে দেশের সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলা বিপন্ন করবার হুমকি দেওয়া হচ্ছে যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে দেশের কাজ না করতে পারি। এই অবস্থায় কি করে একটা দেশের সরকার এইভাবে দেশের স্থায়িত্বকে নষ্ট করতে দেবে? মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাজের দ্বারা দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। দেশের মধ্যে কোন কিছু কাজের দ্বারা দেশের সরকারকে দুর্বল করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ সুগম করে দেওয়া। দেশের স্থায়িত্ব এবং ঐক্যকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। দেশের সংহতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এই পরিস্থিতিতে এই অবস্থা-ঘোষণা করতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে।

দেশের স্থায়িত্ব নষ্ট করার হুমকির জন্য উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। গত কয়েকমাস আমাদের আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা দ্রব্যমূল্য কমাতে পেরেছি। আমরা এখন কিছু কাজ করতে চলেছি যার ফলে দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় করা যাবে। এবং দেশের নানা সম্প্রদায়ের লোকের, বিশেষ করে গরীব অরক্ষিত এবং স্থায়ী আয়ভুক্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা ঘোচানো যাবে। আমি এইগুলি শিঘ্রই ঘোষণা করব।

এই সম্বন্ধে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

আমি তাবার আশ্বাস দিচ্ছি যে, এই নতুন জরুরী অবস্থা আইনানুগত নাগরিকের অধিকারের ওপর কোন ভাবেই আঘাত করবে না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হবে এবং যার ফলে আমাদের এই জরুরী অবস্থা তুলে নিতে সাহায্য করবে। আমি দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ও ভারতের বিভিন্ন অ . থেকে শুভেচ্ছা লাভ করে আনন্দে অভিভূত হয়েছি। আমি অনুরোধ করতে পারি যে, আমার দেশবাসীগণ সকল সময় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং আগামী দিনের জন্যে আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখবে।

কুড়ি দফা কর্মসূচী ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

১। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের সুষ্ঠ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুত ও বণ্টন ও সরকারী খরচের ,ঁস করন।

২। জমির উচ্চসীমা নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন ও জমির পূর্ণ হিসাব রক্ষণ।

৩। দুঃস্থ লোকেদের জন্য বা ভূমিহীন কৃষকদের জন্য গৃহ নির্মানের ব্যবস্থা করন।

৪। হিসাবহীন শ্রমিকদের বেআইনি ঘোষণা করন।

৫। কৃষকদের ঋণ মুক্ত করার পরিকল্পনায় জমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও অন্যান্য শিল্পীদের ঋণ মুক্ত করনের আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। কৃষকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণের আইন করনের পুনঃ বিবেচনা।

৭। পাঁচ মিলিয়ন হেক্টর জমির সেচের আওতায় আনয়ন এবং ভূগর্ভের জল ব্যবহারের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।

৮। বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের ব্যবস্থা করন, বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় করন।

৯। তাঁত শিল্প প্রসারের উন্নতি করন।

১০। সাধারণ ব্যক্তিদের পোশাক পরিচ্ছদ গুণে এবং পূরণে ব্যবস্থা করন।

১১। শহরে বসত এবং পতিত জমির উচ্চসীমা নির্ধারনের ব্যবস্থা করন।

১২। বেনামী-সঠিক ট্যাক্সের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং দোষী ব্যক্তিবর্গের শাস্তির ব্যবস্থা করন।

১৩। চোরাইকারী সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করন।

১৪। লগ্নীর জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা করন এবং আমদানী লাইসেন্সের অপ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করন।

১৫। শিল্প শ্রমিক সমিতির নূতন পদ্ধতি করন।

১৬। মাল আমদানী ও রপ্তানির জন্য জাতীয় পারমিট দানের পরিকল্পনা।

১৭। সাধারণ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের আট হাজার টাকা আয়ের আয়কর মুক্ত ব্যবস্থা করন।

১৮। হোস্টেলের ছাত্রদের জন্য সুলভ মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয় ব্যবস্থা করন।

১৯। বই খাতা পত্রের সুলভ মূল্য ব্যবস্থা করন।

২০। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের চাকুরি প্রদানের জন্য ট্রেনিং এবং হাতে নাতে কাজ শেখাইবার ব্যবস্থা করন।

ক'জন পরিচিত মানুষ সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গী হন আমার। ঘেরা বারান্দায় এসে বসেন। আমার মেয়েরও পরিচিত তাঁরা সকলেই। আসেন, গল্প

করেন, চা খান। আলোচনা করেন তাঁরা নিজেরাই। প্রায়ই নীরব শ্রোতা আমি। কখনো বা অংশ নিতে বাধ্য হই।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক'দিন পরে, এক সন্ধ্যায় ঘেরা বারান্দায় এসে বসেছেন ক'জন ; চা দিয়েছে সরমা। আলোচনা বয়ে চলেছে বিভিন্ন খাতে। একসময় প্রতিবেশী রাজেনবাবু বললেন, শেষ পর্যন্ত কি হবে সেটাই বুঝতে পারছি না।

শিশির হালদার বললেন, কিসের কথা বলছেন ?

—জরুরী অবস্থার।

শিশির হালদার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রাজেনবাবু বললেন, আমার তো মনে হয় এর কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য······চুপ করে গেলেন তিনি।

—আমার কিন্তু ভিন্নমত।

—অর্থাৎ ?

—জরুরী অবস্থা ঘোষণা আরো অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল।

—বলেন কি ?

—ঠিকই বলছি। শিশির হালদার রুখে উঠেছিলেন। দেশে আজকের এই অরাজকতা কেন ? যে দেশে নাগরিকরা তাদের কর্তব্য পালন করে না, ব্যবসাদার শিশুর খাদ্য, রোগীর ওষুধ নিয়ে কালোবাজারী করে, ভেজালে-ভেজালে দেশটা ছেয়ে গেছে। সেখানে শাসনের প্রয়োজন। ইন্দিরা গান্ধী ঠিকই করেছেন।

—বলছেন ?

—হ্যাঁ, বলছি। রাজনীতির নামে কি শুরু হয়েছিল ? জয়প্রকাশ নারায়ণকে আমি অসৎ লোক বলছি না। ভারতবর্ষের কথা বাদ দিন। পশ্চিমবঙ্গের কথায় আসুন। ছত্রিশটা দল এখানে। ছত্রিশ দলের ছত্রিশ রকম মত। লক্ষ্য নাকি একটাই। সেই লক্ষ্যস্থলে আমরা সকলকে একবার নয় দু-দুবার পৌঁছে দিলাম। কিন্তু কি হল দেখলেন ?

রাজেনবাবু নীরব।

শিশির হালদার বললেন, দেখলাম ক্ষমতার লড়াই। মানুষ নয়, দলের হিস্যা গোছাতে ব্যস্ত সবাই। মানুষের কথা চিন্তা করে কেউ দাবী ত্যাগ করতে রাজি নয়। আইন শৃঙ্খলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। দু'বারের যুক্তফ্রন্ট ন্যায় নীতি মানুষের মন থেকে মুছে দিয়ে গেল। নিজেদের দোষেই মানুষের

মন থেকে মুছে গেল বিভিন্ন দলের প্রভাব। নির্বাচনে শোচনীয় ভাবে মার খেল। আজ সুযোগ পেয়ে আবার এগিয়ে আসতে চায়। একটা মানুষকে সামনে রেখে উদ্ধার করতে চায় হারানো সম্পদ। এ সময়…

রাজেনবাবু বললেন, কিন্তু আজ আমাদের অবস্থাটা কি দেখুন। বাজারে গিয়ে দেখুন সকালে একদাম—বিকালে আর এক। আজ যা পাচ্ছেন কাল তা পাবেন নিশ্চয়ই, তবে অনেক বেশি দামে গোপন পথে। তার ওপর…

—তাহলে আপনি বলছেন, যে বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হচ্ছিল তা ঠিকই?

—তা আমি বলছি না।

—কি বলছেন আপনি?

—আমি সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে চাই।

—ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকই তাই চান।

—চাই ভবিষ্যতের নিরাপত্তা।

—সেটাও সকলের কাম্য। অবশ্য আপনাকেও আপনার নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

—কেমন করে?

—সেটা আপনিই চিন্তা করুন।

শুনেছি সকলের আলোচনা। নীরব শ্রোতা আমি। যে আমি একদিন স্বপ্ন দেখতাম। মানুষের কল্যাণ কামনা করতাম। সেই আমি সমাজের রূপ দেখে বহুবার আতঙ্কে শিউরে উঠেছি। আমার স্বপ্ন বাস্তবের নির্মম কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। বারবার প্রশ্ন জেগেছে মনে, এ কোথায় চলেছি?

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, তার আদর্শ একান্ত ভারতীয় হওয়া উচিৎ বলে মনে হয়েছে আমার। ভারতের মানুষ, তার আকাশ মাটি—তার নিজস্ব। এই মাটিতে অন্য ভাবধারা তো টি'কতে পারে না।

দুশো বছরের ইংরেজের শাসন জাতির পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়েছিল। লোভী সুযোগ সন্ধানী করে তুলেছিল মন। আত্মসর্বস্ব করে গড়ে তুলছিল। ইংরেজ চলে গেছে। কিন্তু লোভের ছায়া কি মুছে গেছে আমাদের মন থেকে? যে আমরা একদিন সকলের কথা ভাবতাম—সেই আমরা ভাবি শুধু নিজের কথা।

আমরা শিশুর খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলি, ভেজাল দিই খাদ্যে, ওষুধে। আমরা সময়ে কাজে যেতে চাই না—কাজ না করে মাইনে নিতে পারলে ছাড়ি না। নিজেকে বোঝাই—কোন অন্যায় করছি না আমি। কালো-

বাজারী আমরাই। আমরা ঘুসের বশ। আমরা পড়ি না কিন্তু পাশ করতে চাই। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করি আমরাই। হাজার অন্যায়ের বশীভূত আমরা। আমরা নিজেরাই নিজেদের শেষ করে দিচ্ছি—শেষ হয়ে যাচ্ছি। অপরাধের শেষ সীমায় নেমে যাচ্ছি। হয়তো ব্যক্তিগত ভাবে আমি সৎ, কর্তব্যপরায়ণ কিন্তু অসহায়। যে পরিস্থিতিতে পৌছেছিল দেশ—মানুষ, সেখানে প্রয়োজন ছিল কঠোরতার। ভুলের সংশোধন নিশ্চয়ই আছে।

১৯শে জুলাই, ১৯৫৯ সাল।
সম্পাদকের লেখনী :

১৯শে জুলাই তারিখটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ দিন শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের পদত্যাগ-পত্র প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেছেন। প্রথম এই ঘটনাটি প্রচার হবার পর দ্বিতীয় যে ঘটনাটি প্রচারিত হয়েছে তা ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে উল্লিখিত হবে। ঐ ঘটনাটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পর অর্ডিন্যান্স জারী করে ভারতের বৃহৎ চোদ্দটি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা এবং আর আমানত না বাড়াবার জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া।

প্রথম ঘটনায় অর্থাৎ শ্রীদেশাইয়ের পদত্যাগের ব্যাপারে দলীয় রাজনীতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় বক্তব্য ছিল এই যে, বাঙ্গালোরে এ. আই. সি সি. অধিবেশনে ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হাতে-কলমে তা কার্যকর করে তুলতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা এবং ঐ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পালনীয় কর্তব্য বলেই অর্থদপ্তর তাঁরই হাতে ন্যস্ত থাকা উচিৎ। বলা বাহুল্য, দেশাই অর্থদপ্তর ছেড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে থাকা সম্মানজনক কাজ বিবেচনা করেননি, তাই পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি যাতে ঐ দপ্তরে থাকতে পারেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাঘা-বাঘা নেতৃবৃন্দ দরবার করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রাজি না হওয়ায় দেশাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এবং তারপরই শ্রী এস. কে. পাতিল হুমকি দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে পদচ্যুত করে যে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার যথাযথ

মোকাবিলা করা হবে।

আমাদের মনে হয় শ্রীমতী গান্ধী গভীর ভাবে ভেবেচিন্তেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়ে ইতি কর্তব্য করেছেন। তবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে এটাই প্রমাণ হচ্ছে, কংগ্রেস দলের মধ্যে যে বিরাট ফাটল ধরেছে, তার জের এখানেই শেষ হবে না।

কিন্তু এটাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘ বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে অনেক ভাবে সমাজবাদের কথা বলা হলেও, শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রথম ধাপে পা দিতে গিয়েই যেন সাপের ফণায় পা দিয়েছেন। তবু তাঁর দৃঢ়তা ও মনোবল প্রশংসনীয়। সেই কারণে তিনি জনগণের প্রশংসা লাভ করেছেন।

অবশ্য স্বতন্ত্র, বি. কে. ডি এবং জনসঙ্ঘ হৈ-চৈ শুরু করেছে। দেশটা যেন জাহান্নমে গেল, দেশের শিল্প গেল।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা মাত্র। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ না হওয়ার ফলে কালোবাজারী, ফাটকাবাজী, আজ উর্ধ্বমুখী। ব্যাঙ্কে জমানো টাকায় জনসাধারণের কল্যাণ করা যায়নি; কারণ শিল্পপতিরাই এতদিন নিজেদের স্বার্থে সে-টাকা কাজে লাগিয়েছে। অথচ অর্থের অভাবে চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার কাগজ-পত্রে উই ধরতে শুরু করেছে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন,

যে সব দেশ সমাজবাদী নয়, সে সব দেশেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে।

বিরোধী এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তো বটেই, স্বপক্ষের সহযোগীরাও ভাবতে পারেননি যে, ইন্দিরা গান্ধী এতখানি দৃঢ়তা, এতখানি মনোবলের অধিকারিণী। দুটো কাজের মধ্য দিয়ে সেদিন ইন্দিরা গান্ধী প্রমাণ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক বিচার-বুদ্ধি কত নিখুঁত ও প্রখর। বাঙ্গালোরে কংগ্রেস অধিবেশনে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব করে সম্মেলনে অনুপস্থিত প্রধানমন্ত্রী একটা নোট পাঠিয়েছিলেন।

অর্থমন্ত্রী দেশাই, নেতা পাতিল তাতে এমন ভাব করলেন যেন কেউ মৌচাকে ঢিল মেরেছে। বিরুদ্ধবাদীরা ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ চান না, শ্রীদেশাইয়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ফর্মুলা পেয়েই খুশি। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে যাদের টিকি বাঁধা, তারা করবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবনের আপোষ-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এতটা বাড়াবাড়ি সিণ্ডিকেট গ্রুপ বরদাস্ত করতে প্রস্তুত

নয়। অলক্ষ্যে শুরু হল এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র—প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে ইন্দিরা অপসারণের গভীর চক্রান্ত। কারণ সিণ্ডিকেট মনে করে যে, জওহরলাল কন্যাকে তাঁরাই দয়া করে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছেন, কাজেই ইচ্ছে করলে তাঁকে তাঁরাই আবার গদিচ্যুত করতে পারেন। ভারতবর্ষের জনগণ কেউ নয়, কংগ্রেসের অন্য সদস্যরাও হুকুমের দাস মাত্র।

সে-ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সভায়, যখন দেখা গেল প্রেসিডেণ্ট পদে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থী জগজীবন রামকে সিণ্ডিকেট প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির কাছে পরাজয় বরণ করতে হল। অভূত-পূর্ব না হলেও ঘটনাটা ছিল অভাবনীয়। শ্রীমতী গান্ধী প্রেস কনফারেন্সে এ-ধরণের নির্বাচনে তাঁর ক্ষোভ গোপন রাখেননি। কারণ, পঞ্চাশ কোটি মানুষের মাথার মুকুট হয়ে যিনি বসবেন তাঁর এ পদ্ধতিতে নির্বাচন আর যা-ই হোক, শোভন নয়।

আত্মসম্মান বোধ যাঁর আছে তাঁর পক্ষে এ আঘাত মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি; বিশেষত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অর্থনৈতিক নোটের প্রতিক্রিয়া সঞ্জীব রেড্ডির জয়লাভ।

এরপরই প্রধানমন্ত্রী শক্ত হয়েছেন। অন্যায় আপোষের পথ পরিত্যাগ করেছেন। অর্থদপ্তরের ভার নিজের হাতে নিয়েছেন তিনি। আলোচনা, পরামর্শ, হুমকি কোন কিছুতেই তিনি দেশাইকে অর্থদপ্তর ফিরিয়ে দেননি। কারণ তিনি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, কোন কিছুতেই মাথা নত করলে চলবে না। একবার যদি ভুল পথে পা বাড়ান সে ভুলের সংশোধন আর কোন দিনই সম্ভব হয়ে উঠবে না তাঁর পক্ষে। দেশের কাছ থেকে—মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবেন। হয়ে পড়বেন বিপুল স্বার্থান্বেষীর হাতের পুতুল মাত্র। কোন রকমে টিঁকে থাকবেন ক্ষমতায়।

তারপরই ঐতিহাসিক, বৈপ্লবিক ঘোষণা: দেশের বড় বড় চোদ্দটি ভারতীয় ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ। প্রকৃত সমাজতন্ত্রের পথে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম পদক্ষেপ।

অথচ সেই ১৯৫৪ সালের আবাদী অধিবেশনে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিল। ভুবনেশ্বর অধিবেশনেও কংগ্রেস দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়েছিল। কিন্তু দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে প্রায় কিছুই করেনি। পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত হানতে সাহস করেনি।

কিন্তু দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের চেয়ে

অসংখ্য মানুষের কথাই সেদিন তিনি প্রথমে চিন্তা করেছিলেন। সেইজন্যেই অন্যায় আপোষের প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করতে পেরেছিলেন।

জন্ম : ১৯শে নভেম্বর ১৯১৭ সাল।

শিক্ষালাভ : সুইজারল্যাণ্ডে, কবিগুরুর শান্তি নিকেতনে, অক্সফোর্ডের সোমারভিল কলেজে।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল যখন ইয়োরোপ, আমেরিকা, সোভিয়েট য়ুনিয়ান আর এশিয়ার অন্যান্য দেশে গিয়েছেন, কন্যা ইন্দিরাও গিয়েছেন সঙ্গে। দেশ ভ্রমণ আর সেক্রেটারী হিসাবে বাবাকে সাহায্য করা, একসঙ্গে দুই কাজ।

হরিজন নারীদের নিয়ে প্রথম কংগ্রেস বা জাতীয় আন্দোলনে নামেন। তারপর যুব আন্দোলন। একুশ বছর বয়সে কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ। কারাবাস তের মাসের। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির এবং যুব-উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য পদ। ১৯৫৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি।

নেহেরুর মৃত্যুতে লালবাহাদুর মন্ত্রীসভায় যখন তাঁকে তথ্য ও বেতার দপ্তর দেওয়া হল তখন অনেকেই পরলোকগত নেতার প্রতি সম্মানসূচক বলে মনে করেছিলো। এমন কি যেদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন, সেদিনও বহু নেতা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে নেহেরুর কন্যা বলেই তাঁকে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হল, আসলে প্রধানমন্ত্রীত্বের যোগ্যতা তাঁর নেই।

একজন বিরোধী নেতা বলেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দেশবাসীর এ-লাভ হল যে, তারা রোজ সকালে খবরের কাগজে একটা সুন্দর মুখ দেখতে পাবে।

কিন্তু সরোজিনী নাইডু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেদিন : ইন্দিরার জন্মে ভারতের নতুন আত্মা জন্মলাভ করল!

অনেকে অনেক কথা বলেছেন, অনেকে অনেক কথা ভেবেছেন। বিরোধিতা, সমালোচনা, ষড়যন্ত্রের অভাব হয়নি। এবং শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হবার সময় নয়, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের সময়ও ইন্দিরা গান্ধীকে কম বাধার প্রাচীর অতিক্রম করতে হয়নি!

ভয়! হয়তো ভয়েই। কারণ কংগ্রেস তখন মুষ্টিমেয় মানুষের। দেশের শতকরা পাঁচজন ভাগ্যবানের রক্ষাকর্তা। পঁচানব্বইজন মানুষের 'কেউ

নেই। মুষ্টিমেয় নেতা কংগ্রেসের সর্বময়কর্তা। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা। দেশের কথা, দশের কথা ভাববার সময় কোথায় তাঁদের?

এই ভাগ্যবানের দল জওহরলাল নেহেরুকে ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে রেখেছে। মানুষের কাছ থেকে সব সময় দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি সাধারণ মানুষের কথা। শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রের বিশাল হৃদয়ের অধিকারী মানুষটি রাজনীতির অন্তরালে সহকর্মীদের স্বার্থের লালসা দেখে শিউরে উঠেছেন। অসহায় ভাবে মাথা কুটেছেন। কখনো গর্জে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন সুন্দর ভারত গড়ার। সে স্বপ্ন সার্থক করা সম্ভব হল না কেবলমাত্র রাজনীতির কুটিল আবর্তে।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নিয়েও কুটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। এল যুদ্ধ। পাকিস্থান ভারতভূমি আক্রমণ করল। মৃত্যু এল অকস্মাৎ। না হলে হয়তো স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে বিদায় নিতেন তিনি।

তারপর ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৬ সাল। ভারতবর্ষের রাজনীতির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মোরারজী, অতুল্য, পাতিল যেন কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি। বিশেষ করে পাতিল তুলনাহীন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের উৎসব দিল্লীতে। আলাপ আলোচনা, ব্যস্ততার অন্ত নেই। ফাটকার বাজার যেন। চলছে গোপন কেনা বেচা। নেতাদের মত শিল্পপতির দলও সক্রিয়। ঈশান কোণে মেঘের ছায়া। ইন্দিরা আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত ভাগ্যবানের দল।

নির্বাচন শেষ হল। ফলাফল:

সে সময় কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা মোরারজী দেশাই ভোট পেলেন—১৬৯টি।

অতি সাধারণ ইন্দিরা গান্ধী—৩৫৫টি।

বিজয়িনী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, 'I thank those who voted for me and those who voted against me...once elections are over it is only fit and proper that differences should be forgotten and we should all work together.'

২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের ভাষণে তিনি দেশকে উন্নত এবং মানুষের দুঃখ মোচনের প্রতিজ্ঞাও করলেন।

তারপর.........

জুলাই ১৯৬৯ সাল।

বাঙ্গালোর। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের নোট পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

১। কোম্পানির অনুৎপাদক ব্যয় ও প্রত্যক্ষ খরচাদির সীমা নির্ধারণ।

২। উপযুক্ত ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ যাতে বাড়ে রাষ্ট্রীয়করণের আওতাভুক্ত আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদান ব্যবস্থাকে তদনুপাতে পরিবর্তন করার প্রয়োজন।

৩। অনধিক উন্নত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগে আর্থিক সাহায্য দান।

৪। একচেটিয়া কমিশনের শীর্ষে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিয়োগ।

৫। সরকারী উদ্যোগে তরুণতরদের নিয়োগ ও অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতাদানের ব্যবস্থা।

৬। সরকারী উদ্যোগে বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারী সংস্থা গড়ার চেষ্টা।

৭। নতুন প্রতিভার নিয়োগ পথে বাধা অপসারণ।

৮। স্থানীয় শিল্প-কুশলী পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য প্রবেশে নিষেধারোপ।

৯। অধিকাংশ ভোগ্যপণ্য শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাধীন করা এবং সেখানে বৃহৎ ব্যবসায়ের খবরদারি নিয়ন্ত্রণ করা।

১০। কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

১১। গ্রামাঞ্চলে কৃষি-সমবায় গঠন।

১২। খামার সমবায় এবং কৃষকগণ যাতে কৃষিভিত্তিক ও অপরাপর শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হন, সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন।

১৩। ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্পাদির উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

তের দফা ছাড়াও তিনি যে কটি বিতর্কিত প্রস্তাব অধিবেশনের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে পাঠিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণী চক্রকে কর্তব্যবিমূঢ় করেছিলেন, সেগুলি হল :

১। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। সরকারী ঋণ-পত্রে ব্যাঙ্কের আইনসম্মত লগ্নীর সীমাবৃদ্ধি।

২। একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতা খর্ব করা ও শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ দেওয়ার জন্য শিল্প লাইসেন্স নীতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব।

৩। শিল্পের কাঁচা মাল জাতীয়করণ।

বাঙ্গালোর অধিবেশনে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন কামরাজ, চ্যবন, জগজীবন রাম, স্বর্ণ সিং, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ প্রমুখেরা।

আর মোরারজী দেশাইয়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রধান সমর্থক পাতিল, মোরারজী, নিজলিঙ্গাপ্পা, রাম সুভগ সিং এবং সি. বি. গুপ্ত। এঁরা সেদিন দল ভাঙতে রাজি, গররাজি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাব গ্রহণে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত :

কামরাজ : আমি খুশি!

পাতিল : আমাদের আপোষ করতে হল। দল ভাঙুক। চাই না।

নিজলিঙ্গাপ্পা : প্রধানমন্ত্রীর নোটটি ওয়ার্কিং কমিটিতে বিবেচনার বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। কারণ ঐ নোট না এ-আই-সি-সি, না ওয়ার্কিং কমিটি—কাউকেই সম্বোধন করে লিখিত হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী : নোটটি গ্রহণ করা অপেক্ষা দলকেই ভেঙে দেওয়া শ্রেয়—পাতিল সাহেবের এহেন ভীতি প্রদর্শনের জবাবে—আমি চাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাব কার্যকরী করা হোক।

সংবাদ :

১৯শে জুলাই, ১৯৫৯ তারিখে 'ব্যাঙ্কিং কম্পানিজ (অ্যাকুইজিসন এণ্ড ট্রান্সফার অব আণ্ডারটেকিংস) অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯' বলবৎ করা হয়েছে। দেশের অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধ করার উদ্দেশ্যে এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ভারত সরকারের এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ও সাহসিক। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে গৃহীত এই পদক্ষেপকে সারা দেশের সুস্থ-চিন্তাসম্পন্ন মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা এই আশাও প্রকাশ করেছেন যে, সরকার এখানেই থামবেন না, শীঘ্রই সাধারণ বীমা ও আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের কর্মভারও নিজেদের হাতে গ্রহণ করবেন।

ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রধান প্রধান ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলোর জাতীয়-করণের ফলে ভারতবর্ষের মানুষের দীর্ঘদিনের এক দাবি পূর্ণ হয়েছিল। কংগ্রেসের একটা পুরনো প্রতিশ্রুতি পালিত। সূচনা করাচি কংগ্রেসে—তারপর থেকে কংগ্রেস বারবার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে।

পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত এ-আই-সি-সি'র অর্থনৈতিক কর্মসূচী কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল :

"বিনিয়োগের জন্য প্রাপ্য সমস্ত সম্পদ থাকবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীন। শিল্পে অর্থ লগ্নীর জন্য রাষ্ট্রই গঠন করবে ফিনান্স কর্পোরেশন। ব্যাঙ্কিং ও বীমা জাতীয়করণ করতে হবে।"

ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে জাতীয়করণের নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪৮ সালে জাতির উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন :

"...নতুন যে সব উদ্যোগ একচেটিয়া ধরণের কিম্বা তাদের কাজের পরিধির দিক থেকে সামগ্রিকভাবে সারা দেশ জুড়ে কাজ করে অথবা একটা প্রদেশের চেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে ব্যবসায় করে, সেগুলো সরকারী মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে..."

কিন্তু জীবনবীমা কোম্পানিগুলোকে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াকে জাতীয়করণ করার পর কংগ্রেস সরকার জাতীয়করণের কর্মসূচী বন্ধ রাখে।

তারপর থেকে শুধু প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি। সুবিধাজনক মুহূর্ত এলেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হবে। কিন্তু সেই সুবিধাজনক মুহূর্ত আর এল না। কায়েমি স্বার্থ সুকৌশলে বাধার সৃষ্টি করে চলল একের পর এক। এমন ধারণার সৃষ্টি করল যে, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নততর ও অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন; আর রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলো সবই অপচয় বহুল ও অ-দক্ষ।

সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা এবং দেশগঠনের কাজে অগ্রাধিকারকে বিকৃত করতে শুরু করে, সেই সঙ্গে দেশকে তার ঘোষিত লক্ষ্য থেকে বিপথে চালিত করার অনলস চেষ্টা চালায়। তার ফলে অর্থনীতিতে দেখা দেয় বহু গুরুতর সংকট। অর্থনীতি মূলত বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ভীষণ ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা কমিশনকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়, অর্থনীতির পরিকল্পিত বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে বেকারি এক বিরাট ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

অর্থনীতিকে 'মুদ্রাস্ফীতি মূলক মন্দা'র সম্মুখীন হতে হয়। একদিকে বিরাট অব্যবহৃত শিল্প ক্ষমতা, তার সঙ্গে কাঁচা মাল ও অন্যান্য জিনিসের সরবরাহের অভাব। আর অন্যদিকে মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি।

এই সময়ে অর্থ যোগানের প্রতিষ্ঠানগুলোর, বিশেষত ব্যাঙ্কের, ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সেগুলোকে কাজে লাগাল

অর্থনীত ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন মাল ধরে রাখার উদ্দেশ্যে, তার ফলে দেখা দিল মুনাফাখোরি এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে অসদুপায় অবলম্বন।

ভারতের ব্যাঙ্কগুলোকে সাধারণ ভাবে দুটো গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা:

১। শিডিউল্ড

২। নন-শিডিউল্ড।

১৯৫১-র পর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে। ১৯৫১-তে উপরোক্ত দু'ধরণের ব্যাঙ্কের মোট সংখ্যা ছিল ৫৬৬টি। ১৯৫৫-তে তা নেমে এসে দাঁড়ায় ১০৯টিতে। ১৯৫৫-তে নন-শিডিউল্ড বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৩টি। এখন (১৯৫৯) ভারতীয় শিডিউল্ড বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কেয় সংখ্যা ৫৮টি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী, ১৯৫৫-তে ব্যাঙ্কের আমানত ছিল বর্তমান মূল্যস্তরের (১৯৫৯) জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ, আর ১৯৫১-তে ছিল ৯ শতাংশ।

ব্যাঙ্ক আমানত বেড়েছে গড়ে প্রায় ১৬ শতাংশ হারে অর্থাৎ ১৯৫১-র ৯০৮·৪৭ কোটি টাকা থেকে ১৯৫৫-তে ৩০৭৩·৩৬ কোটি টাকা।

১৯৫৮-র শেষে ৫৮টা শিডিউল্ড ব্যাঙ্কে আমানত হিসেবে ছিল ৩৭৯২ কোটি টাকা এবং দাদন হিসাবে ২৭৮৩ কোটি টাকা।

যে চোদ্দটা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে তাতে আছে ভারতবর্ষের শিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলোর মোট আমানতের শতকরা ৭২ ভাগ এবং দাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ।

ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস এবং আমানত বৃদ্ধির ফলে এই কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। ব্যাঙ্ক আমানত যেহেতু বিনিযোগ যোগ্য এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিমাণের পরিচায়ক এবং আমানত বদ্ধি যেহেতু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হারের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি হয়েছে, সেই হেতু ব্যাঙ্কগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোরই তার ওপর দখল ছিল এবং বিনিয়োগের ছকটা কী হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও ছিল তাদেরই। আর এই বিনিযোগের ছকটা অবশ্যই জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১৯৫০-র দশকে ভারত সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নিয়ে নেন। সেটা পরিণত হয় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায়। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তার সাতটি সাবসিডিয়ারি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রেই আছে। মোট চোদ্দটি

ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্ক ব্যবসায় করছে এবং যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আমানত পঞ্চাশ কোটি টাকার কম, তাদের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি।

জাতীয়করণ করা ব্যাঙ্কগুলো হল :

১। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

২। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

৩। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

৪। ব্যাঙ্ক অব বরোদা

৫। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

৬। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

৭। কানাড়া ব্যাঙ্ক

৮। দেনা ব্যাঙ্ক

৯। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

১০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

১১। সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক

১২। ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক

১৩। ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এবং

১৪। ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র

এই ব্যাঙ্কগুলোতে ছিল ভারতীয় শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের মোট আমানতের শতকরা ৭২ ভাগ এবং মোট দাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ।

১৯৫৮ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কগুলোর মোট আমানত ছিল :

		কোটি টাকায়
১।	সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪৩৩
২।	ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৩৯৫
৩।	পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৩৫৬
৪।	ব্যাঙ্ক অব বরোদা	৩১৪
৫।	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	২৪১
৬।	কানাড়া ব্যাঙ্ক	১৪৬
৭।	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১৪৪
৮।	দেনা ব্যাঙ্ক	১২২
৯।	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১১৫

১০। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১১৩
১১। সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক	১১২
১২। ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	৯৩
১৩। ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	৮৫
১৪। ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	৭৩
মোট	২৭৪২ কোটি টাকা

১৯৫৮ সালে ৩৮টি ভারতীয় শিডিউল্ড ব্যাঙ্কে তাদের মোট আমানতে ১৩'৩ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই বছরে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে ১৫'২ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে। এই ৩৮টি ব্যাঙ্কের মধ্যে আছে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও তার সাতটি সাবসিডিয়ারি ব্যাঙ্ক।

১৯৫৮-তে ১৪টি প্রধান ব্যাঙ্কের তহবিলের উৎস ও তার ব্যবহার

উৎস		(লক্ষ টাকায়)
(ক) আদায়ীকৃত মূলধন		৪৯
১। ইকুইটি		
২। প্রেফারেন্স		
(খ) সংরক্ষিত তহবিল ও উদ্বৃত্ত		২৪৯
(গ) ডেপ্রিসিয়েশন		২২৪
(ঘ) আমানত ও অন্যান্য অ্যাকাউণ্ট		৩৫১,২৫
৩। স্থায়ী আমানত		১৮৭,৯৩
৪। সেভিংস ব্যাঙ্ক আমানত		৮২'৬৫
৫। কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট		৮০'১৮
(ঙ) অন্যান্য ব্যাঙ্ক, এজেণ্ট প্রভৃতির কাছ থেকে ঋণ	(—)	৪৩৭
(চ) প্রদেয় বিল		৮৫৪
(ছ) অন্যান্য দায়-দায়িত্ব	(—)	১৩২
	মোট	৩৫৯,৩২

ব্যবহার :

(জ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্কে নগদ হাতে মজুত	৩৭,১০
(ঘ) অন্যান্য ব্যাঙ্কে মজুত	১২,২৯
(ঞ) 'কল' নোটিশ ও শর্ট নোটিশের জন্য অর্থ	২০,০৪
(ট) বিনিয়োগ	১২২,৮৭

	৬. সরকারী সিকিউরিটি	১১২,০০
	৭. শিল্পক্ষেত্রের সিকিউরিটি	৭,০৪
	৮. অন্যান্য লগ্নী	৩,৮৩
(ঠ)	দাদন	১৫৪,১৯
	৯, ঋণ, নগদ ঋণ, ওভারড্রাফ্ট ইত্যাদি	১১৭,২৯
	১০. ডিসকাউন্ট করা ক্রীত বিল	৩৬,৯০
(ড)	মোট স্থায়ী সম্পত্তি	৬,৬০
(ঢ)	অন্যান্য সম্পত্তি	৬,১৮
(ণ)	নন-ব্যাঙ্কিং সম্পত্তি	৫
	মোট	৩৫৯,৩২

এই ১৪টি ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে ট্যাক্স দেবার পর মুনাফা পেয়েছে যথাক্রমে ৪,৩০ লক্ষ টাকা এবং ৪,৩৭ লক্ষ টাকা। আর সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বাকি ১৬টি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ওই দু' বছরে ট্যাক্স দেবার পর মুনাফা পেয়েছে যথাক্রমে ১৭ লক্ষ এবং ১৮ লক্ষ টাকা।

১৪টি ব্যাঙ্কের নীট মুনাফা :	১৯৫৮ সালে (লক্ষ টাকায়)
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	১,৫০
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	৭৪
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	১,১৯
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	৬৩
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	৫৫
কানাড়া ব্যাঙ্ক	১৯
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক	২৬
দেনা ব্যাঙ্ক	৩১
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	২২
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	২০
সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক	৩১
ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক	১৫
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	১৩
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	২৪
মোট	৬৬২

উপরোক্ত ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলো নিয়ন্ত্রণ করত দেশের বৃহত্তর ব্যবসায়ীরা।

টাটারা : সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

বিড়লারা : ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ডালমিয়া জৈন : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

গুজরাতি বৃহৎ ব্যবসায়ীরা : দেনা ব্যাঙ্ক।

এই বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা তাদের ইচ্ছামত ব্যাঙ্কের সম্পদ ব্যবহার করত। দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রতি কোন দিন ভ্রূক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করেনি।

যেমন, গ্রামীন ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য টাকা দরকার। ন্যাশনাল ক্রেডিট কাউন্সিল পরামর্শ দিয়েছে যে, কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ দানকে সম্প্রসারিত করার কাজ মেটাতে হবে আমানত জড়ো করার মারফৎ বাড়তি সম্পদ থেকে। কৃষি ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বরাদ্দ হবার কথা ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ৩১ শতাংশ। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলো এই পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। গ্রামাঞ্চলকে বরাবরই উপেক্ষা করে গেছে।

অক্টোবর ১৯৫৭-তে এক সমীক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত ভারতীয় শিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলোর অফিসের মাত্র ৩·৮ শতাংশ রয়েছে সেই সব জায়গায় যেখানে জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের কম ; ১৩·২ শতাংশ অফিস হল যেখানকার জনসংখ্যা দশ হাজারের কম। আর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া গ্রামের গভীরে প্রবেশ করেছে।

স্টেট ব্যাঙ্ক ও তার সাবসিডিয়ারিগুলো গ্রামীন ক্ষেত্রে খাদ্য শস্য সংগ্রহ ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে যে ঋণ দিয়েছে তা ১৯৫৭-তে ৩৬·২ কোটি টাকা থেকে ১৯৫৮-তে বেড়ে হয়েছে ১২২·৭ কোটি টাকা।

১৯৫৮-তে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলোর ২,৩৮৪টি অফিসের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগই ছিল গ্রামীন ও আধা-গ্রামীন এলাকায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ হারে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের অবদান অনেকখানি। কিন্তু বহু নৈতিক উপদেশ ও তথাকথিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মালিকানা ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলো গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করে এসেছে।

অঞ্চলগত বিকাশের ভারসাম্যহীনতা দূর করা এবং সমস্ত অঞ্চলের সুষম অর্থনৈতিক বিকাশ—এই ছিল আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু

ব্যাঙ্কগুলো ব্যক্তিগত মালিকের হাতে যতদিন থাকবে, ততদিন তারা পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোকে যথেষ্ট ঋণের সুযোগ দেবে না,: কারণ সেখানে মুনাফার সম্ভাব্যতা কম। সেইজন্যেই তারা দিনের পর দিন অপেক্ষাকৃত কম উন্নত অঞ্চল থেকে উন্নততর এলাকায় সম্পদের প্রবাহকে নিশ্চিত করেছে।

১৯৫৭ সালে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির উদ্যোগে 'ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভারতীয় অর্থনীতি' নামে এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল :

'......দেখা যাবে যে অধিকাংশ শেয়ারের মালিকই হচ্ছেন ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পরিবারবর্গ, সারা দেশ জুড়ে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন। অপর দিকে শেয়ার-হোল্ডারদের একটা ভগ্নাংশ শেয়ারের একটা বেশ বড় অংশের মালিক। শেয়ার হোল্ডারদের ইতঃস্তত ছড়িয়ে রাখাটা ব্যাঙ্কে শেয়ার-হোল্ডারদের এক ক্ষুদ্র অংশের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে। যে কোম্পানিতে সাধারণ সভায় সমস্ত শেয়ার-হোল্ডাররাই উপস্থিত থাকতে পারেন, সেখানে যে গোষ্ঠীটি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে চায় তার দরকার ৫১ শতাংশ ভোট। কিন্তু শেয়ার-হোল্ডাররা যদি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকেন, আগ্রহী গোষ্ঠীটি অনেক কম ভোট নিয়েই কোম্পানির ওপর নিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করতে পারেন। বিরাট দূরত্ব এবং সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারদের আগ্রহের অভাবের ফলেই ছোট একটা গোষ্ঠী ব্যাঙ্কগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ চালায়।

আমাদের সংবিধানের মূলনীতি বহু দিন আগেই সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে ভাঙতে। সরকারও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে বারবার শুধু এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

ব্যক্তিগত ব্যাঙ্কগুলোর মোট আমানতের তুলনায় আদায়ীকৃত মূলধনের অনুপাত অত্যন্ত কম। ব্যাঙ্কগুলোর আমানতকারীরা যে নিরাপত্তা ভোগ করতেন তা যথেষ্ট ছিল না, কারণ তা নির্ভর করত তাঁদেরই যোগ্যতা এবং দক্ষতার ওপর, যাঁরা ব্যাঙ্কের সম্পদেরও বিনিয়োগ নির্ধারিত করতেন।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো কিভাবে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করত তা দেশের ২০টি প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

২০টি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর বোর্ডের মোট ১৮৮ জন ব্যক্তি ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করতেন। এই ১৮৮ জন ব্যাঙ্ক ডিরেক্টর অন্যান্য কোম্পানির ১৪৫২টি ডিরেক্টর পদ অধিকার করে ছিলেন। তাঁদের অধীনে মোট কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১১০০।

ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কগুলো কালো টাকার বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে অনেকগুলো ব্যাঙ্কে ভুয়া একাউন্ট চালানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্কের মারফৎ ওভার ইনভয়েসিং ও আণ্ডার ইনভয়েসিংয়ে দেশ বিরাট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে ভুয়া ও জাল ব্যবসায়িক লেনদেনের কাজে এবং বেনামি শেয়ার কেনার কাজে।

১৯শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সর্বসম্মত সুপারিশ অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি এক অর্ডিন্যান্স জারী করে দেশের চোদ্দটা ভারতীয় ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন।

২১শে জুলাই ১৯৫৯, স্বতন্ত্র দলের মিনু মাসানী এবং জনসঙ্ঘের বলরাজ মাধোক সুপ্রীম কোর্টে এই অর্ডিন্যান্স জারীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এক মামলা দায়ের করায় সুপ্রীম কোর্ট মামলার রায় সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন :

১। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া চলবে না, যা ১৯৫৮ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনের বিরোধী,

২। কোন নতুন উপদেষ্টা বোর্ড নিয়োগ করা চলবে না,

এবং ৩। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পুরানো চেয়ারম্যানদের অপসারণ করা চলবে না।

১৯৫৮ সালের শেষে সদ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা :

(কোটি টাকার হিসাবে)

নাম :	আদায়ীকৃত মূলধন	আমানত	দাদন
সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৪-[illegible]	৪৩৩-২৭	২৭৬-২৭
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪-০৫	৩৯৪-৯৭	২৫৩-০৫
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	২-০০	৩৫৫-৯৬	২০৯-৪০
ব্যাঙ্ক অব বরোদা	২-৫০	৩১৩-৮০	১৯৬-১৪
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	২-৮০	২৪০-৫৮	১৪৪-০০
কানাড়া ব্যাঙ্ক	১-৫০	১৪৬-৪৪	৯৬-৭২
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক	২-৬৯	১৪৩-৮৯	৯৯-৬১
দেনা ব্যাঙ্ক	১-২৫	১২১-৮৮	৭৪-০৮
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১-২৫	১১৫-২২	৬৮-৬৩
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১-০৫	১১১-৭২	৬৯-৯৩
সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক	১-২৯	১১২-১৯	৭০-৬১

ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	১-০০	৯৩-২২	৫৮-৩২
ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	০-৮৯	৮৪-৫৯	৫৭-১৬
ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	১-৪৮	৭৩-০২	৪৯-৭৪
	২৮-৫০	২৭৪১-৭৬	১৭৪৩-৬৬

কংগ্রেসের দীর্ঘ দিনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি প্রথম পালিত হল। লৌহমানব বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ইন্দিরা গান্ধীকে কোন রূপে চিহ্নিত করা উচিৎ ছিল সেদিন? না, ইন্দিরার কোন নতুন রূপ নেই। ইন্দিরা—ইন্দিরা। সরোজিনী নাইডুর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে একটি কথাই বলা চলে, ইন্দিরা ভারতাত্মা!

সেদিন, ১৯৫৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের বিত্তবান শ্রেণী আর তাদের চাটুকারদের দলে গেল গেল রব উঠেছিল। তারা দেশবাসীকে প্রাণপণে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে দেশের অর্থনীতির উর্ধ্বগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং অধোগতি হবার সম্ভাবনাটাই বেশি। কারণ জীবন বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করে বীমাকারীদের কোন সুবিধা হয়নি। আগে একজন কেরানী যে কাজ করতেন, সেই কাজ করতে রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর আধ ডজন লোক লাগে। তারা অফিসের বারো আনা সময় গালগল্প করে কাটিয়ে দেন। বাকি চার আনা সময় এণ্ডায় গণ্ডায় পার করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।

প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে গেলে অথবা ঋণ সংগ্রহ করতে গেলে বীমা-কারীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং সেই সঙ্গে নানা জনকে খোসামোদ। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর সেখানেও এই অবস্থা সৃষ্টি হবে। তার চেয়ে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত না করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চালু রাখাই ছিল ভাল। এবং সেই সঙ্গে বহু বিভ্রান্তিকর প্রচার।

প্রশ্ন জেগেছিল সাধারণ মানুষের মনেও। দেখা দিয়েছিল সংশয়।

উত্তরও পাওয়া গিয়েছিল কিছু কিছু। যেমন:

১। যে দেশ ইতিমধ্যেই মনোপলির বজ্রমুষ্টিতে চলে গেছে, সে দেশে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ শুধুমাত্র সঠিক পদক্ষেপ নয় অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ব্যাঙ্কের ওপর যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চালু করেছিলেন, সেটা শুধু বিরাট ধাপ্পাবাজী নয়

জালিয়াতিও। কারণ তথাকথিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণে মনোপলি সেবক ব্যাঙ্কের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের কোন চেষ্টা হয়নি। ব্যাঙ্কের মালিকরা পর্দার আড়ালে সরে গিয়ে পেটোয়া অফিসারদের মারফৎ ব্যাঙ্কগুলিকে পূর্ববৎ কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থ লগ্নী করার জন্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বার বার নির্দেশ পাওয়া সত্বেও ব্যাঙ্কগুলো সেই পথে এক পা-ও এগোতে চায়নি। মনোপলির নাগপাশ বিস্তারে এবং ফাটকা বাজীতে অর্থ লগ্নী করাতেই তাদের আগ্রহ ছিল বেশি।

২। জীবন বীমা জাতীয়করণের ফলে কর্মচারীদের মধ্যে ফাঁকিবাজীর ঝোঁক বেড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মনে হয় এ অভিযোগের ভিত্তি আছে। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিক কর্মচারীর দাবী দাওয়া সম্পর্কে যতখানি সচেতন, শ্রমিক কর্মচারীর দায় দায়িত্ব (বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে) সম্বন্ধে ঠিক ততখানি সচেতন নয়। এবং সেটা আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মস্ত দুর্বলতা। সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়নগুলো খুবই শক্তিশালী। তারা বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন কিন্তু সরকারি অফিসে দুর্নীতি এবং ঘুষ বন্ধ করার ব্যাপারে একেবারে নীরব। সম্ভবত তাঁদের ধারণা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলে তাঁরা বহু সংখ্যক কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়ে উঠবেন। এবং······

৩। ব্যাঙ্কের দাদন ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক সম্প্রসারিত হলে দেশের অর্থনীতি তেজী হয়ে উঠবে। তাতে সাধারণ মানুষই নানা ভাবে উপকৃত হবেন।

৪। কত তাড়াতাড়ি কত বেশি মুনাফা অর্জন করা যায় এটাই হল প্রাইভেট ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো সামাজিক লক্ষ্য পূরণের (সাধারণ মানুষের মঙ্গল) দিকে নজর রেখে তাদের সম্পদ লগ্নী করবে। তাতে সাধারণ মানুষই লাভবান হবেন।

৫। সৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায় বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দাদন পেতে কোন অসুবিধা বোধ করবে না, কাজেই ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণও সহজ হয়ে উঠবে।

৬। বড় বড় ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর কিছু মতলববাজ এবং কিছু বিভ্রান্ত লোক বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে সেটা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হয় না।

৭। গত বিশ বছরে ভারতবর্ষে একের পর এক ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় গরীব

আমানতকারীরা কয়েকশ কোটি টাকা লোকসান খেয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আমানতকারীর ষোল আনা নিরাপত্তা-সুনিশ্চিত। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আমানত হ্রাস পেয়ে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের আমানত বাড়বার কোন কারণ নেই। এবং আমানতকারীর সুদের হার সব ব্যাঙ্কেই সমান।

৮। অতঃপর মনোপলিস্টরা দাদনের জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোর ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হবার চেষ্টা করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের ওপর কড়া নজর রাখলেই ভাল।

৯। রাষ্ট্রায়ত্ত অন্যান্য শিল্প মোটেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি ঠিকই, তবে এখনও তারা শৈশবেই রয়েছে। প্রাইভেট শিল্পের ইতিহাসও আগাগোড়া সাফল্যের কাহিনীতে পরিপূর্ণ নয়। শিল্পপতিরা যে সব শিল্পের মালিকানায় রয়েছেন, সেই সব শিল্পের অ-আ-ক-খ সম্পর্কে অনেক মালিকেরই কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। বেতনভুক কর্মচারীরাই মালিকদের হয়ে শিল্প বাণিজ্য পরিচালনা করে থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের জন্যে প্রতিভাবান লোক সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন নয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিলে কর্মচারীদের পরিচালনায় অংশ প্রদানের যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কর্মদক্ষতা অনেক বেড়ে যাবে বলেই আশা করা যায়। কর্মচারীরা যদি উপলব্ধি করেন যে, তারা মুষ্টিমেয় মালিকের সমৃদ্ধি সাধনের জন্যে কাজ করছেন না. করছেন আপামর জনসাধারণের জন্যে, যদি তাদের মধ্যে এই জাতীয়তা বোধ সদাসর্বদা জাগ্রত থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই দ্বিগুণ উৎসাহে নিজেদের কাজে ব্রতী হবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীরা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করলে বাঞ্ছিত ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। যে কোন কাজের ভাল-মন্দ যখন একান্ত ভাবে কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল এবং কর্মীদের মধ্যে যখন সততা উচ্চ আদর্শের অভাব নেই, তখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সাফল্য অনিবার্য। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে নেতারা সজাগ থাকলেই. মঙ্গল।

১০। আপাতত সুস্থ প্রতিযোগিতার খাতিরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পৃথক অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় বলেই মনে হয়। তবে পরবর্তীকালে ব্যয় সংকোচের প্রয়োজনে সেটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।

১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সালের জুন। মধ্যে মাত্র ক'টা বছর পার হয়েছে। ১৯৫৯ সালে জীবন বীমা সম্পর্কে যে অভিযোগ দেখা দিয়েছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো সম্পর্কেও সেই একই অভিযোগ। সেই এণ্ডায় গণ্ডায় সময়

কাটানো। অভিযোগ, লাভবান বিত্তবানের দল। কোথাও বা সরকারী অর্থের অপচয়। ঘুষের কারবার ফলাও।

আজ জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে, বিশেষ করে সরকারী কর্মশালায় নতুন রূপ। নতুন কর্মপ্রবাহ। সুতরাং জরুরী অবস্থার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কতদিন এই জরুরী অবস্থা থাকবে? নিশ্চয়ই বেশিদিন নয়। তখন? তখন কি হবে? আজকের এই পরিবর্তনের স্রোত কি তখন আবার ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যাবে! আবার কি সেই শৃঙ্খলাহীনতা গ্রাস করবে মানুষকে, সমাজকে—রাষ্ট্রকে?

আমাদের প্রতি রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের ব্রত কি আমরা পালন করব না?

আমাদের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে কি কোনদিন সচেতন হব না?

লক্ষ্যহীনভাবে একজন মানুষ, সমাজ, একটা রাষ্ট্র বাঁচতে পারে না।

আমার আদর্শকে খুঁজে পেতেই হবে।

আমি কে?

কেন আমি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছি?

কি আমার কাজ?

আদর্শকে বুকে নিয়ে ঠিকই আমি এগিয়ে যেতে পারব আমার লক্ষ্যের দিকে।

কারণ আমার প্রথম পরিচয় আমি মানুষ।

'বাবা।' সরমা, আমার মেয়ে ডাকছে আমাকে।

আমি সরমার দিকে চাইলাম। রোগা রোগা আটপৌরে চেহারা, ঠিক ওর মায়ের মত। দেখলে মনে হবে রুগ্ন-দুর্বল। কিন্তু আমি জানি বাহ্যিক প্রকাশ দেখে ওকে বিচার করলে ভুল করা হবে। ও যত কোমল ঠিক ততই কঠিন। কঠিন বাস্তব ওকে পদে পদে শিখিয়েছে। বাস্তবের সিঁড়ি ভাঙছে প্রতিটি পদক্ষেপে। সংগ্রাম করে চলেছে ও জীবনের পথে।

ও বলে, জীবনে পাঠ আমার তোমার কাছে নেওয়া। কি শিখিয়েছ তুমি সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই, তোমাকে দেখে কি শিখেছি সেটাই আমার আগামী দিনের পথ চলার পাথেয়।

আমি চুপ করে থেকেছি।

সরমা আবার ডাকল, 'বাবা।'

ওর ডাক শুনে আকাশের দিকে চাইলাম। এখানে এখনো আকাশ দেখা যায়। সকালের রোদ এসে পড়েছে চারিদিকে। ফাল্গুনের শেষ। শীতের মিষ্টি আমেজটা এখনও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কটা বাজল?'

'ছ'টা দশ।' হাতে ধরা চায়ের কাপ আমার সামনে ছোট টেবিলটায় নামিয়ে রাখল সরমা। জিজ্ঞাসা করল, 'আজ ক'টায় উঠেছ তুমি?'

'বোধহয় সাড়ে চারটে হবে, ঘড়ি দেখিনি।'

'না, চারটে দশে আমি উঠেছি। তুমি অনেক আগে উঠেছ আজ।'

আমি চুপ করে রইলাম।

সরমা বলল, 'আজ একটু ঘুমোবার ইচ্ছা ছিল। অভ্যাস ঘুম ভাঙিয়ে দিল।'

'তোর স্কুল নেই?'

'আজ তো রবিবার।' হাসল সরমা। বলল, 'কাল রাত তখন একটা হবে। একবার উঠেছিলাম। দেখলাম তুমি তখন কি যেন পড়ছ। তুমি কি পড়া বন্ধ রেখে কাল ঘুমিয়েছিলে?'

ওর কথা বলার ধরণে হেসে ফেললাম। বললাম, 'হ্যাঁ, শুয়েছিলাম। ঘুমিয়েছি। ভোরবেলা ওঠা অভ্যাস। ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে গেছে। তোর ছেলে কি এখনও ঘুমাচ্ছে?'

'ঘুমোচ্ছিল। জোর করে তুলে দিয়েছি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিলাম আমি। সরমা সংবাদ পত্রটা তুলে নিল। আজ ওর স্কুল নেই। অন্যদিন এতক্ষণ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে চলে যায়। কাছেই স্কুল। সেখানে পড়ায়। ও স্কুলে চলে যাবার পর একটি মেয়ে আসে। সে-ই কাজ করে, রাঁধে।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল আমার। সরমা চায়ের কাপ তুলে নিল। বলল, 'কাগজ পড়বে এখন?'

'নিয়ে যা তুই।' বললাম আমি।

সরমা চলে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মানুষের চলাচল শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ। ছুটির দিনের সকালে সবাই ব্যস্ত। আমার কোন কাজ নেই। অখণ্ড অবসর।

আজ দীর্ঘদিন এখানে বসে আছি। সকাল থেকে রাত্রি। যদি এই ঘেরা বারান্দাটাকে জেলখানা ভাবা যায়, অথবা আমি কবিগুরুর রক্তকরবীর রাজার মত মনে করি নিজেকে......যদিও তা সত্যি নয়......তবু আমি কিছু কম

দোষান ; শুনতে না চাইলেও শুনতে হয়েছে অনেক কথাই।

সময় নদীর স্রোতের মতই। কিন্তু আমার সময় কাটতে চায় না। কিছু-দিন আগে, সময়ের হিসাবে মাত্র ক'টা মাস। বৈচিত্রে ভরা ছিল সে দিনগুলো। বিশেষ করে প্রভাতী সংবাদ পত্রের পাতায় অনেক সংবাদ ছাপা হত। কয়েক ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে পার হোত। কিন্তু আজ সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন ছাড়া খুব কম সংবাদ খুঁজে পাওয়া যায়। যেটুকু সংবাদ থাকে তার মধ্যে বেশ কিছু অংশ থাকে ইন্দিরা প্রশস্তি। প্রতিযোগিতার আসর বসেছে আজ সংবাদ পত্র-গুলোকে ঘিরে। কিন্তু একদিন···।

আজ যারা ইন্দিরা প্রশস্তিতে পাতা ভরিয়ে তুলছে একদিন তাদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন। দেশের সরকার বিরোধী দলগুলো যেমন ভাল মন্দ সব কাজের বিরোধিতা করে এসেছে, ঠিক তেমনি সংবাদগুলোর ভূমিকাও ছিল এক সুরে বাঁধা। সস্তা চটকে বাজার গরম করে গেছে দিনের পর দিন। সত্য সংবাদ যে পত্রিকাগুলো প্রকাশ করেছে মিথ্যার ভিড়ে সত্যকে মিথ্যা বলে মনে হয়েছে সেদিন।

রবীন্দ্র-ভাব শিষ্য বিদ্রোহী কবি নজরুলের কথা মনে পড়ে। কানে বাজে তাঁর বজ্রকণ্ঠের বিদ্রোহ ঘোষণা :

"মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল
আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ
ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

ভারতাত্মা ইন্দিরা গান্ধী যেন বিদ্রোহী কবির লেখনী প্রসূত সেই বিদ্রোহী আত্মা। দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্যে যখন যে কাজে তিনি হাত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সহস্র বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। বজ্রকঠিন হাতে দৃঢ়ভাবে সেই বাধার প্রাচীর ভাঙতে হয়েছে তাঁকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের পরই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আবার বাধার প্রাচীর সামনে এসে পথ অবরোধ করেছে তাঁর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তাঁকে (পণ্ডিত জওহরলাল

নেহেরুও পরাজিত হয়েছিলেন এক সময়। তাঁর মনোনীত প্রার্থী ছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, কিন্তু সেবার নির্বাচিত হয়েছিলেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ)। যে চ্যবন, কামরাজ তাঁকে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাও জগজ্জীবন রামের পরিবর্তে দক্ষিণপন্থী সঞ্জীব রেড্ডির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন পাতিল এবং মোরারজীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। প্রধানমন্ত্রী এবং ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ দেখেছিলেন সে দৃশ্য। নেপথ্যের আর এক নায়ক অতুল্য ঘোষ।

১৬ই আগস্ট ১৯৬৯। ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের মতই এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল। কারণ সেই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে হলফ করে আগে ভাগে বলা অসম্ভব হয়েছিল কে বিজয়ী হবেন, রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত হওয়ার সৌভাগ্য বস্তুত কার ললাটলিপি। কারণ ইতিপূর্বে এমন সঙ্কট এত গভীরভাবে দেখা দেয়নি। অবশ্য স্বর্গত রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনকেও রীতিমত শক্ত নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হতে হয়েছিল। বিরোধীরা সেদিন সুব্বা রাওকে খাড়া করে শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব একটা আশাবাদী কেউ ছিলেন না। অন্তত ১৯৬৯ সালের তুলনায় সেদিনের অবস্থা কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে ছিল অনেক বেশি। কংগ্রেসের ঘরে আশঙ্কা অত প্রকট ছিল না।

সেদিন সবচেয়ে গোলমাল বেধেছিল ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর সমর্থকদের নিয়ে। কারণ কংগ্রেসের বাইশ বছরের স্বর্ণ-প্রাসাদে ফাটল দেখা দিয়েছিল, সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করেছিল প্রখর সূর্যকিরণ।

ভারতের শত সহস্র নিরন্ন মার খাওয়া মানুষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল সেদিন,

'তুমি শুয়ে রবে তে-তলার 'পরে,
আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব
সে ভরসা আজ মিছে।'

নিরন্ন সর্বহারার দল সেদিন চেয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর দিকে। অনেক আশা তাদের বুকে। অনেক ভরসা!

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১৯৫৭ সালে প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন ২৪ জন।

কিন্তু প্রার্থী যতজনই হোন, নির্বাচনে প্রধান ছিলেন তিনজন :

শ্রী ভি. ভি. গিরি (নির্দল)

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি (কংগ্রেস)

শ্রী সি. ডি. দেশমুখ (স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ-বি-কে-ডি সমর্থিত)

পার্লামেন্টের দুই কক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভার সব ভোট মিলিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মোট ভোট সংখ্যা ছিল ৮'৬ লক্ষ। এর মধ্যে :

কংগ্রেস—	৪,৫০,০০০ ;
স্বতন্ত্র—	৫৮,০০০ ;
জনসঙ্ঘ—	৪৯,০০০ ;
সি. পি. আই—	৩৫,০০০ ;
সি. পি. এম—	৩৪,০০০ ;
এস. এস. পি—	৩৪,০০০ ;
ডি. এম. কে—	৩৬,০০০ ;
পি. এস. পি—	২১,০০০ ;
বি. কে. ডি—	২১,০০০ ;
মুসলিম লীগ—	৫,০০০ ;
নির্দল—	৪৭,০০০ ;
এছাড়া অন্যান্য রাজ্যস্তরের দলগুলির ভোট সংখ্যা—	৬৬০০০ ,
মোট	৮,৬০,০০০

নির্বাচনে জয়ী হলেন ভি. ভি. গিরি। জয় হল ইন্দিরা গান্ধীর। ভারতের মুক্তিকামী জনগণের।

সিণ্ডিকেট মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন ভি. ভি. গিরি। রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থীরা ' মরমে মরে গেলেন। পাতিল মোরারজীদের অনেক আশায় বাদ সাধলেন রাষ্ট্রপতি গিরি। সঞ্জীব রেড্ডি যদি সেদিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয় লাভ করে রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করতেন, হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে সৃষ্টি হত। হয়তো নয়, নিশ্চয়ই তাই হত। কারণ কায়েমী স্বার্থ পদে পদে মার খেলে তাই হওয়াই সম্ভব।

অবশ্য শেষ চেষ্টাও হয়েছিল। অল্পদিন পরেই দেখা গিয়েছিল ডঃ গিরির নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দুটো মামলা দায়ের হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রিটার্ণিং অফিসার দুজন নির্বাচন প্রার্থীর (শিব কৃষ্ণ সিং ও ডঃ কুল সিং) মনোনয়ন পত্র বাতিল করেছিলেন। কারণ মনোনয়ন পত্রে একই লোক উপরোক্ত দুজনের প্রস্তাবক ও সমর্থক হিসাবে নাম সই করেছিলেন। এবং সেটা প্রচলিত আইনে অনুমোদিত নয়।

শিবকৃষ্ণ সিং ও ডঃ কুল সিং সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, তাঁদের মনোনয়ন পত্র বাতিল হওয়ায় নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হয়েছে। কাজেই নির্বাচন বাতিল করা হোক।

অপর দিকে আবদুল গণিদার (এম. পি) এবং রামা রেড্ডি (এম. পি) একটি বে-নামা ইস্তাহার আদালতে পেশ করে বলেন যে, ওই ইস্তাহারে সঞ্জীব রেড্ডির চরিত্র হনন করা হয়েছে এবং ভোটাররা ইস্তাহারটি পাঠ করে সঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে চলে যান, ফলে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত হয়।

তাঁরা আরো বলেন যে, গিরির সমর্থকরাই এই বে-নামা ইস্তাহারের জনক। কাজেই এই নির্বাচন বাতিল করা হোক। এবং নির্বাচনে দুর্নীতি অবলম্বন করার অভিযোগে গিরিকে নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক।

মামলাটি নানা কারণে ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মামলার শুনানী শুরু হয় ১১ই জানুয়ারী ১৯৭০ এবং শেষ হয় ৮ই মে, '৭০। মামলটা শুনতে আদালতে মোট ৫০ দিন লেগেছে। সাক্ষী দিয়েছিলেন মোট ১১৬ জন। তার মধ্যে বাদীপক্ষের সাক্ষী ছিলেন ৫৫ জন। সাক্ষ্যের বিবরণ টাইপ করে ১৫০০ পাতার একটি দলিল হয়েছিল। এছাড়া আদালতে মোট ১৭০০ পাতার নথিপত্র পেশ করা হয়েছিল।

সুপ্রীম কোর্ট তার ইতিহাসে এই প্রথম মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে সেই প্রথম টেপ-রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি আলাদা ভাবে সাক্ষ্য দেবার অধিকারী হলেও ডঃ গিরি সেই অধিকারের সুযোগ গ্রহণ করেননি। আদালতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি সাধারণ নাগরিকের মতই আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদান করেন; যেটা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এই মামলায় উভয় পক্ষে যাঁরা সাক্ষ্য দেন তাঁরা হলেন জগজীবন রাম,

দীনেশ সিং, ফকরুদ্দীন আলী আমেদ।

অপর দিকে পাতিল, মোরারজী দেশাই, নিজলিঙ্গাপ্পা, সঞ্জীব রেড্ডি।

মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলেন তারকেশ্বরী সিংহ (ইনি এক সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত বলতে দ্বিধা বোধ করেননি।)

এই মামলা বিচারের জন্য বিচারপতি সিকরির নেতৃত্বে একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করা হয়। ১১ই মে, ১৯৬০ সালে তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছেন যে, ডঃ গিরির নির্বাচন সম্পূর্ণ বৈধভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিচারপতি সিকরি বলেন, আমরা সকলেই মামলার রায় সম্বন্ধে একমত হয়েছি। কাজেই মামলার স্বার্থে আমরা এখনই আমাদের আদেশ জানিয়ে দিলাম।

জয়ী হয়েছেন রাষ্ট্রপতি গিরি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। পরাজয় ঘটেছে দেশ, জাতি, গণতন্ত্রের শত্রুদের।

তারপর.........

অবশেষে বিতাড়ন পর্ব। এছাড়া দ্বিতীয় কোন পথও খোলা ছিল না।

সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর জবরদস্ত নেতা বলে সুনাম দুর্নাম ছিল যাঁদের সেই পাতিল মোরারজির দল চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীর অফুরন্ত ধারা বর্ষিত হয়েছিল তাঁদের মুখ থেকে, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসী সরকারের পরমায়ু ঘনিয়ে এসেছে।......কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দিরা সরকার কুপোকাত হবে।

কিন্তু সিণ্ডিকেটীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার নিরাপদেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছেন। উপরন্তু বিভিন্ন উপনির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস অতি অনায়াসেই সিণ্ডিকেট প্রার্থীদের ধরাশায়ী করে জয় লাভ করেছেন।

এগিয়ে এসেছে শেষের সেদিন। সাধারণ নির্বাচনের কথা চিন্তা করেছেন সিণ্ডিকেটের পাণ্ডার দল। বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টায় সিণ্ডিকেটের হাইকম্যাণ্ড স্থির করেছে, দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোকে নিয়ে তারা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করবে।

জনসংঘ নেতা মাধোক সেদিন বলেছিলেন, 'জাতীয়তাবাদী' এবং 'গণতান্ত্রিক' দলগুলোর মধ্যে এতদিনে একটা মিত্রতার সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে

উঠেছে।···কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এবং অন্যান্ত দলেও এমন অনেক সদস্ত আছেন, যাঁরা জনসংঘের চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন। তাঁদের একসূত্রে গেঁথে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে।

এস. এস. পি. নেতা রাজনারায়ণ সেদিন স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে ওল্টাবার জন্যে দরকার হলে এস. এস. পি. দল শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আছে।

সেদিন ভারতবর্ষের রাজনীতির আকাশের বিভিন্ন দলের নেতারূপী নক্ষত্ররা উঠে পড়ে লেগেছেন ইন্দিরা গান্ধীর পিছনে। যেমন করেই হোক ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতা থেকে হঠাতেই হবে। ইন্দিরা গান্ধীকে সরাতে না পারলে দেশের মঙ্গল নেই। দেশ রসাতলে যাবে। মানুষের দুর্গতির শেষ থাকবে না। ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ইন্দিরা গান্ধীর হাতে বিপন্ন হবে।

চিৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। শুধু গেল-গেল রব। নেতার দল আদা-জল খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন কুরুক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। হৈ-হৈ চিৎকার। কুৎসার ছড়াছড়ি। ইন্দিরা বিরোধী-নেতার দল মরিয়া হয়ে উঠেছে।

কারণ? কারণ নিশ্চয়ই আছে। দেশ অথবা মানুষ নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থই তাঁদের কাছে বড়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই তাঁদের নেতা হওয়া। নেতা হয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়েছেন। নিজেদের নেতার গৌরব অম্লান রাখতে হেন কাজ নেই যা তাঁরা করেননি। স্বজনপোষণ, আত্মীয়তোষণ, জাল-জুয়াচুরি সব কাজেই সিদ্ধ হস্ত। দেশ বলতে তাঁদের কাছে ভাগ্যবানদের জগৎ। জনগণ—ভারতবর্ষের কালোবাজারী মুনাফাখোর ধনিক শ্রেণী। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষ শুধু একটা সমস্যা ছিল তাঁদের কাছে। জনগণের মর্যাদা তারা কোনদিনই পাইনি।

সেদিনের দক্ষিণপন্থী বাঘা কংগ্রেসীরা ছিলেন রূপকথার রাজকুমার। তাঁরা ভাবতেন, তাঁরাই সব। আরামে বিলাসে দিন কাটাবার জন্যেই তাঁদের নেতা হওয়া। অশিক্ষিত মানুষগুলোর জন্যে মাঝে মধ্যে একটু করুণা দেখালেই দায়িত্ব পালন করা হয়ে গেল বলে ভাবতেন তাঁরা।

তাঁদের সেই চিন্তাধারায় প্রথম আঘাত হানলেন ইন্দিরা গান্ধী। বাধল স্বার্থের সংঘাত। দেশ-জাতির বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তি স্বার্থের দ্বন্দ্ব। মুখোশ খুলে পড়ল সাচ্চা কংগ্রেসী বলে নিজেদের যাঁরা জাহির করতেন। বিশেষ করে মোরারজীর দল, যে মোরারজী দেশাই অতি আধারণ এক পুত্রের

এক ভাগ্যবান পিতা, পিতার সৌভাগ্য পুত্রকে সম্পদের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল, সেই মোরারজী দেশাইয়ের দল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নগ্ন আক্রমণে মেতে উঠেছিল সেদিন। হাত মেলাতে দ্বিধা করেনি সেদিনের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সঙ্গে। জেহাদ একটাই—ইন্দিরা গান্ধীর অপসারণ।

ইন্দিরা গান্ধীকে সরাতে না পারলে দেশের রূপটা পালটে যাবে। মানুষ স্বাধীন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। মোহ মুক্ত হবে জন। বিচার করবে বন্ধু কে? কে চায় দেশের উন্নতি। কে এনে দেবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা!

এলো আরো একটা ঐতিহাসিক দিন। বন্ধুর পরিচয় আর একবার প্রমাণিত হল।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সাল।

লোকসভায় প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের ভাতা এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা বাতিলের বিল এসেছিল সেদিন।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেদিন লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করে বলেছিলেন, এই বিল ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ!

তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে ভারতবাসীর দ্বিমতের কোন অবকাশ সেদিন ছিল না।

কারণ, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদের ইতিহাস দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বৈরাচার এবং লাম্পট্যের কলঙ্ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করে, তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন স্বাধীন রাজার অধীনে ছিল। প্রজাদের ওপর নির্মম শোষণ এবং পীড়ন চালিয়ে নিজেদের আরাম আয়েস সুনিশ্চিত করা ছাড়া তাদের আর অন্য কোন কাজ ছিল না।

অবশ্য কয়েকজন স্বাধীন রাজা এবং নবাব দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে জীবন মরণ লড়াই চালিয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাকী সকলে ইংরেজ সরকারের অধীনতা স্বীকার করে তাদের বংশবদ ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজের কাজে নিজেদের সার্বভৌমত্ব নৈবেদ্য দিয়ে তারা স্ব-স্ব এলাকার প্রজা শোষণ এবং পীড়নের অধিকার লাভ করেছিল। তাদের একমাত্র কাজ ছিল ইংরেজ রাজপুরুষদের তোষণ করে বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তারা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত অনুচর।

ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম মুক্তিযুদ্ধে (সিপাহী বিদ্রোহ) দেশীয়

রাজারা প্রায় সকলেই ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়ে নির্মম হাতে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম দমন করেছিল।

তাই ভারতবাসী কোনদিনই এই দেশীয় রাজাদের ক্ষমা করতে পারেনি। ইংরেজ রাজত্বকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী :

১। বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ

২। দেশীয় নৃপতি উচ্ছেদ

ভারতের মুক্তিবিপ্লব যখন ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে তখন মেরুদণ্ডহীন এই দেশীয় রাজাদের মধ্যে অনেকেই বিদায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে স্বাধীন হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতবাসীর রক্তচক্ষু তাদের সেই অপচেষ্টা থেকে বিরত করে।

তবে ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজাদের উচ্ছেদের আয়োজন ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতারা কিছুটা ব্যহত করে দেন। দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয় বটে, তবে তার পরিবর্তে দেশীয় রাজাদের ঢালাও ভাতা এবং সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা (এ ছাড়া তাদের বিশাল সম্পত্তি তাদেরই থাকে) হয়।

দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকদের অকর্মা বংশধরদের পোষবার জন্যে ভারতবর্ষের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়।

যে দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় দৈনিক চল্লিশ পয়সা (১৯৭০ সালে), সেই দেশে মুষ্টিমেয় নিষ্কর্মা লোকের জন্যে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা একেবারেই নীতি বিগর্হিত।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই অন্যায় এবং অবিচারের অবসানের পথ প্রশস্ত করতে লোকসভায় রাজন্য ভাতা বিলোপের বিল এনে ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের মতই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন আবার।

আবার সেই গেল-গেল রব। সাচ্চা সমাজতন্ত্রীর দল চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্রের জাল আবার বিস্তার করা হয়েছিল। সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনে ভোট হয়েছিল।

রাজন্যভাতা বিলোপের বিপক্ষে সেদিন যাঁরা ভোট দিয়েছিলেন :

কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী দেশীয় নৃপতি)	৮
কংগ্রেস (নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থী)	৫৮
স্বতন্ত্র	৩৩

জনসঙ্ঘ	৩২
বি-কে-ডি	৮
আকালী	৩
নির্দলীয়	১২
	মোট—১৫৪

বিলের পক্ষে :

কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী)	২১৫
স্বতন্ত্র	১
ডি. এম. কে	২৪
সি. পি. আই	২৩
সি. পি. এম	১৮
এস. এস. পি	১২
পি. এস. পি	১৫
বি কে. ডি	৩
নির্দলীয়	২৮
	মোট—৩৯৯

আবার জয়ী হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী। জয়ী হয়ছে ভারতের লক্ষ কোটি জনগণ।

সামনে চড়াই। উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী পার হতে হবে। ভয় পেলে হবে না। হাত কাঁপলে হবে না। প্রতি পদক্ষেপে কঠিন জীবন সংগ্রাম। জয়ের আনন্দ কঠিন সংগ্রাম শেষে। বাধার পর বাধা। বাধার প্রাচীর অতিক্রম করেই এগিয়ে চলেছেন···আজও চলছেন······এ চলার শেষ কোথায়।

শুধু সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যার পাহাড় জমে আছে। বহুদিনের অন্যায়, লালসা মাথা চাড়া দিয়েছে চারিদিকে। ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে দিয়ে গেছে। শুধু লোভ আর লালসা। ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। ঘুষ, দুর্নীতি, কালোবাজারী, মুনাফা লোটার মতলব। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। কেউ কাউকে মানে না। শ্রমিক কাজ করতে চায় না, চায় প্রয়োজনীয় অর্থ। মালিক ফাঁকি দেওয়ার তাল খোঁজে সব সময়। রাজনৈতিক নেতার দল বাজার গরম করে নিত্য। দেশের-দশের নয় শুধু নিজের

কথা—শুধু নিজের স্বার্থ চিন্তা।

সেদিনও তাই হয়েছিল। কংগ্রেস ভেঙে দু'টুকরো হয়েছিল। নবীনের সঙ্গে প্রবীণের বিরোধ। দলীয় স্বার্থ, ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে কংগ্রেসকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। বুঝেছিলেন, বুঝিয়েছিলেন, মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের জন্যে কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে। কংগ্রেসের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। শুধু কথায় নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে কংগ্রেস ভারতবর্ষের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের। প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীকে এই ধ্যান জ্ঞান সম্বল করতে হবে জনগণের সেবকরূপে।

একাত্তরের নির্বাচনে জয় হয়েছিল নব কংগ্রেসের। জয়ী হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। জনতার রায় বরণ করেছিল নতুন যুগের নেত্রীকে।

বাধার প্রাচীর তবু অপসারিত হয়নি। দেশকে গড়তে চেয়েছেন, দূর করতে চেয়েছেন দারিদ্র। ভারতবর্ষের মানুষের মনে জাগাতে চেয়েছেন আশা আনন্দ। কিন্তু সমস্যার পাহাড় আবার অবরোধ করেছে পথ। শান্তি হয়েছে বিঘ্নিত।

অশান্তির শুরু ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬০।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা ফকার্ ফ্রেণ্ডশিপ বিমান ছাব্বিশজন যাত্রী ও বৈমানিক এবং মালপত্র সমেত জোর করে (Hijack) লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিমানটা কাশ্মীর থেকে জম্মু যাচ্ছিল কিন্তু বিমান দস্যুরা লাহোরে নিয়ে গিয়ে নামায়। সেখানে অবশ্য যাত্রী এবং বৈমানিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিমান দস্যুরা নিজেদের কাশ্মীরের জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট (N. L. F.) এর সদস্য বলে পরিচয় দেয় এবং দাবী করে ভারত সরকার যদি জাতীয় ফ্রন্টের ছত্রিশজন আটক সদস্যকে মুক্তি দেন এবং সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের কোন ক্ষতি করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে মালপত্র সমেত বিমানটা ফেরৎ দেওয়া হবে—নচেৎ···

ভারত সরকার দস্যুদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং অবিলম্বে যাত্রী ও মালপত্র সমেত বিমানটা ফেরৎ দিতে ও দস্যু দুজনকে বন্দী করে ভারত সরকারের হাতে প্রত্যার্পণ করতে পাকিস্থান সরকারকে অনুরোধ জানান।

পাক সরকার ভারতের কোন অনুরোধই রাখতে রাজি হয় না, শুধু আটক বৈমানিক ও যাত্রীদের ফিরিয়ে আনবার জন্যে একটা বিমান পাঠাবার অনুমতি

দেয়। ভারত সরকার বিমান পাঠিয়ে যাত্রীদের ফেরৎ আনেন।

২রা ফেব্রুয়ারী রাত ৮-৩৫ মিনিটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিমানটাকে ধ্বংস করে ফেলে দস্যুরা।

পাক সরকার তাদের অদ্ভুত রীতি বিগর্হিত আচরণের কৈফিয়ৎ দেয় :

১। ওই পাক দস্যুদ্বয়কে তাহারা রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়াছেন এবং যেহেতু তাহারা কাশ্মীরের অধিবাসী ও যেহেতু পাকিস্থান কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, সেই হেতু ওই দুইজন ভারতের নাগরিক নয় ও তাদের প্রত্যার্পণের দাবী করিবার কোন অধিকার ভারত সরকারের নাই।

২। বিমান দস্যুরা সশস্ত্র অবস্থায় বিমানের ভিতর অবস্থান করায় তাহাদের পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বিমানের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নাই এবং বিমানটি ধ্বংস করিবার সময় ওই দুইজন দস্যু হাতবোমা লইয়া বিমানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকায় ও দমকল আগুন নিভাইতে আসিলে ওই বোমার সাহায্যে তাহাদের ধ্বংস করা হইবে এই ভীতি প্রদর্শন করায় বিমানটি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।

বিরোধের সূত্রপাত এখানে। কারণ অবশ্য ভিন্ন। মুজিবর রহমানের দল নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী হয়েছেন। এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী তিনি।

এরপর পশ্চিম পাকিস্থান থেকে একের পর এক সৈন্যবাহিনী পূর্ব-পাকিস্থানে গেছে। ভয়াবহ বন্যায় রিলিফের খাদ্যবস্তুর পরিবর্তে সৈন্য। পূর্ব-পাকিস্থানে শুরু হয়েছে ধ্বংস যজ্ঞ। দুর্গতের দল, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের মাটিতে ছুটে এসেছে জীবন রক্ষায়। আশ্রয় দিয়েছে ভারতবর্ষ। দিয়েছে ক্ষুধার অন্ন। নিরাপত্তা। জন্ম হয়েছে বাংলা দেশের।

শুরু হয়েছে যুদ্ধ। সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। মুক্ত হয়েছে নতুন বাংলা দেশ। বন্দী পাকিস্থানী দস্যুদের একদিন মুক্তি দিয়েছে ভারতবর্ষ। পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় মহানুভবতার।

তারপর·····

আবার ডাক শুনলাম আমি। সরমা ডাকছে।

ও বলল, 'বাবা, তুমি কি এখন স্নান করবে?'

বললাম, 'এত সকালে?'

'প্রায় নটা বাজে। তুমি স্নান করে নাও। জলখাবার হয়ে গেছে আমার।'

সকালে স্নান না করে আমি কিছু খাই না। কিন্তু আজ আমার উঠতে ইচ্ছা করল না।

সরমা বুঝতে পারল যেন। বলল, 'বাবা, আজ তোমার কি হয়েছে বলতো ?'

আমার কিছু হয়নি। ওকে বললাম সে কথা। ও বিশ্বাস করল না। বলল, 'তোমার কি শরীর খারাপ করেছে ?'

'না-না, আমি ভালই আছি।'

সরমা কাছে এল। কপালে হাত দিল। বলল, 'শরীর তো ভালই। তাহলে ?'

'তাহলে কী ?'

'আজ সকাল থেকে তুমি চুপচাপ বসে আছ কেন ? বাবুন ক'বার ঘুরে গেছে তোমার কাছ দিয়ে। তোমাকে ডেকেছে। তুমি শুনতে পাওনি ওর ডাক। বল, কি হয়েছে তোমার ?'

সরমার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাইলাম। ওকে দেখলাম। ওর প্রশ্নভরা চোখ। হাসলাম আমি। বললাম, 'মিথ্যে তুই চিন্তা করছিস। সত্যি বলছি, আমার কিছু হয়নি। আমি বেশ আছি।'

'তাহলে বাবুন যে বললে…'

'কি বলেছে বাবুন ?'

'তোমার কিছু হয়েছে। তুমি কিছু ভাবছ।'

'বাবুন বলেছে একথা ?'

'হ্যাঁ, ওর ডাক তুমি শুনতেই পেলে না, যেন কোথায়—কত দূরে চলে গেছ তুমি।'

সরমার কথা শুনে মনটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। বললাম, 'ওর কথা শুনে তুই কিছু বলেছিস নাকি ?'

সরমা হাসল। বলল, 'আমি নয়, যা বলার ও-ই বলেছে। বললে, মা, দাদু এতদিনে সত্যিকারের বুড়ো হয়ে গেছে। সব কথা তাই শুনতে পায় না।'

হাসলাম আমি। সরমাও হাসল। আমাকে আর একবার ওঠার তাগাদা দিয়ে ভেতরে গেল। রোদের মিষ্টি আমেজটুকু ছেড়ে আজ উঠতে ইচ্ছা করল না। স্মৃতিতে ভেসে উঠল কিছু কথা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ……

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বয়েস নব্বই বছর পার হলেও এখনও সেই কংগ্রেস বৃদ্ধ বা জরাগ্রস্থ হয়নি। চণ্ডীগড়ের কামাগাটুমারু নগরের পঁচাত্তরতম অধিবেশনে দেখা গেল, কংগ্রেসে নতুন জীবন এবং নতুন যৌবনের জোয়ার এসেছে যেন। এই অধিবেশন অনন্যসাধারণ রূপে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকছে। এত ঐক্য, এত শৃঙ্খলাবোধ এবং ভারতের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এত আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে' পৌছুবার জন্য এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সাম্প্রতিক কালের আর কোন কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা যায়নি। এই সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি—প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

ছোট বড় মাঝারি সমস্ত মিটিংয়ে ও অধিবেশনে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অপরাজেয় উদ্যম নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন। কংগ্রেসের নেতা, সদস্য ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে তিনি নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন এবং দেশের সামনে যে নতুন সঙ্কট ও সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং যে সমস্ত কারণে আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবারের কংগ্রেস অধিবেশনের ওপর যেন গভীর রেখাপাত করেছে।

শ্রোতৃমণ্ডলী অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য শুনেছেন এবং উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কোন প্রকার বিক্ষোভ, বিরোধ বা দ্বিমত আত্মপ্রকাশ করেনি—এমন দৃশ্য আগেকার কংগ্রেসে দেখা যায়নি এবং এদিক দিয়ে চণ্ডীগড় কংগ্রেসের অধিবেশনকে অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা এবং উচ্চতম নেতৃত্বের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ আনুগত্য দেখা গেল, তাতে আশা করা যায় আগামী দিনের কংগ্রেস একটা ঐক্যবদ্ধ দল রূপে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবে। এই ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং দৃঢ়তর ভিত্তি ছাড়া দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত ও শাসিত কোন দেশ সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। বিশেষতঃ বিংশ শতকের এই শেষ পদেও দেখা যাচ্ছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ নতুন মূর্তি নিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকার নতুন স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রবেশ করতে চাইছে এবং সমস্ত দেশের সরকার এই সাম্রাজ্যবাদের দোসর নয়, কিংবা যে সমস্ত দেশের গণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে চায়, সেই সমস্ত দেশের সরকারকে উচ্ছেদের জন্যে কিংবা স্থিতিশীল অবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যে বাইরে থেকে সামরিক চাপ এবং ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতমূলক চক্রান্তে মদত দেওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত স্বাধীন দেশের উন্নয়নশীল চেষ্টা ও উদ্যমকে কিংবা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে মিত্রতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে ফ্যাসিজ্‌ম ও সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বা লক্ষ্যকে গলা টিপে মারবার জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় কিংবা মারণাস্ত্রের সরবরাহ করা হচ্ছে।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়েই আমাদের প্রধানমন্ত্রী বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন। বাইরের শত্রু ও ঘরের শত্রু সম্পর্কে দেশবাসীকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলেছেন, 'আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশের ঘটনাবলীর পেছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে।

দেশের অবস্থা যতদিন সুস্থ স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল না হয়, ততদিন জরুরী অবস্থার অবসান ঘটতে পারে না। যদি এই জরুরী অবস্থা ঘোষিত না হত এবং যদি প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এই বিস্ফোরণ-মুখী পরিস্থিতির মোকাবিলা না করতেন, তবে বাংলা দেশের নৃশংস ঘটনাবলীর মত এখানেও ব্যাপক ও ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ এবং অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করত, যার সূচনা বহু অশুভ ঘটনায়।

জরুরী অবস্থার জন্য দেশে শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্ববোধ ফিরে এসেছে, ফলে কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রব্য মূল্য হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কল-কারখানায় যে ছাঁটাই, লে-অফ এবং ক্লোজার চলছে, সেগুলি যথাসম্ভব বন্ধ করার জন্যে সরকার পক্ষ থেকে উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত হবে, এমন ভরসা দেওয়া হয়েছে।

চণ্ডীগড় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল দেশের এবং বিশেষ ভাবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়ন। যে বিশাল ভারতবর্ষের ষাট কোটি লোকের মধ্যে শতকরা প্রায় আশি জন গ্রামবাসী, সেই গ্রাম-গুলোতে যতদিন লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বর্ষিত না হবে, ততদিন গোটা ভারতবর্ষ শ্রী সম্পন্ন হতে পারে না এবং যে কোটি কোটি লোক দরিদ্র-সীমার নীচে বাস করে, তাদের জীবনের দুর্বহ যন্ত্রণাও ঘটবে না।

প্রধানমন্ত্রী বারবার একটি কথার ওপর জোর দিয়েছেন, 'কংগ্রেসের লক্ষ্য সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই সমাজতন্ত্র ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। তবে, বাম ও দক্ষিণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন প্রয়োজন নেই। কংগ্রেসের 'লেফ্‌ট অব সেণ্টার'

কিংবা 'মধ্যপন্থী বামমার্গ' নীতি নিয়ে চলবে।

চণ্ডীগড় কংগ্রেস থেকে প্রধানমন্ত্রী যেমন দলের অকুণ্ঠ সমর্থন ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং একক ব্যক্তিত্বের অনন্যসাধারণ প্রভাব প্রতিফলিত করেছেন, তেমনি সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের মনে নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছেন এবং সেই প্রত্যাশা হল সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ।

জানি, দীর্ঘকালের সাধনা এবং প্রভূত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়া এই ব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব নয়। তার জন্যে যেমন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সৎ ও আন্তরিক চেষ্টা দরকার, তেমনি দরকার দেশবাসীর অকৃপণ সহযোগিতা।

বলা বাহুল্য যে, এখন থেকে কংগ্রেসের নেতা কর্মী ও সেবকদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে গেল। যদি এই দায়িত্ব পালনে তাঁরা ব্যর্থ হন, যদি অতীতের বহু অধিবেশনের প্রতিশ্রুতি শুধু মাত্র প্রতিশ্রুতিই থেকে যায়, তাহলে চণ্ডীগড়ের মুক্তিমন্ত্র একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।

আজ ভারতবর্ষের উদ্বেলিত জনতা প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদনের জন্যেই উৎসুক নয়, এক গভীর প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষমান।

কি সেই প্রত্যাশা?

বঞ্চনা, বিড়ম্বনা, অবিচার ও দারিদ্রমুক্ত এক নতুন ভারতের স্বপ্ন আজ জনতার চোখে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেই স্বপ্ন উদ্রেক করেছেন ভারতব্যাপী কোটি কোটি মানুষের চোখে।

১৯৫১-৫২ সালে যখন তিনি 'গরীবি হটাও' শ্লোগান একটা রণধ্বনির মত প্রচার করেছিলেন, সেদিন ভারতবর্ষের বঞ্চিত সর্বহারা নিরন্ন মানুষের দল নতুন ভাবে জেগে উঠেছিল। অনুভব করেছিল তারা বেঁচে আছে। আছে তাদের আপনজন। কেননা আগে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে আর কেউ এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ডাক দেননি।

কিন্তু তাদের সে স্বপ্ন যেন স্বপ্নই রয়ে গেল। সৌভাগ্যের রুদ্ধদ্বার রুদ্ধই রয়ে গেল। কালোবাজারী, মুনাফাখোর, মজুতদারের দল যেন সক্রিয় হয়ে উঠল বেশি করে। অবাক-বিস্মিত মানুষের চোখে ফুটে উঠল নীরব প্রশ্ন, এ কি হল? এই কি গরীবি হটানোর নমুনা?

তবু তারা প্রতীক্ষায় থেকেছে। বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটতে দেয়নি। সোচ্চার হয়নি কণ্ঠ। শুধু আশা-আশা-আশা……

হ্যাঁ, গরীবের বুকে জাগিয়ে তোলা সেই প্রত্যাশার স্বপ্নকে মুছে যেতে দেন

নি প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সেই আহ্বান সার্থক করার জন্যে নতুন ভারত গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে অর্থনীতির কর্মসূচী।

সমাজের যাঁরা নীচুতলায় বাস করে, যারা নিরক্ষর এবং যারা শোষিত ও লাঞ্ছিত—এককথায় সমাজের দুর্বল অংশের প্রতি ন্যায় বিচার করার জন্যে তিনি যেন এক নতুন আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন।

ভারতব্যাপী এক বিরাট কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যুব-সমাজকে ডাক দিয়েছেন। কারণ, এ কাজ শুধুমাত্র সরকারের নয়, যুবসাধারণের ও জন-সাধারণের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সহযোগিতা ছাড়া এই বিশাল গঠন-পর্ব সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়।

পৃথিবীতে কোন দেশের সরকার যুবজনের ও জনগণের পরিপূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া জাতীয় জীবনকে ঢেলে সাজাতে পারেননি। কেননা, এটা এক ধরণের বিপ্লব, যে বিপ্লবের প্রধান ভিত্তিভূমি গ্রাম এবং গ্রামের চাষী, ক্ষেতমজুর, কারিগর ও শ্রমিক।

শত শত বছর ধরে এরা বঞ্চিত এবং বিগত শত শত বছরে আমাদের সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে বহু গ্লানি, অনাচার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। সেই অনাচার —বঞ্চনামুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা কোন যাদুকরের মন্ত্রে কিংবা দু-এক বছরে সম্ভব নয়। দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই দুঃসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ এই ভারতবর্ষ। যার সাত লক্ষাধিক গ্রামে প্রায় ষাট কোটি লোকের বাস। এই ষাট কোটি লোকের অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা দরকার।

বলা বাহুল্য যে, এই কর্তব্য হিমালয়-সদৃশ কঠিন এব' বর্তমানের অর্থ নৈতিক কর্মসূচী নিতান্তই প্রারম্ভিক কর্মসূত্র মাত্র।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই বিশাল ভারতবর্ষে নতুন শৃঙ্খলাবোধ এসেছে, যে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় মুক্তির দিনগুলোতেই পরিলক্ষিত হয়েছিল।

অরাজকতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায়, সন্ত্রাসে, রক্তপাতে, ডাণ্ডাবাজিতে ও গুণ্ডামীতে দেশ একবারে উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল, সর্বনাশের সেই বিপজ্জনক কিনারা থেকে আমরা সরে আসতে পেরেছি।

পরাধীনতার আমলে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদের জন্যে আমরা সংগ্রামে ও আন্দোলনে নেমেছিলাম। সেই স্বেচ্ছাচারী বিদেশী সরকারকে উচ্ছেদ করাই ছিল প্রত্যেকটি দেশকর্মী, নেতা, বুদ্ধিজীবি, সাহিত্যিক, শিল্পীর অপরিহার্য

কর্তব্য। কিন্তু এখন আমরা এক সম্পূর্ণ নতুন যুগে প্রবেশ করেছি—যে যুগে মানুষ বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে আমরাও আজকের ভারতবর্ষে নবজন্ম ঘটাতে পারি। কেননা, প্রকৃতির সম্পদে-ঐশ্বর্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ। তাহলে কেন আজ আমাদের এই দীন হীন অবস্থা?

স্বাধীন ভারতবর্ষে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী জওহরলাল নেহেরুর আমলে। আজ সেই যজ্ঞশালায় সহস্র প্রদীপ জ্বালাবার আয়োজন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী,—সেই সহস্র প্রদীপ থেকে ভারতবর্ষের লক্ষ-লক্ষ অন্ধকার গৃহে নতুন জীবন-দীপ জ্বলে উঠবে।

কিন্তু একমাত্র উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগের দ্বারা এই মহান ব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব নয়। একমাত্র বৃটিশ আমলের শিক্ষাপদ্ধতি—সেই বিগত আমলের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের দ্বারাও এই কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে বলে মনে হয় না।

এই কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে আমাদের মনে প্রাণে ভারতীয় হতে হবে। পবিবর্তন করতে হবে আচার আচরণের। পরিবর্তন করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গীর।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন সাধারণ গ্রামবাসী পর্যন্ত যদি সত্যি সত্যি হাতে-কলমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জাতীয় জীবনে রূপান্তরিত করতে চান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোকে জনগণের জীবনে সার্থক করে তুলতে চান, তবে, প্রশাসনিক ও কায়েমী স্বার্থের কাঠামোগুলোকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সেই সঙ্গে দলাদলির অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজের বোধন করতে হবে। সৃষ্টি করতে হবে সত্যকারের মানুষের সমাজ।

বাবুন বলল, 'ভাবছ কি?'

বললাম, 'ভাবনার কি শেষ আছে দাদু!'

'কেন ভাবো?'

'মন যে ভাবায়।'

'কি ভাবায়?'

'তার কি ঠিক ঠিকানা আছে।'

বাবুন গম্ভীর হল কথা শুনে। চিন্তা করল। দেখল চেয়ে চেয়ে। কাছে ছিল, সরে গেল দূরে। বলল, 'হ্যা-ভাই।'

'বল!'

'তুমি কি ভাবতে ভাবতেই বুড়ো হয়ে গেলে?'

হাসলাম প্রশ্ন শুনে। চিন্তা করলাম এর পরের প্রশ্ন কি হতে পারে। বললাম, 'ঠিক তা নয়, বুড়ো হতে হতেই ভেবেছি।'

'কি ভেবেছ?'

'অনেক কথাই।'

'শুধুই ভেবে গেলে?'

'না—তা কেন?'

'তাহলে?' প্রশ্নটা করেই ও ছুটে গেল একদিকে। লক্ষ্য করলাম, সামনের বাড়ির আল্‌সেতে দুটো শালিক এসে বসেছে। বড়.বড় দুই চোখে দেখছে ও। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরল আবার। কাছে এল। বলল, 'নাও ওঠো।'

উঠলাম। ক্রাচ দুটো এগিয়ে দিল শিশু হাত। বলল, 'মিছিমিছি ভেব না আর।'

আমাকে যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে ও। ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। সরমার শিশু আমার সঙ্গে। যে আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে। বলল, 'আমি দেখছি, তুমি সব সময় বসে বসে ভাবো। সব সময় বসে থাকা ভাল নয়।'

উত্তর দিচ্ছি না আমি। নীরব শ্রোতা।

ও বলল; 'আমি দুবার-তিনবার আজ ডেকেছি তোমাকে। ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে লুডো খেলব। দেখতে, খেললে তোমার মন কত ভাল হয়ে যেত।'

তবু আমি চুপ করে আছি।

ও বলল, 'আমি কথা বলছি, তুমি চুপ করে আছ কেন?

হেসে বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি শুনছি।'

ও হাসল। খুশি হল যেন।

মনটা আমার খুশিতে ভরে উঠেছিল সেদিন। যেদিন কয়লাখনি রাষ্ট্রীয়-করণের সংবাদ জানতে পেরেছিলাম। একটা স্মৃতি ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। আমার এক সময়ের সহপাঠী বন্ধু। পরবর্তীকালে ঝরিয়ায় কয়লা খনিতে চাকরি নিয়ে চলে যায়। দেখা সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মধ্যে দেখা হত। শুনতাম কয়লা খনির গল্প। গল্প নয় রূপকথা। দারিদ্র, অনাহার, অত্যাচার আর পীড়নের কাহিনী। শ্রমিক সেখানে যন্ত্র। মালিকের সম্পদ বাড়ায়। নিঃশেষ করে যৌবনের শক্তি। পরিবর্তে পায়

বঞ্চনা। বর্তমান বলে কিছু নেই—অতীতের অন্ধকার থেকে ভবিষ্যতের নিষ্ঠুরতায় শেষ হয় জীবন।

বন্ধু লড়াই করেছিল। বিদ্রোহী হয়েছিল। একদিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধর্মঘট মিটেছিল দৈনিক আট আনা রোজ বৃদ্ধিতে। খুশি হয়েছিল ধর্মঘটের অন্যান্য নেতারা। মালিকদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়লাভ বলে ঘোষণা করেছিল। শ্রমিকদের সভায় ভাষণে বলেছিল, আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ আরো বড় জয়ের দিকে। এবং এই সংগ্রামে জয় আমাদের আরো আগেই আসতো, কিছু কিছু মালিকের দালাল বার বার বাধা দিয়েছে। ভুল বুঝিয়েছে তোমাদের। আরো বেশি দাবি আঁকড়ে ধরে থাকার একগুঁয়েমিতে আমাদের ঐতিহাসিক সংগ্রাম বানচাল করে দিতে চেয়েছে। তাদের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে একদিন। ক'জনকে আমরা দূর করে দিয়েছি। পালের গোদা পালিয়ে গেছে। ভাই সব, তোমরা ভাবো, চিন্তা কর—বিচার করে দেখ তোমাদের প্রকৃত বন্ধু কে? আমরা, না যারা তোমাদের দুর্দশার চরমে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল?

ভাই সব, আমরা বলছি, আজকের এই জয়লাভে খুব বেশি আনন্দ করার কিছু নেই। তোমরা আনন্দ কোর না। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখ। গভর্ণমেণ্টের পেটোয়া ওই মালিক পক্ষকে আমরা স্পষ্ট বলে দিয়েছি, তোমরা যা দিলে এটা কিছুই নয়। আমাদের দাবী আমরা আদায় করে নেবই। যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের শ্রমিক ভাইয়েরা জীবনপণ সংগ্রাম করবে। তবু তারা তাদের রক্ত জল করা পয়সায় তোমাদের সুখের প্রাসাদ গড়ে তুলতে দেবে না।

ভাই সব, হুঁশিয়ার হও। শত্রুদের সম্পর্কে সাবধান হও। এই জয়লাভ অনেকেই সহ্য করতে পারবে না। তাদের কথায় কান দিও না। নিজেদের হাত নিজেরা কেটো না তোমরা। এবার যে যুদ্ধে নামব তা হবে আরো ভয়ঙ্কর। তোমাদের এই কষ্ট, যন্ত্রণা, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। আমাদের এবারের সংগ্রাম হবে আরো ভয়ঙ্কর। এই সংগ্রামে আমরা দিল্লীকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেব।

ভাই সব, যদিও এই মুহূর্তে বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, তবু সংগ্রামের স্বার্থে বলছি—মালিক পক্ষের কাছ থেকে আমরা এককালীন পঞ্চাশ টাকা আদায় করেছি। না-না, এই পঞ্চাশ টাকা কাটা হবে না। এটা অনেক কষ্টে আদায় করতে হয়েছে আমাদের। ভাই সব, আমাদের পরবর্তী সংগ্রামের

জন্যে তোমরা সকলে দশ টাকা করে চাঁদা দেবে। আমরা কথা দিচ্ছি, শয়তান মালিক পক্ষের কাছ থেকে আমরা তোমাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে দেবই।

আমার বন্ধুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয়তো কয়লাখনির খাদের অতল গহ্বরে তার দেহটা পচে গলে শেষ হয়ে গেছে!

কয়লা খনি রাষ্ট্রীয়করণের সংবাদে খুশি হয়েছিলাম আমি।

কিন্তু কিছু দিন পরে বারান্দাটা একদিন উত্তপ্ত আলোচনায় ভরে উঠেছিল।

দ্রব্যমূল্য, বেকারী থেকে সিনেমা সংবাদ। তর্কযুদ্ধটা সেদিন প্রবীণে-নবীনে। আমি নীরব শ্রোতা। নিজেদের মধ্যে যখন তর্কযুদ্ধ বাধে, মনে হয় আমার উপস্থিতি ভুলে যায় সকলে। অথচ আমাকে, আমার পঙ্গু জীবনটাকে সাহচর্য দেবার জন্যেই সকলে এখানে আসেন বলেন, কোন-কোন দিন অবশ্য গল্পই করেন। কিন্তু প্রায়ই লক্ষ্য করি দু-চারজন যেদিন একে একে এসে পড়েন সেদিনই তর্ক বাধে কোন না কোন ব্যাপার নিয়ে।

সেদিন শিশির হালদার কথায় কথায় বলেছিলেন, 'বুঝলেন রাজেনবাবু, এবার আমাদের সেই আদিম যুগেই ফিরে যেতে হবে।'

রাজেন চৌধুরী শিশির হালদারের কথাটার গূঢ়ার্থ ঠিক বুঝতে না পারলেও দুবার মাথাটা ঝাঁকিয়ে ছিলেন।

শিশির হালদার বলেছিলেন, 'যে রেটে কয়লার দাম বাড়ছে, আর রান্নার জন্যে কয়লা পোড়াতে হবে না।'

রাজেন চৌধুরী কথাটা লুফে নিয়েছিলেন, 'ঠিক বলেছেন। সরকারী পরিচালনায় অন্য দেশে জিনিসের দাম কমে—এখানে ঠিক উল্টো। দেখছেন ছাই, যেই সরকার হাত ছোঁয়ালে সেই ছাই-ই সোনার দরে বিকোতে শুরু করল।'

পাশের বাড়ির ছেলে ভাস্কর কাছেই ছিল। চলে যাচ্ছিল সে, দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনারা যে দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছেন, এটা আমার জানা ছিল না'

দুই প্রৌঢ়ই সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিলেন। ভাস্কর ওঁদেরও পরিচিত। কিছুক্ষণ কারো কথাই ঠিকমত শোনা যায়নি। পথচারী দু-চারজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একসময় শিশির হালদার বলেছিলেন, 'ভাস্কর, তোমার কথাটা উইথড্র করে নাও।'

'নেব, যদি আমাকে বোঝাতে পারেন আমি অন্যায় করেছি।'

'আমরা বলছি তুমি অন্যায় করেছ।'

'আমি মনে করি না।'

'তুমি তাহলে বলতে চাও আমরা মিথ্যা বলছি?'

'সে কথা আমি একবারও কিন্তু বলিনি।'

'নিশ্চয়ই বলেছ, তোমার কথা শুনে মনে হয়, কয়লার দাম মোটেই বাড়েনি।'

'কি মুস্কিল!' ভাস্কর একটু বিব্রত বোধ করেছিল। বলেছিল, 'আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি নিশ্চয়ই কয়লার দাম বেড়েছে। কিন্তু কেন হঠাৎ বাড়ল সেটা একবার ভেবে দেখুন।'

রাজেন চৌধুরী ইতিমধ্যে নস্যি নিচ্ছিলেন। নস্যি নেওয়া হলে গলাটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলেছিলেন, 'সেটা তুমিই আমাদের বুঝিয়ে দিলে ভাল হয় না কি?'

ভাস্কর দুই প্রৌঢ়কে দেখেছিল। আমার দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করেছিল। বলেছিল, 'দেখুন, আমার যত জানা আছে তা থেকেই বলছি, অতীতে ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়লা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে আজকে অনেক তফাৎ। সেদিন ছিল যারা দিন মজুর, যাদের ভবিষ্যতের কোন নিরাপত্তা ছিল না, ছিল না...'

শিশির হালদার বাধা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার ওই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার সঙ্গে কয়লার দাম বাড়ার সম্পর্কটা কোথায় দয়া করে সেটুকুই শুধু বুঝিয়ে দাও দু-চার কথায়।'

ভাস্কর বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বলেছিল, 'দু-চার কথায় নয় আমি দুটো কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি—শ্রমিকদের মাইনে বেড়েছে, সেই জন্যে কয়লার দাম বেড়েছে।'

'আমি বলছি সেজন্যে দাম বাড়লেও, যে দামে আজ তোমাকে আমাকে কয়লা কিনতে হচ্ছে, শুধু কয়লা বললে ভুল বলা হয়—নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা কিনতে হচ্ছে সেটা দাদন দিতে হচ্ছে বলেই।'

'দাদন মানে?'

হেসেছিলেন রাজেন চৌধুরী। বলেছিলেন, 'দাদন বোঝ না ভাস্কর, ছিঃ। আজ কয়লা খনির হাত বদল হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা বিনা দাদনে গা ঘামায় না।'

ভাস্কর প্রতিবাদ করেছিল, 'না, এ আপনি ঠিক বলছেন না।'

'ঠিকই বলছি ভাস্কর। জানতো আমার ছোট ভাই শ্রীরামপুরে থাকে।

কয়লার গোলা তার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের। সে-ই বলেছে কথাগুলো।'

'আপনার ভাই ঘুষ দেন কেন?'

'ঘুষ না দিলে যে টোকেন পাওয়া যাবে না। লরি পড়ে থাকবে দিন তিনেক। তিন দিনের ভাড়া গুনতে গেলে ঘরের ঘটি বাটি বিক্রী করেও কুলাবে না। কয়লা বেচে লাভ করাতো দূরের কথা।'

ভাস্কর চুপ। রাজেন চৌধুরী বলেছিলেন, 'তুমি হয়তো বলবে ঘুষ যে দেওয়া-নেওয়া হয় তার প্রমাণ কোথায়? কিন্তু যারা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়—আর যারা নেয় তারা কোন প্রমাণ রাখে না। অতএব প্রমাণ দাখিল না করলে কেস টিঁকবে না। অতএব বেশি দাম আমাদের দিতেই হবে। তাই না…'

ভাস্কর চুপ করে ছিল তারপর।

এই সেদিন, আজকের এই জরুরী অবস্থার মধ্যেও ঘুষের লেনদেন বন্ধ হয়নি সব জায়গায়। কিছু দিনের জন্যে শুধুমাত্র থমকে ছিল। সেদিনের অভিযোগকারীর ভূমিকায় একদিনের প্রতিবাদকারী ভাস্কর। ছেলেটা একটা কাজে গিয়েছিল। শুনেছিল পাওনার কথা। সোজাসুজিই বলেছিলেন সেই ভাগ্যবান পুরুষটি, 'আমাদের প্রাপ্য দিতেই হবে আপনাকে। যদি না দিতে চান দেবেন না। তবে…'

অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করার উপায় নেই। অতএব……

বিকালের রোদ ম্লান হয়েছে। অন্যদিন এ সময় বাড়িটা আজকের মত এমন চুপচাপ থাকে না। প্রায় প্রতিদিনই বাবুন তার মাকে এ সময় বার বার তাড়া দেয়। বাবুনের বন্ধু আছে কিন্তু শহর কলকাতায় নিশ্চিন্তে শিশুরা যত্র তত্র ঘুরে বেড়াবে—এমন জায়গার বড় অভাব। পার্ক আছে কিন্তু সেখানে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। শিশুর দল নিরাপদে হৈ-চৈ করে যাবে উপায় কি! সেই জন্যেই সঙ্গীর প্রয়োজন। যে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—ফিরিয়ে আনবে।

এক সময় কদিন সঙ্গী হয়েছিলাম আমি। কিন্তু দুরন্ত শিশুকে সামলানো আমার সাধ্যের বাইরে। হাজার প্রলোভন চারিদিকে ছড়ানো, দুরন্ত কৌতূহল শিশুকে আকর্ষণ করবেই। আমার অশক্ত হাত। সরমা তাই ওকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে আসে। আজ দুপুরে ওরা বাবুনের এক কাকার

বাড়ি গেছে। কথা আছে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরবে।

বাবুনের দুরন্তপনা আমি চেয়ে চেয়ে দেখি—উপলব্ধি করি। ওর শিশু-সুলভ দুরন্তপনায় সরমা যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন বড় ভাল লাগে আমার—তৃপ্তি পাই। মনে পড়ে রাহুলের কথা। ছোটবেলায় রাহুল এমনি দুরন্ত আর চঞ্চল ছিল।

শুধু রাহুল বা বাবুন নয়, সব শিশুরাই বুঝি অমনি দুরন্ত-চঞ্চল-প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা। হয়তো তা নয়। সত্যিই তা নয়।

আর সেইজন্যেই দেশের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষগুলোর কল্যাণের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রেখে গত ২রা অক্টোবর (১৯৭৫) থেকে শিশুদের সম্পর্কে যে নতুন কর্মসূচী চালু করা হয়েছে তার নাম 'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কিম' (আই সি ডি এস) অর্থাৎ শিশুদের সুসমন্বিত বিকাশের পরিকল্পনা।

সারা দেশের গ্রাম এলাকার ১৬টি উন্নয়ন ব্লকে, ১০টি উপজাতি এলাকায় ও শহরের চারটি বস্তি এলাকায় এই পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে।

ছ' বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ও সদ্য প্রসূতিদের এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। শিশুদের ও মায়েদের জন্যে পরিপূরক পুষ্টিকর খাদ্য যোগান, সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক দেওয়া, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং মায়েরা যাতে ভাল ভাবে শিশুদের লালন পালন করতে পারে সেজন্যে তাদের শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদান—এগুলো এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

এই কর্মসূচী আমাদের শিশুদের সম্পর্কে একটা নতুন চেতনার পরিচয় দেয়। আর এর মূলে রয়েছে একটা দুঃখজনক উপলব্ধি। সেটা হল এই যে, আমাদের স্বাস্থ্য পুষ্টির সাধারণ সরকারী পরিকল্পনাগুলো শিশুদের বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণীর শিশুদের স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ, বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য হল, একজন অপুষ্ট শিশুর স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়ে যায় পরবর্তী জীবনে আর কখনও কোন ভাবেই তার পূরণ করা যায় না। একটা জাতির স্বাস্থ্যে সবচেয়ে ফলপ্রসূ অর্গলগ্নের উপায় হল শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

একই কথা বলা চলে গর্ভবতী-প্রসূতিদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কেও। স্বাস্থ্য-বতী মাতাই সুস্থ জাতির জননী।

ভারতবর্ষে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের (অর্থাৎ মা হওয়ার বয়েসের) স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ ও ১৪ বছর পর্যন্ত

বয়েসের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশই আমাদের স্বাস্থ্য পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, এর খুব সামান্য অংশই শিশু ও প্রসূতি কল্যাণ পরিকল্পনাগুলোর দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

সম্প্রতি দিল্লীর সেণ্ট্রাল ইনস্টিট্যুট অব রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং ইন পাবলিক কোঅপারেশন'-কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে এই তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'পারস্পেকটিভ্‌স অন দি চাইল্ড ইন ইণ্ডিয়া।' গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে দেশে স্বাস্থ্য পরিকল্পনাগুলোর ফলে সাধারণ মৃত্যুহার যেভাবে কমেছে, শিশু মৃত্যুর হার সেভাবে কমেনি।

১৯১১ থেকে ১৯২১ এর দশকে ভারতীয়দের মৃত্যুহার ছিল হাজার করা ৪৮। সেই হার দুই তৃতীয়াংশ কমে হাজার করা ১৪তে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু ওই একই সময়ের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার হাজার করা ২২০ থেকে মাত্র ৫০ শতাংশের মত কমে ১৪০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও কুড়ি বছর আগেকার একটা শিশুর তুলনায় আজকের ভারতবর্ষের একজন নবজাতকের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং যদিও ১৯০১ সালের পর এক দশক থেকে অন্য দশকে ভারতীয়দের গড় আয়ু ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, তাহলেও এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, আজও ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর পাঁচ ছয় গুণের কম নয়।

এবং যে শিশুগুলো বেঁচে থাকে সেগুলোর একটা বড় অংশ বেড়ে ওঠে অপুষ্ট, রোগজীর্ণ, পঙ্গু দেহ ও দুর্বল মস্তিষ্ক নিয়ে।

দু' লক্ষের বেশি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা সমীক্ষা করে সম্প্রতি দেখা গেছে, শতকরা ১৩·৬ জন অপুষ্টিতে ভোগে, শতকরা ২৫ জনের দাঁত ও মাড়ি খারাপ, শতকরা ১৮ জন চর্মরোগে আক্রান্ত। এবং অনেকের এই তিনটি রোগই আছে।

একজন ভারতীয় শিশু গড়ে প্রত্যহ ৮১০ ক্যালরি খাদ্য খায়। প্রয়োজন ১২০০ ক্যালরি খাদ্য খাওয়া। যেখানে রোজ ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত ভিটামিন খাওয়ার কথা, সেখানে পায় মাত্র ১৬ থেকে ২০ গ্রাম।

ভারতীয় শিশুদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। শতকরা ৭৫টি শিশুর খাদ্যে ক্যালরির ঘাটতি—শতকরা ৫০টি শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি থাকে।

একই শোচনীয় চিত্র গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও সদ্য প্রসূতিদের ক্ষেত্রেও।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের যেখানে দৈনিক ২১০০ ক্যালরি ও ৫৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয়, সেখানে ভারতবর্ষের একজন গর্ভবতী স্ত্রীলোক গড়ে মাত্র ১৪০০-১৫০০ ক্যালরি ও ৩৫-৪০ গ্রাম প্রোটিন খেতে পায়। ফলে, ভারতবর্ষে অপুষ্টির সমস্যা শিশুকে তার জন্মের আগে থেকেই ঘিরে ধরে।

শিশু মৃত্যুর সঙ্গে ও শিশুদের রোগের সঙ্গে অপুষ্টির ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক রয়েছে। ভারতীয় পুষ্টি সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রতি মাসে একলক্ষ শিশু মারা যায় শুধু মাত্র পুষ্টির অভাবে। এবং এর চেয়ে ঢের বেশি সংখ্যক শিশু মারা যায় নানা সংক্রামক রোগে। কিন্তু এই সব রোগে মৃত্যুর মূলেও রয়েছে অপুষ্টি। কেননা, এই শিশুগুলি অপুষ্ট না হলে রোগে আক্রান্ত হত না—হলেও রোগ এমন মারাত্মক হত না। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হল এই যে, ভারতবর্ষে ছ'কোটি অপুষ্ট শিশুর মধ্যে আড়াই কোটি শিশুর ভিটামিনের অভাবে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিশুদের কল্যাণের দিকে যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেটা উপলব্ধি করেই ভারত সরকার 'শিশুদের সম্পর্কে জাতীয় নীতি গ্রহণ করেছেন। এই নীতির ভূমিকায় বলা হয়েছে, শিশুরা জাতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সম্পদ। তাদের লালন-পোষণ করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের শিশুরা যাতে সবল নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠতে পারে, তাদের দেহ যাতে সক্ষম হয়, মন যাতে সজাগ থাকে ও তারা যাতে নৈতিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় সেজন্য মনুষ্য সম্পদ সংক্রান্ত আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় শিশু-কল্যাণ কর্মসূচীর একটা বিশেষ সুস্পষ্ট অংশ থাকা উচিত।'

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫।

* আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশনা নিরোধ
* সংসদীয় কার্যবিবরণী আইন বাতিল
* প্রেস কাউন্সিল আইন বাতিল

রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ নতুন তিনটি অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলেন। একটিতে আপত্তিকর বিষয়ের প্রকাশ অবিলম্বে প্রতিরোধ এবং অপর দুটিতে সংসদীয় কার্যবিবরণী (প্রকাশ সংরক্ষণ) আইন ও প্রেস কাউন্সিল আইন রদের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রথমটির নামকরণ করা হয়েছিল আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ নিরোধক

অর্ডিন্যান্স ১৯৫৫। সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপত্তিকর বিষয়ের প্রকাশ প্রতিরোধ অথবা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছিল।

এই আদেশ লঙ্ঘন করলে প্রকাশিত বিষয় বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থাও এতে স্থান পেয়েছিল। তবে বিক্ষুব্ধ পক্ষকে কেন্দ্রীয় সরকার ও হাইকোর্টে আপীলের সুযোগ এই অর্ডিন্যান্সে দেওয়া হয়েছিল।

এই অর্ডিন্যান্সের মতই ১৯৫৬ সালের সংসদীয় কার্য বিবরণী (প্রকাশ সংরক্ষণ) আইনটি রদ করে যে দ্বিতীয় অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল তাও অবিলম্বে কার্যকরী করা হয়েছিল। পরলোকগত ফিরোজ গান্ধীর প্রচেষ্টায় দু-দশক আগে সংসদ এই আইনটি পাশ করেন।

তৃতীয় অর্ডিন্যান্স ১৯৫৬ সালের প্রেস কাউন্সিল আইনটি প্রত্যাহার করে নিয়ে প্রেস কাউন্সিল বাতিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, ভারতে সাংবাদিকতার মান উন্নত করার জন্য বিগত কয়েক বছর ধরে নানারূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য হল, সমাজের নৈতিক কাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকর (সিনেমায় মদ্যপান, গুণ্ডামী ইত্যাদিও বন্ধের জন্য আইন প্রয়োগ করা হয়েছে) এবং জন-জীবনকে অবনত করে এমন সব রচনা (শুধু রচনা প্রকাশ বন্ধ করলেই ফল কতটুকু হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ আজ পথে ঘাটে বাসে ট্রামে এক কথায় যে কুরুচিপূর্ণ প্রকাশের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তা যদি বন্ধ করা সম্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার—মনে হয় তার ফলে জন-জীবনের মান অনেক উন্নত হবে) পরিহার করা।

অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল—সংবাদ পত্রকে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দান। অর্থাৎ বৃহত্তর সামাজিক ও জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে সংকীর্ণ স্বার্থবাজরা সংবাদ পত্রকে ব্যবহার করে থাকে। এদের খবরের থেকে সংবাদ পত্রকে মুক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা।

১৯৫৪ সালে প্রেস কমিশন মন্তব্য করেছিলেন, সংবাদ পত্রের ক্ষমতা যেমন ব্যাপক তেমনি তার দায়িত্ব বিরাট। কিন্তু সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুস্থ ও স্বাধীনভাব ফিরিয়ে আনার সমস্যা বহুলাংশে অপূর্ণ থেকে গেছে।

সরকারী মহল থেকে বলা হয়েছিল যে, সংবিধান সম্মত উপায়ে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন, সরবরাহ অথবা বণ্টন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে প্ররোচনা দান ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে

অনৈক্য সৃষ্টি ও অশ্লীল রচনা কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা আপত্তিকর প্রকাশনা প্রতিরোধ অর্ডিন্যান্সে সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদ পত্রের দায়িত্ব ও অধিকারের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ও আচরণবিধি তৈরির জন্যে ১৯৫৬ সালে প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়। কিন্তু কোন আচরণবিধি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রেস কাউন্সিল। এবং বড় রকমের কোন বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে ছোট খাট ব্যাপার নিয়েই থেকেছে। সেইজন্যে উপলব্ধি করা গেছে প্রেস কাউন্সিলের কোন প্রয়োজন নেই।

যে সব দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ সংবাদ পত্রকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে থাকেন নতুন আইন তাদের সেই ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করবে।

১৯৫৬ সালের সংসদীয় কার্য বিবরণী (প্রোটেকশন অব পাবলিকেশন) আইনটি বাতিল করার জন্যে অর্ডিন্যান্সের আকারে আরেকটি আইন গৃহীত হয়েছে। আগের আইন অনুসারে সংবাদ পত্রগুলো সংসদে এম. পি-দের ভাষণ সংবাদ পত্রে প্রকাশ করতে পারত।

৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সাতটি অধিকার স্থগিত।

সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ বলে প্রদত্ত অধিকার কার্যকর করা সম্পর্কে কোন নাগরিক আদালতে আবেদন করার যে অধিকার আছে, দেশের জরুরী অবস্থা কালে তা স্থগিত রাখার জন্যে রাষ্ট্রপতি আদেশজারী করেছিলেন।

১৯ নং অনুচ্ছেদে যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে তা সাধারণত 'সপ্ত অধিকার' নামে পরিচিত :

১। বাক-স্বাধীনতা,

২। অস্ত্র না নিয়ে সমাবেশের অধিকার,

৩। সভা-সমিতি করা বা গঠনের অধিকার,

৪। স্বাধীনভাবে ভারতের যে কোন অঞ্চলে চলাফেরা করার অধিকার,

৫। ভারতের যে কোন এলাকায় বসবাসের অধিকার,

৬। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও মালিকানার অধিকার,

৭। বৃত্তি বা পেশা, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অধিকার।

২৭শে জুন ১৯৫৫ সালে এক নির্দেশ জারী করে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা-কালে সংবিধানের ১৪, ২১ ও ২২ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার স্থগিত

রাখার আদেশ দিয়েছিলেন।

৮ই জানুয়ারীর আদেশে, সংবিধানের ৫৯ নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতার প্রয়োগে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন, সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ বলে প্রদত্ত অধিকার কার্যকর করা সম্পর্কে কোন নাগরিকের আদালতে শরণ নেওয়ার যে অধিকার ছিল এবং উল্লিখিত অধিকার কার্যকর করা সম্পর্কে আদালতে আনীত আবেদনের শুনানীও জরুরী অবস্থা চলাকালে স্থগিত থাকবে।

আদেশে বলা হয়েছিল, সংবিধানের ৩৫২ নং অনুচ্ছেদের ১ নং ধারা বলে ১৯৫১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ও ১৯৫৫ সালের ২৫শে জুন যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তা উভয়েই এখন কার্যকর আছে।

জরুরী অবস্থা কতকাল ?

প্রশ্নটি বহুবার, বহু ভাবে উচ্চারিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত বা ধৈর্য না হারিয়ে উত্তর দিয়েছেন—দিচ্ছেন।

তিনি বলেছেন, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের পরিস্থিতির যখন উন্নতি হয়েছে, তখন অদূর ভবিষ্যতে এই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন না। কারণ, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশে যে শৃঙ্খলা ও উন্নতি দেখা দিয়েছে, তা যদি উবে যায়, তবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত করা চলবে না।

দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই যে সংকট ও বিশৃঙ্খলার দিকে যাচ্ছিল তা রোধ করার জন্যই জরুরী অবস্থা, এই জরুরী অবস্থাকে নতুন স্বরাজ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, এই অবস্থা, সুশৃঙ্খল ভাবে দেশের উন্নতির জন্যে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। সুতরাং জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্যই যে শৃঙ্খলা ও উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে, সেই অবস্থা প্রত্যাহার করলে তো আবার পরিস্থিতি সেই আগেকার মত খারাপ ও সংকটজনক হয়ে উঠবে। সুতরাং জরুরী অবস্থা কেন বাতিল করা হবে এবং কেনই বা স্বেচ্ছায় আবার দেশকে সেই অরাজক অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে ? গণতন্ত্রের অর্থ তো অরাজকতা, অনৈক্য ও পতনশীলতা নয়।

যে কোন দেশের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার স্থায়িত্ব ও ঐক্য। এই দুটি স্তম্ভ ভেঙে পড়লে গণতন্ত্রের পক্ষেও টিকে থাকা সম্ভব নয়। জরুরী

অবস্থা কোন খামখেয়ালীপনা নয়।...'যত দিন না আমরা বুঝছি যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে—ততদিন জরুরী অবস্থা উঠতে পারে না।'

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে বলেই এমন কতকগুলো জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো আগে গ্রহণ করা যেত না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে যে সমস্ত সংগঠন, পার্টি ও গ্রুপ দেশব্যাপী একটা টাল মাটাল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, এমন কি হিংসাত্মক আক্রমণ—খুন-খারাপি পর্যন্ত শুরু হয়েছিল, তাদের সেই সন্ত্রাসমূলক এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস শিশুর খাদ্য, রোগীর ওষুধ, সাধারণের পরণের পাপপড় এক কথায় সব কিছু নিয়েই ব্যবসায়ী মহলের স্বাভাবিক মুনাফা লোঠার অন্যায় প্রলোভনকে দমন করা সম্ভব হয়েছে।

দেশের মানুষ, যাদের সংখ্যা বেশি, যারা পরিশ্রমের অর্থে সংসার প্রতিপালন করে—যদিও ঠিকমত তা সম্ভব হয় না। তাদের মনে বিরূপ ধারণার যে সৃষ্টি তা কি অন্যায়? দেশে স্থায়ী সরকার আছে, আইন আছে অন্যায় দমন করার জন্যে কিন্তু সে আইনের কোন প্রয়োজন নেই। গরীবের জন্যে কেউ নেই। সৎভাবে যারা বেঁচে থাকতে চায় তাদের সহায় কেউ নেই। সরকার আছে নামে। আইন আছে নামে মাত্র। জরুরী অবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে দেশে সরকার আছে। আইন আছে। এবং......

প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিরোধী দলগুলোর প্রতি জনগণের সমর্থন নেই।

শাসকপক্ষের বক্তব্য যা-ই হোক, এ কথা বোধহয় অস্বীকার করা কঠিন যে, ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের পর অনেকগুলো রাজ্যে কংগ্রেস দল একচেটিয়া অধিকার হারিয়ে গদিচ্যুত হয়েছিল এবং কংগ্রেস বিরোধী দলগুলো, যাদের পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ছিল এক—জনগণের দুর্দশা মোচন, শ্রমিক, কৃষক মেহনতী জনতার বন্ধু যারা, নিজেদের মধ্যে গোঁজামিল দিয়ে মন্ত্রীসভাও গঠন করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত মন্ত্রীসভার একটাও স্থায়ী হয়নি। নিজেদের মধ্যে গ্রুপবাজি, দলভাঙ্গা-ভাঙ্গি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

এমন কি, বামপন্থী দল বলে যারা পরিচিত ছিল, তারা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী নীতির পাল্লায় পড়েছিল। আর এই অবস্থাটা নিশ্চয়ই সুস্থ গণতন্ত্রের পরিচায়ক ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে যে হিংস্রতার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছিল, জনসাধারণ তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের বদলে নির্বাচক মণ্ডলী বারবার দুবার বিরোধী পক্ষগুলোকে ভোট দিয়ে যে সুযোগ দিয়েছিল সেই সুযোগের নিতান্ত অপব্যবহার করা হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে যারা বামপন্থীদের সমর্থক ছিল, তারা হতাশ-বিভ্রান্ত হয়েছিল।

এই হতাশা ও বিভ্রান্তিই জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তার দক্ষিণপন্থী সমর্থক ও কিছু কিছু বামপন্থীকে বিশৃঙ্খল সৃষ্টির পক্ষে সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু বিশৃঙ্খলা যে বিপ্লব নয়, এই মৌলিক সত্যটা তারা ভুলে গিয়েছিল। কারণ, এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল, সন্ত্রাসবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংগঠনগুলো তাদের অভিষ্ট সিদ্ধ করার মতলবে ছিল।

জরুরী অবস্থা সমগ্র দেশব্যাপী একটা ভয়াবহ রক্তপাত বন্ধ করেছে।

জরুরী অবস্থা আত্ম-সচেতন করে তুলেছে মানুষকে।

জরুরী অবস্থা কর্মের প্রেরণা এনে দিয়েছে মনে।

২৫শে জুন ১৯৫৫—২রা অক্টোবর ১৯৫৫।

একশো দিনের ঘোষণা। জরুরী অবস্থার একশো দিনে একশো নতুন লাভ।

১। জাতীয় আয়ের প্রত্যাশিত বৃদ্ধি পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ,

২। ১৯৫৫-৫৬-এর জন্য পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ তেইশ শতাংশ বর্ধিত,

৩। ক্ষেত-খামার ও কল কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি

৪। খাদ্যোৎপাদন সর্বকালীন উচ্চমাত্রা ছুঁয়েছে,

৫। শিল্পোৎপাদন ইতিমধ্যেই পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে,

৬। সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন শতকরা চোদ্দ ভাগ বেড়েছে,

৭। সাবানের উৎপাদন বিশ শতাংশ বেড়েছে,

৮। অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন ছত্রিশ শতাংশ বেড়েছে,

৯। চিনির উৎপাদন আটাশ শতাংশ বেড়েছে,

১০। বিক্রয়যোগ্য ইস্পাতের উৎপাদন বেড়েছে তের শতাংশ,

১১। সিমেন্টের উৎপাদন ষোল শতাংশ বেড়েছে,

১২। পাট সামগ্রীর উৎপাদন বেড়েছে দশ শতাংশ,

১৩। এ বছরে অশোধিত তেলের উৎপাদন দশ লক্ষ টন বাড়বে,

১৪। কয়লার উৎপাদন এ বছরে এক কোটি টন বাড়বে,

১৫। সফ্‌ট কোকের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে,

১৬। অত্যাবশ্যক ড্রাগের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে,

১৭। সারের উৎপাদন এ বছরে তিরিশ শতাংশ বাড়বে,

১৮। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে,

১৯। বিদ্যুৎ সঞ্চারের মাত্রা সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে,

২০। শিল্প-সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে,

২১। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে,

২২। জিনিসপত্র আরও সহজলভ্য,

২৩। গ্রামবাসীদের জন্য বস্ত্রাদি যোগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা,

২৪। পেট্রোল পাম্প এবং খুচরো দোকান মারফৎ অত্যাবশ্যক ড্রাগ বিক্রয়ের প্রকল্প বিবেচনাধীন,

২৫। খোলা বাজারে সিমেণ্ট লভ্য,

২৬। সব রাজ্যে বিদ্যুৎ যোগানের কড়াকড়ি শিথিল,

২৭। প্রতি মাসে কুড়ি হাজার রান্নার গ্যাসের কানেকশন,

২৮। কেরোসিনের বরাদ্দ-বৃদ্ধি,

২৯। অসৎ দোকানদারের হাত থেকে গ্রাহকদের রক্ষার ব্যবস্থা,

৩০। প্যাক করা বা মোড়ক-বন্ধী জিনিসের গায়ে ওজন ও দাম লেখা থাকবে,

৩১। প্রতি দোকানে সম্পূর্ণ মূল্য-সূচী টাঙ্গিয়ে রাখা হবে,

৩২। মাল চলাচলের গতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে,

৩৩। মালবাহী যানবাহনের (পাবলিক ক্যারিয়ার) জন্য জাতীয় পারমিট ব্যবস্থা প্রবর্তন,

৩৪। রেলওয়ে কাজকর্মে উন্নতির লক্ষণ,

৩৫। খাদ্যশস্যের দরদাম নিম্নমুখী,

৩৬। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত,

৩৭। সারের মূল্য হ্রাস,

২৮। ইস্পাতের দাম পড়ছে,

৩৯। সর্বোচ্চ ভূমি সীমা সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ত্বরা,

৪০। হরিজন ও ভূমিহীনদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত,

৪১। ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে বাস্তুভূমির সংস্থান,

৪২। কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরীর হার বৃদ্ধি,

৪৩। মুচলেকা মজুরীর প্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে,

৪৪। পল্লী অঞ্চলের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সম্প্রসারিত,

৪৫। ক্ষুদ্র কৃষক ও কারুশিল্পীদের ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে পল্লী ব্যাঙ্ক প্রকল্পের সূত্রপাত,

৪৬। কৃষকদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সুদের হার সমবায় সমিতির হারের সমান,

৪৭। অতিরিক্ত পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে,

৪৮। ভূ-গর্ভে জল-সম্পদ সন্ধান কার্যসূচী দ্রুত রূপায়ণের উদ্যোগ,

৪৯। সার ব্যবহারের পরিমাণ আটশো লক্ষ টন থেকে ছত্রিশ লক্ষ টন করা হবে,

৫০। ক্ষুদ্র কৃষকদের উন্নয়ন এজেন্সী কৃষকদের কৃষি উপকরণ যোগাবে,

৫১। কৃষকদের ফসলের জন্য ভাল দাম সুনিশ্চিত করবে কৃষি সমবায়গুলি,

৫২। হস্তচালিত তাঁত-শিল্পীদের জন্য কল্যাণ প্রকল্প,

৫৩। তন্তুবায়দের পর্যাপ্ত সংখ্যক সূতার আঁটি (হ্যাঙ্ক) যোগানো হচ্ছে,

৫৪। হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের জন্য পৃথকভাবে একজন উন্নয়ন কমিশনার নিয়োগ,

৫৫। উপজাতীর উন্নয়নে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ,

৫৬। নির্বাচিত পনেরোটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে অনুমোদিত ক্ষমতার ওপর আরও পাঁচ শতাংশ উৎপাদন বাড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে,

৫৭। অনুমোদিত ছাড়া অন্যান্য যন্ত্র নির্মাণের আবেদন-পত্রের সঙ্গে লাইসেন্স-ফী দেওয়ার প্রথা রদ,

৫৮। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য ভারতে শিল্প স্থাপনের সুযোগ সুবিধা দান,

৫৯। লাইসেন্স প্রদান ও বিনিয়োগ প্রথা সুসমঞ্জস ও সুষ্ঠু করা হচ্ছে,

৬০। শিল্প ক্ষেত্রে উন্নত সম্পর্ক রক্ষার জন্য উচ্চতম স্তরে 'ন্যাশনাল আপেক্স বডি' গঠিত হয়েছে,

৬১। বিভিন্ন শিল্পের জন্য পৃথক জাতীয় কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব,

৬২। সার কর্পোরেশনের বিভিন্ন ইউনিটে এক বছর পর্যন্ত ধর্মঘট ও লক-আউট না হতে দেওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ,

৬৩। বহু শিল্পে পরিচালন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ,

৬৪। বিদ্যুৎ শিল্পে সর্বস্তরে যুক্ত-কমিটি স্থাপন,

৬৫। শ্রমিক সংক্রান্ত সালিশী-মামলা নিষ্পত্তির হার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়েছে,

৬৬। কর্মচারীদের জন্য ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) সংস্থাপনের বিকেন্দ্রীকরণ,

৬৭। রপ্তানীর ব্যাপারে বার্ষিক উন্নতির ন্যূনতম মাত্রা ধরা হয়েছে দশ শতাংশ,

৬৮। গত বছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি আর্থিক বৎসরে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে কুড়ি শতাংশ,

৬৯। রপ্তানীর নিয়ম কানুন সরল করা হয়েছে,

৭০। রপ্তানীতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নগদের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে,

৭১। ইঞ্জিনীয়ারিং সামগ্রী সংক্রান্ত শিল্পের জন্য 'প্যাকেজ এক্সপোর্ট প্ল্যান',

৭২। রপ্তানীকারকদের বিদেশ যাত্রার জন্য বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার অধিকতর সংস্থান,

৭৩। রপ্তানীর বিকাশে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আমদানীর বরাদ্দের হার বাড়ানো হয়েছে,

৭৪। রপ্তানীযোগ্য একশো নব্বইটি জিনিসের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয়েছে,

৭৫। এক ধরণের কাজের জন্য স্ত্রী ও পু[illegible] কর্মীর মজুরীর হার সমান,

৭৬। শিক্ষানবিশী-প্রশিক্ষণ-বিধির অন্তর্গত পদগুলিতে কর্মী নেওয়া হচ্ছে,

৭৭। সরকারী শিল্পক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় শিক্ষানবিশী গ্রহণ করা হবে,

৭৮। শিক্ষানবীশ বিধিতে ২০১ শিল্প এবং ৬১ পেশা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে,

৭৯। উপজাতীয় জনগণের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি,

৮০। ছাত্রাবাসগুলির জন্য সুলভে জিনিস সরবরাহ,

৮১। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য লেখার কাগজের সুনিশ্চিত যোগান,

৮২। উচ্ছৃঙ্খল বাতাবরণ থেকে ক্যাম্পাসগুলি মুক্ত,

৮৩। ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং নিষিদ্ধ,

৮৪। অর্থ নৈতিক অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান তীব্রতর,

৮৫। কুখ্যাত চোরাই চালানকারীরা আটক,

৮৬। বিদেশী মুদ্রার চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা,

৮৭। কর ফাঁকি ও কালোটাকা মজুতের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা ফলপ্রসূ,
৮৮। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য গোপন করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা,
৮৯। আয়কর সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়,
৯০। মজুতকারীরা ধৃত ও দণ্ডিত,
৯১। ফাটকাবাজদের শাসনে আনা হয়েছে,
৯২। ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান শুরু,
৯৩। অধিকতর শৃঙ্খলাবোধ,
৯৪। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি,
৯৫। প্রায় পরিপূর্ণ সময়নিষ্ঠা,
৯৬। অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বোধ,
৯৭। কেন্দ্রে বকেয়া কাজ সম্পূর্ণ করা সপ্তাহের বাঞ্ছিত সুফল,
৯৮। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনকে অধিকতর ক্রিয়াশীল করে তোলা হচ্ছে,
৯৯। দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের অপসারণ,
১০০। আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা—ফলতঃ শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ও নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষিত।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের অভ্যন্তরে তেমন কোন অশান্তির কারণ ঘটে না থাকলেও বিদেশে কিন্তু ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালানোর বিরাম ছিল না। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ন্যক্কারজনক প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে।

এমন কি ইন্দিরা গান্ধীকে হিটলারের সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করা হয়েছিল। এই সমস্ত সংবাদ পত্র, রেডিও-প্রচারকরা কেবল কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অপবাদ রটনা-কারী নয়, এরা মূলতঃ ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ।

এরা প্রচার করেছিল, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন।

এই সমস্ত কুৎসা রটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে। এবং বৃটেন প্রবাসী কয়েক হাজার ভারতীয় এই সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শোভাযাত্রা গঠন করেছিলেন, হাইড পার্কে জমায়েৎ হয়ে জোরালো প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান করেছিলেন—বি বি সি'র মিথ্যা রটনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন।

ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকায় যে ধরণের রটনাই করা হোক না কেন, পৃথিবীর সেরা সংবাদপত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ভারতবর্ষ এবং প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছিল। তাদের অভিমত এই যে, ভারতবর্ষ প্রায় সম্পূর্ণরূপে শান্ত আছে এবং সমগ্র পরিস্থিতির ওপর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আগের মতই অটুট এবং অব্যাহত আছে।

টাইমসের সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন, যদিও তিনি (সরকার বিরোধী ব্যক্তি) 'এ কথা স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করেন, তবু এটা সত্য যে, ভারতে 'জরুরী অবস্থা' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সুতরাং আমার মত কিছু-কিছু ব্যক্তির পছন্দ না হলেও তাতে কিছু আসে যায় না।'

কিন্তু সরকারের প্রতি সমর্থনের অন্ততঃ বিরোধিতা না করার কারণ কি ?

সংবাদদাতার জবাব :

'ভারতবর্ষের মত বৈচিত্রপূর্ণ দেশের মতই এর কারণগুলোও বিচিত্র এবং বহুল। সেই কারণগুলোর অন্যতম হল এই যে, কোন কোন মহলে এই ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ভারতের সমস্যাগুলো এতই বিরাট ও ব্যাপক যে, কোন বে-পরোয়া পন্থা অবলম্বন না করলে এর মীমাংসা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যমণ্ডিত অহিংসাও এর একটা কারণ এবং অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্যে নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর প্রবর্তন।

আবার ভারতবর্ষে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে যে অর্থনৈতিক অবস্থায় ছিলেন, এখন তাঁরা তার চেয়ে অনেক ভাল আছেন।

আবার কোন কোন গণতন্ত্রবাদী এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে এই জরুরী অবস্থা, একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।'

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার সময় জনসাধারণ একটু ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সামলে উঠতে খুব একটা দেরী লাগেনি। জরুরী অবস্থাটাকে এখন একটা স্বাভাবিক অবস্থা বলেই ধরে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে বেশ কিছু অসুবিধা দূর হয়েছে। বিশেষ করে মিছিল নগরী কলকাতা এখন অনেক শান্ত-নিরুপদ্রব।

যদিও কলকাতার বদনাম মুখে মুখে ছড়ায়, কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় কলকাতার স্থান অপরাধের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অনেকগুলো রাজ্যের নীচে।

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে অনুষ্ঠিত অপরাধের এক সরকারী সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ এই দশকে লোকসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৪ ভাগ অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ৪৬ ভাগ। যে শ্রেণীর অপরাধ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের আওতায় আসে ১৯৫১ সালে তার সংখ্যা ছিল ৯ লক্ষ ৫২ হাজার। ১৯৫২ সালে এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার। এক বছরে বৃদ্ধির হার ৩-৪ ভাগ।

১৯৫২ সালে অপরাধের ব্যাপারে দিল্লীর স্থান সকলের ওপরে-৩০০৫৪, বোম্বাই—২৫৯৭০, মাদ্রাজ—১৩০১৫, কানপুর—১০১০৪, কলকাতা—৯৭৯৩, বাঙ্গালোর—৭৫৫৫, হায়দরাবাদ—৪০৮৯, আমেদাবাদ—৩২১২।

অপরাধের একটা ক্ষেত্রে কলকাতার স্থান সকলের ওপরে। সেটা 'দাঙ্গা হাঙ্গামা (রাজনৈতিক ?) ১৯৫২ সালে কলকাতায়—৬৬১, দিল্লীতে—৩৮৮, বোম্বাইয়ে—২১৪।

চুরি : দিল্লী—১৭৮১২, বোম্বাই—১৩২১৫, কলকাতা—৪৭২৬।

বিশ্বাসভঙ্গ : বোম্বাই—১০৫২, দিল্লী—৬৩১, কলকাতা—৪৫৯।

প্রতারণা : দিল্লী—৭০১, বোম্বাই—৬২৬, কলকাতা—৩৩০।

জালিয়াতি : বোম্বাই—৮৬, দিল্লী—৭০, কলকাতা—৩।

খুন : বোম্বাই—১৬০, দিল্লী—৯৯, কলকাতা—৫১।

অপহরণ : দিল্লী—৪৬৭, বোম্বাই—১৬৭, কলকাতা—১১৩।

লুণ্ঠন ও ডাকাতি : দিল্লী—৩৫৭, বোম্বাই—২৭২, কলকাতা—৮১।

তালা ভেঙে চুরি : দিল্লী—২৮০৭, বোম্বাই—১৮৮২, কলকাতা—৮৫৩।

নারী ধর্ষণ : দিল্লী—৩৩, বোম্বাই—২৯, কলকাতা—১৫।

শিশু অপরাধীদের সম্পর্কে সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭২ সালে মোট ৯৭৯২১ শিশু অপরাধীকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল, তার মধ্যে মহারাষ্ট্রের—২৪৬৩৮, তামিলনাড়ুর—১৯১৪৪, গুজরাটের—১৭৫৪৯, মধ্যপ্রদেশের—১০৪৮৫, আসামের—৪৫১৮, কর্ণাটকের—২৪৬২, বিহারের—২৩৬৫, পশ্চিমবঙ্গের—২১৪৫।

ভারতের তিনটি প্রধান শহরে শিশু অপরাধীর সংখ্যা : মাদ্রাজ—১৩২৫০, দিল্লী—৩৬৮২, বোম্বাই—১৬০৬, কলকাতা—২৫৫।

অপরাধের মোকাবিলায় যে পুলিশ শক্তি নিয়োজিত তার গড়পড়তা হিসাব হল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা শাসন করে ২২ জন পুলিশ। সবচেয়ে কম পুলিশী ব্যবস্থা জম্মু ও কাশ্মীরে—শতকরা চারভাগ। পশ্চিমবঙ্গ

সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৭৫-৯ ভাগ। কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলোর মধ্যে দিল্লী ও চণ্ডীগড়ে যথাক্রমে প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা শাসন করে ১১৮২ ও ১৩৯৭ পুলিশ।

কলকাতায় অপরাধ কম কিন্তু কলকাতায় সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা দিল্লী-বোম্বাইয়ের তুলনায় বেশি। কলকাতায়-৭২৭৬, বোম্বাইয়ে-৪৮৫২, দিল্লীতে ৪১০০ জন।

পশ্চিমবঙ্গে মোট পুলিশ—৬৬৬৫৫, সশস্ত্র—২৫৩৩৫। উত্তরপ্রদেশে—৯৩০৩৭, সশস্ত্র—২৩১৪৯। মহারাষ্ট্রে—৭৭৬৫৮, সশস্ত্র—৭৬৬৮ জন। শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গও শান্ত। প্রতিবাদের মিছিল আজ নেই বললেই চলে। নেই কথায় কথায় ট্রাম বাস বন্ধ করে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার নতুন কৌশল।

আজ, অফিস-আদালতে, কলে-কারখানায়, স্কুলে-কলেজে এবং অজস্র প্রকার সংগঠনে আগের চেয়ে অনেক বেশি নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে, জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা দায়িত্ব বোধ জাগছে।

আচার্য বিনোবা ভাবে সম্ভবতঃ এই অবস্থাটার প্রতি লক্ষ্য করেই জরুরী অবস্থাকে 'অনুশাসন পর্ব' নাম দিয়েছিলেন। আমরা এমন একটা পর্বের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি যখন আমাদের নিজেদেরই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সংযম পালন করতে হবে—যে শৃঙ্খলাবোধ ও সংযম ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কোন মানুষ যেমন আত্ম প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে না, তেমনি এমন একটা সুবৃহৎ জনসমষ্টিও ঐক্যবদ্ধ ও সংহত জাতিরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞজনের বক্তব্য : কিন্তু এই সমস্ত স্বীকার করে নিলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, গত সাতাশ-আটাশ বছরের স্বাধীতার পরেও ভারতের আভ্যন্তরীণ জীবনে এমন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হল কেন? কেননা এই প্রশ্নের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারে বা নিখিল ভারতীয় শাসনে কংগ্রেসেরই একাধিপত্য ছিল ও এখনও আছে। দক্ষিণ বা বাম কোন দলই নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীও ক্ষমতার উৎসে দখল বিস্তার তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেননি, বরং কেন্দ্রের এই শাসন বা নিয়ন্ত্রণ অধিকাংশ রাজ্যগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং অনেকগুলি গঠনমূলক কর্মেই কেন্দ্রের অনুমতি, সম্মতি ও সহযোগিতা ছাড়া অগ্রসর হওয়ার উপায় ছিল না।

অপর পক্ষে একথাও সত্য যে, গত কুড়ি বছরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে শিল্পোৎপাদনের এক নতুন যুগ এসেছে এবং শিক্ষা থেকে শুরু করে নতুন নতুন সড়ক নির্মাণের, নদী-বন্ধনের, কৃষি উৎপাদনের এবং বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের বহু বিস্তৃত কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, এই বিপুল কর্মোদ্যোগ এবং নতুন নতুন প্রকল্প সত্ত্বেও দেশের শতকরা চল্লিশজন লোক দারিদ্র্য-সীমার নীচে জীবনধারণ করে শতকরা সত্তরজন নিরক্ষরতার অভিশাপ বহন করে।

আমাদের বিশ্বাস এই ব্যাপক দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও বেকার সমস্যাই দেশের ভেতর অরাজকতা ও সমাজ বিরোধী শক্তিগুলোকে প্ররোচনা এবং উস্কানি দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অন্যথায় কংগ্রেসের তুলনায় যাদের শক্তি নগণ্য কিংবা যে সমস্ত ক্ষুদে-ক্ষুদে দল আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ তাদের এমন কি সাধ্য ছিল বা আছে যে, ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতা বা অরাজকতা ডেকে আনতে পারে?

সুতরাং কংগ্রেস নেতাদের উচিৎ এই সমস্ত প্রশ্ন গভীর ভাবে তলিয়ে দেখা। অধিকন্তু আমরা এতকাল পর্যন্ত পশ্চিমী গণতন্ত্রের অনুকরণ করে এসেছি। কেননা, প্রায় দুশো বছর আমরা বৃটিশ শাসনের অধীন ছিলাম। কিন্তু পশ্চিমী গণতন্ত্র দেশের সমৃদ্ধিশালী সামাজিক ভিত্তির ওপর গঠিত এবং এই সমৃদ্ধি তাদের ঘটেছিল সারা পৃথিবী কিংবা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য লুঠ ও শোষণ করার ফলে। এই সাম্রাজ্যবাদের শিকার ছিল ভারতবর্ষ।

প্রায় দুশো বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের লাঞ্ছনা বহন করেছে আমাদের কোটি কোটি দেশবাসী—যারা রিক্ত, দরিদ্র ও নিরক্ষর এবং জনগণের সংখ্যাগুরু অংশ এই শোষিত শ্রেণীর অন্তর্গত।

সুতরাং পশ্চিমী ধনশালী দেশের গণতন্ত্র আমাদের দেশের পক্ষে কতটা উপযোগী সে কথাটাও নতুন করে চিন্তা করা দরকার।

ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ়তা আছে, সাহস আছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মত মেরুদণ্ডের শক্তি ও কূটনৈতিক তীক্ষ্ণতা আছে। সুতরাং সমগ্র ব্যবস্থাটাকে তিনি ঢেকে সাজাবার কথা চিন্তা করুন।

জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর দেশে যে সামাজিক শান্তি অব্যাহত আছে, সেটা আনন্দের কথা। কিন্তু অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তো এই অবস্থা চলতে পারে না। তিনি নিজেই বলেছেন যে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত জরুরী অবস্থা

কারণ, তাঁরা জানেন যে, বর্তমান ভারতবর্ষে কংগ্রেসের কোন বিকল্প নেই এবং তাঁদের চোখের সামনে রয়েছে বাংলাদেশের ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

সুতরাং তাঁরা মনে করেন যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার দ্বারা ভারতবর্ষ এক গভীর দুর্বিপাক থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশবাসী প্রত্যাশা করে যে, এই জরুরী অবস্থার সুযোগে তাদের জীবনের জরুরী দাবীগুলোও অগ্রাধিকার পাবে। সেই আশাতেই জনগণ শান্তি সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

ফাল্গুন প্রায় শেষ। শীতের আমেজটুকু সকালের রোদ থেকে মুছে গেছে। দুপুরে বেশ গরম বোধ হয়। আকাশ ঘন নীল। পাখিদের ডাক এখন সব সময় শোনা যায়।

এইমাত্র স্নান করে এখানে এসে বসেছি। প্রায় দশটা বাজে। সরমা ছেলেকে নিয়ে স্কুল থেকে ফিরবে আরো আধঘণ্টাটাক পরে। স্কুল থেকে বাড়ির রাস্তাটুকু এ সময় প্রায় দিনই ওরা হেঁটে আসে। অফিস যাত্রীর ভিড়ে এ সময় ট্রামে বাসে ওঠা নামা করতে বড় অসুবিধা হয়।

কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এ এলাকার অনেক অফিস যাত্রী রাস্তা দিয়ে গেছে। এখন শিশির হালদারকে ফিরে আসতে দেখলাম। ঘণ্টাখানেক আগে ভদ্রলোককে এই রাস্তা দিয়েই অফিস যেতে দেখেছি।

কাছে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার, ফিরে এলেন যে?'

শিশির হালদার অন্যমনস্ক ছিলেন। আমাকে দেখলেন। বারান্দার গেটটা বাবুনের জন্যে খোলা থাকে এ সময়, স্কুলে যাবার সময় ওই খুলে রেখে যায়, বন্ধ করে ফিরে এসে। গেটটা ঠেলে ভেতরে এলেন শিশির হালদার। হাতের কাপড়ের থলিটা ছোট টেবিলটার ওপর রেখে বসলেন। একটু হাসলেন। বললেন, 'কি করছিলেন?'

'স্নান করে এলাম এইমাত্র।' বললাম আমি।

'সরমা স্কুল থেকে ফেরেনি এখনো?'

'প্রায় সময় হয়ে এল ফেরার।'

শিশির হালদার উঠে কাজ করা মেয়েটার কাছ থেকে জল খেয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফিরে এলেন যে!'

বাস-ট্রাম পেলাম না।

'বন্ধ ?'

'না বন্ধ নয়, এক ঘণ্টার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে দুখানা বাস, খানতিনেক ট্রামের সামনেটা দেখতে পেলাম। অনেকেই ঝুলে পড়ল তাতে, আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব হল না।'

কথাটা শুনে চুপ করেই রইলাম। আমাকে ট্রামে বাসে চড়তে হয় না। দীর্ঘদিন এ বাড়ির বাইরে খুব কমই বেরিয়েছি। অফিস যাত্রীদের দুর্ভোগ যে কি, আমার জানার কথা নয়।

টেবিলের ওপর রাখা কাগজখানা টেনে নিয়ে দু-চারবার পাতা উল্টে রেখে দিলেন শিশির হালদার। বললেন, 'মনে হচ্ছে এই বছরই নিত্যদিনের এ দুর্ভোগ শেষ হয়ে যাবে।'

'এ বছর আপনার·· ·· '

'না। তিন বছর আরো পাবার কথা, পাব না।'

'কেন ?'

'প্রায় প্রতিদিন লেট। প্রতিদিন অফিসারের একই প্রশ্ন, কলকাতায় থাকেন তবু কেন লেট হয় আপনাদের ? একটু সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরুতে পারেন না ? কিন্তু কি করে অফিসারকে বোঝাই কলকাতার ট্রাম বাস সময়ে চলে না। শহরের অফিস যাত্রীরা নিত্যদিনের জ্যামের হাত এড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় সময়ে অফিস পৌছাতে পারে না। অথচ···'

আমি তাঁর দিকে চাইলাম।

শিশির হালদার বললেন, 'কথাটা বলা হয়তো অন্যায় হবে। সরকার অর্ডিন্যান্স জারী করে ট্রাম বাসের ভাড়া বাড়ালেন। আমরা নীরবে মেনে নিয়েছি সে ব্যবস্থা। কোন আন্দোলন নেই, প্রতিবাদ নেই। বুঝেছি যে পথ অতিক্রম করি যে মূল্যে তা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি পেলাম ? যে আমি যে সময়ে অফিস বেরুতাম—বেরুচ্ছি তার এক ঘণ্টা আগে। সময়ে ট্রাম বাস পেলে, অফিস পৌছাব আমার অফিস শুরুর আধ ঘণ্টা—তিন কোয়ার্টার আগে। আজ ট্রাম বাস নেই বললেই চলে। অন্যদিন ট্রাফিকের ভিড়ে সেই লেট। তবু দোষ আমার। কারণ বেঁচে থাকার জন্যে,সংসার প্রতিপালনের জন্যে চাকরিটা আমাকেই করতে হয়।'

আমি চুপ করেই রইলাম। এ অবস্থায় কি বলতে হবে আমার জানা নেই।

শিশির হালদারও চুপ করে কাগজটা ওল্টাতে লাগলেন আবার। সহানুভূতি জানানো ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সহানুভূতি জানিয়ে কোন লাভ নেই। আমি তাঁর দুঃখ ভোলাতে পারব না।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন শিশির হালদার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছেন?'

আমি উত্তরে মৃদু হাসলাম।

শিশির হালদার বললেন, 'চাকরি জীবনে পঁয়ত্রিশটা বছর কাটালাম। নিজের কথা বলতে পারি—কাজে ফাঁকি দিইনি কখনো। এক সময় দুর্নাম কুড়িয়ে ছিলাম। দেখতাম বারোটায় আসছে সব—গালগল্প করে বাড়ি যাচ্ছে। কাজ করি বলে বোঝা বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। অফিসার অসহায়। স্টাফকে কাজ করার কথা বলেন সাধ্য কি! প্রতিবাদ করে ভুল করেছিলাম। ছেলের চাকরি হওয়ার কথা ছিল, হয়নি। দুঃখ নেই। নতুন অফিসার এসেছেন বছর তিনেক। মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন স্টাফের সঙ্গে। জরুরী অবস্থায় খুশি আমি কম হইনি। এবার সকলে অন্ততঃ কিছু কিছু কাজ করবে। কাজ করছেও। সেই সঙ্গে শুধু লেটের জন্যে অফিসারের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাই নয়, এতদিন শুধু ফাঁকি দিয়ে এসেছি এ বদনামও কুড়োতে হচ্ছে। নিজেকে কাজের লোক প্রমাণ করে অতিরিক্ত তিনটে বছর আদায় করতে মন সায় দেয় না।'

বললাম, 'চাকরি তো আটত্রিশ বছরের?'

'সেটা আজ ভাগ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করছে।'

'কিন্তু ......।'

'অনেক ক্ষেত্রে এটাই সত্যি হচ্ছে আজ।'

আমি চুপ করে রইলাম।

শিশির হালদার বললেন, 'আপনি বসুন আমি চলি।'

'বাড়ি যাবেন?'

'বাড়িতে থলিটা রেখে একবার পোস্ট অফিসে যাব। হঠাৎ ছুটির কথাটা অফিসকে জানাতে হবে। মাইনের টাকা কম পেলে তো সংসার শুনবে না।'

'বলুন সংসারের কর্ত্রী শুনবেন না।'

হাসলেন শিশির হালদার। বললেন, 'দুটোই ঠিক।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক। বড় সংসার। একমাত্র উপায়ী। দুটো মেয়ের

বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলেটি বি-এ পাশ করে বহুদিন বসে আছে। মেজটি লেখাপড়া খুব একটা শেখেনি, টালিগঞ্জের ওধারে ছোট একটা কারখানায় অল্প মাইনের কাজ করে। সেজ ছেলে ক' বছর আগে কলেজে পড়তে পড়তে পার্টি করতে নামে। জেল হয়েছিল ক'বছরের। এখন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। ছোট ছেলে স্কুলে পড়ছে।

নিজের ছোট বাড়িটা আছে বলেই কোন রকমে সংসারটাকে চালাতে পারেন শিশির হালদার। তুটো মেয়ের কোন রকমে বিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওঁর স্ত্রীকে দেখেছি, অধিক সন্তানের জননী, দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন। অশান্তির আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন অহরহ।

মাঝে মাঝে বড় তুঃখ হয়। শুধু শিশির হালদারের জন্যে নয়। শিক্ষিত একজন মানুষ···। আমি চিন্তা করতে পারি না। আজকের ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা। তার মধ্যে বোধহয় প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

মনে পড়ে ১৯৩৮ সালের কথা। ১৯৩৮ সালের ৮ই জানুয়ারী সর্বসম্মতিক্রমে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। গুজরাটের তাপ্তী নদীর তীরে হরিপুরায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের একান্নতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্রের সভাপতির ভাষণটি রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ভবিষ্যৎ-প্রজ্ঞা দৃষ্টির স্বকীয়তায় অসামান্য মূলবত্তার অধিকারী। সভাপতির ভাষণে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। ভারত বিভাগ সম্পর্কেও তিনি ভবিষ্যৎবাণী (যদিও তখন পাকিস্তানের নামগন্ধও কোথাও ছিল না) করেছিলেন।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে তিনিই প্রথম অগ্রণী। তাঁর মতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে স্বাধীনোত্তর ভারতকে পুনর্গঠন করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এই সময়ের ব্যবধানে যদি ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে দেশের সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করবে। কাজেই স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান কর্তব্য প্রথমে পরিবার পরিকল্পনায় সচেষ্ট হওয়া।—

"With regard to the long-term programme for a free India, The first problem to tackle is that of our increasing population. If population goes up by leaps and bounds our plans are likely to fall through. It will, therefore, be desirable to restrict our population until we are able to

feed, clothe and educate those who are already exist."

বর্তমান বিশ্বে প্রতি ২½ সেকেণ্ডে ১০টি করে শিশু জন্মগ্রহণ করে। প্রতি ঘণ্টায় ১৪০০ ও প্রতিদিনে ৩৩,৫৯৭ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্বের প্রতি সাতজন ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়। ভারতবর্ষের স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র বিশ্বের মোট স্থলভাগের ২.৪ ভাগ। কিন্তু এখানে বসবাস করছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় চৌদ্দভাগ—গড় হিসাবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা হচ্ছে ১৭৮ জন।

ভারতবর্ষের বার্ষিক জনসংখ্যা হল দু' কোটি দশ লক্ষ, আর মৃত্যুর সংখ্যা আশী লক্ষ। কাজেই ভারতবর্ষে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে এককোটি ত্রিশলক্ষ (যা অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার সমান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ভারতবর্ষের চেয়ে আয়তনে আড়াইগুণ)।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আরও জটিল। এ রাজ্যের স্থলভাগের পরিমাণ সমগ্র ভারতবর্ষের মোট স্থলভাগের শতকরা ২.৭৪ ভাগ। কিন্তু বসবাস করছে ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮.১১ ভাগ। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ৫০৪ জন (ভারতে ১৭৮ জন)।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনাকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ১৯৫১-৫২ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি পরিবার তথা জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই এই কর্মসূচীর লক্ষ্য। ভারতবর্ষই হচ্ছে প্রথম দেশ, যেখানে পরিবার পরিকল্পনাকে জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৫১-৫২ থেকে ৫৫-৫৬) পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী সীমাবদ্ধ ছিল—গবেষণা ও ক্লিনিক ভিত্তিক প্রথায়—প্রধানত শহরাঞ্চলে হাসপাতাল ও কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে, যেখানে মায়েদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া হত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬) এই কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার সূচনা হয়।

প্রথম দুটি পরিকল্পনা কালে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় 'ক্লিনিক ভিত্তিক' থেকে 'সম্প্রসারণ পদ্ধতিতে' সমগ্র কর্মসূচীকে রূপায়িত করা হল। এর উদ্দেশ্য হল জনগণের কাছে সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার বাণী পৌছে দেওয়া।

অন্তর্বর্তী পরিকল্পনা কালে (১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯): প্রকৃতপক্ষে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার কাজ গভীর ভাবে ও ব্যাপক ভাবে শুরু হয়।

১৯৬৬-৬৭ সালে পরিবার পরিকল্পনার কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে 'পরিবার পরিকল্পনা' নামে একটা পূর্ণাঙ্গ পৃথক দপ্তর খোলা হয় এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের নামকরণ করা হয় 'স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা' দপ্তর। এই কর্মসূচীকে গুরুত্ববোধে পরম অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং সর্ব স্তরে সংগঠন ও কর্মী নিয়োগ করা হয়।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৫৯-৬০) ছোট পরিবারই সুখী পরিবার—এই আদর্শ জনসাধারণের মনে দৃঢ়বদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। যোগ্য দম্পতিকে ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা কালে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ধার্য লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে (১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৮-৫৯) পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কর্মসূচীর ওপর আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করে চরম অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয় পরিকল্পনার শেষে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় বর্তমান জন্মহার ছত্রিশ থেকে কমিয়ে ত্রিশে এবং ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে পঁচিশে নামিয়ে আনতে হবে। ভারত সরকার এই পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অর্থ বরাদ্দ করেছেন—৫১৯ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনার প্রতীক ও শ্লোগান এখন দেশের সর্বত্র সুপরিচিত। যদিও এই কর্মসূচীর জন্যে প্রথম দিকে ভারত সরকারকে স্বদেশে-বিদেশে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবং এর জন্যে দায়ী জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার। অন্ধ বিশ্বাস—ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রথম দিকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

এছাড়া বামপন্থী মতবাদের দিক থেকেও পুরোপুরি সমর্থন পাওয়া যায় নি। এবং বর্তমান বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতেও আর কোন বিরূপতা নেই।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ প্রজননশীল দম্পতি কোন না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। মোট জনসংখ্যা চার কোটি নব্বই লক্ষ। প্রজননশীল দম্পতির সংখ্যা প্রায় আটাত্তর লক্ষ। এবং বাকি আটষট্টি লক্ষ দম্পতির যাঁরা কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করেননি, এঁদের অধিকাংশই

নিরক্ষর ও দরিদ্র—বসবাস পল্লী অঞ্চলে। এবং মূলতঃ এঁদের নিয়েই আজকের সমস্যা!

এই সমস্যার যদি সমাধান সম্ভব না হয় ভারতবর্ষের নানান সমস্যার সমাধান হওয়াও সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে ভাস্করের কথাগুলো মনে পড়ছে। মাত্র কিছুদিন আগে সংবাদ পত্রে জন্ম নিয়ন্ত্রণের আইন হবে কি হবে না নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। ওরা কজন বন্ধু এসেছিল। ওদের প্রয়োজন সরমার সঙ্গে। সরমা বাবুনকে নিয়ে বাইরে তখন।

ওরা ঘরে বসেছিল। এখানে বসেই ওদের আলোচনা স্পষ্টই কানে আসছিল আমার। ভাস্করের গলা উচ্চগ্রামে।

একজনের মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল, 'কি করব বল, ওর জেদের জন্যেই এমন হল।'

ভাস্কর বলল, 'চুপ কর, কথা বলিসনি। তিনটে ছেলের পর মেয়ের সখটা তোরও কম ছিল কি?'

ও পক্ষ চুপ।

'কি রে বল, এবারও তো ছেলে হল। হাসপাতাল থেকে ফিরেই তো তোর বউ আবার একটা মেয়ের বায়না ধরবে।'

বন্ধু নীরব।

'তোদের গুলি করে মারতে হয়, বুঝলি। বুঝতাম গ্রামে থাকিস, লেখাপড়া জানিস না। কিন্তু...... ।'

একজন ভাস্করকে থামাতে চেয়েছিল। আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

ভাস্কর চুপ করেনি। বলেছিল, 'মাইনে কি পাস জানি। বাড়ি ভাড়া দিস দেড়শো টাকা। মা, বিধবা বোন রয়েছে। চারটেকে মানুষ করবি কেমন করে? তারপর চাকরি? বুঝলি, তোদের জন্যেই আজকে দেশের এই হাল-হালৎ। ছিঃ ছিঃ।

ভাস্করের বন্ধু এবার প্রতিবাদ করেছিল। শুরু হয়েছিল কথা কাটাকাটি।

ভাস্করের কণ্ঠস্বরটা কানে এসেছিল, 'বুঝলি, বুঝিয়ে হবে না। বুঝেও বুঝবি না তোরা। তোদের জন্যে চাই...ইত্যাদি-ইত্যাদি......

ক'দিন পরে শিশির হালদারের কাছে শুনেছিলাম, 'মেজ ছেলের ছোট কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে।' বন্ধ হয়ে গেছে বললে ঠিক হয় না। মালিক পক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে।

জরুরী অবস্থায় জনজীবন শান্ত। শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। উৎপাদন বেড়েছে। দেশ-জাতি একটা নতুন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। যে অরাজকতা, অনিশ্চিত অবস্থা ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল দেশকে—জাতিকে, ভেঙে পড়বার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল—তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত।

জনসাধারণ মেনে নিয়েছে জরুরী অবস্থাকে। স্বাগত জানিয়েছে। শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনতা চেয়েছে মুক্তি। দাসত্বের শৃঙ্খল মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে। কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষে মুক্তির স্বাদ তারা পায়নি!

কিন্তু জরুরী অবস্থায় শ্রমিকের জীবনে মুক্তির স্বাদ আসেনি। মালিকের স্বার্থ আজও অব্যাহত। যথেচ্ছাচারের নমুনা ভুরি-ভুরি। জরুরী অবস্থার সুযোগ তাদের আরো ক্ষমতাশালী করেছে। বিশেষ করে চটশিল্পে। এক-তরফা লে-অফ, লক আউট, ক্লোজার সমানে চলছে। চলছে সামান্য কারণে ছাঁটাই। প্রতিবাদের উপায় নেই, প্রতিকার কে করবে। জরুরী অবস্থা একশ্রেণীর মালিক পক্ষকে অন্যায় সুযোগ নিতে সহায়তা করছে। কারণ জরুরী অবস্থায় লে-অফ, লক আউট, ক্লোজার নিষিদ্ধ হয়নি!

প্রধানমন্ত্রী অন্যায় ছাঁটাই, লে অফ এবং ক্লোজার বন্ধের ব্যবস্থার কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এখন দ্বন্দ্ব সংঘাত নয়, চাই আরো বেশী উৎপাদন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মালিক ও শ্রমিকরা কেউই দায়িত্বহীন আচরণ করবেন না।

কিন্তু সরকারী তথ্যে প্রকাশ বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের তুলনায় অর্দ্ধেক হলেও শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা প্রায় বারোগুণ।

জরুরী অবস্থার ছ'মাস পরে দেখা গিয়েছিল একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে জমা পড়েনি এমন টাকার পরিমাণ দশ কোটি টাকারও বেশি। বছর বছর বেড়ে পনেরো কোটিতে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ায় বকেয়া পাঁচ কোটি টাকা জমা পড়েছে।

আইন আছে কিন্তু সেই আইন মেনে কাজ করতে মালিক পক্ষ অতীতে যেমন বাধ্য ছিল না জরুরী অবস্থার প্রাক্কালেও ঠিক তাই। আজও আইনের ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে মালিক পক্ষ। কর্মচারীদের বেতন থেকে কাটা অংশ

এবং মালিকদের দেয় অংশ জমা না দিয়ে কি ভাবে আইনের আওতা থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে—এখনও পাচ্ছে?

তেমনি ই-এস-আই স্কীম অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন থেকে কাটা টাকা—মালিকদের দেয় অংশ সময় মত জমা না পড়ায় অভিযোগ কম নয়। ক্ষতি-গ্রস্ত হচ্ছে শ্রমিকরাই।

অভিযোগের অন্ত নেই দু' পক্ষেরই। শ্রমিক মালিক সম্পর্কে তিক্ততা দিনের পর দিন বেড়েছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের শেষ ছিল না। পরিণাম কখনো কখনো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পরিণতি বহু ক্ষেত্রেই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পরিণতি বহু ক্ষেত্রেই সুখের হয়নি।

আর সেদিনের নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে। তবু কেন আজও লে-অফ, ক্লোজার, ছাঁটাই সমানে চলছে? কেন?

অথচ পশ্চিমবঙ্গ এতদিনে নতুন কর্মসৃষ্টিতে ভারতবর্ষের শীর্ষতম রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। তালিকাভুক্ত কর্মপ্রার্থী সংখ্যায় শীর্ষ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত শিল্পে গত তিন বছরে (১৯৫২-৫৫) ১ লক্ষ ৯৭ হাজার নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের ছ' বছরের তুলনায় (১৯৫৬-৫৭ মার্চ) এই অগ্রগতির হার ৫৩৫ শতাংশ। ওই ছ'বছরে সংগঠিত শিল্পে মাত্র ৩১ হাজার নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু ১৭ লক্ষ তালিকাভুক্ত কর্মপ্রার্থী বা ৮ লক্ষ ৩০ হাজার পূর্ণ বেকার (সরকারী হিসাব মতে) মানুষের কাছেই নয়, রাজ্যের সকল মানুষের কাছে নতুন আশার সঞ্চার করবে।

বিবিধ অসুবিধার মোকাবিলা করে পশ্চিমবঙ্গে কি ভাবে শিল্পায়ণের প্রয়াস এগিয়ে চলেছে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী সে তথ্যও তুলে ধরেছিলেন। যেমন:

১। ১৯৫২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৬৭৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন সহ মোট ২০৪০টি নতুন কোম্পানি রেজেস্ট্রী হয়েছে। আগের পাঁচ বছরের (১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৫১-৫২) তুলনায় অনুমোদিত মূলধনের হার ৫০০ শতাংশ বেড়েছে।

২। ১৯৫৫ সালে যে পাঁচ বছর শেষ হয়েছে সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্যে ৯৯৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের ৮৬৫টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন। এই বিনিয়োগের পরিমাণ আগের বছরগুলোর (১৯৫৭-৬০) তুলনায় ৫৭২ শতাংশ বেশী।

৩। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার আর্থিক সাহায্য গত তিনবছরে ৬১-৫ শতাংশ বেড়েছে।

৪। অনুমোদিত শিল্প প্রকল্পগুলোর মধ্যে ৩১৭টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ১৮০টি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। ৭৯টি চালু হওয়ার মত পর্যায়ে এসেছে। ৫৮টির কাজ চলছে। একমাত্র ১৯৫৫ সালেই ৬৭টি প্রকল্প চালু হয়েছে। ২৩০টি প্রকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। আর ৩১৮টি প্রকল্প প্রাথমিক স্তরে রয়েছে।

৫। কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে কতগুলি প্রকল্প সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ক'বছরে মোট ১১০৮টি শিল্প প্রকল্প কেন্দ্রের কছে পাঠিয়েছে। এতে মোট বিনিয়োগের প্রস্তাব হল ১৩১৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সরকারী ক্ষেত্রের ১৮টি, বেসরকারী ক্ষেত্রের ২২২টি এবং জয়েণ্ট সেক্টরের ৩টি—মোট ২৪৩টি প্রকল্প এখনও কেন্দ্রের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই অনুমোদন সাপেক্ষ সরকারী ক্ষেত্রের প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে হলদিয়ার রিফাইনারী প্রসারণ ও হলদিয়ার শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড প্রকল্প।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংকট মুক্তির জন্যে রাজ্য সরকারের প্রশংসনীয় ভূমিকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বা শিল্পমন্ত্রী আত্মতুষ্টি প্রকাশ করতে পারেনি। কারণ বাস্তব পরিস্থিতি—বিশেষ করে কাঁচামাল ও জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধি, দেশে ও বিদেশে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার অভাব এবং মন্দাজনিত সংকটগুলো সম্পর্কে সরকার সচেতন আছেন।

পাট শিল্প, ওয়াগন শিল্প, বস্ত্র ও পরিবহন শিল্পে যে সংকট চলছে তার কথা প্রায় সকলেই জানেন। এবং এর প্রতিকার চিন্তায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যম প্রশংসনীয়।

শিল্পের প্রসার ও নতুন কর্মসংস্থানের বেগবান গতি বজায় রাখতে হলে শিল্পের দরজা খোলা রাখা ও উৎপাদন বৃদ্ধি—শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি, একতরফা লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজারের গতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তেমনি ধর্মঘট এড়াতে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নতি বিধান। জরুরী পরিস্থিতির বিধি নিষেধ শুধুমাত্র শ্রমিকের ক্ষেত্রে নয়, মালিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী লে-অফ, ধর্মঘট, লক-আউট, ক্লোজার ও নষ্ট শ্রমদিবসের যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা এরূপ :

১৯৫৫ সালের জুন থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৭ হাজার শ্রমিক লে-অফ হয়েছেন।

লক-আউটে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন : ৩২,৯৪০ জন,

ক্লোজারে : ৪২১৯ জন।

ধর্মঘট হয়েছে ৫৯টি এবং এর সঙ্গে জড়িত ছিল ৩১০০০ শ্রমিক। এর ফলে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হল ২,৪০,১৫১টি জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর এই হল শ্রম পরিস্থিতি।

১৯৫৫ সালে মোট লক আউটের সংখ্যা (অতীতের ৩৪টি সহ) ছিল ১৬৪টি। ওই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নষ্ট শ্রমদিবসের সংখ্যা হল ১০,৮৮৩,০৬১।

সরকারী হিসাবে দেখা যায় ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫এর আগস্ট পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৩৯১টি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। এতে জড়িত ছিল ৪০১৯১ জন কর্মী। ওই সময়ে বন্ধ কারখানা খোলা হয় ১৪৪টি। চাকরি রক্ষা পায় ১৮২০৫ জন কর্মীর।

এবং পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যে যখন কর্ম সংস্থান বাড়ছে তখনও কেন রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার বাড়ছে না, বরং তুলনামূলক ভাবে বহু ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে বা একই হার বছরের পর বছর স্থির থাকছে তার কারণ কি?

রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্যে চাকরিতে সুযোগ বৃদ্ধি বা অগ্রাধিকারের প্রশ্নে কোন ভাষাগত সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার স্থান নেই। রাজ্যে যাঁরা দশ পনেরো বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এমন অধিবাসীদের রাজ্যের সন্তান বলে ধরা হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবে, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ, মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে চাকরিতে স্থানীয় প্রার্থীদের অগ্রাধিকারের ব্যাপক ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেখানে বেকার সমস্যা সবচেয়ে কঠিন ও ব্যাপক সেখানে স্থানীয় কর্মপ্রার্থীর ভাগ্যে চাকরির কত অংশ জুটছে?

এই প্রশ্নের উত্তর রাজ্য সরকারের তথ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ১৯৫৫ সালের মুদ্রিত রিপোর্টে দেখতে পাওয়া যায়—ওই বছর শিল্পে নিযুক্ত মোট কর্মীর ৪২-৬৫ শতাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গের সন্তান। ১৯৫২ সালে ওই হার ছিল ৪৪-১৩ শতাংশ। তিন বছরে শিল্পে রাজ্যের সন্তানের চাকরির হার না বেড়ে কমে গেছে। তেমনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার ৫৮ শতাংশ। গত তিন বছর ধরে একহার চলছে। সংগঠিত শিল্পে গত তিন বছরে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ ঘটলেও এই শিল্পে রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার দেড় শতাংশ কমে গেছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় এই যে, রাজ্যের সন্তানদের চাকরি সংস্থানের মূলকেন্দ্র

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে লোক নিয়োগের হার প্রতি বছর কমে যাচ্ছে। অথচ তালিকাভুক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। এই কর্মপ্রার্থীদের অধিকাংশই রাজ্যের সন্তান।

বর্তমানে এক্সচেঞ্জের তালিকায় ১৭ লক্ষ ৯ হাজার প্রার্থীদের নাম রয়েছে। তার মধ্যে ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত প্রার্থী। কর্মপ্রার্থী মেয়েদের সংখ্যা হল ১ লক্ষ ৪ হাজার। এক্সচেঞ্জের প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ শহরের লোক। বাকি প্রায় ২৫ শতাংশ মফঃস্বল এলাকার।

এক্সচেঞ্জের ১৭ লক্ষ প্রার্থীর সকলেই পূর্ণ বেকার নন। কিন্তু অধিকাংশই বেকার এটা বাস্তব তথ্য। এক্সচেঞ্জ গত বছরে সরকারী ক্ষেত্রে ৯৭২১ জন এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৪১০৩ জনের চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন কিন্তু ১৯৫৫ সালেই মোট ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার নতুন কর্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।

বেকারত্বের এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কোন শিল্পে রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার কত তার তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের প্রকাশিত রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায়:

চটশিল্প॥ এই শিল্পে ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ। তার মধ্যে রাজ্যের সন্তানদের হার ছিল ২৪-৯৭ শতাংশ। প্রত্যেক বছরই সামান্য হলেও, রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার চটশিল্পে কমেছে।

কাপড়ের কল॥ এই শিল্পে ৫৩ হাজার ৭৬৫ জন কর্মী ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে শতকরা ৫৫ জন পশ্চিমবঙ্গের সন্তান। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যের বাসিন্দাদের কর্ম নিযুক্তির হার বাড়ছে না। বরং ১৯৫৩ সালের তুলনায় সামান্য কমেছে।

ইঞ্জিনীয়ারিং॥ এই শিল্পে ১৯৫৪ সালে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭৬৭ জন নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫২ সালের তুলনায় চাকরি নিযুক্তের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওই সময়ে রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার এই শিল্পে দুই বছরের মধ্যে প্রায় দেড় শতাংশ কমে গেছে।

ইস্পাত ও লোহা॥ এই শিল্পে ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল ৩৮২৩৯ জন। তার মধ্যে রাজ্যের সন্তানদের হার ছিল ওই সময়ে ৪২-৭৮ শতাংশ। ১৯৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে চাকরি হার ৩-৪৪ শতাংশ কমেছে।

মুদ্রণ শিল্প॥ ১৯৫৪ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল ১৭২০৬ জন। তার মধ্যে ৭৬-৪৯ শতাংশ রাজ্যের সন্তান।

কেমিক্যাল্‌স ॥ এতে ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত ছিল ৩০৮৫৪ জন। তার মধ্যে ৬০-৭৮ জন রাজ্যের সন্তান।

কাঁচ ॥ ১৯৫৪ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল ৭৪৮২ জন। তার মধ্যে রাজ্যের সন্তানের হার ছিল ৪৮-৭২। ১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৪ সালে এই শিল্পে ৮ শতাংশ রাজ্যের সন্তানের চাকরি বেড়েছে।

কাগজ ॥ এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৬৭০০ জন। তার মধ্যে ১৯৫৪ সালে রাজ্যের সন্তানের হার ছিল ২৭-৮২ জন। এই শিল্পে রাজ্যের সন্তানের চাকরির হার কমেছে।

রবার ॥ এই শিল্পে ১৯৫৪ সালে নিযুক্ত কর্মী ছিল ১৬০৬৫ জন। তার মধ্যে রাজ্যের সন্তানের হার ছিল ৬৯-৭৮ জন। ১৯৫২ সালে ওই হার ছিল ৭৭-৪৪।

অন্যান্য শিল্প ॥ রাজ্যের সন্তানের চাকরির হার সামান্য বেড়েছে।

ব্যবসায় বাণিজ্য ॥ ১৯৫৪ সালে ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাজ্যের সন্তানদের চাকরির হার ৫৮-৬৬ শতাংশ হয়েছে। ১৯৫২ সালের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেড়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র কেরানী ও টাইপিস্টের চাকরিতে রাজ্যের সন্তানদের হার ৯০ শতাংশ। কিন্তু গাড়ি ও লরীচালকদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ। অদক্ষ শ্রমিকের কাজে ৪২ শতাংশ এই রাজ্যের সন্তান। কারিগরীর কাজে শতকরা ৬৯ জন, সেল্‌সম্যানের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৯ জন এই রাজ্যের সন্তান।

ব্যবসায়-বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে ব্যাঙ্কিং, ইঞ্জিনীয়ার্স, কণ্ট্রাকটর্স ফার্মস, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং জলযান সংস্থায় রাজ্যের সন্তানের চাকরির হার বেড়েছে। কিন্তু ট্রেডার্স এসোসিয়েশন, শিপিং, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থায় চাকরির হার কমেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। আজকের মত এমন শান্ত পরিস্থিতি বহুদিন দেখা যায়নি। রাজ্যের বেকার সন্তানদের চাকরি সংস্থানের ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাক—এটাই কাম্য!

বাবুন ডাকল, 'ভাই।'

বললাম, 'বল দাদু।'

'আমি তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।'

বললাম, 'কেন, আজ তুমি বেড়াতে যাবে না?'

কথাটা বলেই ভুল বুঝতে পারলাম নিজের। সরমা কিছুক্ষণ আগে হাসপাতালে গেছে। এক বান্ধবী অসুস্থা, তাকে দেখতে গেছে। আজকের জন্যে বাবুনের ওপর পাহারাদারী আমার।

বাবুন বলল, 'ভাই, তুমি বড় ভুলে যাও। মণি, হসপিটালে গেছে কথাটা এর মধ্যেই ভুলে গেলে।'

লজ্জিতভাবে বললাম, 'সত্যি, দাদু বড় ভুল হয়ে গিয়েছে।'

'আচ্ছা ভাই, তোমার অত ভুল হয় কেন?'

'আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি।'

'আচ্ছা, তুমি বুড়ো হয়ে গেলে কেন?

'আমার যে অনেক বয়স হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা ভাই, আমিও একদিন তোমার মত বুড়ো হয়ে যাব তো?'

'যাবে বৈকি।'

'আমি কবে তোমার মত বুড়ো হয়ে যাব বলতে পারো?'

শিশু মনের কৌতূহল। সে কৌতূহল মেটাতে হবে। উত্তর দিতে হবে পছন্দমত। বললাম, 'তুমি এখন ছোট। ধীরে ধীরে বড় হবে। এখন স্কুলে পড়ছ, কলেজে পড়বে। তারপর চাকরি করবে—ধর তুমি ব্যবসাও করতে পারো—বা অন্য কিছু হতে পারো। এখন বালক আছ, তারপর কিশোর—যুবক—প্রৌঢ় তারপর আমার মত বৃদ্ধ।'

বাবুন মন দিয়েই আমার কথা শুনছিল। বলল, 'আচ্ছা ভাই, একবারে—ধর আজ রাত্রিবেলা আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম তোমার মত হয়ে গেছি। হয় না?'

'হয়।' বললাম আমি, 'তবে সকাল পর্যন্ত নয়।'

'তবে?'

'ধর তুমি আজ ঘুমালে—ঘুমিয়ে দেখলে তুমি আমার মত হয়ে গেছ। বা মনে কর তুমি দেখছ রাজপুত্র হয়ে গেছ। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়তে উড়তে চলেছ……।'

বাবুন হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'আশ্চর্য ভাই। আমি কাল রাতেই দেখেছি।'

'কি দেখেছ তুমি?'

'আমি রাজপুত্র হয়ে গিয়েছিলুম। পি-কে বলতে বললে, আমি স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন নাকি সত্যি নয়!'

'কে বললে সত্যি নয়?'

'পি বলছিল।' একটু ভাবল বাবুন। বলল, 'আচ্ছা ভাই, তোমার কি মনে হয়?'

'কি?'

'স্বপ্ন সত্যি হয়?'

'নিশ্চয়ই সত্যি—সত্যি না হলে তুমি দেখলে কি করে?'

'তাহলে পি যে বললে…।'

'পি ঠিক জানে না তাই বলেছে।'

উত্তরে খুশি হল বাবুন কিন্তু পরক্ষণেই আবার প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা ভাই, পি জানে না কেন?'

ওর সারল্য ভরা শিশু মুখের দিকে তাকালাম। কি উত্তর দিই—কোন্ উত্তরে ও খুশি হবে। বললাম, 'তোমার পি তো এখনও আমার মত বুড়ো হয়নি, সেই জন্যেই সব কিছু জানে না।'

এবার খুশি হল ও। বারান্দার একপ্রান্তে চলে গেল। দূরে ক'টা শিশু রাস্তার ওপরে রবারের বল নিয়ে খেলা করছিল। ও দূর থেকে দেখতে লাগল তাদের খেলা। কারণ একলা বাইরে যাবার হুকুম নেই ওর।

বাবুনকে দেখছি। অবাক বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে ও মুক্ত শিশুদের খেলা দেখছে।

হঠাৎ কানে এল কণ্ঠস্বর, 'ভাই।'

'কি হল?'

'আচ্ছা, ওই যে ওরা রাস্তায় খেলা করছে, ওদের মা-রা কিছু বলে না কেন?'

কঠিন প্রশ্ন। কি উত্তর দেব সহসা ভেবে পেলাম না।

বাবুন বলল, 'ওই ভাবে রাস্তায় খেলা করা তো ঠিক নয়।'

স্বীকার করতে হল আমাকে। সারা শহর জুড়ে আজ একই চিত্র। পার্কে যত শিশু যায় তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী শিশু খেলা করে পথে। এও একটা সমস্যা।

বাবুন বলল, 'আচ্ছা, ওদের বাড়ির কেউ ওই ভাবে খেলতে নিষেধ করে না কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরও আমাকে দিতে হবে। ভাবছি কি বলব। কি বললে,

ও সন্তুষ্ট হবে। হঠাৎ দূরে ভাস্করকে দেখা গেল। বাবুনও দেখতে পেল তাকে। ভাস্কর এসে বাবুনকে নিয়ে গেল।

বসে আছি। আজ ক'দিন হল কেউ একটা আসছে না। শিশির হালদার গতকাল একবার এসেছিলেন। সামান্য বসেই চলে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের মন মেজাজ ভাল নয়—জোর করিনি আমি।

একলা থাকতে খুব একটা খারাপ লাগে না। একলা থাকতে অভ্যস্ত আমি। বসে থাকি চুপ করে। মনে পড়ে অতীতকে। অতীতের অসংখ্য দিন-মাস-বছর। আমার বাল্য, কৈশোর, যৌবনের অসংখ্য দিনগুলোর অসংখ্য ছোট-বড় স্মৃতি। কোনটা মধুর কোনটা তিক্ত।

স্বাধীনতার স্মৃতি আমার জীবনে তিক্ততা এনেছে। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হওয়ার মতই অঙ্গহীন হয়েছি আমি। তবু স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন সফল হয়নি। লোভ লালসায় স্বার্থপরতায় ভরে গেছে দেশ। দলবাজির চরম প্রকাশ ঘটেছে। নাগরিক জীবন হয়েছে বিপন্ন। আমরা ভারতের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের অধঃপতন।

কিছু দিন আগের ঘটনা। এই বারান্দাতেই তর্কের বন্যা বয়ে যেত। প্রায় নবীনে প্রবীণে বাকযুদ্ধ শুরু হত। আমি নীরব দর্শক। বসে বসে দেখতাম আর শুনতাম।

এ শহর এক সময় পূতিগন্ধময় হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতির উন্নতি কিছুটা হয়েছে আজ।

প্রবীণদের দল নবীনদের আক্রমণ করেছিল সেদিন, 'আজ মুখে বড় বড় কথা বলছ তোমরা। চাকরি নেই বলে চিৎকার করছ। কিন্তু কোন্ সিনেমাটা হাউসফুল যাচ্ছে না দেখাও তো আমাদের!'

'সেটা কি আমরা ভর্তি করছি?'

'তাছাড়া আর কারা? দুপুরে কি আমরা গিয়ে ভিড় বাড়াচ্ছি?'

'আপনাদের দলকেও কম দেখি না।'

'সেটা তোমাদের চোখের ভুল। তাছাড়া যত্র তত্র নোংরা করা। আমাদের লজ্জা সরমের কথা ছিল, কিন্তু তোমাদের দেখি লজ্জা সরমের বালাই বলে কিছু নেই। ট্রামে বাসে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করছ মদ খাওয়ার, বান্ধবী নিয়ে...।'

নবীনের দল হৈ-হৈ করে উঠেছিল। প্রতিবাদ—পাল্টা প্রতিবাদ।

প্রবীণের দলের অভিযোগ, 'যথেচ্ছাচার তোমাদের গ্রাস করেছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'ভারতীয় আদর্শকে তোমরা ভুলতে বসেছ।'

'আমরা তারুণ্যের প্রতীক—খোলা মনের পরিচয় আমাদের ধর্ম।'

'পরিণতির কথা চিন্তা করেছ?'

'পরিণতি আমাদের সুখের।'

'কিন্তু মন যে তোমাদের মেকীতে পরিণত হচ্ছে।'

'আমরা প্রতিবাদ করছি।'

পাশ্চাত্ত ভাবধারা না গ্রহণ-না বর্জনের মাঝামাঝি একটা কিছু তৈরি হচ্ছ তোমরা।'

'মিথ্যে—মিথ্যে—সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।'

'তাহলে তোমরা কি হচ্ছ?'

'আমরা—আমরা······'

'বল কি হতে চাও তোমরা? তোমাদের আদর্শ কি? কি ভেবেছ?'

ভাবলেই কি হওয়া যায়?'

'তা হয়তো যায় না। কিন্তু আমরা ভাবতাম।'

'যা ভেবেছিলেন তাই হতে পেরেছেন কি?'

'তা হয়তো পারিনি।'

'তাহলে ভেবে লাভ কি? মিথ্যে চিন্তা শক্তি নষ্ট করে কিছু লাভ আছে?'

'তার চেয়ে সত্যি কথাটা স্বীকার কর না কেন?'

'কী সত্যি?'

'তোমরা ভাবতে ভুলে যাচ্ছ।'

'না-না···।' প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

শুরু হয়েছিল গোলমাল। নবীনে প্রবীণে দ্বন্দ্ব। আমি শুনেছিলাম। দেখেছিলাম। অতীতের সঙ্গে আজকের হিসাব কষেছিলাম যেন মনে মনে।

অতীতের সঙ্গে আজকের পার্থক্য অনেক। আজকের সঙ্গে আগামী দিনেরও নিশ্চয়ই পার্থক্য ঘটবে। তবে যুবসমাজের মন থেকে একটা বিষাদ বা অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। অস্থিরতা শান্ত-সুসংহত। যে স্বপ্ন মুছে গিয়েছিল তারুণ্যের চোখ থেকে আজ তা আবার ফুটে উঠেছে। তরুণ আজ আত্ম-প্রত্যয়ে দৃঢ়। সামনে আগামী দিন। বিশ্বাস তার মনে—সে জয়ী হবেই।

মনে পড়ে একটা দশক আগের কথা। ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৬ সাল।

এই একটা দশক ইন্দিরা গান্ধী দশক বলা চলে। এক দশক আগে তিনি জাতির নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন।

এই দশ বছরে তিনি ভারতবর্ষকে যেমন একদিকে বিশ্বসভায় একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্যদিকে তেমন দেশের অভ্যন্তরে তিনি এনেছেন রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও অর্থ নৈতিক শৃঙ্খলা।

বিগত বছরগুলোতে নানা ধরণের অসুবিধা ও সংকট পার হয়ে এসে আজ অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রকৃত পক্ষেই এক নতুন সম্ভাবনার দিকে পদক্ষেপ করেছে।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬—এই দশ বছর দেশের বাইরে থেকে যেমন তেমনি দেশের ভেতর থেকেও এসেছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে সব চ্যালেঞ্জেরই মোকাবিলা করেছেন এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই লাভ করেছেন সাফল্য। এই সাফল্য তার বিশ্বাসেরও সাফল্য—একদিকে অগ্রগতি ও অন্যদিকে সাময়িক ন্যায়—অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর জলন্ত বিশ্বাসেরই সাফল্য তিনি লাভ করেছেন এই দশ বছরে নতুন এক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত করে।

এই দশ বছরে ভারতবর্ষের সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্বগুলোর কথা বলতে গেলে ১৯৭৪ সালের মে মাসে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের জন্য ভূগর্ভে পরমাণু পরীক্ষা। অবশ্যই পরমাণু পরীক্ষার পরই পৃথিবী ব্যাপী 'গেল গেল' রব উঠেছিল। ভারতবর্ষের মত দারিদ্র সমস্যা পীড়িত দেশকে সত্য সত্যই পরমাণু শক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে উঠতে দেখে পৃথিবীর শক্তি রক্ষকের ভূমিকায় যারা সদা ব্যস্ত তাদের আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসে সাফল্যের সঙ্গে 'আর্যভট্ট' উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের ঘটনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া সম্পূর্ণ স্বদেশী উপকরণ ও প্রযুক্তি বিদ্যায় কয়েকটি পরমাণু শক্তি কেন্দ্র স্থাপন, ফ্রিগেট তৈরি এবং ইস্পাত, তৈল শোধনাগার ও সার কারখানা স্থাপনের ঘটনাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সঙ্কট ও ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরিণতিতে ভারতবর্ষকে জয়মাল্য উপহার দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়ে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সিমলা চুক্তির মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে স্থায়িত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন।

এই দশকে লোকসভার দুটি নির্বাচন (১৯৫৬ ও ১৯৫৭) হয়েছে। তাঁর নেতৃত্ব কালের প্রথমদিকে দলের মধ্যে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় প্রধানমন্ত্রী তাতে জয়লাভ করেন এবং তারপরই ১৯৫১ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচনে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতির প্রতি দেশবাসী একবাক্যে সমর্থন জানান।

১৯৫৭ সালের পর বিভিন্ন রাজ্যে যে অস্থিরতা দেখা দেয় ১৯৫২ সালের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পরিচালিত কংগ্রেসের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্যে দিয়ে তার অবসান ঘটে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে দুটো আলাদা রাজ্যের পত্তন করে এবং হিমাচল প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি করে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের সীমানা নতুন করে চিহ্নিত করলেন এবং মেঘালয়, মণিপুর ও ত্রিপুরাকে রাজ্যের মর্যাদা দান করলেন। পূর্বোত্তর সীমান্তে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল অরুণাচল প্রদেশকে দান করলেন আরও বেশি স্বায়ত্ত শাসনাধিকার।

ভারতের উত্তরে সিকিম রাজ্যে চোগিয়াল রাজত্বের অবসান এবং সিকিমকে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে স্বীকৃতিদানও প্রধানমন্ত্রীর অনন্য কীর্তি।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রথম দশকের শেষ দিকে ভারত অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করেছে। ১৯৫১-৫৬ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যে সব রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে ১৯৫৩-১৯৫৪ সালেই প্রথম সে সব শিল্প এক নতুন দিকে মোড় নেয় এবং তারপর থেকেই সেগুলোতে আরো বেশি বেশি মুনাফা অর্জিত হয়।

১৯৫৪-৫৫ সালে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। চলতি বছরে এই অগ্রগতি আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৫২ সালে ভারত তার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করেছে এবং এটাও ঘটেছে তাঁরই নেতৃত্বকালের মধ্যে।

দশ বছরের প্রধান-মন্ত্রীত্বকালে ইন্দিরা গান্ধী প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দৃঢ়তর করেছেন এবং বিশ বছরের শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের চিরায়ত মৈত্রীর সম্পর্ক আরও সংহত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ইন্দিরা গান্ধীকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার স্মারক 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। স্বাধীনতার পরে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রশ্নে যে কঠিনতম চ্যালেঞ্জ এসেছিল ১৯৭১ সালে, ইন্দিরা গান্ধী সে চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেন এবং ভারতকে নতুন গৌরবে উদ্ভাসিত করেন।

১৯৭৪ সালে এবং ১৯৭৫ সালের প্রথমার্দ্ধে ভারতের অভ্যন্তরে যে রাজনৈতিক ডামাডোল দেখা দেয়, যার পরিণতিতে কোন কোন বিরোধী দল সরকার বিরোধী অভিযান চালিয়ে হিংসাত্মক আচরণের হুমকি দেয় প্রধানমন্ত্রী তার সার্থক মোকাবিলার জন্যে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করেন।

রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তার প্রধান কারণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরেই প্রধানমন্ত্রী আকাশবাণীর মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাতে তিনি ইঙ্গিত দেন :

'কিছু সংখ্যক লোক সেনাবাহিনী ও পুলিশকে উস্কে দিচ্ছে এবং তাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী ঘোষণা করছে যার ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে চলেছিল। তাই এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। কোন সরকারের পক্ষে দেশের স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয় তা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়।'

তিনি আরো বলেছিলেন :

'আমি প্রধানমন্ত্রী থাকি বা না থাকি সেটা বড় প্রশ্ন নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই পদটির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা গণতন্ত্র বা জাতির স্বার্থে নিশ্চয়ই নয়।'

প্রধানমন্ত্রী অবশ্য তাঁর ভাষণে কোন্ কোন্ লোক এই চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের নাম করেননি। কিন্তু যেদিন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছিল তার আগের রাত্রে দিল্লীতে আয়োজিত এক সভায় জয়প্রকাশ নারায়ণ আগে তিনি যে সকল উক্তি রেখেছিলেন তারই পুনরুল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন, সেনাবাহিনী পুলিশ সরকারী কর্মচারীদের তারা সরকারের যে আদেশ বে-আইনী মনে করবেন তা যেন উপেক্ষা করেন। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আসামী সাব্যস্ত করার কথাও উল্লেখ করেন।

এবং সি পি আই ছাড়া অন্য সব বিরোধীদল ২৭শে জুন (১৯৭৫) থেকে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ শুরু করার প্রস্তাব নিয়েছিল জরুরী অবস্থা ঘোষণার পিছনে এ-একটা বিশেষ কারণ।

বর্ষীয়ান গান্ধীবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। জীবনের অমূল্য সময় তিনি ব্যয় করেছেন দেশের কাজে। লক্ষ্যহীনতা ভিন্ন আর কোন অভিযোগেই তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে না, কারণ তিনি বহুবার তাঁর নীতির পরিবর্তন করেছেন। দেশে বিদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা কম নয়। তিনি চাইলে, ভারতের রাজনীতিতে বিশিষ্ট আসন লাভ করতে পারতেন। ঐশ্বর্যের সমারোহে জীবন অতিবাহিত করাও অসম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। তিনি নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের জনগণ অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করুক। দেশের লোক খেয়ে পরে ভাল ভাবে বাঁচার অধিকার ফিরে পাক। কিন্তু দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে লক্ষ্যে পৌছানো কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। না, তাঁকে শিখণ্ডী খাড়া করে বিরোধী দলগুলো আসর মাত করতে চেয়েছিল। দেশকে মানুষকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে বিপ্লবের আত্মপ্রসাদ লাভ করত?

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন:

'ঘৃণা ছড়ানো, মিথ্যা অভিযোগ করার অপপ্রচার আমরা অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু তারা যখন সরকার ও তার কাজকর্ম অচল করে দেবার হুমকি দেয় তখনই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করি।'

জরুরী অবস্থা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেন (১লা জুলাই '৭৫) ;

চূড়ান্ত পর্যায়ে হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যাবে ১৯৭৫ সাল ভারতীয় অর্থনীতিতে এক ঐতিহাসিক বছর। চোরাই-চালানকারী ও সমাজ বিরোধীদের দ্বারা সঞ্চিত ও অঘোষিত সম্পদকে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়ে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা মনে রাখার মত। শিল্প ও শ্রমিকদের মনোভাবের কতকগুলি মূলনীতির পরিবর্তন হওয়ায় উৎপাদনের ব্যবস্থাদির মধ্যে তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। উৎপাদক ও শ্রমিকদের শৃঙ্খলাবোধ নতুন ভাবে জাগরিত হয়েছে। দেশের ভবিষ্যতের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ।

এবং সত্তরের দশকে দেশের আর্থিক উন্নতি যা ঘটেছে তা হল:

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর ১৯৭৫-৭৬ সালের এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের যে তুলনামূলক সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। যেমন চলতি

মূল্যের ভিত্তিতে মাথা পিছু আয় ৪২৬ টাকা থেকে ৮৫০ টাকায় উঠেছে।

সারের ব্যবহার—৭ লক্ষ ২৪ হাজার টন থেকে ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টন।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন—৭ কোটি ২০ লক্ষ টন থেকে ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ টন।

অপরিশোধিত তেল—৩০ লক্ষ ২২ হাজার টন থেকে ৭১ লক্ষ ৯৮ হাজার টন।

বিজলী চালিত মোটর—১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার থেকে ২৯ লক্ষ ৮ হাজার।

বাইসাইকেল—১৫ লক্ষ ৭৪ হাজার থেকে ২৫ লক্ষ ৭৭ হাজার।

রেডিও রিসিভার—৬ লক্ষ ৬ হাজার থেকে ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার।

রেজেস্ট্রিকৃত কারখানা—৪৮ হাজার থেকে ৮০ হাজার।

উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন—৮০০০ কোটি টাকা থেকে ১৪৮০০ কোটি টাকা।

কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৩৯ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষ।

টেলিফোন—৮ লক্ষ ৫৮ হাজার থেকে ১৬ লক্ষ ৩৭ হাজার।

সংবাদপত্রের প্রচার—২ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি ৩১ লক্ষ।

মজুত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ—২৯৮ কোটি টাকা থেকে ৯৪৭ কোটি টাকা।

রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ—৮১০ কোটি টাকা থেকে ২৪৮৩ কোটি টাকা।

আমদানীর পরিমাণ—১৩৯৪ কোটি টাকা থেকে ২৯২১ কোটি টাকা।

ইন্দিরা দশকের প্রথম দিকের বাধাবিঘ্নগুলোর কথা মনে রেখে একথা বলা যায় যে, যদি নতুন কোন বিপর্যয় বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি না করে, উৎপাদন এবং উন্নয়নমূলক কাজ যদি সমান বেগে চলে, যদি কালোবাজারী মুনাফাখোরীর প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে—তাহলে পরবর্তী দশকে দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

ভারতে সেই ভিত দৃঢ় হবে যার ওপর পা রেখে সে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার পথে অগ্রসর হতে পারবে।

গত ক'বছরে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। যেমন :

১৯৫৪-৫৫ সালের প্রথম সাতমাসে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০১৬ কোটি টাকা। এটা ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় শতকরা পনেরো ভাগ বেশি।

এই সময়ের মধ্যে আমদানি হয়েছিল ২৯৫২ কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ বেশি।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতির একটা বিশেষ দিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের ছ'টা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের বৃদ্ধি।

দশ বছর আগে এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে সাত ভাগ। বর্তমানে, বিশ থেকে পঁচিশ ভাগে উঠেছে।

১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন হয়েছিল ৩৯৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা।

আমদানি—১৯৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

রপ্তানি—২০২ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা।

১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ—১০৬৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

আমদানি—৪৬৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

রপ্তানি—৫৯৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন ৬২৫ কোটি টাকার মত (অনুমান আগামী পাঁচ বছরে লেনদেনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হবে)।

১৯৫৪ সালে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ—১৩৩ কোটি টাকা।

১৯৫৫ সালে এই অঙ্ক—২০০ কোটি টাকায় ওঠে।

১৯৫৬ সালের জন্যে চুক্তিতে ২৬০ কোটি টাকায় উঠবে বলে আশা করা যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে ১৯৫৫ সালে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল—১২০ কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালে—১৬৫ কোটি টাকায় এই লেনদেন উঠবে।

রুমানিয়ার সঙ্গে ১৯৫৫ সালে বাণিজ্য ছিল ১১৩ কোটি টাকার।

১৯৫৬ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে—১২৪ কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালে বুলগেরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ হবে ৯৫ কোটি টাকা।

১৯৫৪ সালের বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রায় দ্বিগুণ !

১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ—৩৬ কোটি টাকা।

১৯৫৬ সালে চুক্তিতে—৬১ কোটি টাকা।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ১৯৫৫ সালে লেনদেন—৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

১৯৫৬ সালে পরিমাণ দাঁড়াবে—১১ কোটি টাকা।

উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের শুরু ১৯৫৮ সাল থেকে। ১৯৫৪ সালের হিসাবে দেখা যায় গত ছ'বছরে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা থেকে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় উঠেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনে ভারত কয়েকটি বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। যেমন বাণিজ্যিক লেনদেনের মুদ্রা ভারতীয় টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা নয়। ফলে ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত আমদানী করার সুযোগের সঙ্গে ভারতে তৈরি পণ্য রপ্তানির অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো থেকে প্রযুক্তি বিদ্যালাভের যে সুযোগ রয়েছে ধণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে তা লাভের সুযোগ নেই।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে ভারত যা আমদানি করে তার মূল্য দিতে হয় বিদেশী মুদ্রায় (ডলারে ও স্টার্লিং-এ)। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রপ্তানি ছাড়া এই বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয় না (অন্য যে সব উপায়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয় তার পরিমাণ সামান্য)। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো ভারত থেকে যে সব জিনিস কেনায় আগ্রহী তা হল কৃষিপণ্য, শিল্পের জন্য কাঁচা মাল, খনিজ দ্রব্য (পাট, চা, কফি, আকরিক লোহা) ইত্যাদি।

এসব জিনিসের বৈদেশিক বাজার সীমাবদ্ধ। তাছাড়া কিছু কিছু জিনিস ভারতকে বিক্রী করতে হয় অন্য রপ্তানিকারক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এবং ন্যায্য মূল্য লাভে বঞ্চিত থেকে। সহজ কথায়, কোন কোন ক্ষেত্রে একশো টাকার মাল বেচে পঞ্চাশ টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জন হয় এবং যেহেতু কেনার ব্যাপারে ভারতের স্বাধীনতা সীমিত সেই হেতু সেই পঞ্চাশ টাকায় বিদেশী মুদ্রায় পঁচিশ টাকা মূল্যের জিনিস আমদানি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন জিনিস আমদানি করা হয় (করতে বাধ্য হয় বলাই সঙ্গত) যার কোন প্রয়োজন নেই বা যা স্বদেশেই লভ্য।

এছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে ভারত যে বিদেশী মুদ্রা ঋণ পায় তার একটা বড় অংশ সে পায়, নগদে নয়, জিনিসে। যে জিনিস ঋণদাতার দেশে উদ্বৃত্ত, অন্যত্র তার বাজার নেই এবং নিম্ন মানের (মানুষের খাদ্য বলে যা আমদানি করা হয় তার একটা বড় অংশ রপ্তানিকারক দেশে পশু খাদ্য হিসাবে বিক্রী

হয়)।

ভারতীয় টাকায় কেনার সুযোগ থাকায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো থেকে আমদানির ব্যাপারে ভারতের স্বাধীনতা অনেক বেশি। তাছাড়া একটা বাড়তি সুবিধা এই, আমদানি ভারতের বহু টাকার বিদেশী মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করে। যেমন ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে রাসায়নিক সার, ইস্পাতজাত দ্রব্য, কেরোসিন, ডিজেল, ধাতু, নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় ৩৮৫ কোটি টাকার যে মাল আমদানি করেছে তা প্রায় ১৯০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে রপ্তানির ব্যাপারে ভারতের আর একটা সুবিধা এই যে, ওই সব দেশে স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্যাদি অধিকতর পরিমাণে বিক্রী করার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে যাবে—রেডিও, টেপ রেকর্ডার, তৈরি পোশাক, চামড়ার তৈরি জিনিস এবং যন্ত্রপাতি।

বুলগেরিয়াতে—চামড়ার দ্রব্যাদি, ইস্পাতের দড়ি, মাটি কাটা যন্ত্র ইত্যাদি।

চেকোশ্লোভাকিয়ায়—চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, পাইপ-ফিটিং, ছোট খাট যন্ত্র, যন্ত্র তৈরির যন্ত্র, মোটর গাড়ির অংশ, ট্রানজিস্টর, রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ব্যাটারী টর্চ প্রভৃতি।

রুমানিয়ায়—যন্ত্রপাতি।

পোল্যাণ্ডে—সুতীবস্ত্র, ইস্পাতের বিবিধ জিনিস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ির পার্টস।

পূর্বজার্মানী—টায়ার, টিউব, চামড়ার তৈরি জিনিস, হোসিয়ারী, যন্ত্রপাতি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারত যা রপ্তানি করে তার একটা বড় অংশ হল কৃষিপণ্য। যেমন, চা-কফি, পাট, তামাক, মশলাপাতি ইত্যাদি। এই রপ্তানির পরিমাণ মোট রপ্তানির আশীভাগ। বাকি কুড়ি ভাগের মধ্যে কিছু ছোট যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, হাসপাতালের সরঞ্জাম, ঔষধপত্র ইত্যাদি।

ভারত আমদানি করে রাসায়নিক সার, ইস্পাত, কেরোসিন, ডিজেল, ধাতু এবং শিল্পের প্রয়োজনে কিছু কিছু কাঁচা মাল, নিউজপ্রিন্ট, যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ, জাহাজ, রাসায়নিক পদার্থ, ঔষধপত্র ইত্যাদি।

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে গত কুড়ি বাইশ বছরে ভারত-

সোভিয়েত বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র দেড় কোটি টাকা থেকে বাড়তে-বাড়তে আজ সাতশো কোটি টাকায় উঠেছে। বৃদ্ধির হারের বাণিজ্য চুক্তির (১৯৫১-৫৫) একটা উদাহরণ :

১৯৫১ সালে—৩০১ কোটি টাকার মত।

১৯৫৪ সালে—৬৪৫ কোটি টাকা।

নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে (১৯৫৮-৬০) লেনদেনের অঙ্ক দেড়গুণ থেকে দু'গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তবে প্রীতির সম্পর্ক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সহজ করলেও বাণিজ্যের ভিত লেনদেনের অর্থাৎ পারস্পরিক স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল এবারের আলোচনাকালে এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, সোভিয়েত থেকে আমদানি বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ থাকলেও বাণিজ্যিক সমতা রক্ষার জন্যে ভারতের পক্ষ থেকে রপ্তানির সুযোগ সীমাবদ্ধ।

অবশেষে প্রীতির সম্পর্কের প্রসার ঘটেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে তৃতীয় পথ।

এই তৃতীয় পথটি কি?

তৃতীয় পথটি ভারতে শিল্পোন্নয়নে সোভিয়েত সহযোগিতা। অন্ততঃ আট-দশটি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বা শিল্পোন্নয়নে সোভিয়েত ইউনিয়ন যন্ত্রপাতি এবং কারিগরী বিদ্যা দিয়ে সাহায্য করবে এবং উৎপাদিত পণ্যের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ খরিদ করবে।

ইতিপূর্বে সোভিয়েত সহযোগিতায় ভিলাই ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু উৎপাদিত মাল কিনবে চুক্তির মধ্যে এমন বাধ্য বাধকতা ছিল না। নতুন সহযোগিতার মধ্যে সেই বাধ্য বাধকতা থাকবে।

এখন চৈত্রের শেষ। প্রায়ই বিকালের দিকে আকাশটা থমথমে দেখায়। ইতিমধ্যে দিন দুই একটু ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। এবার প্রায় দিনই আলো জ্বলছে। দিনে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে।

কিছুদিন হল সন্ধ্যার পর কেউ আসছে না। কেউ আসছে না বলা ঠিক নয়—পরিচিত দু-একজন আসেন। রাজেন চৌধুরী অনেক দিন দেশে গেছেন। চাকরির শেষ বছর এটা। চাকরি শেষে গ্রামে ফিরে যাবেন।

শিশির হালদার আর আসেন না। সকালে তাঁকে অফিস যেতে দেখি। দাঁড়ান না, যেতে যেতেই একটু হাসেন। ভাস্করদের দলটা যেন হঠাৎ নিরুদ্দেশ

যাত্রা করেছে।

শিশির হালদারের বড় ছেলে গৌতমের সঙ্গে এখন আমার রোজ দেখা হয়। ফর্সা-রোগা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল, চোখে চশমা। অনেক সকালে ওকে যেতে দেখি। ফেরে সন্ধ্যার পর। কোনদিন রাত্রি হয়।

ও এসে দাঁড়ায়। কথা বলে। ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে চলে যায় এক সময়। আমিই ওকে জোর করে পাঠাই।

ও বলে, 'বিশ্বাস করুন আপনি, বাড়ি যাওয়ার চেয়ে আপনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগে।'

বলি, 'তবু তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

হাসে ও। বলে, 'এই তো বিশ্রাম হচ্ছে আমার।'

'তাহলে উঠে এসো, বোস—যদি চাও একটু চা খেতে পারো।'

'চা খেতে এখন ইচ্ছা করে না। সারা দিন ঘোরাঘুরি চা খাওয়া। বাড়ি ফিরে স্নান করে দুটো ভাত খেয়ে ঘুমাব একবারে।'

'তাহলে বাড়ি চলে যাও।'

'এখনও রান্না হয়নি, নটায় খাই রোজ। এখন আটটা বাজে। মাকে ব্যস্ত করতে চাই না।'

জিজ্ঞাসা করি, 'ব্যবসা কেমন লাগছে?'

'মন্দ কি!' হাসে ও।

'তবু?'

'মাঝে মধ্যে লজ্জায় পড়তে হয়। গামছা বিক্রি করতে গিয়ে অনেক প্রশ্নের জবাবও দিতে হয়। অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগে না। তবে নতুন একবারে সেইজন্যেই……।'

'সেইজন্যেই কি?'

হাসি মুখে চুপ করে থাকে শিশির হালদারের বড় ছেলে গৌতম। পথের সন্ধানটা মেজ ভাই দিয়েছে। কারখানা বন্ধ হতে বড় ভাইকে ধরেছিল। দাদার বন্ধুর হাওড়া হাটে। মহাজনী কারবার বড় ভাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল বন্ধুকে বলে। মেজ ভাই সপ্তা পার করেনি বসে। বন্ধুর ব্যবসাতে লেগে গেছে। মাইনে নয় কমিশনে কাজ করে রাহা খরচ বাদে।

শুনলে মনে হবে গল্প কথা। অসম্ভব ঘটনাই তো গল্পের উপাদান। লাজলজ্জা ফেলে দিয়েছে বড় ভাই। বন্ধু প্রথমটায় গরবাজী ছিল। বন্ধু বন্ধুকে বুঝিয়েছে, 'তুই আমার সঙ্গে কলেজে পড়েও যদি হাটে বসে গামছা

বিক্রি করতে পারিস, হোক না তোদের পৈত্রিক ব্যবসায়। আমি পারব না কেন ?'

বন্ধু রাজি হয়েছে। সাহায্য করেছে বন্ধুকে।

জিজ্ঞাসা করেছি, 'কতদিন হল ব্যবসার ?'

'পার করেছি পনেরো দিন।' হেসেছে গৌতম।

'লাভ লোকসান বুঝছ কেমন ?'

'ঠিক নেই সব দিন। কম বেশি হয়। তবে ব্যবসা তো লাভের জন্যেই।'

'বাঃ বাঃ।' তারিফ জানিয়েছি, 'তোমার হবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' গৌতমের কণ্ঠ ম্লান হয়, 'যদিও বাবা মেনে নিতে পারেননি। আর সেইজন্যেই ঠিক করেছি, যদিও ছাত্র হিসাবে আমি কোন দিনই ভাল ছিলাম না। তবু এম. এ পরীক্ষাটা একবার দেব।'

প্রতিদিন টুকরো টুকরো কথা হয়। যেদিন সময় থাকে একটু দাঁড়ায়। ফিরতে দেরী হলে দু-চারটে কথা বলেই চলে যায়।

গৌতম বলে, 'এতদিন চাকরির জন্যে বসে থেকে খুব ভুল করেছি।'

বলি, 'তাই বা বলি কি করে।'

'চেষ্টা করলে একটা যা হোক কিছু নিশ্চয় যোগাড় করতে পারতাম।'

আমি চুপ করে থাকি। চিন্তা করি। গৌতমের কথাগুলো মনে পড়ে প্রায়ই। জানি না শেষ পর্যন্ত পারবে কিনা। ওর বাবার ধারণাটা ভিন্ন। তিনি অনেক আশা করেছিলেন। আমার বিশ্বাস গৌতম ঠিকই করেছে। নিজের বাঁচার পথ বেছে নিয়েছে। হয়তো দেরী হয়েছে। হোক !

গৌতম বলে, 'আমার বাবা কিন্তু অবাক হয়।'

বলি, 'স্বাভাবিক।'

হাসে গৌতম, 'আচ্ছা আপনিই বলুন, কাজ হচ্ছে কাজ—সেখানে বংশ জাত এসবের প্রশ্ন কেন ? বাবা বুঝতে চান না। অথচ বাবা কিন্তু খুবই উদার চরিত্রের মানুষ। আজ কেন যে এমন করেন বুঝতে পারি না।'

আমিও যেন ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি না শিশির হালদারকে। একজন সৎ মানুষ এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। জীবনে বহু ঠকেছেন, তবু বিশ্বাস হারাননি। একটা ছেলে যখন রাজনীতির আবর্তে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, এ কি হচ্ছে ? কেন এমন হচ্ছে ? এর শেষ কোথায় ?

শিশির হালদার বলেছেন, 'এভাবে চলতে পারে না। পরিবর্তন দরকার।

শুধু ধ্বংস করলেই তো সমস্যার সমাধান হবে না। সৃষ্টির জন্যে সাধনারও প্রয়োজন। ভাঙতে খুব বেশি সময় লাগে না—সময় লাগে গড়তে। ভাঙবার আগে চিন্তা করতে হবে কেন ভাঙছি—কিসের জন্যে—কি গড়ে তুলতে চাই। কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই পথে চলা।'

পশ্চিমবঙ্গে পর পর দু'বার যুক্তফ্রন্ট এসেছে। শিশির হালদার অসংখ্য মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। স্বাগত জানিয়েছেন পরিবর্তনকে। তার পরেই শিউরে উঠেছেন আতঙ্কে। এ কি হচ্ছে! আইন শৃঙ্খলা ধুয়ে মুছে গেল। দেখতে দেখতে অরাজকতা ছেয়ে ফেলল দেশটাকে।

দেখেছি, যারা একদিন দূরের চায়ের দোকানটায় দিন রাত্রি বসে হল্লা করত—হঠাৎ নেতা হয়ে গেল তারা।

দেখেছি, যে সব ছেলেরা একদিন বয়োজেষ্ঠদের সম্মান দিত তারা তা ভুলে গেল হঠাৎ।

দেখেছি যে পথে একদিন রাত্রে পথচারী ভরা থাকত তা সন্ধ্যার পরই জনশূন্য।

তার পরের দিনগুলো আরো ভয়ঙ্কর। শুধু ভয়, ভয় আর ভয়।

একদিন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হল অবস্থা। দূর হল দুঃস্বপ্নের রাত্রি। কিন্তু······

তার পরের দিনগুলো বড় কষ্টকর। অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল ঘরে ঘরে। সেই সুযোগে আবার এগিয়ে আসতে লাগল চরম বিশৃঙ্খলার দিন। এল না। সামনে কঠিন বাধা। যার প্রয়োজন ছিল।

শিশির হালদার প্রথম মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন জানালেন। বললেন, 'এ শাসনের প্রয়োজন ছিল।'

সেই শিশির হালদার দেখলেন, চাকরি গেল ছেলের। শেষ হল না নিত্যদিনের অফিস যাত্রীর দুর্ভোগ।

বললেন, 'এ শাসন আরো কঠিন—আরো কঠোর হচ্ছে না কেন? শ্রমিক দেশের স্বার্থে উৎপাদন বাড়াচ্ছে—মালিক কেন দেশের স্বার্থের দিকে না চেয়ে কারখানা বন্ধ করে দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে শ্রমিকের ক্ষুধার অন্ন? কাজে ফাঁকি না দেবার জন্যে যারা সময়ে কর্মস্থলে পৌঁছাতে চায় তারা কেন পাচ্ছে না যান-বাহনের সুবিধা? দেরিতে চলা ছিল ট্রেনের রীতি—আজ সময়ের এদিক ওদিক হয় না। কিন্তু কলকাতার ট্রাম-বাস সেই পুরানো রীতিই মেনে চলেছে। উন্নতি একবারেই কি হয়নি? হয়েছে। কিন্তু যা হওয়া

উচিত ছিল তা হয়নি। অভিযোগের উত্তর প্রস্তুত। রাস্তা জ্যাম। কলকাতার পথের জ্যাম কি কোন দিনই স্বাভাবিক হবে না?

এই যে আজ শিশির হালদার আমার এখানে আসেন না, গৌতমের এই যে অভিযোগ, তিনি কেমন হয়ে গেছেন—আমার মনে হয় তা সত্য নয়।

শিশির হালদার আজ চিন্তা করছেন। ছেলেরা যে শিক্ষার মূলধনকে আঁকড়ে বসে না থেকে, তারা যে আজ কাজ করছে, তা সে যত সাধারণ কাজই হোক না কেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন।

শিশির হালদারের কথায় শীতের একটা দিন মনে পড়ছে আমার। ১১ই নভেম্বর ১৯৫৫ সাল।

সেদিন বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন :

'গত জুন মাসে যে 'ইমারজেন্সী' ঘোষণা করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে তেতো বড়ি, কিন্তু জাতির স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে এই বড়ি খাওয়ানোর একান্ত দরকার ছিল, তবে এই তেতো বড়ির সঙ্গে যে অর্থনৈতিক কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে পণ্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।'

জরুরী অবস্থা জারী থাকার সময় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের কি কি উন্নতি হয়েছে তার উল্লেখ করেন। যেমন :

১। পণ্য মূল্যমান ৮ শতাংশ কমেছে,

২। সরকারী শিল্পে ১৫ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে,

৩। পণ্য বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে,

৪। ভূমিহীন ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পনেরো লক্ষ বাস্তুজমি দেওয়া হয়েছে,

৫। উৎপাদনের ওপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমদানি লাইসেন্সের অপব্যবহার রোধ করার চেষ্টা হয়েছে এবং কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্যেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্যা দুটি এখন আয়ত্তাধীন বলা যেতে পারে। ফাঁকি রোধ করতে গিয়ে এই সময়ের মধ্যে একশো চল্লিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে।

অর্থনৈতিক কার্যসূচী গ্রহণ করার ফলে, কৃষির ওপর অধিকতর নজর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য শুধু সেচ খাতে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বছর ত্রিশ লক্ষ একর আবাদযোগ্য জমি সেচের আওতায় আনা হবে।

শহরাঞ্চলের কয়েকটা সমস্যাও আয়ত্তে আনা হয়েছে। শহরের জমির সমাজ-

তন্ত্রীকরণ অবশ্য একটা জটিল ব্যাপার। তবু সরকার তা নিয়ে ভাবছেন একটা খসড়া বিল তৈরির কাজও প্রায় শেষ।

প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, ওই সময় সারা দেশটা যেন এক ব্যাধিতে ভুগছিল। সমস্যাটা ছিল দেশের, তাঁর নিজের নয়। যে সব বৈদেশিক শক্তি ভারতের উন্নতি চায় না, তারাও ওই সময়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে দেবার তালে ছিল। কিছু লোক এই বিদেশীদের ফাঁদে পা দেন।

এরা সেই সব লোক, যারা সরকারী নীতির সঙ্গে একমত নন অথবা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে দেশে গণ্ডগোল বাধাতে চাইতেন। কয়েকটি বিরোধী দলও, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারেননি। সারা দেশে এমন একটা অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল যে, প্রত্যেকেই কেবল নিজের সমস্যা নিয়েই মশগুল থাকতে শুরু করেছিল—নিজেদের জন্যেই লম্বা-চওড়া দাবী পেশ করতে শুরু করেছিল। কৃষকরা চাচ্ছিলেন, তাঁদের উৎপন্ন শস্যের দাম আরো বাড়ানো হোক। শহরের লোক চাইছিলেন, আরও সস্তা দামে খাদ্য শস্য দেওয়া হোক। শ্রমিকরা-কর্মচারীরা চাচ্ছিলেন, তাঁদের বেতন বাড়ানো হোক। বেকাররা চাইছিলেন, চাকরি দেওয়া হোক।

এই অবস্থায় দেশের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করছিল। আর যারা দেশে গণ্ডগোল বাধাতে চান, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তাদের একটা সুযোগ জুটিয়ে দিল।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে আরও বলেন, ভারতের মহান উত্তরাধিকার, তার সংস্কৃতি, স্বাধীনতা অর্জনের পরে নানা দিকে তা' সাফল্যের জন্যে সকলেরই গর্ববোধ করা উচিৎ। সকলেরই ভাবা উচিৎ, তারা প্রত্যেকেই দেশের সেবা করছেন। এক্ষেত্রে কেউ বড় নন, কেউ ছোট নন। যদি কেউ তার নিজের কাজ সম্বন্ধে গর্ববোধ না করেন, তবে আরো ভাল ভাবে কাজ করার উৎসাহ কি করে পাবেন!

অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান হয়েছিল। সেদিনের তারিখ ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫। এস-এস-পি প্রার্থী রাজনারায়ণ-প্রধানমন্ত্রীর মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট। জয়ী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭১ সালে রায়বেরিলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা

গান্ধীর নির্বাচন বাতিল করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আবেদন সুপ্রীম কোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আগামী ছ' বছরের জন্যে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁর ওপর অযোগ্যতা-গত যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন সুপ্রীম কোর্ট তা নাকচ করে দিয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের কনস্টিটিউশন বেঞ্চের পাঁচজন বিচারপতিই এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১১ই জুন (১৯৭৫) তারিখের রায় বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

পাঁচটি পৃথক রায়ে সুপ্রীম কোর্ট ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালের নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত সকল সংশোধন বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি বলে বিচারপতিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

এই পাঁচজন বিচারপতি হলেন—প্রধান বিচারপতি রায়, বিচারপতি খান্না, বিচারপতি ম্যাথু, বিচারপতি বেগ ও বিচারপতি চন্দ্র চুড়। এবং তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের বিভিন্ন কারণ দেন।

ইন্দিরা গান্ধী প্রায় লক্ষাধিক ভোটে রাজনারায়ণকে পরাজিত করে লোক-সভায় নির্বাচিত হওয়ার পর আইন ও রাজনীতিগত যে দীর্ঘ লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় এই সিদ্ধান্তের ফলে তার অবসান ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার স্পীকারের নির্বাচন কোন আইনে বা কোন আদালতের নির্দেশ বলে বাতিল করা যাবে না এই মর্মে সংবিধানের ৩২৯ (ক) অনুচ্ছেদের ৪ নং ধারার যে সংশোধন করা হয়েছিল তিনজন বিচারপতি—আর. খান্না, কে. কে. ম্যাথু ও ভি. ভি. চন্দ্রচুড় বিশেষভাবে তা খারিজ করে দিয়ে বলেছেন,—পার্লামেন্টকে সংবিধান সংশোধনের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত সংশোধনের দ্বারা তা লঙ্ঘন করা হয়েছে, কেননা এটি সংবিধানের মৌল কাঠামোর বিরোধী। তাঁদের পৃথক সিদ্ধান্তের বিভিন্ন কারণ তাঁরা দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি এ. এন. রায় ৩৯তম সংবিধান সংশোধনের এই বিশেষ ধারা সম্পর্কে তাঁর অভিমতে বলেন: আইন পরিষদ তাঁদের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার প্রয়োগে যে ঘোষিত রায় দিয়েছেন তা আইন নয়। সুতরাং আইন পরিষদে সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা এটি সংবিধানের সংশোধন নয়।

বিচারপতি এম. এম. বেগ বলেন : তিনি ধারার যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনি নির্বাচনী আবেদনের বিচারগত পরীক্ষা নিষিদ্ধ করেননি। তিনি মামলার গুণাগুণ বিচার করেছেন এবং শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচন বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। নির্বাচনী মামলা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্ট বারংবার যে সব বিধান দিয়েছেন তা উপেক্ষা করে এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্পষ্টতঃ ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে পৌছেছেন।

রাজনারায়ণ যে পাল্টা আবেদন করেছিলেন সুপ্রীম কোর্ট তা অগ্রাহ্য করে বলেন যে, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী নির্ধারিত ব্যয়ের সীমা পঁচিশ হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয় করেছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৩২৯ (ক) অনুচ্ছেদের ৪নং ধারা খারিজ :

সুপ্রীম কোর্ট আজ সংবিধানের ৩২৯ (ক) অনুচ্ছেদের ৪ নং ধারা আইনের চোখে অসঙ্গতি পূর্ণ বলে ঘোষণা করেছেন। এই ধারার চারটি অংশ রয়েছে :

১৯৭৫ সালের সংবিধান (৩৯ তম) সংশোধনী আইন চালু হওয়ার আগে সংসদে গৃহীত কোন আইন নির্বাচনী আবেদন ও সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অথবা উক্ত আইনের ১নং ধারায় বর্ণিত উভয় সভার সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না (১নং ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিরা হলেন—রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার অধ্যক্ষ)।

২। সংশোধনী আইনে এঁদের নির্বাচন কোন কারণেই বাতিল বলে গণ্য হবে না অথবা এই আইন চালু হওয়ার আগে কোন আইনে নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষিত হলেও তা অগ্রাহ্য হবে।

৩। এই আইন চালু হওয়ার আগে কোন আদালতের আদেশে কোন নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হলেও এই আইনে তা সর্বতোভাবে বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

৪। এবং কোন আদেশ বা যার ওপর ভিত্তি করে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে এবং কার্যকর হবে না। সংবিধানের ৩৯তম সংশোধনী আইন এবং ১৯৭৪ ও ১৯৭৫-এর জন প্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনী বৈধ কিনা সুপ্রীমকোর্ট এই প্রশ্নের জবাব ৯ই অক্টোবর (১৯৭৫) স্থগিত রেখেছিলেন। ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বর সকালবেলা সেই জবাব দিলেন।

১৯৭৫-এর নির্বাচনী আইন সংশোধনীতে বিধান রাখা হয়েছে :

১। কোন সরকারী কর্মীর পদত্যাগ অথবা কর্মাবসান সরকারী গেজেটে প্রকাশনাই তার চূড়ান্ত প্রমাণ এবং তাই-ই ঐ পদত্যাগী ও কর্মাবসানের তারিখ বলে ধার্য হবে।

২। কোন সরকারী কর্মী তাঁর সরকারী কর্তব্য সম্পাদন অথবা তদ্রূপ বলে গণ্য কাজ কোন প্রার্থীর নির্বাচনের সম্ভাবনায় সহায়ক বলে গণ্য হবে না।

৩। নির্বাচন কমিশন যে প্রতীক স্থির করে দেবেন তা কখনো 'ধর্মীয় প্রতীক' বলে গণ্য হবে না এবং কাউকে 'প্রার্থী' বলে সেই তারিখ থেকেই ধরা হবে যে-তারিখে তিনি মনোনয়ন পত্র দাখিল করবেন।

১৯৫৪-এর-জন-প্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধিত বিধানে বলা হয়েছে:

কোন রাজনৈতিক দল বা সমর্থকগণ যে অর্থব্যয় বহন করবেন তা ঐ দলভুক্ত প্রার্থীর ব্যয় বলে গণ্য হবে না।

প্রধান বিচারপতি তাঁর রায়ে বলেন:

১৯৫৪ সালে এবং ১৯৫৫ সালে যেভাবে নির্বাচনী আইনের সংশোধন হয়েছে তাতে মৌল বিষয়াবলীর কোন ক্ষতি হয়নি বা এই সংশোধনীর জন্যে মৌল বিষয়াবলী ধ্বংসও করা হয়নি। এই সংশোধনীর দ্বারা মৌল অধিকারেও কোনভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। তাই, এই সংশোধনীর যে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, তাও মেনে নেওয়া যায় না।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি চারটি উচ্চ পদাধিকারীর নির্বাচন বিচারাদালতের আওতার বাইরে রাখায় আইন সভা ও বিচারাদালতের এক্তিয়ার স্বতন্ত্রীকরণে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়নি। এ ব্যাপারে আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার নজির আমাদের দেশে খাটে না।

সুপ্রীম কোর্ট প্রধানমন্ত্রীর অনুকূলে রায়দানের অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাসভবনের সামনে এক সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন:

সম্প্রতি সরকার যে সব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন, দেশের অভ্যন্তরে কোন দল তা উপলব্ধি করতে পারছে না এবং নিজেদের গণতন্ত্রের সমর্থক বলে পরিচয় দিয়ে ভুয়াধ্বনি তুলেছে। বস্তুত, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা শোনেন তাঁরাই হচ্ছেন গণতন্ত্রের প্রকৃত সমর্থক। কিন্তু এরা অতীতে কখনো জনগনের সমর্থন লাভ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

...আমরা অন্যান্য দেশে বাইরের হস্তক্ষেপের পরিণাম দেখেছি। দুঃখের বিষয়, নিজেরা ভারতীয় বলে দাবি করেন এরূপ কিছু লোক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেশের মানুষের নিন্দা করেন এবং এইভাবে দেশের দুর্নাম করেন।

এদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

তিনি বলেন, গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী থেকে যে শিক্ষা লাভ করা গেছে তা হচ্ছে, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে নেতাদের প্রদর্শিত পথে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কঠোর পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলার সাহায্যে জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। শহর বা পল্লী অঞ্চলের মুষ্টিমেয় লোকের কল্যাণ সাধন করা আমাদের কার্যসূচী নয়। সমগ্র জনসাধারণের সবার অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। গণতন্ত্র হচ্ছে বেশীর ভাগ মানুষের ইচ্ছা পূরণ করা।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে ইন্দিরা গান্ধী বলেন:

'কারো জয়ে বা পরাজয়ে খুব আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া উচিৎ নয়।'

রাজেন চৌধুরী একদিন বলেছিলেন, 'বুঝলেন মশাই, কদিন ধরেই ভাবছি এবার একটা কিছু করতে হবে।'

শিশির হালদার মনোযোগ দিয়ে সেদিনের কাগজটা পড়ছিলেন। দুই প্রৌঢ়ের বাক্যালাপ শুনতে ভালই লাগে আমার। কর্মক্লান্ত সারাদিনের শেষে ওঁদের আলোচনায়-তর্কে সতেজ ভাবটা লক্ষ্য করি। দেশের পরিচ্ছন্ন বাস্তব সত্যটা ফুটে ওঠে কখনো কখনো। হয়তো কখনো কখনো ওঁদের আলোচনা রীতিনীতির বাইরে চলে যায়। কখনো বা বয়সের সীমা ছড়ায়।

যেমন একদিন রাজেন চৌধুরী একখানা হিন্দী সিনেমার উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'বইখানা দেখবেন নাকি শিশিরবাবু?'

শিশির হালদার বলেছিলেন, 'দেখতে বলছেন আপনি?'

'বলছি না, দেখবেন কিনা জিজ্ঞাসা করছি।'

'দেখেছেন আপনি?'

'না-না, শুনলাম খুব ভাল হয়েছে।'

'ভাল বলতে?'

'সব কিছুই আছে। যা চান আপনি।'

'আমি চাই বলতে! কি বলতে চান আপনি?'

'ক্ষমা করবেন, কথাটা ভুল করে বেরিয়ে গেছে। যদিও কথাটা আমার চেয়ে এক বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোক আজই বললেন আমাকে। ছেলেদের সঙ্গে

দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৌতূহল জেগেছিল। যেচে আলাপ করে জেনেছিলাম।'

'কেমন বুঝলেন ?

'দারুণ।'

'তবে আর কি ?' ভেংচে ছিলেন শিশির হালদার, 'লেগে পড়লেই পারতেন ?'

'ভেবেছিলাম তাই। হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়তে দেখা হল না। যদি দেখতে হয় আপনাকে সঙ্গে নিয়েই দেখব। কারণ ছবি দেখে বেরুবার পরই নাকি হল্লাবাজি করতে ইচ্ছে করবে। একা-একা কি হল্লাবাজি করা যায় ? আপনিই বলুন ?'

'এই বুড়ো বয়সে ? রক্ষে করুন মশাই।' হেসেছিলেন শিশির হালদার। বলেছিলেন, 'তবে আপনাকে বলছি—এই যা ইচ্ছা তাই খুব বেশীদিন চলবে না, কথাটা মিলিয়ে নেবেন।'

শিশির হালদারের কথাটা মিথ্যা হয়নি। সরকারী কঠোরতা ফিল্ম-মেকারদের মাথায় হাত দেবার যোগাড় করেছেন। যা ইচ্ছা আজ আর তা চলবে না। সিনেমার অশুভ প্রভাব সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘূণ ধরাচ্ছিল। বিশেষ করে দেশের যুবসমাজ বিকৃত চিন্তার অধিকারী হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। সরকারী কঠোরতা দেরী হলেও উপযুক্ত সিদ্ধান্তই নিয়েছেন।

সেদিন রাজেন চৌধুরীর কথার উত্তর দেননি শিশির হালদার। কাগজ থেকে মুখ তোলেননি।

'ও মশাই, কথাটা শুনলেন না।'

'বলে যান, শুনছি ঠিকই।' কাগজ পড়তে পড়তেই বলেছিলেন শিশির হালদার।

'আপনি তো দেখছি কাগজ পড়ছেন।' বলেছিলেন রাজেন চৌধুরী।

'পড়তে পড়তে শুনছি—কি বলছেন ?'

'বলছি, এভাবে আর চলতে পারে না। একটা কিছু হওয়া দরকার।'

'কিছুক্ষণ আগে বললেন, একটা কিছু করা দরকার। এখন চিন্তা করে বলুন তো—কি বলতে চাইছেন ?'

'দুটোই, হওয়া এবং করা।'

'এখন বলুন, কি হওয়া এবং কি করা ?'

দুই প্রৌঢ়ের আলোচনা শুনেছি। এ শোনা নিত্যদিনের। অফিস থেকে ফিরে এসে তাস-পাশা না খেলে এসে বসেন। কাটিয়ে যান কিছুটা

সময়। এক সময় অফিসে ইউনিয়ন করতেন রাজেন চৌধুরী। মতান্তর হতে ছেড়ে দিয়েছেন। একটা বিরোধী দলের সমর্থক ছিলেন। এক সময় দেখেছি সক্রিয় অংশ নিতে। শিশির হালদার কোন দলের নন। কোন দলের সমর্থক কিনা আমার জানা নেই। তবে ভাল কাজকে সব সময় উচ্চ-কণ্ঠে সমর্থন জানিয়েছেন।

সেদিন আলোচনার শেষের দিকে শিশির হালদারের কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। দেখবেন সব হচ্ছে। কোন অন্যায় কোন দুর্নীতি রেহাই পাবে না। প্রভাব-প্রতিপত্তির দিন নিশ্চয় শেষ হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার, যা এতদিন বহু ক্ষেত্রেই চলে এসেছে—দেখবেন তা একদিন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে।'

আর হঠাৎ একদিন সংবাদ-পত্রের পাতায় দেখলাম সেই সংবাদ। একটু চমকে উঠেছিলাম সংবাদটা দেখে। তারিখটা ২৯শে অক্টোবর ১৯৫৫।

সংবাদ : সারা দেশে হীরা জহরৎ ব্যবসায়ীদের ঘরে ঘরে গতকাল ভোর রাত্রে হানা দিয়ে আয়কর বিভাগর কর্মীরা দিল্লী-বোম্বাই-আগ্রা-জয়পুর-হায়দরাবাদ এবং কলকাতায় প্রায় এককোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত হীরা-জহরৎ ও প্রায় চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন।

১লা জুলাই ১৯৫৫ :

প্রধানমন্ত্রী আকাশবাণী মারফৎ যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা হল :

'ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া অপরাধ। কর না দেওয়ার ফলে যে কালো-টাকার সৃষ্টি হয়েছে তা বহুলাংশে ধনীর আমোদ-প্রমোদের কাজে নিয়োজিত। শহরাঞ্চলের সম্পত্তির মূল্য কম দেখানো হয়। সম্পত্তি যথাযথ মূল্যায়নের জন্যে অতি সত্বর স্পেশাল স্কোয়াড গঠন করা হচ্ছে। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। তাড়াতাড়ি যাতে অপরাধীদের বিচার করা যায় তার ব্যবস্থার কথাও প্রসঙ্গে বিবেচনায় আছে।'

তারপর কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পরিচালনায় বিভিন্ন বিভাগ কালোটাকার বিরুদ্ধে বহুমুখী যে আক্রমণ শুরু করেছিলেন তা অবশ্যই উল্লেখ করার মত। ফল পাওয়া গেছে ভাল। ভবিষ্যতের জন্যে শক্ত ভিতও প্রস্তুত হয়েছে। চোরাই চালান, মজুতদারী, আয়কর, সম্পত্তিকর প্রভৃতি ফাঁকি দেবার ব্যাপারে বুদ্ধি খাটিয়ে সমান্তরাল অর্থনীতি যারা বজায় রেখেছে তাদের ও দাগী আসামীদের মোকাবিলা করার জন্যে অর্থমন্ত্রণালয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। গৃহে গৃহে হানা, চোরাই মাল বাজেয়াপ্ত—স্বাধীন

ভারতে যারা অবাধে লুণ্ঠন চালিয়ে এসেছিল এতদিন, ত্রাহি ত্রাহি রব তুলে ছিল তারা। বহু অনুনয় বিনয়, ব্যক্তিগত প্রভাব, এমন কি অর্থকরী প্রস্তাবেও কোন সুফল পায়নি অপরাধীর দল। অবশ্য এর একমাত্র কারণ প্রশাসনিক কঠোরতা। অতীত সেই সাক্ষ্যই দেয়।

এর ফলে কেবল স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঘোষণার পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর হিসাবে পাওয়া গেছে ২৪৬ কোটি টাকা। এবং আরো ৪০ কোটি টাকা সরকারী সিকিউরিটি হিসাবে জমা দিয়েছে ওই সকল লোক। ট্যাক্সের আওতায় আনা হয়েছে আরো ২ লক্ষ ৫৩ হাজার জনকে। এর ফলে সরকারী কোষাগারে জমা পড়েছে বেশি অর্থ।

৮ই অক্টোবরের (১৯৫৫) মধ্যে যে কোন কারণে যারা তাদের আয় ঘোষণা করেনি বা অর্দ্ধেক ঘোষণা করে ভুল করেছে তাদের ত্রুটির সংশোধনের জন্যে স্বেচ্ছাকৃত ঘোষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় কিছু কনশেসন দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। পরিকল্পনায় যারা আয়ের পরিমাণ ঘোষণা করেছিল তাদের শাস্তি না দেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

তবে যে সব চোরাই চালানকারী আটক রয়েছে তাদের কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। এই প্রসঙ্গে সোনার চোরা চালান সম্পর্কে একটা মামলার কথা মনে পড়ে। মামলাটির শুনানী চলছে নয়া দিল্লীর এক ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে। গত ২১শে এপ্রিল ১৯৫৫-এর পর শুনানীর দিন পড়েছে ১৭ই মে ১৯৫৫।

মামলাটা বিয়াস বিজ্র সোনার চোরা চালান নামে পরিচিত। শুরু ১৯৫৩ সালে। অভিযুক্ত ৫২ জনের মধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ২ জনের। মামলায় ধৃত আসামীদের মধ্যে যাদের জামিনে খালাস দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ৯ জন জামিন ভঙ্গ করে সরে পড়েছে। পুলিশ এখনও তাদের খোঁজ পায়নি।

মামলার সঙ্গে জড়িত ৫২ জনের মধ্যে ১৩ জন বিদেশী। তাদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। পলাতক ৯ জন। মৃত ২ জন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায় লেবানন থেকে সোনা নিয়ে আফগানিস্থান ও পাকিস্তান পার হয়ে ভারতে অমৃতসরে আসামীদের কজন ধরা পড়ে—বিয়াস ব্রিজ পার হবার সময়। এদের সঙ্গে ছিল ১৪২০ কিলোগ্রাম বিদেশী মার্কা সোনার বাট। যার তখনকার মূল্য ছিল ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

গ্রেপ্তারের পর পুলিশী তদন্ত শেষ হতে সময় লাগে প্রায় তিন বছর। আদালতে মামলা দায়ের হয় ১৯৫৬ সালের জুন মাসে। মামলা চলছে প্রায়

১০ বছর। সরকারী পক্ষে সাক্ষীর তালিকায় নাম আছে ১১০ জনের। জেরা করা শেষ হয়েছে তাদের মধ্যে ৫ জনের।

একটি সরকারী সমীক্ষায় প্রকাশ গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৫) ভারতের ১৮টি হাইকোর্টে দেওয়ানী-ফৌজদারী মামলাজাত প্রায় পাঁচ লক্ষ আপীল নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল।

ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়, সুপ্রীম কোর্টে ওই সময় শুনানী এবং রায়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল এগারো হাজার পাঁচশো মামলা।

বিচার বিভাগের এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। জরুরী অবস্থায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি এ অবস্থার। ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি যে মানুষ স্বেচ্ছায় ১৫২৯ কোটি টাকা আয় ঘোষণা করেছে।

কালোটাকা কি পরিমাণ বাজারে রয়েছে তা জানার জন্যে এই ধরণের পরিকল্পনা অবশ্য নতুন নয়। তবে সেই দিনগুলোতে এমন কঠোরতা ছিল না। তা যদি থাকত তাহলে ভারতবর্ষের অর্থনীতি হয়তো কিছুটা ভিন্ন খাতে বইত।

১৯৫১ সালে এই পরিকল্পনায় মাত্র সত্তর কোটি টাকা আয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার ১৯৫৫ সালে ১৯৭ কোটি টাকা ঘোষিত হয়।

১৯৫৫ সালে যেখানে ১ লক্ষ ১৬ হাজার লোক স্বেচ্ছাকৃত ভাবে তাদের আয় ঘোষণা করেছিল, এবার সেখানে ২ লক্ষ ৫৩ হাজার জন আয়ের পরিমাণ ঘোষণা করেছে। এবার পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে সরকার কাউকে বাদ দেননি। আগের রাজা-মহারাজা-ব্যবসায়ী-শিল্পী কেউই এবার কোন কৌশলেই এড়িয়ে যেতে পারেনি।

দেশে কি পরিমাণ কালোটাকা রয়েছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত যথাযথ হিসাব নিকাশ করা সম্ভব হয়নি। ওয়াংচু কমিশন আন্দাজ করে বলেছিলেন চার হাজার কোটি কালোটাকা রয়েছে এবং তা হয়তো ঘুরে সাত হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

কমিশন বলেছেন: বছরে চোদ্দ শত কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়া হয়ে থাকে। এই হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫২৯ কোটি টাকার ঘোষণা খুব কম নয়। এছাড়া চোরাই চালানকারীদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, চোরাই মাল তাই বা কম কি? এবং এই টাকা ভবিষ্যতে উন্নয়নমূলক কাজে নিশ্চয় ব্যয়িত হবে।

প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করা বা অর্থের অপচয় নিশ্চয় কমে আসবে। একদিকে মানুষ সামান্য উপায়ে সংসার চালাতে পারে না। অন্যদিকে প্রাচুর্যের মধ্যে যাদের বসবাস—টাকার দাম যাদের কাছে মূল্যহীন না হলেও গুরুত্বপূর্ণ নয়, নিত্য বাজার চড়িয়ে দিচ্ছে তারাই। এর ফলে আশা করা যায় মুদ্রাস্ফীতিও বন্ধ হবে এবং দেশের অর্থনীতি নিশ্চয়ই ভালর দিকে যাবে।

এক শ্রেণীর মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যদি কিছুটা অন্তত: সীমিত হয় তাহলে নিত্যদিনের ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার ঝোঁক নিশ্চয় কিছুটা কমবে। কারণ প্রাচুর্যের নির্লজ্জ প্রকাশ আজ ব্যবসায়ীদের অতি মুনাফার দিকে ঝুঁকিয়েছে। তারা শুধু লাভ চায় না, চায় লুণ্ঠন। এই প্রসঙ্গে কিছু বিদেশী ওষুধ কোম্পানির কথা মনে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্যি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ কতকগুলি বছর পার হয়েছে, তবু এখনও এদেশে ৬৬টা বিদেশী কোম্পানিকে রাখা হয়েছে যেন শুধুমাত্র মুনাফা লোটার সুযোগ দেওয়ার জন্যে। ওরা নির্বিকার ভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর কোন সামাজিক লক্ষ্য তো নেই—উপরন্তু ওষুধ নিয়ে ফাটকাবাজি করে চলেছে। একটি আমেরিকান ওষুধ কোম্পানি তাদের একটি বাতের ওষুধ তৈরি করার মৌল উপাদান মার্কিন মুলুক থেকে আমদানী করত প্রতি কেজি সাড়ে চার হাজার টাকা দরে, অথচ স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতি কেজি মাত্র পাঁচশো সত্তর টাকায় ইণ্ডোমেথিসিস আনল পোল্যাণ্ড থেকে। ডেক সামেথা সোন ওই কোম্পানি প্রতি কেজি আমদানী করত ষাট হাজার টাকা দরে, আজ সরকারী চাপে আনতে বাধ্য হচ্ছে মাত্র ষোল হাজার টাকায়।

একটি সুইস প্রতিষ্ঠান বিখ্যাত একটি মাথা ধরার বড়ির উৎপাদক। আন্তর্জাতিক বাজারে ওই ওষুধের বাজার দর কেজি মাত্র তিনশো বারো টাকা, এদেশে আমদানীর মূল্য ধরত সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত হফকিন্স ইনস্টিটিউট সাল্‌ফা ড্রাগ উৎপাদনের আগে, হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন বাজারে ছাড়ার আগে ও ইণ্ডিয়ান ড্রাগস ফার্মাসিউ-টিক্যাল টেট্রাসাইক্লিন, এনালজিন, স্ট্রেপটোমাইসিন বাজারে নিয়ে আসার আগে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো তিনগুণ দামে ওই জীবন রক্ষাকারী ওষুধ বেচে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। আজও করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশ মাত্রেই ওষুধ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত—ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ।

এবং জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার পর দেশে অপরাধের সংখ্যা উল্লেখ-যোগ্যভাবে কমে গেছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী গ্রাহ্য অপরাধের সংখ্যা

সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকাগুলোতে গত জুলাই মাসে [(১৯৫৫) জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রথম মাসেই) ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। ওই সময় ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী রেজেস্ট্রীভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ছিল :

১৯৫৫—জুলাই ৮১৫৬৪।

১৯৫৪ „—৯৫০৩৭।

দাঙ্গাবাজি : ১৯৫৫ জুলাই—৩৩৮৩।

১৯৫৪ „ —৪৩১৮টি।

ডাকাতি : ১৯৫৫ „ —১৫৭৪টি।

১৯৫৪ „ —১৯৬৩টি।

চুরি : ১৯৫৫ „ —২৯০৫৫টি।

১৯৫৪ „ —৩২৪৯৮টি।

হত্যা : ১৯৫৫ „ —১১২১টি।

১৯৫৪ „ —১৪৩৪টি।

এবং কিছু দিন যাবৎ সারা পৃথিবী ব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা দেখা দিয়েছে—তা রোধ করা কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি ; এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারেনি—একমাত্র পেরেছে ভারতবর্ষ।

ওয়াশিংটন, ১৬ই মে ১৯৫৬।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারত অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে বলে বিশ্বব্যাংক ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের রিপোর্টে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বব্যাংকের এই রিপোর্টে কৃষি, শিল্প শক্তি উৎপাদন, ইস্পাত তৈরি, রপ্তানি বাণিজ্য ও সরকারী উদ্যোগ প্রভৃতি সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি রোধ এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভারত যে সব ব্যবস্থা নিয়েছে তা একটা বিশ্বরেকর্ড বলে রিপোর্টে প্রশংসা করা হয়েছে।

ভারত উন্নয়নের জন্যে বৈদেশিক সাহায্যের ওপরেই বেশী নির্ভরশীল বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তাকে রিপোর্টে নস্যাৎ করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, গত কয়েক বছরে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টার বেশির ভাগই ছিল স্ব-নির্ভর। ভারত চূড়ান্ত সর্তে বেশ কিছু বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছে বটে, কিন্তু এই বিশাল দেশের তুলনায় সে সাহায্য ছিল খুবই সামান্য। গত তিন বছরে এই

সাহায্যের পরিমাণ মাথাপিছু ছিল ১·৫ ডলার, এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের ১·৫ শতাংশের কম। অপর পক্ষে পাকিস্তানে ওই সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৮ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ১০ শতাংশ। ভারতবর্ষ বরাবরই প্রয়োজনের তুলনায় কম সাহায্য পেয়েছে, ফলে মোট বিনিয়োগের ৮০ শতাংশের বেশী তাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে: বিশ্বব্যাংকের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যায় ভারত একটি ব্যতিক্রম। ভারতের জনসংখ্যা ৬০ কোটি, এবং এর শতকরা আশীভাগ লোকই গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি হল ভারত। সেখানে মাথাপিছু আয় মাত্র ১৩০ ডলার।

কিন্তু মোট জাতীয় উৎপাদনের দিক দিয়ে ভারত পৃথিবীর দশম স্থানাধিকারী দেশ। এবং খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। গম নিয়ে গবেষণায় ভারত পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশ, ভারতে আছে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র, এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণাতেও এদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। ভারত এক বহুমুখী এবং পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতির বিশাল দেশ। তার সম্পদের অভাব নেই, কিন্তু সেই সম্পদের উন্নয়নের গতি খুবই মন্থর।

বিগত কয়েক বছরে ভারতের অর্থনীতিতে যে সংকট দেখা দিয়েছিল তা ১৯৫৫ সালে অনেকটা কেটে গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারের কতকগুলো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, অনুরূপ আবহাওয়া এবং অতিরিক্ত বৈদেশিক সাহায্যের দরুণ।

১৯৫৫-৫৬ সালে ১১কোটি ৪০ লক্ষ টন শস্য উৎপাদন, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, পেট্রোল ও কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি। এবং ভারতে ধর্মঘটের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ও সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলোতে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৫২ সালে জুন মাসে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে। ১৯৫৩-৫৪ সালের প্রথম দিকে ৩০ শতাংশে পরিণত হয়। ভরত সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ নীতির ফলে ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে আগে বছরের তুলনায় পাইকারী মূল্যসূচক সংখ্যা ৮ শতাংশ হ্রাস পায়।

ভাল ফসল হওয়ায় এবং শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের উন্নয়ন হার এখন ৬ শতাংশ। এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বমন্ত্রী বলেন (৯ই মে ৫৬), 'কর ফাঁকিবাজদের হাতে এখনও কালোটাকার একটা বিরাট অংশ রয়েছে। তিনি

আয়কর কমিশনারদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করুন, যেন ওরা অসদুপায়ে অর্জিত ওই সম্পদ ব্যবহারের একটুও সুযোগ না না পায়।'

এবং এপ্রিল ১৯৫৪ সালে অনাদায়ী করের পরিমাণ ছিল ৮০২.৩৮ কোটি টাকা।

এপ্রিল ১৯৫৫ সালের পরিমাণ—৯২১.৫১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

রাজস্ব মন্ত্রকের সচিব আয়কর কমিশনারদের বলেন, আপনারা কর-দাতাদের মধ্যে ধনী শ্রেণীর দিকেই বেশী নজর দিন। ছোট করদাতাদের চেয়ে তাদের প্রতি বেশি দৃষ্টি রেখে তাদের আয় খতিয়ে দেখুন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর ফাঁকি রোধের সংগ্রাম শিথিল করা যাবে না। কিন্তু আয়কব অফিসারদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সৎ করদাতাদের পক্ষে আয়-কর আইন এবং তৎসংক্রান্ত পদ্ধতি সহজ হয়।

এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হতে শুরু হয়েছে আবার (৬.৫.৭৬)। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধের কথা চিন্তা করছেন। ফাটকাবাজি প্রতিরোধের কথাও চিন্তা করছেন।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয়ও কিছুটা বেড়ে (যদিও এ সময় কিছুটা দাম বাড়ে) গিয়েছে। কিছু পণ্য যেগুলির মূল্য বেড়েছে :

ভিত্তি (১৯৫১-৫২ = ১০০) ২০শে মার্চ সপ্তাহ শেষে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য সূচক ৩০৯.৯ এবং ১৭ই এপ্রিল ৩১৫.২, দানাশস্যের ক্ষেত্রে ২৮৮.০ এবং ২৯১.৯ ; ভোজ্য তেল ২৩৩.৭ এবং ২৫২.৪, শিল্পের কাঁচা মাল ২৪০.৩ ও ২৫৫.৪, তন্তু ২৪৩.৩ ও ২৫৯.৩, তৈলবীজ ২৩৪.২ ও ২৫৮.৩, কাপড়ের সূতো ২২০.৭ ও ২২৪.০, চামড়া ৩০৬.৩ ও ৩১৯.৭ এবং পাইকারী মূল্যসূচক ২৮২.৪ ও ২৮৯.৪।

১৯৫২-৫৩ সালে পাইকারী দরের মূল্যসূচক ছিল ৯.৯ শতক।

১৯৫৩-৫৪ সালে বেড়ে হয় ২২.৭ শতক।

১৯৫৪-৫৫ সালে ২৩.১ শতক।

মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ বাজারে ভোগ্য পণ্যের অনটন। সেটা ঘটে উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিলে। প্রতিকার : উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু কদাচিৎ মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের যোগ থাকে। কারণ উৎপাদন যতটা কমে, দাম বাড়ে তার অনেক বেশী। কারণ মুনাফাবাজ লোভী ব্যবসায়ীর দল পণ্যের ঘাটতির সুযোগ নিয়ে ফাটকাবাজি করে। দাম বাড়ার কথা চার আনা, বাড়ায় এক টাকা—কোন কোন ক্ষেত্রে চার টাকা বাড়াতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে না।

দাম কমেছিল মজুতদারা কালোবাজারী বন্ধ হওয়াতে। চোরা চালানে যারা লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালিয়ে বিপর্যস্ত করে দেওয়াতে। তাদের মুনাফার টাকায় কালোবাজার ফেঁপে-ফুলে উঠেছিল। কিন্তু সরকারের কঠোরতায় তা চুপসে গিয়েছিল।

সাধারণ মানুষ দেশের কথা ভাবে—বোঝে, কিন্তু মুনাফাখোর ব্যবসাদারের দল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আপন স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না তারা। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণেছে—সুযোগ বুঝে দর চড়াতে এতটুকু ইতঃস্তত করেনি।

পাইকারী দরের সূচক সংখ্যা বাড়তে সরকার উদ্বেগ বোধ করেছেন। প্রতিকারের আয়োজন করতেও অতীতের মত আজ আর গড়িমসি করে কালক্ষয় করেননি। হয়তো এমন দিন আসবে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জওহরলাল নেহেরুর ব্যবসাদারদের প্রতি সতর্কবাণী হয়তো সত্যে পরিণত হবে। কারণ আজ এটা আর মিথ্যা নয়। অতীতের সেদিন আজ ভারতবর্ষের নেই।

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা অপরিবর্তনীয় মূল্য (১৯৫৫-৬০) সম্পর্কে ১৯৫৪-৫৫ সালের জাতীয় আয়ের যে দ্রুত হিসাব প্রস্তুত করেছেন, তাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মাত্র ০-২ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে।

১৯৫৩-৫৪-এ ১৯৫২-৫৩ সাল অপেক্ষা ৫-০ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে মাথা পিছু ৩৪১-৪ টাকা আয় সহ ১৯৫৫-৬০ সালের মূল্য অনুযায়ী নীট জাতীয় আয় হয় ২০ হাজার ৭৫ কোটি টাকা।

জাতীয় আয়ের দ্রুত হিসাব ১৯৫৪-৫৫ সালের কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের সর্বশেষ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। ১৯৫৪-৫৫ সালে জাতীয় আয়ের যৎসামান্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ হল ১৯৫৪-৫৫ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস। এর ফলে ১৯৫৪-৫৫ সালে কৃষিক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় নীট দেশীয় উৎপাদন ৪-৩ শতাংশ কম হয়। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে।

মৎস্য চাষে—৭-৩ শতাংশ।

খনিজ উত্তোলন ও পাথর কাটার ক্ষেত্রে—৮ শতাংশ।

গৃহ-নির্মাণ—৫ শতাংশ।

বিদ্যুৎ—৫ শতাংশ।

গ্যাস—৫ শতাংশ।

জল সরবরাহ—৫ শতাংশ।

রেল ছাড়া অন্যান্য পরিবহনে (সংরক্ষণ সহ)—৬-১ শতাংশ।

সরকারী প্রশাসনে— ৫-৯ শতাংশ।

১৯৫৬-৬০ সালের মূল্য অনুসারে ১৯৫৪-৫ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়ায় ৩৪১-৫ টাকায়। ১৯৫৩-৫৪-এ এর পরিমাণ ছিল ৩৫৭-২ টাকা।

চলতি মূল্য অনুসারে ১৯৫২-৫৩ সালে মাথা পিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৭০০ টাকা ও ৮৫১-৮ টাকা।

দ্রুত হিসাব অনুযায়ী ১৯৫৪-৫৫ সালে সাধারণ সঞ্চয় ও মূলধন সঞ্চয় যথাক্রমে ১১-৮ শতাংশ ও ১২-৮ শতাংশ বলে জানা গেছে।

চলতি বছরে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকারী হিসাব অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় পাচ থেকে ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

অপরিবর্তনীয় মূল্যে ১৯৫৩-৫৪ সালের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাণ ২০ হাজার ৩৪ কোটি টাকা এবং মাথা পিছু আয় ৩৪৭-২ টাকা। ১৯৫২-৭৩ সালের জাতীয় আয় ছিল ১৯ হাজার ৭৭ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ৩৩৭-৬ টাকা। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৫৩-৫৪ সালে মাথাপিছু আয় ২-৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তার পরের বছর তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১-৭ শতাংশ। এবং গত কয়েক বছরে গার্হস্থ্য সঞ্চয় ও মূলধন সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পে য়ছে।

ভারত সরকার দেশের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে এবং জনগণের আশু প্রয়োজন মেটাবার দিকে নজর রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণার নীতির পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন (২৭।১০।৫৫) : জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। কারণ, বিদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় চালিত কর্মসূচীতে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিভাকেই পরীক্ষার বিষয় (গিনিপিগ) রূপে ব্যবহার করা হয়।

পূর্বে সরকারও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুরীতে শৈথিল্য প্রকাশ করেছে। আমি এই ত্রুটি সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পেতে পারে। ঘরোয়া অর্থলগ্নীর অভাব বশতঃ বহু বিজ্ঞানী বিদেশের সাহায্য পুষ্ট গবেষণা কর্মসূচীর দিকে চেয়ে আছেন। ওই সব কর্মসূচী বিদেশী পৃষ্ঠ-

পোষকদের ইচ্ছামত হয়, দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রণীত বা চালিত হয় না। আমাদের বিজ্ঞানীরা অপরের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরাই পরীক্ষাগারের গিনিপিগ রূপে ব্যবহৃত হই।

আমাদের বিজ্ঞানীরা অনেক সময় গবেষণাকে একটা ফ্যাশন এবং খ্যাতির বিষয় রূপে নেন। এর দ্বারা জনগণের তাৎক্ষণিক অভাব পূরণের সাহায্য হয় না। তবে তিনি, এই সব গবেষণার বিরোধী নন মোটেই, কারণ ঐসব গবেষণা থেকেও অনেক সময় কোন কোন গুরুতর সমস্যার সমাধানের পথে উপনীত হওয়া যায়। যেমন কোন তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানকালে বিজ্ঞানীরা মহত্তর সত্যের সন্ধান পান।

গরিষ্ঠ সংখ্যক দরিদ্রের দুঃখ দারিদ্র যাতে লাঘব করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে সেই ধরণের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা প্রয়োজন।

আমি দেখি আমাদের বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র ও অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে উৎসাহী, বিদেশ থেকে সুযোগ এলেই তার সদ্ব্যবহার করেন। এতে অনেক সময় অপচয় হয়। আর ছাত্র ও জুনিয়াররাও ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়। আমরা চিরকালের জন্যে সবার পিছনে পড়ে থাকতে পারি না। আমরা গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহী। পরমাণু শক্তি, মহাকাশ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি সবাধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা চালাতে চাই। সেই সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রতিও আমরা সমান আগ্রহী। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপযোগী উন্নয়ন পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্যেও আমাদের সজাগ ভাবে প্রয়াস করতে হবে, যাতে ওই সব পদ্ধতি ক্রমে সাধারণ গ্রামীণ হস্ত শিল্পী ও মিস্ত্রীরাও শিখে নিতে পারে।

বিজ্ঞজনের অভিমত : ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কি নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে ?

ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজনের অগ্রাধিকার এবং জনগণের জরুরী প্রয়োজনের দিকে আগে নজর দিতে হবে—এজন্যে ভাত সরকার গবেষণার নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সেই নীতি পরিবর্তন নব বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলকে জনগণের দুয়ারে-দুয়ারে পৌঁছে দেব, সৌর-শক্তির সহায়তা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাল-টানা গরুর গাড়ির পর্যন্ত উন্নতি করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞান গবেষণায় এই গণতান্ত্রিক

চিন্তাধারাকে জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। কেননা, এই ঘোষণা কেবল মৌখিক বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থানের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আর্থিক সংস্থানের অভাবে ভারতের বিজ্ঞানীদের অনেকেই বিদেশী পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে গবেষণা চালাতে গিয়ে যে কর্মসূচী অনুসরণে বাধ্য হন, তাতে ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিভাকেই যেন পরীক্ষার বিষয় করে তোলা হয়। ...এই অবস্থা জাতীয় স্বার্থের যে অনুকূল নয়, সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

সম্ভবত আজকের দিনে একটা স্কুল বালকেরও অজানা নয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যথাযথ অনুশীলন গবেষণা ও প্রয়োগ ছাড়া কোন জাতির পক্ষে সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরাধীন ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের দ্বারা বঞ্চিত ছিল। ফলে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা—অগ্রগতি দূরের কথা, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাটাই যেন ছিল একমাত্র কেরানী ও চাকুরীজীবি সৃষ্টির একটা যন্ত্র বিশেষ।

তবু বৃটিশ আমলের সেই দুর্দিন—নিদারুণ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কয়েকজন প্রতিভাধর ভারতীয় দেখা দিয়েছিলেন বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে। সেই আলোকবর্তিকার দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে এই আশা-আশ্বাস জেগেছিল যে, অনুকূল অবস্থা, সুযোগ পেলে আমরাও পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর মত জাতীয় জীবনে নব জন্মান্তর ঘটাতে পারি।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর ভারতে যে নতুন শিল্পায়ন বিজ্ঞান গবেষণাগারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার জনক ছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তাঁর দৃষ্টি গভীর এবং সুদূরপ্রসারী ছিল—তিনি সমাজ-তন্ত্রে এবং বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন।

এই বিশ্বাসের জন্যেই তিনি যেমন ভারতীয় জনসমাজের মুক্তির জন্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা ঘোষণা করেছিলেন, ঠিক তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—'একমাত্র বিজ্ঞানই পারে দেশের জনগণকে ক্ষুধা-দারিদ্রের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে।' কারণ তিনি জানতেন ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের এবং লোকবলের কোন অভাব নেই। যদি আধুনিক বিজ্ঞান—প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এই সম্পদ আহরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে এই অভাব, দারিদ্র ও ক্ষুধা থেকে দেশবাসী নিশ্চয়ই একদিন মুক্তি পেতে পারেন।

কিন্তু জওহরলাল নেহেরুর সেই বিশ্বাস ও স্বপ্ন আজও চরিতার্থ হয়নি। কারণ আমলাতান্ত্রিক মনোভাব—ঔদাসীন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে একটা প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণা ও অনুশীলনের উপযুক্ত সুযোগ-সহযোগিতা ও সহায়তা পেতেন না। সেইজন্যেই দলে দলে তরুণ বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার যেমন হতাশাগ্রস্ত—তেমনি দুর্দশা থেকে ত্রাণ পাবার আশায় চলে গেলেন বিদেশে। যাঁদের প্রতিভায়—অনুশীলনে দেশের মুখ উজ্জ্বল হতে পারত, তাঁদের মস্তিষ্ক চালান হয়ে গেল দেশের বাইরে।

এই ট্রাজেডির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা—তিনি ভারতীয় এবং আমাদের স্বদেশবাসী হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন আরো অনেকেই। আমলাতন্ত্রের মূঢ়তা—যথেচ্ছাচার এতদিন খুব কমই প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছে।

এবং আজও যে সমস্ত তরুণ বিজ্ঞানী দেশে আছেন তাঁদের প্রতিভা শক্তিকে দেশের কল্যাণে নিয়োগ করা হচ্ছে না। তা যদি হ'ত তাহলে আজ এভাবে ভেজালে দেশ ছেয়ে যেতে পারত না।

কারণ বহু তরুণ বৈজ্ঞানিককেই প্রাইভেট মালিকানার অন্তর্গত গবেষণাগারে মোটা মাইনের বিনিময়ে নিজেদের মস্তিষ্ক বিকিয়ে দিতে হয়। বৃহৎ শিল্পপতিদের অধিকাংশই এমন সমস্ত বস্তু বা দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করে থাকেন, যার দ্বারা জনসমাজের কল্যাণের বদলে বৃহৎ মুনাফা অর্জিত হয়। দেশের দৈন্য-দুর্দশা অপসারিত হওয়া দূরে থাক, শোষণ ও বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এত যে জাল ও ভেজাল দ্রব্যে—এমন কি ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে—সেগুলোর উৎপাদনের উৎস কি এবং কোথায়?

মালিকেরা বা শিল্পপতিরা নিশ্চয়ই নিজেদের হাতে ওই সব দ্রব্য তৈরি করেন না।

তাহলে তৈরি করেন কারা?

সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এক শ্রেণীর অসহায় বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায়ই এমন অপব্যবসায় বাজার দিনের পর দিন ছেয়ে চলেছে।

ভেজাল নিবারণে সরকারী কঠোরতা দেরিতে হলেও প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের জন্যে আন্তরিক চেষ্টা ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনা নিশ্চয়ই একদিন

নব দিগন্তের উন্মোচন করবে।

দেশের অগণিত মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ণ এবং গরিষ্ঠ সংখ্যক দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্যে আমাদের বিজ্ঞানকে আরো এগিয়ে যেতে হবে।

বাবুন বলল, 'না ভাই, তুমি কিছুই জান না।'

উত্তরে স্বীকার করতে হল আমাকে। কারণ স্বীকার না করে উপায় কি আমার। মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধন যদি বড় বীর বলে মনে স্থান পায় তার আমি কি করতে পারি।

সরমা ছেলেকে ধমকাল, 'বাবুন, ভাইয়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে নেই।'

বাবুন বলল, 'ভাই, কেন আমাকে ভুল বোঝাচ্ছে?'

'ভাই ঠিক কথাই তো বলেছে।'

'কি করে ঠিক কথা বলল ভাই? যুদ্ধে না পেরে অন্যায়ভাবে ভীম দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেনি?'

সরমা বলল, 'দুর্যোধনও তো কম অন্যায় করেনি।'

'তাই বলে জিততে পারবে না জেনে ভীম ওই ভাবে……। 'কথাটা শেষ করতে পারল না বাবুন।

সরমা চুপ। বললাম, 'ধরতে গেলে দাদুর কথাই এক দিক দিয়ে ঠিক। অবশ্য… ..'

বাবুন আমার দিকে এমন ভাবে চাইল, চুপ করে যেতে হল আমাকে।

রবিবারের ছুটির দিন নয়, সরমার স্কুল ছুটি হয়েছে গ্রীষ্মের। সকালের রোদটা এ সময় ভোরবেলা একবার বারান্দায় এসেই বেঁকে যায়। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সরমা। বলেছিল, 'তোমরা দুজনে তর্ক কর— আমার কাজ আছে।'

সরমা চলে গেল। বাবুনকে দেখে মনে হল সে চিন্তা করছে।

এক সময় বাবুন ডাকল, 'ভাই।'

আমি ওর দিকে চাইলাম।

ও বলল, 'আচ্ছা ভাই—যুদ্ধ কেন হয়?'

বললাম, 'অনেক কারণে। তবে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে।'

বাবুন বুঝল কিনা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতি মনে পড়লে

কেমন যেন কষ্ট হয় আমার। যুদ্ধের কথা আলোচনা করতে এতটুকু ইচ্ছা করে না।

'আচ্ছা ভাই, আমরাও তো স্কুলে টিফিনে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলি।'

আমি ওর দিকে চাইলাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম, ওর পরবর্তী প্রশ্নটা কি হতে পারে।

'আচ্ছা, আমরা কেন যুদ্ধ করি?'

একটু চমকালাম। বললাম, 'তোমাদের স্কুলে?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ল বাবুন।

একটু চিন্তা করে বললাম, 'স্কুলের যুদ্ধে তুমি কি সাজো?'

'আমি সেনাপতি হই।'

'রোজ জেতো তুমি?'

'রোজ নয়, হেরে যাই যেদিন—সেদিন খুব কষ্ট হয়।'

'কেন?'

'আমার হেরে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু রোজ যদি জিতি আমরা, কেউ খেলতে চায় না আমাদের সঙ্গে। সেইজন্যেই হারতে হয়। কিন্তু হারতে ইচ্ছা করে না আমাদের।'

শিশুর সরল স্বীকারোক্তি। খেলা বন্ধ হওয়ার কারণে হার স্বীকার। কিন্তু……

অতীতটাকে মনে পড়ে। অতীতের কিছু ঘটনা:

ইতিহাসের সম্ভবতঃ এটা এক বিচিত্র বিদ্রূপ যে, এশিয়াখণ্ডের যে দুটো দেশ সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং যে দুটো দেশের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোন সীমান্ত বিরোধ-সংঘর্ষ ছিল না, সেই দুটো দেশ—চীন-ভারতের মধ্যে সরকারীভাবে প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

অথচ একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু—চীনের প্রধান-মন্ত্রী চৌ এন-লাই পঞ্চশীলের চুক্তি ঘোষণা ও বান্দুং সম্মেলনের দ্বারা সমগ্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নব যুগের প্রবর্তন করেছিলেন।

সেদিন পশ্চিমের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো এশিয়ার সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্য—পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। কেননা, এই সমস্ত দেশে নয়া সাম্রাজ্যবাদীর অনুপ্রবেশ ঘটাবার জন্যে যে সমস্ত চক্রান্ত চলছিল এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ ও বিরোধ ঘটিয়ে প্রভুত্ব বিস্তারের যে নয়া পন্থা অবলম্বিত হচ্ছিল নেহেরু, চৌ এন-লাই, সুকর্ণ, বন্দরনায়েক প্রভৃতি জনগণ-বন্দিত নেতাগণ সেই সমস্ত ফন্দি-ফিকির নষ্ট করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্ভাবনার দিন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৪ সালে তিব্বত উপলক্ষে ভারত-চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত পঞ্চশীল চুক্তি কিংবা বান্দুংয়ে অনুষ্ঠিত আফ্রিকা-এশিয়ার উনত্রিশটি জাতির ঐতিহাসিক সম্মেলনে গৃহীত শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিগত ঘোষণা কয়েক বছরের মধ্যে দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়েছিল।

১৯৫৯ সালে তিব্বত উপলক্ষেই ভারতের সঙ্গে চীনের বিরোধ দেখা দিল। যে হিমালয় সীমানার দীর্ঘ আড়াই হাজার মাইল বেষ্টনী চিরদিন দুর্ভেদ্য বলে বিবেচিত ছিল, যে সীমান্ত কঠিন বরফের মতই জমাট—ঘুমন্ত ছিল—সহসা সেই সীমান্ত একদিন সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

ভারতবাসীর কাছে এই অবস্থাটা ছিল অকল্পনীয়। কেননা, প্রায় দু' হাজার বছর ধরে হিমালয় ছিল যেন শান্তির সীমানা। সেখানে যে কোনদিন সশস্ত্র সংঘাত, রক্তপাত ঘটতে পারে—যে প্রাচীন চীন-ভারতের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ছিল ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়, সেখানে যে আধুনিক সীমান্ত রাজনীতি—নরহত্যার কলুষ ডেকে আনতে পারে, কূটনীতির কুটিলতায় অনভ্যস্ত ভারতবাসী সেটা কোনদিন ভাবতে পারেনি।

এমন কি, জওহরলাল নেহেরুর মত অদ্বিতীয় নেতাও সেকথা ভাবতে পারেননি। কারণ তাঁর যে জীবন মন্ত্র ছিল :

সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তি হীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে—
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিয়াছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—"বুদ্ধের শরণ লইলাম ॥"

'পঞ্চশীল' নীতির সার্থক প্রয়োগে উদ্যম ছিল তাঁর অক্লান্ত। উৎপীড়িত-

বঞ্চিত পৃথিবীর মানুষের শেষ আশ্রয় অভয় মন্ত্র 'পঞ্চশীল'। তিনি চেয়েছিলেন :

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আর বার এদেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি॥
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক। মুক্ত হোক মোহ আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রি শেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রভাতে উঠুক কুসুমি॥
চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি
এনে দিক অজেয় আহ্বান॥

পঞ্চশীলের আদর্শকে মুছে ফেলে দিতে চাইল চীন।

শুরু হল সীমান্ত বিরোধ। চীনের মানচিত্র—ভারতের মানচিত্রের সঙ্গে কোন মিল হল না। হিমালয়বর্তী ভারতীয় সীমানার অন্ততঃ চল্লিশ হাজার বর্গমাইল চীনা-দাবীর অন্তর্গত হল।

১৯৫৯ সাল থেকে বিসম্বাদের শুরু। উত্তর-পূর্ব সীমানার নেফার লংজুতে, পূর্বে লাডাকে—আকসাই চীনে চীনাদের হানাদারি, সংঘর্ষ ঘটলো। ২১শে অক্টোবর লাডাকে সশস্ত্র চীনা টহলদারদের আক্রমণে নয়জন ভারতীয় প্রহরী সৈন্য নিহত হল, দশজন বন্দী, একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

১৯৫৯ সালের রক্তাক্ত ঘটনার শেষ পরিণত ঘটল ১৯৫২ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের মধ্যে। সামরিক দিক থেকে ভারত সেদিন প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্যেই পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

আজ ভারত অপ্রস্তুত নেই। চীন ও পাকিস্তানের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষ আজ সজাগ, সতর্ক ও প্রস্তুত। সামরিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান দখল করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনো আগ্রাসকের ভূমিকা গ্রহণ করবে

না, কারণ ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র নীতি শান্তি ও মৈত্রীর।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষ চীনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসের লাডাকের ঘটনার মত এবারও সেই অক্টোবর (১৯৭৫) মাসেই ভারত-তিব্বত সীমান্তের তুংলুংয়ের পাঁচশো মিটার দক্ষিণে চীনাদের আক্রমণে চারজন টহলদার জওয়ানের প্রাণ গেল। ভারতীয় জমিতে ভারতীয় জওয়ানদের তপ্ত রক্ত ঝরে পড়ল।

বিনা প্ররোচনায় এই রক্তপাত ও এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। কিন্তু চীনাদের পক্ষ থেকে অতীতের মত সেই একই যুক্তির পুনরাবৃত্তি ঘটেছে—ভারতীয় সৈন্যরা চীনাদের এলাকায় হানাদারি করেছিল।

তবু অতীতের মত বাদ-বিসম্বাদ ভুলে চীনের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয়েছে, জাতীয় সংহতি—শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার যে আন্তরিক চেষ্টা চলছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতবর্ষের বৈদেশিক সম্পর্কেরও পুণর্মূল্যায়ন ঘটেছে। কারণ প্রত্যেক দেশেরই পররাষ্ট্র নীতি অভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গে অপরিহার্য রূপে জড়িত। ভারতবর্ষের সেই অভ্যন্তরীণ নীতির লক্ষ্য দেশ ও সমাজকে গড়ে তোলা—দারিদ্র ও বেকারী দূর করা। কিন্তু সততা, শান্তি ও শৃঙ্খলা ছাড়া এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়—সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা।

একমাত্র নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করেন যে, ভারতবর্ষের নীতি শান্তির-মৈত্রীর। সেই নীতির দার্শনিক ভিত্তি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ এই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের নীতি প্রচার করে এসেছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের প্রাচীন ভারতবর্ষ কোন দিন কোন সমুদ্র-পারবর্তী দেশের স্বাধীনতা হরণের জন্যে কিংবা ঔপনিবেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নৌ-বল-সৈন্যবল পাঠায়নি। বরং শান্তি, মৈত্রী ও ধর্মের বাণী প্রচারের জন্যে এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে দূত ও প্রচারক পাঠিয়েছে।

পুরাতন ভারতের সেই সুমহান ঐতিহ্য চীন-ভারতের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক কালের সেই শাশ্বত ভারতের বাণী স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, "বৃটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতের এক বিরাট বিপদ দেখা দেবে চীনের দিক থেকে।"

১৮৯৫ সালে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"আমি বলছি শোন—শূদ্র অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায়, তারপর চীনে।" সমগ্র ইউরোপকে সাবধান করে বলেছিলেন তিনি—"এখনো সময় আছে, যুদ্ধের দামামা বন্ধ করো, নয়তো আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তোমরা ধ্বংসকে বরণ করে নেবে।" তাঁর কথা ইউরোপ শোনেনি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুটো মহাযুদ্ধে নাভিশ্বাস উঠেছিল মহাদেশের। ১৮৯৭ সালে তিনি বলেছিলেন—"আগামী পঞ্চাশ বছর ধরে মাতৃভূমিই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হন।" ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে।) ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

মহাত্মা গান্ধীও সেই বাণীকেই তাঁর অহিংসা, প্রেম ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে নতুন করে প্রচার করেছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে জওহরলাল নেহেরু তাঁর জোট-নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পররাষ্ট্র নীতিকে সেই ঐতিহ্যের ওপরেই দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর সুবিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

তারপর ?......

দীর্ঘ তের-চোদ্দ বছর পর জনগণতন্ত্রী চীন ও প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের যে ঘোষণা প্রদত্ত হয়েছে, তা কি সেই নতুন শান্তি পর্বের সূচনা নয় ?

প্রধানমন্ত্রী চীনের নতুন প্রধানমন্ত্রী মিঃ হুয়া কুও-ফেং এর উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে সেটা কেবলমাত্র সাধারণ কূটনৈতিক শিষ্টাচার কি ?

১৯৫২ সালের দুর্ভাগ্যজনক সীমান্ত সংঘর্ষের পর গত তের বছর ধরে দিল্লী ও পিকিংয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল বটে, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই নামে মাত্র—গতানুগতিক। সরকারী স্তরে বিশেষ কোন আদান প্রদান ছিল না কিংবা আন্তরিকতা ও হৃদয়ের উষ্ণ অনুভূতির চিহ্ন মাত্রও ছিল না। দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূতের পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন কোন প্রতিনিধিও ছিলেন না।

আজ যখন সেই রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হতে চলেছে, তখন উভয় দেশের বিরোধ কি শান্তিপূর্ণ ভাবে মীমাংসা হতে পারে না ?

১৬ই এপ্রিল ১৯৭৬।

চীনের সরকারী সংবাদ সংস্থা বা পিকিং বেতার থেকে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের

সংবাদ সম্পর্কে এখনও কোন মন্তব্য করা হয়নি। তবে কিয়াডো বলেছেন, পিকিং শীঘ্রই এ সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করবে।

পিকিংয়ে পর্যবেক্ষকের দল বলেছিলেন, নতুন করে, রাষ্ট্রদূত নিয়োগ সম্পর্কে চীনের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয় দিল্লী ঘোষণার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে।··· এটা শুধু ভারত চীন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নয়, প্রধানমন্ত্রী হুয়ার নতুন উল্লেখযোগ্য দিক।

নিউ ইয়র্ক থেকে খবর: ভারত-চীন রাষ্ট্রদূত বিনিময় করছে এ খবর শুনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত হতচকিত।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র বলেন: এ সম্পর্কে তার কোন মন্তব্য নেই।

রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিরা বলেন: এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব তার মুখপাত্র মাধ্যমে বলেন: সদস্য রাষ্ট্ররা নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করলে তিনি খুশি হবেন।

১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিসের প্রতিযোগিতা উপলক্ষে যে চীনা প্রতিনিধি দল এসেছিলেন, তাঁদের পক্ষ থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে একটা সুন্দর কথা উচ্চারিত হয়েছিল: 'আগে বন্ধুতা পরে প্রতিযোগিতা।'

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতবাসীর বিশাল হৃদয়ের পরিচয় দিলেন আর একবার।

৭ই নভেম্বর ১৯৫৫। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যা ঘটছে, তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমরা ভাল ভাবেই জানি যে, কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয়। তবু একথা স্মরণ না করে পারা যায় না যে, বাংলাদেশে ভারতীয়-দের নিরাপত্তার প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত এবং সেই সঙ্গে জড়িত আমাদের এই অঞ্চলের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি। কারণ এই অঞ্চলের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার মূলেও আঘাত হানার চেষ্টা চলেছিল—যদিও অনেকে তখন একথা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আজ বাংলাদেশের ঘটনাবলী সেই প্রমাণ বহন করে এনেছে। এমন কি, সোভিয়েত রাশিয়ার পত্র পত্রিকায় পর্যন্ত মন্তব্য করা হয়েছে যে, যাঁরা বাংলা-দেশের বন্ধু ছিলেন, বর্তমান ক্ষমতাশীল দল তাঁদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন

হয়েছেন।

কিন্তু কেন হঠাৎ এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদয় হল?

সে কথা উপলব্ধি করতে হলে এশিয়ার বৃহৎ শক্তিবর্গের অবস্থান মনে রাখা দরকার।

চীন, রাশিয়া, ভারতবর্ষ যেমন এশীয় শক্তি হিসাবে এই মহাদেশের মানচিত্রের অন্তর্গত, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার কোন শক্তি না হওয়া সত্ত্বেও গত উনিশ শতক থেকে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর ও বর্তমানে ভারত মহাসাগরের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত একটা প্রবল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে, বৃটেন এশিয়ার ভূভাগ ও জলপথ থেকে দূরে অপসারিত। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে যে সমস্ত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ হারিয়ে ফেলেছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে চাইছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাঁচা মালের ঐশ্বর্যপূর্ণ দেশগুলোর ওপর সে প্রভুত্ব খাটিয়ে এসেছে। কিন্তু বিপ্লবী ভিয়েতনামের অদ্ভুত সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ফলে মার্কিন সামরিক শক্তি সেখানে পরাজিত—অপসারিত। কিন্তু রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ এই সুবৃহৎ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে হলে তার দরকার পাকিস্থানকে শক্তিশালী রাখা, চীনের সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টি করা এবং জাপানের সঙ্গে মিত্রতা অক্ষুন্ন রাখা।

কিন্তু এশিয়াতে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া। সেই রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মিত্রতা। শুধু তাই নয় রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আজ দুর্বল বা অক্ষম নয়। সামরিক বলের দিক থেকে সে আজ শক্তিমান।

১৯৫১ সালে সেই প্রমাণ পেয়েছে। পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর পূর্ণ পরাজয়—আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে হঠাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় এক সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতি যাতে রোধ করা সম্ভব হয় সেজন্যে মার্কিন সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে ছুটে এসেছিল। কিন্তু মার্কিন নৌশক্তি কিছু করার আগেই পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন—বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিপদ গণল। দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। শুরু হল পর্দার আড়ালে হৃতশক্তির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা।

সবশেষে সম্ভব হল। বাংলাদেশে শুরু হল নৃশংস হত্যাকাণ্ড—ক্ষমতার লড়াই। এই সমস্ত উদ্বেগজনক—উত্তেজনাপ্রদ ঘটনাবলী থেকে একটা প্রশ্নই

বার বার মনে জাগে—তা হল এই :

পূর্বদিকে : ভয়াবহ রক্তসিক্ত ঘটনাবলী—সেই সঙ্গে ভারত-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ। প্রগতিশীল শক্তি প্রায় নিশ্চিহ্ন।

পশ্চিমদিকে : ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান কর্তৃক নতুন মারণাস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা, সেই সঙ্গে সমরাস্ত্রের কারখানা নির্মাণের উদ্যোগ। চীন ও এশিয়ার কিছু কিছু আরব রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক বল বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

উত্তরদিকের চীন-ভারত সীমান্তে সশস্ত্র চীনা প্রহরী কর্তৃক ভারতীয় জওয়ানদের প্রাণ নাশ এবং তিব্বতে সামরিক সড়ক নির্মাণ, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন ও পাঁচ লক্ষ চীনা সৈন্যের অবস্থান।

দক্ষিণদিকে : ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহরের আনাগোনা। দিয়াগো গার্সিয়াতে নতুন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ। যদিও ভারত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই এই নতুন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের বিরোধী তবুও জঙ্গীবাদ জলপথে এগিয়ে আসছে।

মাত্র সেদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে নাগরিক আইন নিয়ে সম্মেলন হয়ে গেল। যোগ দিয়েছিলেন একশো ছাপান্নটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। সম্মেলন চলল আট সপ্তাহ ধরে কিন্তু কোন সমস্যারই সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান মেলেনি। আবার বৈঠক বসবে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে—চলবে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রশ্নটা হচ্ছে—সমুদ্রের ওপর উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার কতখানি? তার সীমানা কতদূর?

প্রশ্নটা আজকের নতুন নয়। বহু আগেই এটা জেগেছিল। মধ্যযুগে ছিল বৃটেন, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের নৌ-শক্তির প্রচণ্ড দাপট। সাগরগুলো ওরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে চেয়েছিল। দাবি এবং পাল্টা দাবি নিয়ে সেদিন জল ঘোলা কম হয়নি। তারপর আন্তর্জাতিক আইনের ধারণা দানা বেঁধে ওঠবার পর একটা নীতি মেনে চলার ইচ্ছা জেগেছিল সকলের মনে। সেই থেকেই নথিভুক্ত হতে লাগল সামুদ্রিক কনভেনশন।

কেউ বললেন, তটভূমি থেকে কামান দাগলে তার গোলা যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌম এক্তিয়ার।

কেউ কেউ মানলেন এ নীতি। অনেকেই মানলেন না। ফলে ১৯২০ সালে বসল হেগ সম্মেলন।

১৯৫৮ এবং ১৯৬০ সালে জেনিভা সম্মেলন। তারপর আরো অনেকগুলো সম্মেলন। প্রশ্ন সেই একটাই—তটভূমি থেকে সাগরের ওপর উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌম এক্তিয়ার ক'মাইল বিস্তৃত হবে?

বার মাইলের দিকে ক'বছরই ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল। এখন সমস্যা আরো জটিল রূপ নিয়েছে। প্রতিরক্ষার প্রশ্ন। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রশ্ন। প্রশ্ন বহুবিধ। আমেরিকার মন উঠছে না কিছুতেই। সে চায়… …..

সংবাদ:

নিউ ইয়র্ক, ২৩ শে এপ্রিল ১৯৫৬।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছে, এ বছরই সে পাকিস্থানকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করবে, তবে সব রকমের নয়, কিছু বাছাই করা। এর মধ্যে থাকতে পারে 'টাও' ক্ষেপণাস্ত্র, গোলাবারুদ আর সাঁজোয়াগাড়ি।

আগামী মাসগুলোতে প্রশিক্ষণ বিমান ও পরিবহনের জন্যে হেলিকপটার বিক্রির প্রস্তাবও রয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এ কথা স্বীকার করেছেন। তবে এ কথাও বলেছেন, মার্কিন সরকার পাকিস্থানের কাছে জঙ্গীবিমান বিক্রির ব্যাপারে কোন রকম কথা দেননি। ওই সব কেনাকাটা করতে দেওয়ার জন্যে পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত কোন অনুরোধ জানায়নি।

ব্যবসাভিত্তিক প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী কয়েকটি সংস্থার আমন্ত্রণে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সফরকালে তিনি দেখেছেন বেশ কিছু সামরিক বিমান। যেমন, এ-৪ জঙ্গী বিমান (এই হালকা জাতের বোমারু বিমানে বসবার আসন মোটে একটি। মার্কিন নৌবহরের জাহাজ এগুলো বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ইজরায়েল, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা এবং অস্ট্রেলিয়ার বিমান বাহিনীতে এই বোমারু বিমানের ব্যবহার যথেষ্ট। এগুলো সব সাইজের এয়ারক্র্যাফট্ ক্যারিয়ার থেকে যাতে উড়তে পারে সেই ভাবে এগুলোর নকশা তৈরি, নামতে চাই ছোট্ট একটু মাঠ। এই বোমারু বিমানে উপরন্তু দুটি কুড়ি মিলিমিটার ব্যাসের এম-কে ১২ কামান। কি ওপর থেকে মাটিতে, কি হাওয়া থেকে হাওয়ায় গোলা ছুঁড়তে এই কামান সব্যসাচী—সমানভাবে দড়। এ-৪-এর আবার নানান রকম ফের আছে। ঘণ্টা প্রতি সর্বোচ্চ গতি ৬৭৫ মাইল।),…এ-৭ জঙ্গী বোমারু বিমান (এই বিমানেও

সিট একটি, জাহাজের পাটাতন এদেরও ঘাঁটি। হাওয়াই হানার পক্ষে উপযুক্ত এই ধরনের হাল্কা বিমান তৈরি করিয়ে নেয় মার্কিন নৌবহর। উদ্দেশ্য এ-৪ বোমারু বহরকেই জোরদার করা। দরকার ছিল শব্দের চেয়ে মন্দগতি বিমানের, এমন বিমান, যা আরও বেশি ওজনের অ-পারমানবিক বোমা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই এ-৭ বিমানেরও প্রচলিত হয়েছে অন্য কয়েকটি সংস্করণ। বেশ কিছু এ-৭ বিমান আছে মার্কিন নৌ আর বিমান বহরের; গ্রীক আর সুইস বিমান বহরও এই জাতের কিছু বিমান-বলে বলীয়ান হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এ-৭। এক ঘণ্টায় সর্বোচ্চ গতি—সোজা উড়ে গেলে ৬৯৮ মাইল)…এফ ৫ই জঙ্গী বিমানের আধুনিক সংস্করণ (এটি হাল্কা বিমান এফ-৫ এর আরো পরিণত নমুনা। মার্কিণ বিমান বহর, ইরানী বিমান বহর, তাইওয়ান, গ্রীস, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, মরক্কো, তাইল্যাণ্ড, লিবিয়া, নরওয়ে, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ-ভিয়েতনাম ইত্যাদি অনেক দেশ এই বলে বলী, কেউ-কেউ ব্যবহার করতেও বাকি রাখেনি। এফ-৫ই বিমান চলে শব্দের চেয়ে মোটামুটি দেড়গুণ গতিতে—শব্দের গতি ঘণ্টায় ৭৬০ মাইল, উড়তে পারে পঞ্চাশ হাজার ফিট উঁচুতে। হাওয়াই লড়াইয়ে এর জুড়ি মেলা ভার। মার্কিন বিমান বহর তো বটেই, ওদেশের নৌবাহিনী ব্রাজিল, চিলি, তাইওয়ান, ইরান, জর্ডন, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব—এই জঙ্গী বিমান ব্যবহার করেছে অনেকেই। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুন এর সৃষ্টি, এবং অন্যান্য দেশের হেফাজতে এদের তুলে দেওয়া হয় ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে। এই বিমানে আছে উন্নত ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র, ২০ মিলিমিটার ব্যাসের কামান। এরা ৭০০০ পাউণ্ড অস্ত্রশস্ত্র, ২০০০ পাউণ্ড সাইজ অব্দি বোমা, অন্তত ২০টি 'এয়ার -টু-সারফেস্' রকেট বহন করতে পারে। এই জঙ্গী বিমান যেমন হাওয়াই লড়াইয়ে দড়, তেমনই আবার পর্যবেক্ষণমূলক ফটো তুলতেও পারে। দরকার হলে এরা ঘাঁটি ছেড়ে উড়ে কাজ সেরে ফিরে আসে শুধু একটি মাত্র ইঞ্জিন কাজে লাগিয়ে)।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বলেছেন, হ্যাঁ, পাকিস্তানের ওই কর্তাব্যক্তি এই সব বিমান দেখেছেন ঠিকই, তবে এর মানে এই নয় যে, ওই সব বিমান বিক্রির ব্যাপারে মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

জঙ্গী বিমান কেনার ব্যাপারে পাকিস্তানের দিক থেকে সুস্পষ্ট অনুরোধ এলে তা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচিত হবে কিনা সে সম্পর্কে ওই অফিসার কোন আভাস দেননি।

'টাও' ক্ষেপণাস্ত্র* দেখতে টিউবের মতো, এটি একটি নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। এদের দরকার ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, কামানবাহী গাড়ি ইত্যাদির মহড়া নিতে। পাল্লা এক মাইলের বেশি এবং নানারকম গাড়ির ওপর এদের স্থাপন করা যায়। হেলিকপ্টার থেকে সমতলে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে এদের ব্যবহার সম্ভব। টাও-এর নির্মাণ কৌশলের মধ্যে আছে ফাইবার গ্লাসের নল, তেপায়া এবং বিবিধ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। মোট ওজন ২০০ পাউণ্ড তবে চারটে ভাগে ভাগ করে নেওয়া চলে), গোলা বারুদ ও সামরিক গাড়ি বিক্রয় ব্যাপারে দু'পক্ষ কার্যত একমত। সাকুল্যে এসব জিনিসের বিক্রয় মূল্য দাঁড়াবে হয়তো দশ কোটি ডলারের মত, অর্থাৎ টাকার অঙ্কে নব্বই কোটি।

মার্কিন অফিসারের যুক্তি : এখন সাজসরঞ্জামের দাম চড়া। এই টাকা দিয়ে তেমন কিছু কেনাকাটা করা যাবে না। পাকিস্তানকে আমেরিকার তরফ থেকে দামের ব্যাপারে ভরতুকি দেওয়ার কথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, না, তা করা হচ্ছে না। কারণ অন্যান্য ক্রেতাদের নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে।

মার্কিন অফিসাররা অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারটা হালকা করে দেখাতে চাইছেন। তাঁরা বলেছেন, ওই দেশকে অস্ত্র বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর রুটিনমাফিক স্বাভাবিক অস্ত্র বিক্রির সম্পর্ক আবার চালু করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার সঙ্গে এই ব্যাপারটা সঙ্গতিপূর্ণ।... এই অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ এত বেশি হবে না যে, তাতে দক্ষিণ এশিয়ায় অস্ত্র রেষারেষি বেড়ে যাবে বা কোন না কোন ভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ব্যাহত হবে—বিশেষ করে যখন সেখানে একটা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

তাঁরা জানিয়েছেন, ভারত বললে তাদের সঙ্গেও একই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের কথা আমেরিকা বিবেচনা করবে।

তাঁরা একথাও বলেছেন, ১৯৫৫ সালে—অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর পাকিস্তানকে ইতিমধ্যেই কিছু সামরিক সামগ্রী বিক্রি করা হয়েছে। যেমন, যন্ত্রাংশ, গাড়ি ইত্যাদি। বিশেষ ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের জন্যে পাক অনুরোধ মার্কিন সরকার আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করে দেখবেন, একসঙ্গে নয়। এটাই মার্কিন সরকারের ঘোষিত (?) নির্দেশ। এবং সকল ক্রেতার ক্ষেত্রেই এটা সত্য। সরাসরি বিক্রির জন্য সরবরাহের পরিমাণ আড়াই কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বাইশ কোটি টাকার নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে চারগুণ বেশি।

তাই নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসনকে কংগ্রেসের কাছে এ বছর পাকিস্তানকে যা-যা সরবরাহ করা হবে তার একটা যথোপযুক্ত প্রস্তাব পাঠাতে হবে। প্রশাসনের ইচ্ছা কংগ্রেসের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠানোর। কংগ্রেস সেটা অগ্রাহ্য বা সংশোধন করতে পারেন।

সম্পাদকের কলমে (২৭. ৪. ৫৬):

দেশ-বিদেশে পাক-প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মাধুকরী মনে হয়, নেহাৎ বিফলে যায়নি। এক মুরুব্বি আমেরিকা তো হাতিয়ার বেচবে বলে কিছু কাল হতে মুখিয়ে ছিল, তাছাড়া ওই বিকিকিনির বাজারে অন্যান্য দোকান-দারদেরও কখনো আগ্রহের অভাব ছিল না। পিণ্ডির সহায় সৌদি আরব প্রভৃতি ক'টা ক্ষুদে রাষ্ট্র তো বটেই, উপরন্তু বাঘা-বাঘা দাদন-প্রবণ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন-আমেরিকা। খুদে মুলুকগুলো আকারে ছোট হলেও প্রকারে দস্তুরমত বড়, কেননা তাদের হাতে যথেষ্টই রেস্ত রয়েছে। তাছাড়া পাওয়া মাল রিডাইরেক্ট করে ইসলামাবাদে পাঠানো ঠেকায় কে? পিণ্ডির অস্ত্রাগারে সুতরাং এখন দেদার হাতফেরতা হাতিয়ার।

কমিউনিস্ট দুনিয়ার মধ্যে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় যোগানদার বোধহয় চীন। আর অকমিউনিস্ট কুলে এই ভূমিকাটা যে আমেরিকার সেটা বলে না দিলেও চলে।

প্রতিরক্ষা খাতে পাকিস্তানের ব্যয় মাত্র সত্তর কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার। কী মোট জাতীয় আয়ের হিসাবে, কী আনুপাতিক বিচারে এই খরচটা ভয়ঙ্কর রকম বেশি কি?

ব্যয়ের পর্যায়ে ভারতের স্থান দুনিয়ায় আটত্রিশতম, পাকিস্তান এর অনেক অনেক ওপরে। যে-দেশ শক্তিমদে মত্ত হয়ে তার রাজস্বের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ সামরিক খাতে উড়িয়ে দেয়, সে মরিয়ার মত কোনও জুয়ার দান খেলতে বসেছে, বলা যায়!

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রটার রণসজ্জার যে চিত্রটা আঁকা, তা রীতিমত চমকপ্রদ। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে আরও বলীয়ান হবার জন্যে পাকিস্তান একবারে হাল-ফ্যাশানের যে সব আয়ুধ জোগাড় করে চলেছে তার ফিরিস্তি দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। ট্যাঙ্ক, গান বোট, ক্ষেপণাস্ত্র, হেলিকপ্টার, সাবমেরিন ইত্যাদি সব কিছু। পিণ্ডির তূণে নেই কী?

বৃথাই ভারতবর্ষের বিদেশ মন্ত্রকের বিবরণ দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে বলে দেয়নি যে, আশঙ্কার কারণ যথেষ্ঠ এবং প্রয়োজনে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার।

কারণ একা আমেরিকাই পাকিস্তানের জন্মকাল থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি ডলারের ওপর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছে। এর কোনটা নাম-কা ওয়াস্তে খরিদ, কোনটা বা স্রেফ খয়রাতি—সে সব খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার দরকারটা কি? যে বিকট রূপটা চোখের সুমুখে পরিদৃশ্য, আমাদের কর্তব্য শুধু সেটুকুই দেখা।

তবু পাগলের হাতে মারাত্মক খেলনা যদি পড়ে তবে আশ্বাস কোথায়—বিশ্বাসই বা কী?……

এবং… …

খবরটি ছোট।

গুরুত্ব অসাধারণ।

বালুচি গেরিলারা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত (সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) মাসে তাদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হয়েছে মাত্র চৌত্রিশজন পাক সৈন্য এবং আধা সামরিক জওয়ান। সংঘর্ষ চলছে মারি খণ্ডজাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

গেরিলাদের দাবী—ওরা একখানা স্যাবার জঙ্গীবিমানও গুলি করে নামিয়েছে।

ভুট্টো হয়তো অবাক হয়ে সে সময় ভেবেছিল—এখন মুখ দেখাব কেমন করে?

বছরখানেক আগে পাকিস্তানের জবরদস্ত প্রধানমন্ত্রী হুকুম দিয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গেরিলাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে নইলে পাবে কঠিন শাস্তি।

গেরিলারা বোধহয় তার কথা শুনতে পাননি।

অতএব মিঃ ভুট্টো মেয়াদ বাড়াল। সৈন্যেরা ঘিরে রাখল উপক্রুত অঞ্চল। গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকদের ঝেঁটিয়ে আনা হল কোয়েটায়। রাখা হল বন্দী শিবিরে।

মিঃ ভুট্টো সগর্বে বলল—সব ঠাণ্ডা। গেরিলারা বিলকুল খতম।

দুর্গম পর্বতে বসে হেসেছিলেন বালুচি মুক্তিযোদ্ধারা।

এক লক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে গেরিলাদের বশে আনতে পারল না জুলফিকার আলী ভুট্টো। মাঝখান থেকে ছারখার হল একটার পর একটা জনপদ আশ্রয়ের জন্যে শরণার্থীরা দলে দলে ছুটলেন আফগানিস্থানে।

কাবুল সরকার প্রতিবাদ জানালেন রাষ্ট্রসংঘে।

ইসলামাবাদ এবং পাক দোস্তরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল—ঝুট বাত—বিলকুল ঝুট বাত।

ইরানের শাহ রইল নির্বাক।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের মে মাস পর্যন্ত ইরানী জঙ্গী বিমান বোমা ফেলেছে পাক-বালুচিস্থানে। অবশ্য ওটা তারা করত মিঃ ভুট্টোর একান্ত অনুরোধে।

অবশেষে শাহ দেখল—বালুচি বিদ্রোহ সহজে দমবার নয়। মাঝখান থেকে বালুচিদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে ইরান। চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে ইরাণী রাষ্ট্রের বালুচি এলাকায়।

শাহ সরিয়ে নিল ইরাণী বৈমানিকদের। একা পড়ে রইল ভুট্টো আর তার সৈন্যদল। ব্যর্থ হল জেনারেল টিক্কার সামরিক কসরত। মরি এলাকা এখনও পাহারা দিচ্ছে চল্লিশ হাজার পাক সৈন্য।

পার্বত্য গেরিলারা দুর্ধর্ষ। বর্তমান সংখ্যা আট হাজারের মত। সংস্থার নাম পপুলার ফ্রন্ট আব আর্মড রেজিস্ট্যান্স (পি-এফ-এ-আর) এঁরা নিয়মিত বুলেটিন বার করেন। সাধারণ মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে তা পড়ে। রাজনৈতিক আদর্শে তাঁরা সমাজতন্ত্রী। স্বায়ত্তশাসিত বালুচিস্থান এবং পাখতুনীস্থান তাঁদের কাম্য। পাক-আফগান সীমান্তবর্তী ঝালবান অঞ্চল থেকে শুরু করে করাচীর অদূরে চাগল জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ওদের কর্মক্ষেত্র। কোয়েটা এবং করাচী কলেজ-গুলোর ছাত্ররা এখন যোগ দিচ্ছে গেরিলা দলে। খণ্ডজাতিগুলোর নিরক্ষর মানুষের দল এসব শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। তারা জানে অস্ত্রের ব্যবহার। নিজেদের কারখানা আছে গেরিলাদের। বছরে শ'খানেক রাইফেল বানায়। পাক সৈন্যদের অস্ত্র লোপাট করে। চোরা গোপ্তা পথে বিদেশী অস্ত্রও পায়।

শুধুমাত্র সৈন্যদল লেলিয়ে নয়, রাজনৈতিক হত্যাও চালিয়েছিল পাক-প্রশাসকরা। একাজে পাক পুলিশ ভারী তৎপর। গত বছর (১৯৫৪) নিহত হয়েছেন আবদুস সামাদ আচাকজাই এবং মৌলভী সামসুদ্দিন। হত্যার শেষ নেই। উপজাতিগুলোর মধ্যে মারামারি বাধানোর চেষ্টার বিরাম নেই। ইয়াহিয়ার আমলে যা ঘটেছিল বাংলাদেশে তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বালুচিস্থানে। মারি অঞ্চল ঘুরলে দেখা যাবে শ্মশানের দৃশ্য। খাঁ-খাঁ জনপদ। মানুষগুলো প্রাণের ভয়ে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। রাজধানী কহানে এক সময়

ছিল আড়াই হাজার মানুষের বাস। ওটা এখন পরিত্যক্ত শহর। পরিত্যক্ত কিন্তু জনহীন নয়। চারদিকে গিজ-গিজ করছে পাক সৈন্য। বীরদর্পে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছে। শুধু ভয় পায় পাহাড়ী অঞ্চলে ঢুকতে। সেখানে পাক সৈন্যদের যম গেরিলারা সক্রিয়।

আগুনে হাত দিয়েছে মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো। বালুচিস্থানে লোকায়ত্ত সরকার বরবাদ করেছিল একদিন। বসিয়েছিল নিজের পেয়ারের লোকেদের। তবু হালে পানি পায়নি। হামেশাই বদল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী-রাজ্যপাল।

ভুট্টোর সামনে উভয় সঙ্কট। মারি এলাকার নীচে রয়েছে তেল সম্পদ। বলেছে, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব পাকিস্থান। কিন্তু এ' তেল আহরণের বিরাট বাধা বিদ্রোহী বালুচিরা। তাদের নিঃশেষ করতে চাইছে জেনারেল-টিক্কা খানের পাঞ্জাবী সৈন্যরা। চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু পারছে না।

মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে ভুট্টো। হুঁশিয়ারী দেয় আফগানিস্থানকে। বালুচি এবং পাখতুন বিদ্রোহীদের মদৎ দিলে কাবুলে উড়াবে পাক পতাকা!

আবার কখনো-কখনো অভিযোগ করে—বালুচি বিদ্রোহ ভারত-আফগান ষড়যন্ত্রের ফল। পাক-বেতার প্রচার করে এসব কাহিনী।

ভুট্টো বলেছিল—ভারত জনমন অশান্ত। তাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরাবার জন্যে পাকিস্থানের ওপর হামলা চলতে পারে। তাই অস্ত্রের দরকার পাকিস্থানের।

বালুচিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী দেখলে বোঝা যাবে কোথায় অশান্ত জনমত। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হলে কার দরকার প্রতিবেশীর ওপর হামলার।

আয়ুব-ইয়াহিয়া দেখিয়ে গেছে পথ। উত্তরসূরী ভুট্টো। তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গেরিলারা। পাক সৈন্যদের মেরে মেরে প্রমাণ করেছে মুক্তি সংগ্রামীরা মরে না। আদর্শের মধ্যে বেঁচে থাকে। কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র শানায়। কখনো দ্রুত—কখনো মন্থর গতিতে।

সুযোগ সন্ধানী নেতা ভুট্টো। আদর্শ এবং সদাচার তার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। মিথ্যার বেশাতিতে তার জুড়ি মেলা ভার। দেশের উন্নতির কথা ভাবতে তার বড় বয়ে গেছে। মানুষের দুর্গতি দূর না হলে তার কি এলো-গেল! নিজে এবং ইয়ার দোস্তের দল ঠিক থাকলেই হল। আর ঠিক রাখতে হবে সৈন্যদের। কারণ তারাই তার শেষ ভরসা!

সেইজন্যেই রণসজ্জায় সর্বস্ব পণ করেছে পাকিস্থানের হয়ে জনাব জুলফিকার

আলি ভুট্টো। কিন্তু তাদের বৈষয়িক অবস্থা যে কতখানি কাহিল তার উল্লেখ করে আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন পাকিস্থানেরই অর্থনীতিবিদ্‌রা।

ডঃ আনওয়ার ইকবাল কুরেশী পাকিস্থানের একজন নাম-করা অর্থনীতি-বিদ্‌। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, পাকিস্থানের অর্থনীতি ঠিক পথে চল্‌ছে না। পাকিস্থান এখন বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্য সম্বল করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৫৫ সালে পাকিস্থানের বৈদেশিক সঞ্চয় মাত্র ২০ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় নেমে আসে। এই অধোগতি থেকে উদ্ধারের কোন আশাই নেই। তুলোই মুখ্যতঃ পাকিস্থানকে বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেয়। (অতীতে পাটও এনে দিত)। এ বছর তুলোর উৎপাদন হয়েকে কম। এবার উৎপাদন ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার গাঁট কম হয়েছে বলে রপ্তানীও বন্ধ করতে হয়েছে। এ বছর বড় জোর আটাশ লক্ষ গাঁট তুলো উৎপাদন হবে। তার সবটাই লেগে যাবে দেশের ভেতর। তাই এ বছর কোন ভাবেই আর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আশা নেই।

এবং করাচির 'ডন'-এ লেখা হয়েছে: গত দু'বছর ধরে পাকিস্থানের রপ্তানী বাণিজ্য একটুও বাড়েনি। সরকারী মহল অবশ্য আশা করেছিলেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে পাকিস্থানের একশো কুড়ি কোটি ডলার আয় হবে। কিন্তু প্রথম ছ'মাসের হিসাব-নিকাশ ভালভাবে খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হবে যে, এ বছরে শেষ পর্যন্ত একশো কোটি ডলারের বেশি রপ্তানি করা পাকিস্থানের পক্ষে সম্ভব হবে না।

১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্থানের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল: সাড়ে পঁচাশি কোটি ডলার।

১৯৫৩-৫৪ এ ছিল: একশো এক কোটি সাড়ে সাতাশি লক্ষ ডলার।

১৯৫৪-৫৫-এ ছিল: নশো আটানব্বই কোটি ডলার।

এই অবস্থায় পড়ে পাকিস্থান সরকার শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছেন যে, তাঁরা শ্রমশক্তি রপ্তানি করবেন।...বিদেশে চাকরি জোগাড়ের জন্যে পাকিস্থান সরকার তাঁদের তরুণদের তৈরি করবেন!

আরব দেশগুলো পাকিস্থানে একশো কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছেন।

এ সম্পর্কে করাচির পাকিস্থান ইকনমিস্ট পত্রিকার মন্তব্য:

পাকিস্থানের বেসরকারী বাণিজ্যিক মহলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর বৈষয়িক সহযোগিতা একেবারেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকে—তা নগণ্য। এবং আরব দেশগুলোতে রপ্তানি বৃদ্ধি নেহাতই কম। ১৯৫২-৫৩ সালে সৌদি আরব, লিবিয়া, কুবায়েৎ এবং ইরাক যত টাকার মাল

বিদেশ থেকে আমদানী করে তাতে পাকিস্থানের অংশ যথাক্রমে, দেড়-দুই-দেড় এবং দেড় শতাংশ।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৫।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন: ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি করায় এবং (পাকিস্থানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় তার বিপদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জাতিকে সুশৃঙ্খল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এই সঙ্কটের মোকাবিলার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পূর্বেও বহুবার ভারত সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং প্রতিবারই অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করে সে সব বিপদ ও সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ জাতি তখন সাহস ও ঐক্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। এখনও সেই সাহস ও ঐক্যের প্রয়োজন।

১লা মার্চ ১৯৫৬।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন: পাকিস্থান জোর কদমে নিজেকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করছে। তবে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী যে-কোন আক্রমণকারীকে বিধ্বস্ত করতে সক্ষম।

তিনি আরো বলেন, পাকিস্থান আবার প্রস্তুত হচ্ছে। অনেক রাষ্ট্র থেকে সে অস্ত্র-শস্ত্র পাচ্ছে এবং সে তার সশস্ত্র বাহিনীকে সম্প্রসারিত করছে। সাধারণভাবে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে প্রস্তুতি দরকার পাকিস্থান তার থেকে অনেক বেশি করছে।

তিনি বলেন, ভারতীয় বাহিনী সতর্ক রয়েছে, তারা যে-কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় প্রস্তুত। যে-কোন দেশ ভারতের আঞ্চলিক সংহতি ক্ষুন্ন করার সাহস করবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত তাকে চরম আঘাত হানবে। ভারতের বিরুদ্ধে যদি আক্রমণ হয়, তাহলে ১৯৫১ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

১৯৫১ সালে পাকিস্থান ভারত আক্রমণ করে। সেই আক্রমণের পরিণতিতে প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্থানে তার একলক্ষ সৈন্যকে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম পাকিস্থানে পাঁচ হাজার বর্গ মাইলের বেশি এলাকা দখল করে নেয়। সকল রাজ্যের লোক নিয়ে গঠিত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এক বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়।

২৮ শে মার্চ ১৯৫৬।

প্রধান মন্ত্রী বলেন: বাইরের বিপদ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে আমরা মনে করেছিলাম বিপদ একদিক থেকে আসতে পারে। কিন্তু এখন যে-কোন দিক থেকে—পাহাড়, সমতল ভূমি অথবা সমুদ্র—এই বিপদ আসতে পারে। কিন্তু ভারত কখনো কোন চাপের নিকট মাথা নত করেনি এবং ভবিষ্যতেও করবে না।

তিনি বলেন, বিশ্বের কোন কোন শক্তিশালী দেশ ভারতের ঘটনাবলীর কথা আলোচনা করছে, যেমন অতীতে এদেশের সংবাদপত্র-গুলো করত। এরা দেশের এমন চিত্র তুলে ধরেছে যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। কোন কোন লোক এবং দেশ আমাদের সমালোচনা করছে। তারা আমাদের দেশের সমালোচনা করার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সমগ্র বিশ্বই আমাদের বিরুদ্ধে।

বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক, জোট নিরপেক্ষ এক আফ্রিকার দেশগুলো ভারতের পরিস্থিতির উপলব্ধি করেছে ; যে সব দেশ ভারতের সমালোচনা করছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ঠিক যেমন দরিদ্রের প্রতি ধনীদের দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এসব নিয়ে ভারত মাথা ঘামায় না।

ভারতকে তার নিজের পথ বেছে নিতে হবে, জাতিকে শক্তিশালী করতে হবে, কারণ একমাত্র শক্তিশালী হলেই ভারত অপরের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারবে। আমাদের বিপদে কেউ আমাদের সাহায্য করবে না।…ভারতের শত্রু হচ্ছে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক এবং কয়েকটি বাইরের দেশ। তবে ভারত এরূপ অনেক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, তিনি ভারতের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চান। গণতন্ত্রের অর্থ শুধু নির্বাচন নয়। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে দায়িত্ব তা সহর এবং গ্রামের প্রতিটি মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রকৃত গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, যেখানে জনগণের ইচ্ছাই প্রাধান্য পাবে। কিন্তু সেই অধিকারের সঙ্গে ভারত যাতে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারে সেই দায়িত্ব বোধও থাকা চাই।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু লোক জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল বলে তাঁদের এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। একটা বাড়ি গড়তে হলে অনেক সময় লাগে, কিন্তু খুব অল্প সময়েই তাকে ধ্বংস করা যায়। তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা দেশকে রক্ষা করার জন্যেই করা হয়েছে এবং জনসাধারণ যখন সেই ব্যবস্থা স্বীকার করে

নিয়েছেন তখন প্রমাণিত হয়েছে যে, সেই ব্যবস্থা সঠিক।

ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলেই আজ সে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, রাজনৈতিক স্বাধীনতা দ্বারা কত সংখ্যক দরিদ্র এবং নিপীড়িত মানুষ উপকৃত হয়েছে। এই সব মানুষের ভাগ্যের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা পাকা হবে না। ...দারিদ্র জাতিকে দুর্বল করে' সুতরাং দারিদ্রকে নির্মূল করতে হবে। যদিও দারিদ্র দূর করার মত ভারতের সামর্থ নেই—তথাপি ভারতের অবস্থা নিশ্চয়ই অতীতের চেয়ে অনেক ভাল। এখন আমরা আমাদের গরীব এবং অবহেলিত দেশবাসীকে সাহায্য করতে সক্ষম।

নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র কৃষক, নিপীড়িত জনসাধারণ এবং ছাত্রদের সাহায্য করা। সরকারী পর্যায়ে এই কর্মসূচীর রূপায়ণ চলছে। কিন্তু তাতে জনসাধারণেরও অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রত্যেকেরই উচিত নিজের স্বার্থের ওপরে দেশের স্বার্থকে স্থান দেওয়া। একমাত্র তাহলেই দেশের উন্নতি হতে পারে। আমাদের পথ সোজা নয়, এবং আমরা যতই এগিয়ে যাবো আমাদের সামনে আরো বেশি অসুবিধা আসবে। আমরা যদি সেই বোঝা এবং অসুবিধা সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে পারি তাহলে দেশও এগিয়ে যাবে।

যারা ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে, তারা দেশের শত্রু। সামাজিক দুর্নীতি নির্মূল করে সমাজকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের সঙ্গে শেখ আবদুল্লার বোঝাপড়া সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে কাশ্মীরে কংগ্রেস ও জাতীয় সম্মেলনের একযোগে কাজ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে ঝগড়া করতে চায় না, রাজ্যের জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে তার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চায়। দুই পক্ষেরই ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু দুই দল যদি এক-সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করে তাহলেই কেন্দ্র-আবদুল্লার চুক্তি সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

গুর্জর সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনসাধারণ যদি শৃঙ্খলাপরায়ণ হন, তাহলে দেশে সর্বাঙ্গীন উন্নতির অধ্যায় আরম্ভ হবে।

তিনি বলেন, জম্মু-কাশ্মীর একটি সীমান্ত রাজ্য এবং অতীতে এর ওপর বাইরের আক্রমণ ঘটেছে। দেশের সংহতি এবং ঐক্য রক্ষার ব্যাপারে এই

রাজ্যের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

ভারত কোন দেশের সঙ্গে বিরোধ করতে চায় না, কিন্তু সে অন্য কোন দেশের চাপ সহ্য করতেও প্রস্তুত নয়। ...ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি করছে। কোন বাইরের শক্তি যাতে তার মত ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে সেইজন্যেই ভারতকে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে।

২০শে এপ্রিল ১৯৫৬ (সংবাদ)।

ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে শেষ বৈঠকের পর পুরো এক বছর অতিক্রান্ত প্রায়। অবশেষে আবার বৈঠকের জন্যে জমি তৈরী হচ্ছে। জানা গেল, দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে ইসলামাবাদ প্রস্তুত।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বরের যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের জন্মের সাত মাস পরে জুলাই মাসে সিমলা শীর্ষবৈঠক বসে। তারপরও বিভিন্ন পর্যায়ে দুদেশের মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। এই সব আলোচনায় দ্বি-পাক্ষিক কিছু সমস্যা মেটাতে, যেমন যোগাযোগ, বাণিজ্য ইত্যাদি আবার শুরু করার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক চুক্তি পর্যন্ত এগিয়েছিল।

কিন্তু যে কোন কারণেই হ'ক এসব চুক্তি শেষ পর্যন্ত কাগজের পাতাতেই থেকে গেছে, ফল দেয়নি। না চলেছে বিমান, না চালু হয়েছে ডাক-তার ব্যবস্থা। আর বাণিজ্য বলতে গত বছর ভারত পাকিস্থান থেকে দু-লক্ষ গাঁট কাপড় কিনেছিল মাত্র।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এবারের বৈঠকের ভবিষ্যৎ কিছুটা উজ্জ্বল। পাক প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিরুদ্ধে 'আকাশ মামলা' তুলে নিতে রাজি। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীও বিনিময়ে আভাস দিয়েছেন যে, ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুণঃস্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত।

সিমলায় শীর্ষ বৈঠকে বসে অবধি পাক প্রধানমন্ত্রী কুটনৈতিক সম্পর্ক পুণঃ স্থাপনের জন্যে চাপ দিয়ে আসছে। এতদিন ভারত বলেছে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ভালোয় ভালোয় মিটলে তবেই কূটনৈতিক সম্পর্ক আর হাই-কমিশনার বিনিময়ের কথা উঠতে পারে, তার আগে নয়।

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে কূটনীতির দিক থেকে নয়াদিল্লীর প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। চীনের সঙ্গে দূত বিনিময়ের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছনোর পরই পাকিস্তানের দিকে

ভারত হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবে, একটা বিষয়ে নয়াদিল্লী এখনও ক্ষুব্ধ। সেটা হল পাকিস্তানের ভারত বিরোধী প্রচারে ভাঁটা পড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অথচ সিমলা চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা ছিল একের বিরুদ্ধে অন্যের বিষোদ্গার বন্ধ করতে দুই দেশের সরকারই সব রকম ব্যবস্থা নেবেন।

কিন্তু বাংলা দেশে ভারত বিরোধী জিগির তুলতে ইসলামাবাদ সদা ব্যস্ত। কাশ্মীর প্রশ্নেও পাকিস্তান একহাত নিতে চাইছে। গত বছর যখন জানা গেল প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীরের নতুন রাজনৈতিক গঠন নিয়ে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে বোঝা-পড়ায় পৌঁছেছেন তখন পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো নিজে কাশ্মীরিদের হরতাল করতে ডাক দিয়েছিল। অবশ্য সে ডাক কাশ্মীরিরা শোনেনি। ডাক নিষ্ফল হলেও পাকিস্তানী প্রচার কিন্তু থামেনি। তারা সমানে সমগ্র মুসলমান জগতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিষিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৬।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর হাতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, সব সময়েই মনে রাখা দরকার আমাদের দেশটা বিরাট। একে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও কঠোর শ্রম—অবশ্য প্রয়োজন। বিরাট এই দেশের সামনে নানাদিক থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা, কাজেই আমাদের সদা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে ছোট-খাট বিষয়ে যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, শান্তিপূর্ণ ভাবেই তার মীমাংসা করা উচিৎ। বিভেদের মধ্যে ঐক্য—ভারতীয় জীবনযাত্রার এ-এক উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। একথা মনে রাখা দবকার।

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৬।

পিণ্ডির রণসাজে মারকিন মদত: ৯০ কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির তোড়জোড়।

…তবু, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ভারত সরকারের নীতি।

অবশ্য এই নীতি সব সময়েই যে সফল হয়েছে একথা বলা চলে না। এবং তার কারণ খুঁজে বার করাও খুব একটা কঠিন কিছু নয়।

এক হাতে যেমন তালি বাজেনা, ঠিক তেমনি এক হাতে করমর্দনও সম্ভব নয়। এই বাস্তব সত্য। কিন্তু এই সহজ কথাটাই সব বিদেশী ধুরন্ধর

রাজনীতিকেরা বোঝেন বলে মনে হয় না, অথবা বুঝলেও না বোঝার ভাণ করেন—হয় তো বা করতে বাধ্য হন।

ফলে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী কোন দেশের মতভেদ বা বোঝাবুঝি হলে সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেই দোষী সাব্যস্ত করার একটা প্রবণতা কিছু বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের আছে।

গত কয়েক বছরে এই প্রবণতা কমার পরিবর্তে আরও বেড়েছে। ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে দেশে রাজনৈতিক স্থিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতের স্বভাব-সমালোচকেরা এ বিষয়ে আরো বেশি করে মুখর হয়ে উঠেছেন।

১৯৫২ সালে ভারত-পাক সম্পাদিত সিমলা চুক্তিকে মুখে স্বাগত জানালেও তার জন্যে ভারতকে তার প্রাপ্য প্রসংশাটুকু দিতে কৃপণতা করেছেন।

মধ্যে বিরতি তার পর আবার নতুন উৎসাহে ভারতের সমালোচনা আবার সুরু হয় ১৯৫৪ সালেব মে মাসে রাজস্থানের পোখরাণে পারমাণবিক পরীক্ষার পর (অবশ্যই এই পরীক্ষাপর্বের গোপণীয়তা মর্মপীড়ার কারণ। যদি…)।

তখন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, তার আচরণে প্রতিবেশী সব দেশ সন্ত্রস্ত।

এই অপপ্রচার যদি বিবৃতি বা বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ থাকতো তাহলে বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটতো না। কিন্তু তা হয়নি। এই অপপ্রচারকে উপলক্ষ করে এই উপমহাদেশে বিদেশী অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। মারকিন সরকার আবার পাকিস্তানকে মারণাস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীন দরাজ হাতে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে (পাকিস্তানের মত এত চীনা অস্ত্র পৃথিবীর আর কোন অ-কমিউনিষ্ট দেশ পায়নি)। দিয়েছে এবং দিচ্ছে আরো অনেক দেশ।

এই অস্ত্র আমদানির অবশ্যম্ভাবী ফল এ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা। অনিচ্ছা সত্বেও ভারত সরকারকে এই নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হচ্ছে, তার প্রতিবিধানের জন্যে তৈরি হতে হচ্ছে। ফলে উন্নয়নের কাজে দেশের সম্পদ ও প্রচেষ্টার ষোল আনা নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না।

গত কয়েক সপ্তাহে (৩০।৪।৫৬ ভারত সরকার এমন কয়েকটি পদক্ষেপ করেছেন, তাতে মনে হয় এবার এই অপপ্রচারের মূলচ্ছেদ হবে। অবশ্য সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সমান নয়।

শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের শত অপপ্রচারেও অবনতি

হয়নি। তবু ভারত সরকারের এই নতুন প্রচেষ্টা থেকে এই দেশ দুটোকেও বাদ দেওয়া হয় নি।

ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ১,৪৭৪ কিলোমিটার সীমান্ত চিহ্নিত করার বিষয়ে দুই দেশের ঐক্যমত হয়েছে এবং সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুই দেশের প্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট সব মানচিত্রে সাক্ষর করেছেন। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সীমান্ত চিহ্নিতকরণের কাজ সুরু হয় ১৯৫৮ সালে।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে বেশ কিছু দিন আগে। এই উদ্দেশ্যেই কাছতিভুর ওপর শ্রীলঙ্কার দাবী ভারত সরকার মেনে নিয়েছিলেন।

সম্প্রতি ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণের জন্য যে চুক্তি হয়েছে তাতেও এই চেষ্টা পরিস্ফুট। বস্তুত এই চুক্তির পর ভারত-শ্রীলঙ্কার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অমীমাংসিত বিষয় থাকল না।

নেপালের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টাও নতুন নয়। নেপালের মহারাজার ভারত সফরের সময় খোলা-খুলি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছিল।

কিন্তু সিকিমের ভারত অন্তর্ভুক্তিকে কেন্দ্র করে আবার দু' দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভারত সফরের ফলে আবার দু'দেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে মনে হয়।

নেপাল স্থলবন্দী দেশ; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার অন্যতম প্রধান দাবী সমুদ্রে প্রবেশাধিকার। রাষ্ট্র সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে স্থলবন্দী রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা সম্পর্কে সম্মেলনে ভারত সরকার এই অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উপকূলবর্তী দেশগুলোকে এই প্রবেশ পথ দিতে হবে, তবে প্রবেশ পথের ওপর তাদের সার্বভৌমত্ব থাকবে না।

ব্রহ্মদেশ-শ্রীলঙ্কা ও নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্যে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থায় রাজী হয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে তাদের গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে তাঁরা আরও অনেক দূরে গেছেন। এর একটা কারণ অবশ্যই যে পাকিস্থানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ হবে না।

গত বছর মে মাস থেকে সিমলা চুক্তি কার্যকর করা সম্পর্কে দুদেশের আলোচনা বন্ধ আছে এবং ভারত পাকিস্তান সম্পর্কে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি

হয়েছে। ইতিমধ্যে অবশ্যই দুদেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু নিছক সুসম্পর্কের খাতিরে ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে পঁচিশ কোটি টাকার তুলো কিনলেও তার বদলে পাকিস্তান ভারত থেকে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস কিনেছে। কার্যত বাণিজ্য চুক্তির উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছে।

এই অচলাবস্থা ভাঙবার জন্যে ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রে জানিয়েছেন, বিমান চলাচল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়, এমনকি কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন, সম্বন্ধেও ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় রাজি।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে কিভাবে ধাপে ধাপে এগুতে হবে সিমলা চুক্তিতে তা বিশদভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। তার ব্যতিক্রম করে এতদিন পাকিস্তান চেয়েছে শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে।

কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, আসন্ন ভারত পাকিস্তান বৈঠকে যেন মনে রাখা হয় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর-জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার পর ভারত ও বাংলাদেশের পুরানো সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ নেই। বাংলা দেশের পরবর্তী দুই সরকারই বলেছেন, তাঁরা ভারতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখায় আগ্রহী। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তাঁদের ঘোষণা ও আচরণে বিরোধ দেখা গেছে। ভারত সরকার স্বভাবতই উদ্বিগ্ন।

কিন্তু এই উদ্বেগের মধ্যেও ভারত সরকার তাঁদের মিত্রসুলভ মনোভাবের ও মীমাংসার আগ্রহের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।

মাত্র চার-পাঁচ সপ্তার মধ্যে প্রতিবেশী সব কটি দেশ সম্পর্কে মৈত্রীবহ এই আচরণ আকস্মিক হতে পারে না। এই উপমহাদেশের মুখ্য রাষ্ট্র ও ধারক শক্তি হিসাবে ভারতের প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর এদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার সুরু হয়েছে তা বন্ধ করা নিশ্চয়ই এই আচরণের একটা উদ্দেশ্য। তার নিরপেক্ষ ও সকলের সঙ্গে বন্ধুতার নীতি নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

৮ই জানুয়ারী ১৯৭৬।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে সব বাধা বিঘ্ন তৈরির খেলা চলছিল, তা বন্ধ করার জন্যেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

যদি ওই সব প্রয়াস সফল হ'ত তাহলে ভারতে গণতন্ত্রের অবসান ঘটতো। এদেশেও বাংলা দেশ ও অ্যাঙ্গোলার পরিস্থিতি দেখা দিত।

গোষ্ঠি নিরপেক্ষ নীতির অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে এব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব রয়েছে। এই নীতিকে শক্তিশালী করার এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী শক্তির সার্থক মোকাবিলার দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। ...আমাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতি একই মুদ্রার দুই দিক।

কায়েমী স্বার্থ ও ঔপনিবেশিক শক্তি অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকে হস্তক্ষেপ করেছে। এই সব শক্তিই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করায় সচেষ্ট। প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টির কাজেও এই সব শক্তি সক্রিয়। বাংলা দেশে ভারত বিরোধী জঘন্য প্রচার চালান হচ্ছে। এই সব প্রচারের উদ্দেশ্য হল, সন্দেহ সৃষ্টি করে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে প্রতিবেশীদের মধ্যে আস্থা জাগানো— তাদের দুর্বল করে দেওয়া।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক লক্ষ্য হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪ই মে ১৯৫৬।

শেষ পর্যন্ত বাধার প্রাচীর ভাঙ্গলো। ইসলামাবাদে ভারত-পাকিস্তান দু' পক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। বিষয়ঃ ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। এখন চুক্তি কার্যকর করার পালা।

বাবুনের ডাক শুনতে পেলাম। ওর কথা। বলল, 'আচ্ছা ভাই, মাঝে মাঝে তোমার কি হয় বলতো?'

বললাম, 'আমি তো তোমার কথাই শুনছিলাম দাদু।'

প্রতিবাদ করল ও। বলল, 'মোটেই তুমি আমার কথা শোননি। তুমি কিছু ভাবছিলে। কি এত ভাবো বলতো?'

'ভাববো কেন, কিসের ভাবনা আমার।' হাসলাম আমি।

'হেস না।' বলল ও। 'আমি জানি তুমি ভাব। কি ভাব তাও জানি।'

'কি ভাবি?' একটু যেন গলাটা কেঁপে উঠল আমার।

'বলবো?'

'বল।' বলেই শঙ্কিত হলাম। যদি ও সত্যি সত্যিই বলে আমি কি এত

চিন্তা করি।

আমার শঙ্কাটাই সত্যে পরিণত হল। প্রথমে অঙ্গীকার করিয়ে নিল আমাকে। বলল, 'বল একথা কাউকে বলবে না ?

বললাম, 'কাউকে বলার দরকার কি আমার ?'

'ঠিক তো ?'

'ঠিক।'

'তুমি আমার বাবার কথা ভাব।'

'বাবুন !'

'তুমি আমার মামার কথা ভাব।'

'না—না।' যেন চিৎকার করে উঠতে চাইলাম আমি। কি বলছে ওই শিশু ? কেমন করে জানল। ও .....

বাবুন বলল। একটু যেন কাঁপা ওর গলাটা, 'আমি সব জানি—সব।'

আমি নির্বাক। নীরবে বসে আছি। বুকের মধ্যে একটু যেন যন্ত্রণা অনুভব করলাম। বাবুনের মুখের দিকে চেয়ে যন্ত্রণাটাকে 'অনেকদিন ভুলে-ছিলাম। যার জন্যে ভুলে থাকা সেই আজ......। ভাবতে পারলাম না।

বললাম, 'এসব কথা তুমি কোথায় জেনেছো ?'

আমার প্রশ্নের ধরনে বাবুন তার ভাসা ভাসা দুচোখের দৃষ্টি দিয়ে একটু দেখল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার মা বলেছে।'

'তোমার মা ?' আমি কি ভুল শুনছি। একি বলছে বাবুন! সরমা তার ছেলেকে···

ঘাড় নাড়ল বাবুন। বলল, 'মা সব বলেছে আমাকে। আমি আমার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মামার ছবিতে মালা দেওয়া হয় কেন সে কথা বলতে, মা আমাকে মামার কথাও বলেছে।'

সরমার কথা চিন্তা করলাম। একি করছে সরমা ? ইচ্ছা হল ডাকি। ডেকে বলি কিছু।

বাবুন বলল, 'আচ্ছা ভাই ?'

আমি ওর দিকে চাইলাম।

'আচ্ছা, যুদ্ধ ভাল না খারাপ।'

ওকে দেখলাম আমি। উত্তরের অপেক্ষায় আমার দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম কি জানতে চায়। তবু বললাম, 'তোমাদের স্কুলে টিফিনে যে যুদ্ধ-যুদ্ধ......'

'না—না।' অধৈর্য শোনাল ওর গলা। বলল, 'না, সত্যিকার যুদ্ধ ?'

কি বলব ভাবছি। ভাবছি ওর মনের কথা জানি না বলেই। তার আগে, শুনলাম, 'না ভাই যুদ্ধ ভাল নয়।'

মনে মনে স্বস্তি পেলাম। কিন্তু আজ যুদ্ধের দামামা পৃথিবীর বহু দেশে। অভ্যুত্থান—পাল্টা অভ্যুত্থান। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের ঘটনাবলীর কথা মনে পড়ল। রক্তক্ষরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে জাতীয় উত্থান, আজ কি হচ্ছে সেখানে ?

শুধু 'তাই নয়—যে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছে—গড়ে দিতে সহায়তা করেছে দেশকে, সেই ভারতের প্রতি, দেশের নেত্রীর প্রতি অপপ্রচারের অন্ত নেই। ভারত বিদ্বেষ প্রচার আজ বাংলা দেশের একমাত্র কাজ যেন।

মুজিব হত্যার পর বাংলা দেশের শাসন ব্যবস্থায় মধ্য যুগের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। কখনো শান্ত—কখনো অশান্ত। নতুন করে আবার সুরু হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। ৭ই নভেম্বর ১৯৫৫। প্রধান মন্ত্রী বলতে বাধ্য হন :

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঘটনাবলী আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই আমাদের নীতি ; এই নীতি আমরা অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করে চলি কিন্তু আমাদের আঞ্চলিক সংহতি বিপন্ন হওয়ার মত অবস্থার উদ্ভব হলে সে অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ না করে থাকতে পারি না।

২০শে এপ্রিল ১৯৫৬ (সংবাদ)।

মেঘালয়ে ভারত-বাংলা দেশ সীমান্তে বাংলা দেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর একজন রক্ষী আহত হন।

ভারত সরকার এই ঘটনার কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং বিনা প্ররোচনায় গুলি চালানোর এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুতর বলেছেন।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দু-দুবার গুলি চালানো হয় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের লক্ষ্য করে। প্রথমবার ঘটনাটি ঘটে গতকাল সকাল নটায়।

এই ঘটনার খবর পেয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল অশ্বিনী কুমার, সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ইনেসপেকটর জেনারেল (শিক্ষা) ও আর একজন অফিসারকে নিয়ে ঘটনা স্থলে আসেন। ওঁরা নির্দিষ্ট স্থলে পৌছলে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আরও একবার গুলি ছোঁড়া হয়। এবার

গুলি এসে লাগে একজন রক্ষীর গায়ে। তিনি গুরুতর আহত হন।

২৩শে এপ্রিল ১৯৫৬।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর পরিবারের লোকেদের হত্যার নায়ক মেজর ডালিম ঢাকায় ফিরে এসেছেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে আসেননি।

সঙ্গীরা বেনগাজিতে (লিবিয়া) রয়েছে। মেজর ডালিম ফিরে এসেছেন সরাসরি ওয়াশিংটন থেকে।

মেজর ডালিম ঢাকায় ফিরেছেন এবং তাঁর পিতা সামসুল হক তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে আনতে যান। সামসুল হক বাংলা দেশ সরকারের মৎস্য দপ্তরে ডিরেকটর।

এবং—

মেঘালয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বাংলা দেশ থেকে আর গুলি ছোঁড়া হয়নি এপারে। ভারতের প্রতিবাদ লিপির জবাব এখনও আসেনি।

২৭শে এপ্রিল ১৯৫৬।

ঢাকায় সেনাবাহিনীর বড় কর্তাদের মধ্যে আবার ক্ষমতার লড়াই সুরু হয়েছে। ঢাকা, রংপুর, ময়নামতি ও যশোহর সামরিক ছাউনিতে সিপাইরা বিভক্ত।

মুজিব হত্যার পরই জিয়াউর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশ ট্যাঙ্ক বাহিনী বগুড়ায় জিয়ার নিজের জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত দশ-বার দিন ধরে বগুড়া থেকে আবার ঢাকায় দেখা যাচ্ছে। এবার ক্ষমতার লড়াই চলছে এয়ার ভাইস মার্শাল, এম জি তোয়াব এবং সামরিক বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত প্রায় বিশ হাজার সিপাই অফিসার তোয়াবকে সমর্থন করছে।

মুজিবের পলাতক হত্যাকারীরা ঢাকায় আবার। এদের পিছনে বিদেশী রাষ্ট্র। এবং খোন্দকার মোস্তাক, মহাবুল আলমচাষী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর সফিউল আজম—এই গোষ্ঠী। এঁদের জিয়াউর রহমান নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বাস্তবে সে সম্ভাবনা নেই। তাই মোসতাক এবং তাঁর অনুগামীরা চোদ্দজন খুনী মেজরের সাহায্যে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা করছেন।

আর একটা খবর: একাত্তর সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্যে মামুদ আলী, আমিনুল হক চৌধুরী, ত্রিদিব রায়, ক্যাপ্টেন

অজগর হোসেন, শফিকুল ইসলাম, রেজাউল হোসেন রিজভী, অধ্যাপক গোলাম আজম সহ যে উনচল্লিশ জনকে বাংলাদেশ সরকার তখন নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তাদের সবাইকে আবার সে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তোয়াব আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্যে গত জানুয়ারী মাস থেকে মারচের মধ্যে ঝটিকা সফর করেছেন পশ্চিম জার্মানী, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ।

এবং·········

ফারাক্কা নিয়ে দু-দফা বৈঠক হবে—প্রথমে ঢাকায় পরে দিল্লীতে।

১৯৬০ সাল থেকে ফারাক্কা নিয়ে দু' দেশের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী আলোচনা চলার পর অবশেষে চুক্তি হয়েছিল ১৮ই এপ্রিল ১৯৫৫ সালে।

২রা মে ১৯৫৬।

এয়ার মার্শাল তোয়াব পদত্যাগ করেছেন। জিয়াউর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী চায়। আমাদের দেশ ছোট। আর্থিক ব্যাপারে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে। আমরা সব দেশেরই বন্ধুত্ব চাই।

তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে ঢাকার বর্তমান মতবিরোধ সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তাঁর দেশ ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ। এবং চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

৭ইমে ১৯৫৬।

বাংলা দেশে ধর্মীয় রাজনীতিতে আর বাধা নিষেধ রইল না। মুসলিম লীগ, কনভেনসন মুসলীম লীগ, জামাইত ইসলাম, নিজামে ইসলাম, আলবদর, আল-সামমন সহ পনেরোটি রাজনৈতিক দল আবার প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ ফিরে পেল।

রাষ্ট্রপতি এ এম সায়েমের ঘোষণাটির পরই সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উল্লাস ও আনন্দ দেখা দেয়। নিরপেক্ষ দলগুলো হতাশায় মুসড়ে পড়ে।

এবং·········

তোয়াবকে বাংলা দেশ ছাড়তে হল। মাথা নীচু করে নীরবে নিঃশব্দে। কদিন আগে মেজর ডালিমও বিতাড়িত। তার আগের দিন মুজিব হত্যার আর এক নায়ক কর্নেল রসিদও বিতাড়িত।

৯ইমে ১৯৫৬ .

এবার খন্দকার মোস্তাকের দেশ ছেড়ে যাবার পালা। মুজিবের হত্যাকারীরা তাঁকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়ে ছিলেন আগষ্ট (১৯৫৫) মাসে। কিন্তু নভেম্বর মাসে তাঁকে সাধের আসনটি ছাড়তে হয়। আরো ছমাস পরে রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায়। ইতিমধ্যেই তাঁর দুই স্ত্রীর একজন দেশ ছেড়ে লণ্ডনে।

সেই সঙ্গে গ্রামে গঞ্জে সহরে সামরিক বাহিনীর সমর্থন পুষ্ট ডিফেন্স পার্টির লোকজন জোর-জুলুম স্থরু করে দিয়েছে।

গত মার্চ মাসে ঢাকা সহরে সভা করে তোয়াব বলেন: বাংলা দেশের আশি ভাগ লোকই মুসলমান। তাই এটাই বাঞ্ছনীয় যে আমাদের নীতি অভ্যন্তরীণ আর বৈদেশিক—দুটোই ঐশ্লামিক ভাব ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ হবে। এবং বাংলা দেশের বর্তমান নাম তাঁর পছন্দ নয়। এ নামে ঐশ্লামিক গন্ধ কই। অতএব নাম বদল চাই।

তোয়াব নেই কিন্তু সাম্প্রদায়িক জালগুলো আজ সক্রিয়। মূলধন ভারত বিদ্বেষ। উপলক্ষ্য ফারাক্কা।

১০ই মে ১৯৫৬

বাংলা দেশ প্রতিনিধিরা ফারাক্কায় তন্ন তন্ন করে মাপ জোখ নিলেন।

এবং···(ঢাকা ৯ই মে)

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের যে পথ নিয়েছেন, মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানি তার প্রশংসা করেছেন। অবশ্য শ্রীমতি গান্ধীর চিঠির জবাবে মৌলানা বলেছেন, 'ওই সমাধান স্থায়ী ও ব্যাপক হওয়া উচিত। এবং·········'

মৌলানার চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ফারাক্কা ব্যারেজকে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব ভারতের প্রাণ-প্রবাহ কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর একমাত্র পন্থা বলে মনে করা হয়েছে। এটা কোন মতেই বাতিল করা যায় না।

ভবিষ্যতে আমাদের দু-দেশের চাহিদা মেটাতে জলের ঘাটতি দেখা দিলে, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেই সমস্যা সমাধানের পথ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

তাই আমরা এখন দি হুগলী নদীর জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ জল না দিয়েও বাংলাদেশের গঙ্গার জলপ্রবাহ বজায় রেখেছি।

তিনি বলেছেন, কোন বাংলাদেশী কি সত্যি এটা বিশ্বাস করেন—বাংলা

দেশ থেকে যারা অভূতপূর্ব দ্রুততার সঙ্গে তাদের সামরিক বাহিনী সরিয়ে এনেছে, সেই ভারতই তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে বৈরী মনোভাব পোষণ করে?

তাঁর দেশের জনগণ ও সরকার চান যে, বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামে তাঁদের সমর্থন এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাঁদের সহযোগিতার নিরিখে বিচার করা যাক।

ভাসানীর ১৮ই এপ্রিলের চিঠি পেয়ে প্রধানমন্ত্রী যেমন বেদনা অনুভব করেছেন তেমনি বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, একদা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যে মানুষটি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং পরে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির জন্যে দুঃখ এবং ত্যাগের অংশভাগী হতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হননি, সেই তিনি আজ আমাদের এইভাবে ভুল বুঝলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য রূপায়নের আন্তরিকতার সম্পর্কেও এমন কি প্রশ্ন তুলছেন—এটা আমার পক্ষে ভাবতেও কষ্টকর।

প্রতিবেশীদের মধ্যে সময়ে সময়ে সমস্যা দেখা দেয়। তখন কিন্তু সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন তাহল পারস্পরিক বোঝাবুঝি ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সেই সব সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা। আমরা যদি সংঘর্ষ ও শত্রুতার পথ অনুসরণ করি তাহলে তাতে আমরা পরস্পর পরস্পরের ক্ষতিই করব। লাভ কারুরই হবে না।

আমরা আমাদের দিক থেকে এটুকু বলতে পারি যে বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে আমরা বাংলাদেশকে আমাদের সাহায্য দিয়ে যাব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুরোধ উপরোধ এবং যুক্তিপূর্ণ কথায় তাঁর সরকার কান দিতে সব সময় প্রস্তুত। কিন্তু কেউ যেন এটা আশা না করে যে ভারত হুমকির কাছে মাথা নোয়াবে এবং অযৌক্তিক ও অসংগত দাবী মেনে নেবে।

১৩ই মে ১৯৫৬।

ভাসানিকে অভিযান বন্ধ করতে বলুন: ঢাকাকে নয়াদিল্লী।

ভাসানি ১৬ই মে ফারাক্কা অভিযানের হুমকি দিয়েছেন। তিনি রাজশাহীতে পৌছেছেন। রাজশাহী থেকে ফারাক্কা মোটরে ঘণ্টা তিনেকের পথ। রাজশাহীতে লোক যোগাড়ের কাজ এবং উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা পুরোদমে চলছে। অনেক কমিটি গজিয়ে উঠেছে।

ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশে উত্তেজনমূলক অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। ১৬ই মের প্রস্তাবিত ফারাক্কা বাঁধ ভাঙ্গা অভিযানের

[illegible] যে ব্যাপক [illegible] এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশঙ্কা [illegible]
সেটি গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করেছেন ভারত সরকার।

ভারত সরকারের আশা—সীমান্তে যাতে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপ না ঘটে, বাংলাদেশ সরকার নিজে থেকেই তার ব্যবস্থা করবেন। এটা বাংলাদেশ সরকারেরই দায়িত্ব। সীমান্ত লঙ্ঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তা হবে খুবই দুঃখের এবং দুর্ভাগ্যের।

১৪ই মে ১৯৫৬।

ভাসানীর ফরাক্কা অভিযান রুখতে সবরকম ব্যবস্থা।

মৌলানা ভাসানী এবং তাঁর সমর্থকদের প্রস্তাবিত ফরাক্কা অভিযানের মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের কোন নাগরিক যাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন না করে সেটা দেখা বাংলাদেশ সরকারেরই কর্তব্য। ভারত সরকার বিশ্বাস করেন, হুমকি নয়, পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়েই ভারত বাংলাদেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

১৫ই মে ১৯৫৬।

অধিক রাত্রে ভাসানীর মত বদল অভিযান বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ভাসানী মত পাল্টেছেন। তিনি বলেছেন, না, সীমান্ত পার হব না। ফরাক্কা শান্তি অভিযান বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত খবর ছিল ভাসানীর ফারাক্কা অভিষানের তোড় জোড় এগুচ্ছে। কারণ ভারত সরকারের কোন অনুরোধ বাংলাদেশ সরকার কানেই তোলেননি —ভাসানীকে ঠেকাবার কোন চেষ্টাই করেননি।

.১৪ই মে রাত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির জল ও বন্যা সংক্রান্ত সামরিক উপদেষ্টা, নৌবাহিনীর প্রধান মোশারফ হোসেন খাঁ ঢাকায় এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মৌলানার আন্দোলনের প্রতি সরকারের সমর্থনের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন। তাঁর ওই ঘোষণার পর ভাসানীর অনুরোধ রক্ষার জন্যে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে সরকারী উদ্যোগে স্পেশাল ট্রেনে রাজশাহীতে লোকজন আনার ব্যবস্থা করা হয়। বগুড়া, রংপুর থেকেও স্পেশাল ট্রেন রাজশাহী এসেছে। যারা ট্রেনে এসেছে তারা ভারত ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা শ্লোগান দেয়।

গত ১০ই মে পাবনায় এক জনসভায় ভাসানীও ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন।

বিদেশী সাংবাদিকদের থাকবার জন্যে রাজশাহী এবং ভারত সীমান্তের চাইবাসাগঞ্জে টেলিফোনের অফিস খোলা হয়েছে। এবং বাংলাদেশ সরকার হেলিকপটারে কিছু বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ে এসেছেন।

ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল বলেছেন, চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হবে। বাংলাদেশের দিক থেকে সীমান্তে যে কোন হামলার মোকাবিলা করা হবে।

তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে শান্তির সীমান্ত বলে ঘোষণা করার জন্যে ভারত সরকার বহু চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশকে বহুবার একথা বোঝান হয়েছে। কিন্তু সাড়া মেলেনি।

মৌলানার এই অভিযান সার্থক করার জন্যে বাংলাদেশ বেতারও উঠে পড়ে লেগেছে। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা কেন্দ্র থেকে মোশারফ হোসেন খাঁ ও ভাসানীর বক্তৃতা অহরহ প্রচার করা হচ্ছে।

ভাসানী ও তাঁর সমর্থকদের এই অভিযান সম্পর্কে ভারত যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তার উত্তরে বাংলাদেশের কাছ থেকে এ পর্যন্ত সরকারীভাবে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

১৬ই মে, ১৯৫৬।

দস্তগীর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন :

ভাসানী এগোচ্ছেন, সীমান্তে উত্তেজনা।

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত সরকার মৌলানা ভাসানীকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেবেন না।

মৌলানা ১৫ই·মে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে কয়েক হাজার লোককে শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে ভারতের উদ্দেশ্য রওনা করিয়ে দেন। এবং তিনি সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে সীমান্ত থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে নবাবগঞ্জের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন।

মালদায় অশ্বিনীকুমার বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বার করার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা বাংলাদেশ থেকে অনেকে ভারতে ঢুকে পড়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বার করতে সাহায্য করার জন্যে তিনি সীমান্ত এবং অন্যত্র সবার কাছে আবেদন জানান।'

এবং রাজশাহীতে সকালে ভাসানী ও বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে এক প্রস্থ বিবাদ হয়েছে। মৌলানা তার প্রোগ্রাম দুদিন পিছিয়ে দিয়েছেন লোক সংগ্রহের জন্যে।

১৭ই মে ১৯৫৬।

ভাসানী অভিযান প্রত্যাহার করে ফিরে গেলেন।

ভাসানী একদিন আগেই অভিযান প্রত্যাহার করে রাজশাহী ফিরে গেলেন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের দশমাইল ভেতরে শিবগঞ্জে এক জনসভায় ভাসানী অভিযান প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। তবে তিনি হুমকি দিয়েছেন, ১৬ই আগষ্টের মধ্যে ভারত যদি বাংলা দেশকে বেশী জল না দেয় তাহলে তিনি আমরণ অনসন শুরু করবেন। এ ছাড়া বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন (প্রকৃত সত্য বাংলাদেশে সরকারী সমর্থন মিললেও জন সমর্থন তিনি পাননি —সেইজন্যেই অভিযান প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন তিনি। রাজশাহী থেকে শুরুতে সঙ্গী ছিল দশহাজার কিন্তু কংসায় পৌছে সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় সাকুল্যে তিন হাজার)।

২১ শে মে ১৯৫৬।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফারাক্কা সমস্যা আপসেই মিটিয়ে নিতে হবে। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এই সমস্যাটি কোন এক পক্ষের ক্ষতি না করে সমাধান করা সম্ভব নয়—এ কথা ঠিক নয়। আলোচনার মাধ্যমেই উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসা সম্ভব এবং সেটাই করতে হবে। বাংলাদেশ এবং আমাদের অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেক সমস্যাই আমরা এভাবেই মিটিয়েছি।

নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে দু-দেশের সমস্যা এই নতুন নয়। অনেক দেশের মধ্যেই অনুরূপ সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং তার মীমাংসাও হয়েছে। এক্ষেত্রেও না হওয়ার কোন কারণ নেই।

বাংলাদেশ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে চলছে। সেখানে অনেক বিচ্ছিন্ন হাঙ্গামা ঘটছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যারা সেখানে ভারতের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চায় তাদের তৎপরতা সেখানকার সরকারের মদত পায়নি। বরং তাঁরা তা নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন।

ভারত চিরদিনই বাংলাদেশের সঙ্গে সাম্য-ন্যায় ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে।

দু-দেশের মধ্যে গঙ্গাই একমাত্র নদী তা নয়। ব্রহ্মপুত্র এবং আরও কয়েকটি নদী দু দেশের ওপর দিয়ে বহে গিয়েছে। বাংলাদেশের চিরন্তন সমস্যা হল বন্যা। আর এই উপমহাদেশের অনেক জায়গাতেই গ্রীষ্মকালে জলাভাব ঘটে। এরই ফলে হুগলী নদীতে পলি জমে। কলকাতার বন্দরের পক্ষে যা ক্ষতিকারক। ফারাক্কা বাঁধ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হল হুগলী নদীর নব্যতা রক্ষা, কলকাতা

মহানগর ও তার বাণিজ্যকে বাঁচানো।

তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মীমাংসার জন্যে তৃতীয় পক্ষের কোন প্রয়োজন নেই। মীমাংসার সেরা পথ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ সক্ষম।

এবং একটি সংবাদ:

নয়াদিল্লী, ২০ শে মে ১৯৫৬।

পাটশিল্পের বহুল বিজ্ঞাপিত সমস্যা নিয়ে আগামী দুদিন কলকাতায় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। পাটশিল্পের শিল্পপতিরা গত কয়েক মাস ধরে এই বৈঠকের প্রস্তুতি চালিয়েছেন। এবং আশা করা যায় যে, এই বার্ষিক সভায় তাঁরা তাঁদের অভ্যস্ত কাঁদুনি গাইবেন।

গত দুবছরে এই শিল্পটি সরকারের কাছ থেকে এত বেশি পরিমাণ সুবিধা আদায় করে নিয়েছে যা এই শিল্পের আগের পঁচিশ বছরের ইতিহাসে আর ঘটেনি। পাট-শিল্পপতিদের শুধু সব রকম রপ্তানী শুল্কই মুকুব করা হয়নি, উপরন্তু কয়েকটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নগদ ভরতুকিও দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বছরে কেন্দ্রীয় তহবিলের ত্রিশ কোটি টাকারও বেশি টাকা ক্ষতি হচ্ছে।

এ ছাড়া, শিল্পপতিদের সুবিধার জন্যই বহুবছর ধরে কাঁচা পাটের দাম এবং পাটশিল্পের উৎপন্ন পণ্যের দামের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রেখে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশী ক্রেতারা আমাদের দেশের রপ্তানীকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের ক্রয় আটকে রেখেছে। ফলে পাটকলগুলিতে মজুত মালের পাহাড় জমেছে এবং সেখানে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কয়েকটি মিল বন্ধ হয়ে গেছে (ইতিমধ্যে আরও হয়েছে) এবং একুশ হাজার কর্মী বেকার হয়েছেন। এগুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য কাঁচা পাটের যোগানে ঘাটতির অনুযোগ করা হয়েছে।

এই সমস্ত অসুবিধাগুলির বোঝা শ্রমিক এবং পাট চাষীদের ঘাড়ে না চাপিয়ে মিল মালিকরা নিজেরাই কি সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না?

মিলগুলির অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজদের কাছ থেকে পাটকলগুলি কিনে নেওয়ার পর মিলমালিকরা কেবল চেষ্টা করেছেন সহজে মুনাফা লুটতে (শুধু তাই নয়, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা অর্থের বিনিময়ে যে শ্রমদান করতে বাধ্য হয় তার তুলনা আর কোন শিল্পের সঙ্গে মিলবে কিনা সন্দেহ এবং অপদার্থ স্বজন পোষণের নজির এই শিল্পেই বেশি পাওয়া যাবে। যোগ্যতার মাপ-

কাঠি এ শিল্পে অচল—বিশেষ করে পরিচালন ব্যবস্থায়)। এই শিল্পের ক্ষেত্রে কোন গবেষণা বা আধুনিকীকরণের চেষ্টাই হয়নি।

পাট শিল্প যে ভাবে চালানো হচ্ছে তাতে যোজনা কমিশনও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কমিশনের কয়েকজনের মত, কাঁচা পাট ও পাটশিল্পের যাবতীয় বাণিজ্য অধিগ্রহণ করাই হল এর একমাত্র সমাধান।

মিলগুলির কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তকেই মিলমালিকরা সবচেয়ে বেশি ভয় পান। কারণ, এই শিল্পের মালিকদের অনেকেই আবার কাঁচা পাটেরও ব্যবসায় করেন এবং দুই শিল্প থেকে যে প্রচণ্ড মুনাফা হয় তা সুকৌশলে সরিয়ে নিয়ে মুনাফাকে নিম্নতম স্তরে নির্দেশ করা হয়।

একটু চমকে উঠেছিলাম। অনেকদিন পরে এলেন। এভাবে যে আসতে পারেন—ভাবিনি। আসলে ওঁর কথা ভাবতে ভুলে যাচ্ছিলাম ক্রমশ। শুধু একটা দুশ্চিন্তা জেগে উঠতো মনে। একটা মানুষ ধীরে-ধীরে নয়-হঠাৎই দূরে সরে গেলেন। কি কারণে, সেটাই জানা হয়নি।

শিশির হালদার হাসি মুখেই বললেন, 'বাজার যাচ্ছিলাম।'

ভদ্রলোক এ পথও পরিত্যাগ করেছিলেন। বললাম, 'বসবেন এখন ?'

'কাগজটা একটু দেখব।' উঠে এসে বসলেন। পাশে কাগজটা ছিল টেনে নিলেন।

আকাশটা মেঘলা। কদিন অসহ্য গরমের পর-পর বৃষ্টি হয়েছে। আজ ভোর থেকেই সূর্যের মুখ মাত্র কবার দেখা গেছে ক্ষণিকের জন্যে। আমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'একটু চা দিতে বলি ?'

'এখন থাক।' কাগজ পড়তে পড়তেই উত্তর দিলেন শিশির হালদার।

রাজেন চৌধুরীর কাছে শুনেছিলাম তিনি শিশির হালদারের সঙ্গে কবার দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা হয়েছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের কি যেন একটা পরিবর্তন এসেছে মনে হয়েছিল তাঁর।

হঠাৎ মেঘলা আকাশ থেকে এক ঝলক রোদ সন্তর্পনে নেমে এল। বারান্দায় এসে পড়ল একটু। দেখলাম। আবার রোদ চলে গেল। সরমা বাবুনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে। কদিনেই ফোড়া উঠেছে বাচ্চাটার। বাবুন থাকলে রোদের এই লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠতো নিশ্চয়ই।

'বলুন, কি ভাবছেন ?' বললেন শিশির হালদার।

কথাবলার ধরনে হেসে ফেললাম। বললাম, 'এ বয়েসে চিন্তাই সার।'

'আমারও ফিফ্‌টি ফাইভ।'

'তবু অনেক জুনিয়ার বয়েসে আমার চেয়ে।'

'বাড়ির সব গেল কোথায় ?'

'কাছেই—ডাক্তারের কাছে।'

'কিছু··················।'

'বাচ্চাটার ফোড়া হয়েছে কটা। একটা বিরাট বড়। ভীষণ যন্ত্রনা পাচ্ছে।'

'খুব কষ্ট। ছোট বেলা আমারও বছর বছর হোত। আপনার ?'

'জ্ঞানতঃ হয়েছে মনে পড়ে না।' কথা বলছি। দেখছি ভদ্রলোককে। মনে হচ্ছে কিছু বলতে চান—সঙ্কোচ বাধা দিচ্ছে।

হঠাৎ বললেন, 'কদিন আমারও যেন কি হয়েছিল।'

কথা না বলে নীরবে চাইলাম আমি।

'বিশ্বাস করুন, ঠিক বোঝাতে পারবো না; একটা কিছু হয়েছিল। কেমন যেন সব কিছু ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। একটা বিশ্রী দিশাহারা ভাব। আমার লাইফে এই প্রথম। মানে পর পর কটা ধাক্কায়, আমি যেন কেমন সব কিছু থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিলাম। এখন অবশ্য অনেকটা সামলে উঠেছি।'

'ডাক্তার···।'

'না-না, ডাক্তার নয়।' বাধা দিলেন শিশির হালদার। 'কোন অসুখ হয়নি আমার।'

চুপ করে রইলাম।

'কি যে হয়েছিল তাই বুঝতে পারলাম না।'

'আপনার মেজ ছেলে··।'

'হ্যাঁ, কারখানা বন্ধ। ওর দাদার বন্ধুর কি সব কাজ করে। অনেক ঘুরতে হয় শুনলাম।'

'খাটতে হয়।'

'হ্যাঁ-খাটুনি আছে। বড়টাও হঠাৎ কিছু করছে। ভবিষ্যৎ জানি না।'

হেসে ফেললাম। বললাম 'ভবিষ্যতের চিন্তাটা ওদেরই করতে দিন না।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিশির হালদার স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। মৃদু কণ্ঠস্বরটা কানে এল আমার। বললেন, 'আশ্চর্য!'

'কিসের আশ্চর্য বলছেন ?'

'ও-একটা আছে।' হাসলেন তিনি। বললেন, 'এবার আমি উঠবো।'

'বাজার ?'

'হ্যাঁ। একটু চড়েছে কিন্তু পাওয়া যায় সব।'

বারান্দা থেকে নামলেন তিনি। বললেন, 'সন্ধ্যায় আসবো।'

আসবেন, বলে, বিদায় দিলাম। চলে গেলেন তিনি।

কিছুদিন আগের একটা রবিবারের সকালকে মনে পড়ল আমার। রাজেন চৌধুরী আর আমি বসে কথা বলছিলাম। দু'হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে বারান্দায় উঠে এসেছিলেন শিশির হালদার।

রাজেন চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাজার করলেন ?'

'হ্যাঁ, বাজার করে ফিরলাম।' হাসি মুখে বলেছিলেন শিশির হালদার।

'খুব খুশি দেখছি আপনাকে ? কি ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ, এবার আমি খুশি।'

'এবার আপনি খুশি মানে ?'

'দীর্ঘ কবছর পরে এবার মানুষ সত্যি-সত্যিই খুশি।'

হেঁয়ালীটা বুঝতে পারেন নি রাজেন চৌধুরী। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'বুঝতে পারলেন না ?'

'কি করে বুঝবো বলুন।'

'বাজার করেন ?' একটু গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন শিশির হালদার।

'বাজার করি বলতে ?'

সংসারের কেনা কাটা আপনি করেন না, ম্যাডাম ?'

'না-না, তিনি করবেন কেন ? তিনি প্রকৃতই গৃহবাসিনী।'

'তাহলে আপনার বোঝা উচিৎ ছিল।

বাতাসে যেন কিছু খুঁজেছিলেন রাজেন চৌধুরী। ব্যর্থ হয়ে বলেছিলেন, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার করুন মশাই।'

'আমাকেই কবতে হবে ?' জুত করে একটিপ নস্যি নিয়েছিলেন শিশির হালদার।

রাজেন চৌধুরী একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন।

আচমকা শিশির হালদার বলেছিলেন, 'যে সিগারেটটা খাচ্ছেন দাম কত ?

'এটা—এটা দশ পয়সা।'

'দাম ছিল কত ?'

'দশ পয়সাই।'

'দাম বাড়ে নি ?'

'দাম বাড়বে কেন ?'

এবার অনেকটা সহজ হয়েছিল শিশির হালদার। হাসি ফুটেছিল মুখে। বলেছিলেন, 'এবার একবার বিগত বছরগুলোর দিকে দয়া করে ফিরে তাকান চৌধুরী মশাই।'

রাজেন চৌধুরীর অসহায় অবস্থাটা কাটেনি। ধরান সিগারেট হাতে পুড়ছে। তিনি চেয়ে আছেন শিশির হালদারের দিকে।

শিশির হালদারের কণ্ঠে আবার কৌতুকের ছোঁয়া। বলেছিলেন, 'জাতীয় উৎসব কাকে বলে জানেন ?'

'তা জানবো না কেন ?'

'এবার বলুন তো ভারতবর্ষের মানুষের সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব কোন মাসে পালিত হয়। কতদিন আগে স্বরু হয়। শেষ হতে কত দিন লাগে ?'

রাজেন চৌধুরী এবার সত্যি সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন। আমার দিকে একেবার চেয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে স্কুলের পড়ুয়া শিশু ভেবেছেন কিনা বলুন তো ?'

'বিশ্ব সংসারের নিরিখে আমাদের বয়েস বাড়লেও আমরা শিশুই চৌধুরী মশাই।'

'আরে রাখুন মশাই বিশ্বসংসারের কথা। সোজা কথাটা—গোদা বাংলায় স্পষ্ট করে বলুন দেখি।'

গম্ভীর ভাবে আরো একটিপ নস্য নিয়েছিলেন শিশির হালদার। মুচকি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'আর কদিন পরে বাজেট বলুন তো ?'

'কেন আগামী সপ্তাহে।'

'এবার বাজারে সব কিছু পাচ্ছেন কি ?'

'হ্যাঁ—তা পাচ্ছি।'

'আগে কোন দিন পেতেন এভাবে ?'

সত্যি তো—স্বীকার করেছিলেন রাজেন চৌধুরী। প্রতি বছর বাজেটের মাস খানেক আগে থেকেই বাজারের দর বাড়ে। অতি প্রয়োজনীয় কিছু কিছু জিনিস লোপাট হয়ে যায় বাজার থেকে। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। দর

বাড়া তো দূরের কথা—সব জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। অভাবনীয় কাণ্ড! কি করে সম্ভব হল এমনটা! আগে কেন সম্ভব হত না?

শিশির হালদার বলেছিলেন, 'বুঝলেন মশাই ঠেলার নাম বাবাজীবন কথাটা মিথ্যে নয়। এবার সরকারের পক্ষ থেকে ঠেলার অন্ত নেই—সেইজন্যেই বাজার এমন ঠাণ্ডা মেরে আছে। মাঝে মধ্যে আমাদের দেশের সৎব্যবসায়ীর দল যে কিছু কিছু জিনিস নিয়ে বদমাসী করছে না—তা নয়। যেমন ধরুন না পিঁয়াজ নিয়ে কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। বন্ধু ইউ-পিতে পিঁয়াজ কিনেছে চল্লিশ পয়সা কেজি—একমাস পরে ফিরে এসে দেখে এখানে আড়াই টাকা। সরকারের তরফ থেকে রাম ঠেলা যদি অব্যাহত থাকে তাহলেই মানুষ বাঁচবে—না হলে সেই হরিহর ছত্রের মেলা স্বুরু হয়ে যাবে আবার। সরকার কর চাপাবে যা, ব্যবসাদারের দল বগল বাজাবে তার তিনগুণ।

কদিন পরে পরেই সংসদে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট পেশ করেছিলেন অর্থমন্ত্রী। উন্নয়নভিত্তিক ও কল্যাণমূলক বাজেট।

সম্প্রতিকালের মধ্যে এই প্রথম মাত্র আটচল্লিশ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় কর বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি রোধের ব্যবস্থা আরো এক বছর চলবে। এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীসহ ব্যক্তিগত আয় কর—সাধারণ সম্পত্তি কর এবং যৌথ শিল্পের ক্ষেত্রে ঢালাও ভাবে কর ও উৎপাদন শুল্কের হার হ্রাস করা বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

গ্রাম সমাজ ও শ্রমিক কল্যাণের প্রতিও বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। এসবের ফলে ১৯৫৬-৫৭ বর্ষে বাজেটে মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ৩৬৮ কোটি টাকা। কয়েকটি দ্রব্যের ওপর শুল্ক বসিয়ে কেন্দ্রীয় খাতে আটচল্লিশ কোটি টাকা তুলে সামান্য ঘাটতি পূরণ করা হবে, শেষ পর্যন্ত ৩২০ কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাবে।

পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে মোট ৭৮৫২ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ বর্ষের থেকে ব্যয় বৃদ্ধির হার ৩১.৬ শতাংশ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও ঢালাও ভাবে কর ছাড়ের প্রস্তাব দেওয়া আছে।

১৯৫৬-৫৭ এর পরিকল্পনা খাতে ৭৮৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় খাতে ৪০৯০ কোটি টাকা এবং রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্যে ৩৭৬২ কোটি টাকা।

কৃষি ও শক্তি উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে।

পেট্রোল খাতে ৩১ শতাংশ বর্ধিত বরাদ্দ হচ্ছে। রাজ্য পর্যায়ে সার উৎপাদন পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধির জন্যে এ শিল্পে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা হয়েছে।

কর্মচারীদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার অর্ধেক কর্তিতই থাকবে।

ফসফেট সারের দর কমেছে।

অতিরিক্ত বেতন ও মহার্ঘ ভাতা যা কাটা হয়েছে তা দফায় দফায় ফেরৎ দেওয়া হবে। ফলে কর্মচারীরা ১৯৫৬-৫৭ সালে অতিরিক্ত ২৭০ কোটি টাকা আয় করবে।

বিদেশী সাহায্য বাবদে মোট ৩৪১ কোটি টাকা পাওয়া যাবে।

রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিয়ে ৬৬০ কোটি টাকা রাজস্ব ধরা হয়েছে।

কর থেকে রাজ্যগুলি ২২৬ কোটি টাকা বর্ধিত সাহায্য পাবে।

যে যে খাতে কর কমেছে ;

ব্যক্তিগত আয়ের ওপর সর্বোচ্চ করের হার ৭৭ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৬৬ শতাংশ করা হল।

আয়কর দাতাদের আবশ্যিক জমা প্রকল্প আরো এক বছর চলবে।

সম্পত্তির ওপর কর প্রথম পাঁচ লক্ষ টাকায় অর্ধ শতাংশ, পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকায় দেড় শতাংশ এবং দশ লক্ষ থেকে পনের লক্ষ টাকায় দু-শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে।

তামার ওপর কর প্রতি মেট্রিক টনে ১৪০০ টাকা হ্রাস করা হল।

টেলিভিশন সেট সস্তা হবে। যেসব টি ভি সেটের-ইউনিট মূল্য আঠারশো টাকার বেশি নয়, সে সবের ওপর ডিউটি মূল্যানুপাতিক হারে কুড়ি শতাংশ থেকে কমিয়ে পাঁচ শতাংশ করা হবে।

যে সব রেফ্রিজারেটরে একশো লিটারের বেশি ধরে কিন্তু একশো পঁয়ষট্টি লিটারের বেশি ধরে না সেগুলোর ওপর কর পঞ্চাশ শতাংশ থেকে কমিয়ে চল্লিশ শতাংশ করা হচ্ছে।

শিল্প সংস্থা ও হিমঘরের জন্যে রেফ্রিজারেশন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রপাতির ওপর বর্তমানের তুলনায় করের বোঝা অনেকটা কমিয়ে কুড়ি শতাংশ করা হচ্ছে।

তৈরি পোষাকের ওপর কর দশ শতাংশ ছিল, তা একেবারে বাদ যাচ্ছে।

সেফটিরেজারের স্টেনলেশ ষ্টীল ব্লেডের ওপর কর দশ শতাংশ থেকে কমে মাত্র এক শতাংশ হচ্ছে।

গৃহস্থালী ও ধোবিখানার সাবানের ওপর কর সাত শতাংশ থেকে কমে পাঁচ শতাংশ হচ্ছে।

সস্তাদরের প্রসাধন সাবান ১২.৫ শতাংশ থেকে কমে ১০ শতাংশ হচ্ছে।

ধৌতির অন্যান্য দ্রব্য (ডিটারজেন্ট প্রভৃতি) ১৫ শতাংশ থেকে কমে ১২.৫ শতাংশ হচ্ছে।

ধাতব আবরণযুক্ত শুকনো ব্যাটারি পঁচিশ শতাংশ থেকে কমে কুড়ি শতাংশ।

ছোট টেবিল ফ্যান ও দাঁড় করানো পাখার ওপর দশ থেকে কমে পাঁচ শতাংশ।

যাত্রীবাহী মোটর কার, জীপ, অ্যাম্বুলেন্স, পিক-আপ ভ্যান ও ষোল অশ্বশক্তির কম ব্যবসায়িক যানবাহন পাঁচ শতাংশ রিলিফ পাবে।

ব্যবসায়িক মানের অ-লেভি অ্যালুমিনিয়ামের ওপর ডিউটি প্রতি মেট্রিক টনে বারশো টাকা কমে যাচ্ছে।

টায়ার, টিউব ও ব্যাটারি, যাত্রীবাহী কারের (১৬ অশ্বশক্তি কম) মূল অংশ হিসাবে সরবরাহ করা হলে তার ওপর আলাদা ডিউটি বসানো হবে না।

কৃত্রিম ও রাসায়নিক ধুনা, রজন বা লাক্ষা জাতীয় দ্রব্য ও প্লাষ্টিক নির্মিত দ্রব্যের ওপর ডিউটি মূল্যানুপাতিক হারে ছাপান্ন শতাংশ থেকে কমে চল্লিশ শতাংশ হচ্ছে। এ সব উৎপাদন থেকে তৈরি মালের ওপরও উপযুক্ত রিলিফ দেওয়া হবে।

জল ঠাণ্ডা করার যন্ত্রের ওপর কর পঁচাত্তর শতাংশ থেকে কমে চল্লিশ শতাংশ।

সুতী বস্ত্রাদি—মূল্যানুপাতিক কর। বেশী দামের কাপড়ের ওপর শুল্ক বাড়ছে।

সার ও সংবাদ পত্র মুদ্রণের কাগজ শিল্পের যন্ত্রপাতির ওপর আমদানী শুল্ক হ্রাস পাবে।

জীবন রক্ষার ওষুধের ওপর ২-৫ শতাংশ কর এবং সিরাপ, ভ্যাকসিন ও ভৈষজ জন্ম নিরোধক দ্রব্যের কর মুক্তি বহাল থাকবে।

কোন খাতে কর বাড়ছে :

বাজেটে প্যাটেন্ট ও মালিকানাধীন ওষুধের ওপর কর মূল্যানুপাতিক হারে ৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২.৫ হচ্ছে।

সিগারেটের কর কাঠামোর পরিবর্তন করে সস্তা দরের সিগারেটকে রিলিফ দেওয়া হবে, দামী সিগারেটের ওপর কর বাড়বে বেশি। দামের মার্কা দেওয়া

মসলার ও চুরুটের ধূম্রপায়ীদের আর সুযোগ দেওয়া হবে না, মিশ্র তামাক মসলার সমান হারে তাদের ডিউটি দিতে হবে। এই ডিউটি বৃদ্ধির ফলে ১২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় হবে।

বিদ্যুৎচালিত তাঁতের ওপর সংযুক্ত লেভি বৃদ্ধি পাবে। এতে ছোট খাট তাঁত মালিকদের ওপর আঘাত আসবে না।

সুগন্ধযুক্ত সোডা-লেমনেড প্রভৃতির ওপর কর বাড়ছে। এতে আট কোটি টাকা আয় হবে।

সাধারণ সোডা ওয়াটারের ওপর কর বাড়ছে না।

সিমেণ্ট-মূল্যানুপাতিক কর পরিণত হচ্ছে নির্ধারিত করে। এতে আয় হবে সামান্য।

রং বার্ণিশ অ্যাক্রিলিক তন্তু কয়েক ধরনের ইলেকট্রনিক দ্রব্য শ্বেত সারের ওপর করের হার পরিবর্তন হচ্ছে। এতে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় হবে।

হাই কার্বন ও মিশ্র ইস্পাতের ওপর আমদানী শুল্ক ছত্রিশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পঁচাত্তর শতাংশ করা হয়েছে।

মুদ্রণ ও লেখার কাগজের ওপর মূল্যানুপাতিক পঁচিশ শতাংশ ডিউটি থাকবে। অন্যান্য সকল রকম কাগজ ও কাগজের বোর্ড—মূল্যানুপাতিক ত্রিশ শতাংশ। আয় হবে ১৩ কোটি টাকা।

পাঠ্য পুস্তক ও একসারসাইজ বুকে ব্যবহৃত হোয়াইট প্রিন্টিং কাগজের প্রতি কনসেশন কার্যতঃ অপরিবর্তিতই থাকবে। সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের ওপরও বর্তমান কনসেশন বহাল থাকবে। বাদামী প্রিন্টিং ও লেখার কাগজের ওপর কনসেশন হারে ডিউটি হবে পনের শতাংশ।

অর্থমন্ত্রী গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য অর্থমন্ত্রী একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেন এবং অপ্রত্যক্ষ কর হার সুসঙ্গত করার প্রস্তাব দেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে দেশ দারিদ্রের কবল মুক্ত হতে পারে বলেই আগামী বাজেটে ১৫৬ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

শিল্প-শ্রমিকদের নতুন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে শ্রমিকদের জীবনবীমায় তাঁদের কিছুই দিতে হবে না। চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে সেই শ্রমিকের পরিবার পোষ্য পূর্বের তিন বছরের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের হারাহরি টাকা পাবে এর সর্বোচ্চ অঙ্ক হবে দশ হাজার টাকা।

এই বাজেটের মূল লক্ষ দেশের আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। প্রাপ্ত

সাংগঠনিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাস্তবে রূপায়ণের জন্যে সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক অর্থ বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়েছে ক্ষুদ্র সেচপ্রাপ্ত এলাকার পরিমাণ আগামী বছরে দশ লক্ষ হেক্টর হবে বলে আশা করা হয়েছে।

১৯৫৫-৫৬ সালে খাদ্যে ভরতুকীর পরিমাণ ছিল ২৫০ কোটি টাকা ১৯৫৬-৫৭-এর বাজেটে ৩০০ কোটি হবে। পরিকল্পনা খাতে সর্বাধিক সম্পদ বিনিয়োগের ব্যবস্থা রাখার জন্যে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে যথাসম্ভব ব্যয় সঙ্কোচ করা হয়েছে।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় খাতে মোট কুড়ি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে—বন্যা নিয়ন্ত্রণে বার কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পের জন্য আছে ৬৭৩ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমূহের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্যে ১৪১২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য দেওয়া হবে। ১৯৫৫-৫৬ সালের চেয়ে ১৯৮ কোটি টাকা বেশি।

নিবিড় গ্রামোন্নয়ণ প্রকল্পে পনের কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

১৯৫৬-৫৭ এর বাজেটে কর ও শুল্ক বাবদ রাজ্যগুলো থেকে আসবে ১২৬৫০ কোটি টাকা।

ব্যয় হবে—১২৯৭০ কোটি টাকা।

ঘাটতি—৩২০ কোটি টাকা।

মোট ব্যয়ের অঙ্ক থেকে উন্নয়ন খাতে—৭৩১৩ কোটি টাকা (৫৬ শতাংশ)

প্রতিরক্ষা খাতে—২৫৪৪ কোটি টাকা।

সুদ পরিশোধ—১৩৫২ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলকে সাহায্য খাতে—৭৩৪ কোটি টাকা।

অন্যান্য খাতে—১০২৭ কোটি টাকা।

উন্নয়ন খাতে ৭৩১৩ কোটি টাকার মধ্যে :

আর্থিক সেবায়—৪৫৫০ কোটি টাকা।

সামাজিক ও সম্প্রদায়ের সেবায়—৬৯০ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসনাধীন অঞ্চলগুলিকে সাহায্য খাতে—২০৬৯ কোটি টাকা।

যোজনা ব্যয় ও সাধারণ সেবায়—৩ কোটি টাকা।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কর ও শুল্কের অংশ হিসাবে দেওয়া হবে—১৬২৭ কোটি টাকা।

উন্নয়ন খাতে দেওয়া হবে—২০৬৯ কোটি টাকা।

বিধি সম্মত অন্যান্য ঋণ ও অনুদান হিসাবে—৭৩৪ কোটি টাকা।

পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় যোজনা সমেত ব্যয় ৪৭৫৯ (৩৩৪৭) কোটি টাকা।

রাজ্যগুলিকে সাহায্য—১২৯৪ কোটি টাকা।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য—১১৮ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য—৩২৩ কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী ব্যক্তিগত আয়করের যে প্রস্তাব করেছেন :

আয়ের সীমা :	বর্তমান হার (শতাংশ)	প্রস্তাবিত হার (শতাংশ.)
৮ হাজার টাকা পর্যন্ত	নেই	নেই
৮০০১—১৫০০০	১৭	১৫
১৫০০১—২০০০০	২০	১৮
২০০১—২৫০০০	৩০	২৫
২৫০০১—৩০০০০	৪০	৩০
৩০০০১—৫০০০০	৫০	৪০
৫০০০১—৭০০০০	৬০	৫০
৭০০০১—১ লক্ষ	৭০	৫৫
এক লক্ষের ওপর	৭০	৬০

* উল্লিখিত হারে আয়কর হিসাবের ওপর দশ শতাংশ সারচার্য ধার্য হবে।

বাজেট প্রকাশের পর বিজ্ঞজনের অভিমত :

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজেটে ১৯৫৬-৫৭ সালের জন্যে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে—পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৫৪৪ কোটি টাকা। ১৯৫৫-৫৬-এর তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১৩৪ কোটি টাকার মত। ২৫৪৪ কোটি টাকার অঙ্কটা নিতান্ত সামান্য নয়। কিন্তু ১২,৯৭০ কোটি টাকার মোট বাজেটের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের অঙ্কটা খুব বেশীও নয়। এবং সামাজিক প্রগতি ও বৈষয়িক উন্নয়নের পরিকল্পনাও কোন দিক দিয়ে ব্যহত হচ্ছে না।

তবে প্রতি বছর যদি সামরিক বা প্রতিরক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি না করে চলা সম্ভব হতো তবে, ওই টাকার একটা বড় অংশ জনগণের অধিকতর কল্যাণের জন্যে ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া যেত।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা একটা সঙ্কটের যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই সেদিন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, যদিও বাহ্যত একটা শান্তির অবহাওয়া দেখা দিচ্ছে, তথাপি বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা চলে না। ভারতের কেবল উত্তর দিক থেকেই এই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এমন নয়, দক্ষিণ দিক থেকে সমুদ্র পথেও বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এবং বর্তমানে ভারতের ঐক্য ও স্বাধীনতার পক্ষে এত বড় বিপদ আর কখনও দেখা যায় নি।

প্রধানমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণীকে যদি আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করি, তবে ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যায়বৃদ্ধিকে নিশ্চয়ই অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। বরং স্বাধীনতার পর আমরা বার বার আক্রান্ত হয়েছি। গোড়ার দিকে আমাদের উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি না থাকায়—একাধিক বার জব্দও হয়েছি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আমরা সামলে উঠেছি—আমাদের প্রতিরক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, একাত্তর সালে তার চুড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে—ভারত আক্রমণকারী পাকিস্তান সম্পূর্ণ পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু তার জন্যে আত্মতুষ্টির কারণ নেই। ভারত শান্তি নীতিতে বিশ্বাসী। জঙ্গীবাদ—আগ্রাসনের একান্ত বিরোধী, তবুও ভারতের বাইরে কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাবের অভাব নেই।

এজন্যেই প্রধানমন্ত্রী ভারতের উত্তর সীমানার দিকে চীন এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে—অর্থাৎ মার্কিন নৌবহরের কিংবা দিয়াগো গার্সিয়ার নতুন ঘাঁটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

স্বাধীনতা অর্জনের পর আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমাদের কোন শত্রু নেই এবং আমরা শান্তি-সহযোগিতা ও বিশ্বমৈত্রীর মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি দীর্ঘকাল রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়নি। ১৯৫২ সালে চীন—ভারত আক্রমণ করার ফলে আমরা এক অসম্মানজনক অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেদিনের তীব্র ও তিক্ত শিক্ষা আমাদের নতুন করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিল।

তারপর থেকে ভারত সরকার আধুনিক রণবিজ্ঞানের ও সমর সম্ভারের

এবং সামরিক সংগঠনের নতুন কর্মসূচী অনুসরণ করে এসেছেন। হাল আমলে এজন্যে গত কয়েক বছরে অন্ততঃ দশহাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং আমাদের স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীকে অতীতের তুলনায় প্রায় নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

আমাদের সুবৃহৎ দেশের আয়তন, সুদীর্ঘ সীমানা—উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে আড়াই হাজার মাইল, দক্ষিণে ও পশ্চিমে সমুদ্রতীরের সাড়ে তিন থেকে চার হাজার মাইল বিবেচনা করলে প্রতিরক্ষার জন্যে এই বিপুল ব্যয় অসঙ্গত মনে হবে না। বিশেষতঃ আজকের দিনের যুদ্ধ পুরোপুরি যান্ত্রিক এবং এই যান্ত্রিক সাজসজ্জা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেই সেকালের একমাত্র বন্দুকধারী পদাতিক বাহিনীর যুদ্ধ আর নেই।

এখন অজস্র প্রকারের যান্ত্রিক অস্ত্র সজ্জার যুদ্ধ—যার সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে। কিন্তু সেই আমলকেও ছাড়িয়ে কিংবা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ট্যাঙ্ক—এরোপ্লেন ও রকেট ইত্যাদিকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিগুলো প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জার দিকে এগিয়ে গেছে।

রণবিজ্ঞানে অস্ত্র সজ্জায় আমরাও ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ সালের কালপর্বে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। এমন কি, ১৯৭৪ সালের মে মাসে আমরা ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণও ঘটিয়েছি।

সবচেয়ে বড় কথা সামরিক অস্ত্র, যন্ত্র, সাজসজ্জা ইত্যাদিতে আমরা স্বয়ম্ভর হতে চলেছি। অর্থাৎ আমরা আর পশ্চাৎপদ বা পর নির্ভরশীল দুর্বল দেশ নই। এমনকি ভারতবর্ষকে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলোর পর অন্যতম সেরা শক্তিশালী দেশরূপে গণ্য করা যায়।

আমাদের সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা (২৫ ডিভিসন) বিমনে বহর (৪৫ স্কোয়াড্রন) ও নৌবহর এখনও প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তির পর্যায়ে পৌছায়নি।

কিন্তু ভারত পারমাণবিক শক্তির রহস্য করায়ত্ত করেছেন। তার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও যন্ত্রবিদরা এমন দক্ষতার স্তরে পৌছেছেন যে ভারত ইচ্ছা করলেই পারমাণবিক অস্ত্রও তৈরী করতে পারে।

কিন্তু পারমাণবিক শক্তিকে ভারত ধ্বংসের বদলে শান্তির কাজে নিয়োগের পক্ষপাতি—এই নীতির কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রী বার বার ঘোষণা করেছেন (পারমাণবিক শক্তি হিসাবে ভারতের বয়স যেদিন দুবছর পূর্ণ হল ঠিক সেদিন কানাডার বিদেশমন্ত্রী অটোয়ায় হাউস অব কমনস-এ ঘোষণা

করলেন ভারতের সঙ্গে তাঁরা আর কোন পরমাণু-সহযোগিতা করবেন না।

রাজস্থানের মরুভূমিতে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের তারিখ ১৮ই মে ১৯৭৪ সাল।

ভারতের সঙ্গে পরমাণু সম্পর্ক ছেদের একতরফা কানাডিয়ান সিদ্ধান্ত ঘোষণার তারিখ ১৮ই মে ১৯৭৬ সাল।

১৮ই মে-র ঘোষণায় ভারত ও কানাডার মধ্যে পরমাণু-সহযোগিতা আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং আপাতদৃষ্টিতে বরাবরের জন্যে বন্ধ হল। কার্যত এই সহযোগিতা দুবছর বন্ধ আছে।

পোখরান বিস্ফোরণে ভারতের প্রতি বিরূপতা পশ্চিমের প্রায় সব দেশেই দেখা গিয়েছিল। কানাডার প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্রতম। কানাডা তখনই ঘোষণা করে, ভারতের সঙ্গে সব রকম পরমাণু সহযোগিতা বন্ধ করা হল।

কারণ হিসাবে বলা হয়, কানাডার পরমাণু সাহায্য অস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানো হবে না, এই প্রতিশ্রুতি ভারত সরকার রক্ষা করেন নি।

উত্তরে ভারত সরকার বলেন, পোখরান পরীক্ষার উদ্দেশ্য পরমাণু শক্তির পূর্ণ ব্যবহার, সামরিক প্রয়োগ নয়। তাছাড়া এই পরীক্ষায় সহযোগিতা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হয়নি, কারণ পোখরানে যে প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছে তা কানাডার সরবরাহ করা কোন পদার্থ জাত নয়।

কানাডায় তখন সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কাল। কাজেই ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কোন নমনীয়তা প্রকাশ করায় রাজনৈতিক বাধা ছিল।

নির্বাচনের পর সহযোগিতা পুনরাম্ভের উদ্যোগ সুরু হয়। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোকে জানান, কানাডার আশঙ্কা ভিত্তিহীন।

অটোয়া ও নয়াদিল্লীতে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হয় শেষ আলোচনা হয় নয়াদিল্লীতে মার্চ মাসে। এই আলোচনায় একটা খসড়া চুক্তি অনুমোদিত হয়, এবং দু-পক্ষই এই খসড়া চুক্তিতে সই করেন। স্থির হয়েছিল, এই খসড়া চুক্তিতে দু-দেশের সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মতি জানালে এটি কার্যকর করা হবে এবং কানাডা সরকার আবার সহযোগিতা সুরু করবেন। অবশ্য এই চুক্তিতে কি ছিল উভয় সরকার তা প্রকাশ করেন নি।

তবে খবর বেরিয়েছে যে, কানাডা সরকার বলেছিলেন, সহযোগিতা সুরু হতে পারে মাত্র এই শর্তে যে, যতদিন ভারতের পরমাণু কর্মসূচীতে কানাডা সহযোগিতা করবে ততদিন ভারত সরকার কোন ধরনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ করবেন না। শর্তের একটি মর্মার্থ হল যে, চালু প্রকল্প ছাড়া নতুন কোন

প্রকল্পে কানাডার সহযোগিতা পাওয়া যাবে না।

এই বিরোধে ভারত সরকার বরাবর বলে এসেছেন, যে সহযোগিতায় কানাডা সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেবল সেই সহযোগিতাটুকু তাঁরা করুন। সুতরাং কানাডার শর্তে তাঁরা আপত্তি করেন নি; তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন, ভারত-কানাডা পরমাণু সহযোগিতা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন তাঁরা কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ করবেন না। তারপর এমন কিছু ঘটেনি যার অজুহাতে কানাডা সরকার মত পরিবর্তন করতে পারেন।

কানাডার পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে এই খসড়া চুক্তির কোন উল্লেখ করেননি। তাঁর বিবৃতিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কানাডা সরকার চান ভারত নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফরেশন চুক্তিতে সই করুক না করুক এই চুক্তির শর্তগুলো ভারত সরকার মেনে চলুন। যার অর্থ দাঁড়াবে পরমাণু-শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যেও কোন পরীক্ষা-বিস্ফোরণ করা চলবে না। স্বভাবতই ভারত সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন নি।

ভারতের সঙ্গে পরমাণু সহযোগিতা কেবল কানাডাই করছে না। তা সত্ত্বেও কানাডার সঙ্গে ভারতের একটা বিশেষ সম্পর্ক গত দু-দশকে গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক বৈষয়িক বা প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছিল। ইন্দোচীনের কনট্রোল কমিশন তার একটা উদাহরণ।

ভারত ও কানাডার মধ্যে প্রথম পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে। কানাডা-ভারত আণবিক রিঅ্যাকটরটি চালু হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এটি এশিয়ার বৃহত্তম রিঅ্যাকটর।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু তখন বলেছিলেন, এই রিঅ্যাকটর কেবল ভারতের অগ্রগতির কাজেই লাগানো হবে না, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য দেশগুলোও এই রিঅ্যাকটরের সুবিধা পাবে।

বর্তমানে কানাডা-ভারতের মধ্যে যে দুটো পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি চালু ছিল সে দুটো সম্পাদিত হয়েছিল ১৯৬৩ ও ১৯৬৬ সালে।

তাছাড়া কানাডা ভারত ছাড়া অন্য দেশেও পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যা রপ্তানী করেছে। করাচীর কাছে পাকিস্তানের প্রথম আণবিক রিঅ্যাকটর নির্মাণ করা হচ্ছে কানাডার সহযোগিতায়। পাকিস্তান সহযোগিতা পাচ্ছে ফ্রান্স, আমেরিকা ও পশ্চিম জার্মানীর কাছ থেকেও।

গত ফেব্রুয়ারী (১৯৭৬) মাসে ভুট্টো যখন কানাডা গিয়েছিলেন, তখন

নাকি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তান ভারতের অনুকরণে ধার-করা প্রযুক্তি বিদ্যা পারমাণবিক বিস্ফোরণের কাজে নিয়োজিত করবে না।

ভুট্টো সেই প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষিত হয় তার জন্যে প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে বলে প্রচার করা হয়।

নিশ্চয়ই পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছে পাক প্রধানমন্ত্রীর উল্টো প্রতিশ্রুতির কথা কানাডা সরকারের মনে নেই। ভুট্টো বলেছিলেন, ভারত যদি পারমাণবিক শক্তিধর হয় তাহলে পাকিস্তানও প্রয়োজন হলে ঘাস খেয়ে, আণবিক বোমা তৈরি করবে।

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে ভারত সরকারের নিষ্ঠা এ রকম শর্ত-কণ্টকিত নয়।

পাকিস্তান ফ্রানসের কাছ থেকেও পারমাণবিক সাহায্য পাচ্ছে। এই সাহায্যের ফলে পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারবে।

অবশ্য পাকিস্তান যে তা করবে না সে সম্বন্ধে ফ্রান্স নাকি নিঃসন্দেহও— অথচ এই ফ্রান্সই দক্ষিণ কোরিয়াকে অনুরূপ সাহায্য দিতে অসম্মত। ফরাসী সরকারের এই সিদ্ধান্তে আমেরিকা পর্যন্ত আপত্তি জানিয়েছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়নি।

কানাডার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার কিছুদিন আগে তারাপুর আণবিক প্রকল্পের জন্যে আমেরিকার প্রতিশ্রুত ইউরেনিয়াম সরবরাহ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল। সর্বশেষ খবর, গত ডিসেম্বরে (১৯৫৫) যে ইউরেনিয়াম সরবরাহের কথা ছিল সেটি সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় আমেরিকা থেকে সময় মত সরবরাহের আশা না করাই ভাল।

পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যার রপ্তানীকারী দেশগুলো সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতের সঙ্গে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত আকস্মিক বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

গত নভেম্বর (১৯৫৫) মাসে লণ্ডনে এক গোপন বৈঠকে সাতটি পরমাণু বিদ্যা রপ্তানীকারক দেশ পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের সংখ্যা যাতে আর না বাড়ে তার জন্যে একটা আচরণ বিধি গ্রহণ করে। এই সাতটি দেশ হল:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, কানাডা, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি ও জাপান।

এই আচরণ বিধির মূল কথা হল, পরমাণু সহযোগিতার ওপর এমন সর্ত আরোপ যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো পরমাণু প্রযুক্তি বিদ্যা কোনদিন আয়ত্ত না

করতে পারে। অর্থাৎ যে বৈষম্য কায়েম রাখার জন্যে নিউক্লিয়ার ননপ্রলিফারেশন চুক্তি, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এই সাতটি রাষ্ট্রের গোপন আচরণ বিধি।

ভারতের ওপর এই আচরণবিধির প্রথম প্রয়োগের একটা কারণ ভারতের নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফারেশন চুক্তি মেনে নিতে অসম্মতি। পাকিস্তানও মানে নি। তা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধের কারণ ভারত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের ক্ষমতা ধরে এবং পরমাণু-প্রযুক্তি বিদ্যা রপ্তানী করার যোগ্যতাও তার আছে।

ভারতের সঙ্গে অসহযোগিতার কারণ পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতের পারদর্শিতা। পোখরানে পরীক্ষা-বিস্ফোরণ না করলে হয়তো সহযোগিতা অব্যাহত থাকত। এই অসহযোগিতার বিস্ফোরণ পোখরানের পশ্চিমী প্রত্যুত্তর।

এক হিসাবে ভারতের বিপুল জনসংখ্যা ভারতের বিপুল শক্তির উৎসের মত। যদি এই জনশক্তিকে আমরা কলকারখানার শ্রমশিল্পের, যন্ত্রশিল্পের-কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাফল্যের সঙ্গে নিয়োগ করতে পারি, তবে, সৈন্যবাহিনীর সংখ্যায় ও আধুনিকতম অস্ত্রসজ্জায় আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারি। বিমান করে এবং নৌবহরের দিক থেকেও আমরা একদিন বিপুলতর শক্তির অধিকারী হতে পারি। অবশ্য এজন্যে আরো হাজার-হাজার কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হবে।

কিন্তু যেদেশে অন্ততঃ বাইশ কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সেই দেশে প্রতিরক্ষার পাশাপাশি অবশ্যই জীবনরক্ষার প্রশ্নও উঠবে। অর্থাৎ বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি দারিদ্রের বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেই তামাদের এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু যারা পৃথিবীতে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, বিক্রয়-সরবরাহের যে জুলুম চলছে—যে ভাবে ভয়ঙ্কর পারমাণবিদ অস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাতে পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল মানুষেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন।

পারমাণবিক যুদ্ধে সমগ্র প্রাণিজগৎ মহাশ্মশানে পরিণত হতে পারে। যে শক্তি সমগ্র মনুষ্য জাতিকে এবং যে কোন জীবিত বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলতে পারে, সেই বর্বর শক্তির সঙ্গে নিশ্চয়ই আমরা পাল্লা দিতে যাব না।

কারণ ভারত যে মহাকবির অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করেছিল। শুনেছিল

মহাজীবনের আহ্বানবাণী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগ যুগব্যাপী অমা-রজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্দ্রে হল অবসান
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

সঁপিবে তোমার নবীন বাণী কে ?
নব প্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে
তারি লাগি বসি আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জরার জড়িমা আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না-ফুটে—
কর পুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

'খোল খোল দ্বার ঘুচুক আঁধার'
নবযুগ আসি ডাকে বার বার—
দুঃখ আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ ;
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

বিশ্বকবির আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। জেগেছে ভারতবর্ষ। খুলে দিয়েছে হৃদয়ের দ্বার। আহ্বান জানিয়েছে দিকে দিকে। শান্তি-সৌভ্রাতৃত্ব আর বিশ্বমৈত্রীর শপথ নিয়েছে চলার পথে।

শান্তিদূত পণ্ডিত নেহেরুর যোগ্য উত্তরাধিকারিনী ইন্দিরা গান্ধী। শত্রুর পরিচয় রণক্ষেত্রে। ভারতের চির বৈরী পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী যখন ২৭ শে মার্চ ১৯৫৬ এ তাঁকে লিখলেন :

শ্রীমতী গান্ধীকে জনাব ভুট্টো।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রশ্নটি নিয়ে আপনাকে চিঠি লিখতে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছি। নানা কারণে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার কাজে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এই অচলাবস্থার অবসান হলে উভয়েরই যে সুবিধা হবে, এটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পাকিস্তানের জনগণ দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তির প্রশ্নে এখনও স্থির লক্ষ্য।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ অন্তত আংশিক ভাবে ব্যাহত হওয়ার কারণ, দুই দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপন ও একে অন্যের আকাশ পথ ব্যবহার সম্পর্কিত মতৈক্যে আমরা পৌছতে পারিনি। আমাদের মনে রাখা দরকার, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন সম্পর্কে মতৈক্য হলে তা দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চুক্তির কাজ সহজতর হবে। এ কথা বলা বাহুল্য যে এ-যাবৎ নানাস্তরে এ বিষয়ে যে সব আলাচনা হয়েছে, তাতে কোন ফল হয়নি।

আমাদের দিক থেকে বলতে পারি, কি ভাবে আমাদের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সচেতন।

সে কথা ভেবেই আমরা ওয়াঘতে ভারতের সঙ্গে রেলপথে সংযোগ পুনঃস্থাপনের কথা বলেছি। দুই দেশের মধ্যে জলপথে সীমানা নির্দেশ করার ব্যাপারেও আমরা সম্মত হয়েছি। দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ-আয়োজনে আমরা স্বভাবতই সচেষ্ট আছি। কিন্তু অন্য বকেয়া সমস্যাগুলির মীমাংসায় অগ্রগতি না ঘটলে এই ধরনের উদ্যোগের মূল্য সামান্যই, ফলাফলও যৎকিঞ্চিৎ।

বস্তুত, দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ-আয়োজন ত্বরান্বিত করার মানসে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছার সফল রূপায়ণের আশায় আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা সমীপে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতে পারে? এইভাবে ছাড়া আর কোন উপায়ে কি এ-হেন অচলাবস্থার অবসান হতে পারে?

আমার বিশ্বাস, একে অন্যের আকাশ পথ ব্যবহারের প্রশ্নে আর সমস্যা থাকা উচিত নয়। এখন সিমলা চুক্তির নিরিখে অন্য বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃকপাত করা উচিৎ।

আন্তরিক অভিনন্দন সহ
জুলফিকার আলি ভুট্টো

১১ই এপ্রিল চিঠির উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

জনাব ভুট্টোকে শ্রীমতী গান্ধী

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

২৭শে মার্চের চিঠির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভারত-পাকিস্থান সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ব্যাপারে আপনি বর্তমান অচল অবস্থার উল্লেখ করেছেন। এই অচলাবস্থা ভারতের সৃষ্টি নয়। আমাদের স্থির বিশ্বাস, দু দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিরলস প্রয়াস অক্ষুণ্ণ রাখতে সিমলা চুক্তিই আমাদের চালিকা শক্তি।

আমার মনে হয়, এবং এটা অত্যন্ত জরুরী, পরস্পরের প্রতি বিষ বিদ্বেষ উদ্রিক্ত হতে পারে এমন অপপ্রচার বন্ধ করে আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। সেই সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া কখনই উচিত নয়, যা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী আপনাদের দিক থেকে সম্প্রতি এমন কিছু বিবৃতি বক্তব্য আমাদের

নজরে পড়েছে, যা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। আমাদের জনগণের মনেও এমন ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ভারতের নীতি ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি তার মনোভাব সম্পর্কে পাকিস্তান সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা করছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আপনার চিঠিতে সিমলা চুক্তি সম্পর্কে। আপনার মন্তব্য কিন্তু ওই চুক্তি রূপায়ণের পক্ষে অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করে না। স্থির নিশ্চিত ভাবেই বলা বলা যায়, উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে এই উপমহাদেশের অন্তর্গত কোন দেশেরই কোন লাভ নেই। জনগণের কল্যাণের জন্যই, সেই দিকে এগিয়ে যেতেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের উপর।

আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে

ইন্দিরা গান্ধী

১৮ই এপ্রিলের চিঠি

শ্রীমতী গান্ধীকে জনাব ভুটো।

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনাকে ধন্যবাদ ১১ই এপ্রিলের চিঠির জন্য।

আমি, বলতে কি, আপনাকে একথা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যে, একে অন্যের আকাশ পথ ব্যবহার ও বিমান যোগাযোগ পুনঃস্থাপন নিয়ে অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে দুইদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ সুগম করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

এর উত্তরে আপনি যা লিখেছেন, তাতে মনে হয় আমরা আরও এক কদম এগিয়ে যেতে সমর্থ হব। আপনার প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদে এলে তাঁদের স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত হয়েই আছি। আশা করছি বিমান যোগাযোগ পুনস্থাপন সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হবে। কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন বিষয়ে আলোচনা হবে। আমি একমত যে, পারস্পরিক বিদ্বেষ-প্রচার থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত।

আমার বিশ্বাস, আমাদের সদিচ্ছা থাকলে বাধার প্রাচীর পার হতে পারব। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে।

ধন্যবাদান্তে

জুলফিকার আলি ভুট্টো

বৈঠক বসল ইসলামাবাদে। চলল ১২ই মে থেকে ১৪ই মে। সম্পন্ন হল পাক-ভারত চুক্তি। শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমৈত্রীর প্রমাণ দিল ভারত।

ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির এই মহান ভিত্তিকে যেমন আমরা রক্ষা করতে চাই, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকেও আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই।

ভারতের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্যে ভারতের জনগণকে যেমন, তেমনি ভারতের সমর বিভাগকেও সতর্ক সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই প্রস্তুতির জন্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ না করেও এই গরীব দেশের উপায় নেই। কারণ, দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন সর্বাগ্রে।

১৯৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক যোজনায় ৭৮৫১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ৫৯৭৮ কোটি টাকা। ব্যয় বরাদ্দ সব চেয়ে বেশি বেড়েছে শিল্প ও খনির ক্ষেত্রে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ছিল ১৬৪৪ কোটি টাকা—বেড়ে হল ২১৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা।

ইস্পাতে—৪৩৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা (১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭১·৭২ কোটি টাকা)।

সার—৪৩৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ সালে ৩০৩·৬ কোটি টাকা)।

পেট্রোলিয়াম—৩৭১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ সালে ২৫৪ কোটি টাকা)।

কয়লা ও লিগনাইট—২৮৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ সালে ২৩০ কোটি টাকা)।

সরকারী মালিকানাধীন ভোগ্য পণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বস্ত্র, সিমেণ্ট, কাগজ ইত্যাদি—৮৫ কোটি টাকা (৫৫-৫৬ সালে ৬৪ কোটি টাকা)। এবং এই বছরে যোজনায় জাতীয় বস্ত্র পর্ষদের জন্যে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বিনিয়োগ এবং পরিবহন ভরতুকি খাতে বরাদ্দ পাঁচ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে দশ কোটি টাকা করা হয়েছে।

বোকারোর জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে—১৫০ কোটি টাকা।

হিন্দুস্থান ষ্টিল লিঃ—১৫০ কোটি টাকা।

কোরবা অ্যালুমিনিয়ম প্রজেক্ট—৪৬ কোটি টাকা।

কোল ইণ্ডিয়া লিঃ—২২৭ কোটি টাকা।

হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন—৩৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস—৩৭ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা।

ফারটিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া—২২৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল ফারটিলাইজার—১৭১ কোটি টাকা।

তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন—২২৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

বনগাইগাঁও শোধনাগার—২৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।

কোচিন জাহাজ নির্মাণ কারখানা—২২ কোটি টাকা।

অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ—৩৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

এই বছর বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় বরাদ্দ—১৪৫৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ এ ১১০১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা)।

পরিবহন—যোগাযোগের জন্য—১৩০৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ এ ১০৪০ কোটি টাকা)।

রেল—৪১১ কোটি টাকা।

সড়ক—২৫৪ কোটি টাকা।

যোগাযোগ—২২৩ কোটি টাকা।

জাহাজ—৮০ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা।

বড় বড় বন্দর—১১৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা (বন্দরগুলোর মধ্যে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে, মুরমুগাঁওয়ের জন্যে—১৬ কোটি টাকা, বোমবাই—১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, হলদিয়া ডক প্রকল্প—১০ কোটি টাকা, হলদিয়া চ্যানেল ড্রেজিং—৫ কোটি টাকা)।

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস—২৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

এয়ার ইণ্ডিয়া—১৯ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

কৃষি ও অন্যান্য খাতে—৮৯৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (৫৫-৫৬ এ ৬৯১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা)।

গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে—৯৫ কোটি টাকা (৫৫-৫৬ এ ৭৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা)।

সমাজ কল্যাণ—১০১০ কোটি টাকা (৫৫-৫৬ এ ৭৮২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা)।

অন্যান্য খাতে—২২০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

১৯৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক যোজনায় কুড়ি দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বিভিন্ন

অংশকে আরও জোরদার করতে চাওয়া হয়েছে। বর্তমান যোজনার কর্মসূচীর সঙ্গে এই প্রকল্পগুলোকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এইসব ক্ষেত্রের যে সব খাতে অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেগুলো হল :

ভূমি সংস্কার—৩৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

ছোট সেচ—১৪৯ কোটি টাকা।

বড় ও মাঝারি সেচ—৬১৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

সমবায়—৫৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

বিদ্যুৎ—১২৮৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

হস্ত চালিত তাঁত শিল্প—১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা।

ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য বাস্তু জমি—৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা।

অ্যাপ্রেনটিস শিল্প প্রকল্প—৯৫ লক্ষ টাকা।

বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ এবং বই ব্যাঙ্ক—৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

মোট বরাদ্দ ২১৭৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এছাড়া এই কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্যে কেন্দ্রীয় যোজনায় ১৬৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী ১৯৫৬-৫৭ সালে যে টাকাটা আদায় করবেন, তার মধ্যে চব্বিশ পয়সা আসবে উৎপাদন শুল্ক থেকে, বার পয়সা শুল্ক থেকে, আট পয়সা আসবে পৌর কর থেকে, দু পয়সা আয়কর থেকে এবং দু পয়সা আসবে অন্যান্য কর থেকে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব পাওয়া যাবে পনের পয়সা, ঋণ আদায় বার পয়সা, বাজার ঋণ, স্বল্প সঞ্চয় ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ন' পয়সা, বাইরে ঋণ ছ পয়সা এবং অন্যান্য খাতে পাওয়া যাবে আট পয়সা। দু' পয়সা ঘাটতি অপূর্ণই থেকে যাবে।

এইভাবে আদায়ীকৃত প্রতি টাকা থেকে সরকার পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় করবেন, সাঁয়ত্রিশ পয়সা এবং উনিশ পয়সা ব্যয় হবে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে। প্রতিরক্ষা ব্যয় উনিশ পয়সা, সুদ দান এগার পয়সা, রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত এলাকাগুলোতে বিধিসম্মতভাবে অন্যান্যভাবে হস্তান্তর করা হবে ছ' পয়সা এবং অন্যান্য ব্যয় আট পয়সা।

লাজুক ছেলেটা, গৌতম, কথা বলছিল আমার সঙ্গে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অনেক খানি ধুয়ে মুছে গেছে কদিনের বৃষ্টিতে। আজও আকাশ মেঘলা। বিকালের রোদটা দু একবার উঁকি দিয়েছিল মেঘের আড়াল থেকে। বাবুনের নিত্যদিনের কর্মসূচীর বিরতি আজ। সরমা ঝড় বাদলের আশঙ্কায় ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে যেতে রাজি হয়নি। অভিমানী ছেলেটা খেলনার বাক্স নিয়ে বারান্দায় এসে বসেছে। অনেকক্ষণ ধরে সশব্দে খেলনাগুলো নাড়াচাড়া করছে নিজের মনে।

জিজ্ঞাসা করেছি, 'কি হল দাদু?'

উত্তর আসেনি ও তরফ থেকে।

'ইঞ্জিন গণ্ডগোল করেছে?'

তবু উত্তর নেই।

'যদি জানতে পারি তাহলে একটা কিছু করলেও করা যেতে পারে।'

'পারবে না।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেছে।

'কেন, ব্যাপারটা খুব জটিল কি?'

ও পক্ষ আবর চুপ।

'সমস্যার সমাধান করা যায় না কি?'

'না।'

'কেন জানতে পারি কি?'

'আকাশে মেঘ জমেছে।'

'তাইতো দেখতে পাচ্ছি।'

'কালও মেঘ হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, কালও মেঘ একটু করেছিল বটে।'

'এখন রোজই মেঘ করবে।'

কিছু একটা উত্তর দেবার আগেই গৌতম এসে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। গৌতমকে দেখেই বাবুন গম্ভীরভাবে উঠে ভেতরে চলে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কোথায় চললে?'

লাজুক একটু হাসি ফুটেছিল গৌতমের মুখে। মৃদু কণ্ঠে বলেছিল, 'একটু বন্ধুদের কাছে যাব। অনেক দিন সিনেমা দেখিনি—টিকিট কেটে রাখার কথা আছে।'

'আজ তাহলে ছুটি?'

'ছুটি নয়—দুপুরে ফিরেছি। কদ্দিন যা বৃষ্টি হচ্ছে।'

'তাহলে খুবই অসুবিধা হচ্ছে তোমার ?'

'বর্ষায় একটু অসুবিধা হয় শুনলাম।' হেসেছিল গৌতম। 'গত কালের জলে কিছু মাল ভিজে গেছে।'

বাবুন আবার বেরিয়ে এসেছিল। গৌতমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, 'বেড়াতে যাচ্ছ তুমি ?'

'হ্যাঁ, তুমি যাবেনা আজ ?'

'না, বৃষ্টি আসবে। কিন্তু তুমি অংশুদার জামাটা পরেছো কেন ?'

গৌতমের পরণের জামাটা আমিও লক্ষ করেছিলাম। কিন্তু ওটা কার জামা আমার জানা ছিল না।

গৌতম বলল, 'কে বলল এটা অংশুর জামা ? আমি নতুন করিয়েছি।'

'না।' মাথা নেড়েছিল বাবুন। 'এটা তোমার জামা হতেই পারে না।'

'কেন ?'

'অংশুদা, অংশুদার বন্ধুরা সব এরকম জামা পরে। ওদের সকলকে এক রকম দেখতে।'

শুনে অবাক হচ্ছিলাম। ও এত কিছু জানল কেমন করে ?

গৌতম লজ্জিতভাবে বলল, 'এটা সেজ ভাইয়ের জামা। আমারটা কেচে দিয়েছিলাম, শুকোয়নি।'

আরো একটু কথা বলে চলে গিয়েছিল গৌতম। গৌতম চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুন বলেছিল, 'অংশুদার জামা পরে গৌতমদাকে একবারে মানায়নি।'

বললাম, 'কে বললে মানায়নি, আমি দেখলাম সুন্দর মানিয়েছে।'

'তুমি কিচ্ছু জান না।'

'বটে !' গম্ভীর হলাম আমি। বললাম, 'তোর অংশুদাকে মানায় ?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নেড়েছিল বাবুন। 'অংশুদার বন্ধুদের সকলকে।'

'কেন ?'

'বারে ওদের সকলের মাথায় বড় বড় চুল—জুলফি রয়েছে না ?'

'ওসব না থাকলে বুঝি এ জামা মানায় না ?'

'মানায় নাই তো।'

কি বলবো—শুনে চুপ করে গেলাম। দেখেছি—দেখছি কিন্তু এভাবে চিন্তা করিনি কখনো। যুব সম্প্রদায়ের এই পোষাক-আসাক যে আধুনিকতার লক্ষণ এমন মন্তব্যও কিছু কিছু কানে এসেছে। শুনেছি—মন্তব্য করিনি কিছু।

অবশ্য আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির বিদায় অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী কিছু বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সকল পর্যায়ের জনগণকে দায়িত্ব দিতে হবে। কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর বা কার্যকর হবে না যদি না তাঁরা বিকেন্দ্রীকরণ করেন, এবং জেলা পর্যায়ে, ব্লক পর্যায়ে, পঞ্চায়েত পর্যায়ে।

এ ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা খুব ভাল নয়। রাজ্যগুলি প্রায়ই বিশেষ বিশেষ কর্মসূচীর গ্রহণের জন্যে পীড়াপীড়ি করে। তারপর তাঁরা দেখতে পান ঐ কর্মসূচী জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা বিশেষ খাতে ব্যয়িত হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখের যে, এ-দেশের কিছু শিক্ষিত যুবক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে, আধুনিক হতে হলে বিশেষ ধরনের কাপড় জামা পরতে হবে, বিশেষ ধরনের সুরে গান গাইতে অথবা এটা-ওটা করতে হবে। কিন্তু এই সবের সঙ্গে আধুনিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি অবশ্য সেই সঙ্গে বলেন, এইসব ভাল কি মন্দ সে সম্পর্কে তিনি কোন অভিমত প্রকাশ করছেন না। লোকে কি জামা কাপড় পরে অথবা কিভাবে কথা বলে তাতে কিছু এসে যায় না, এগুলো নিতান্তই বাইরের জিনিস। এই ফ্যাসন আসে—আবার চলেও যায়। বিভিন্ন বয়সে তাঁরা সকলেই এই সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষিত যুবকরা ভারতীয় জীবনধারার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, এটা মোটেই ভাল নয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদেশের যুবকদের নয়, বেশির ভাগ লোকেরই বিশেষ নাগরিক বোধ নেই। তাঁদের সহর গ্রাম অথবা সামগ্রিক ভাবে দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ নেই। অতি-আধুনিক যুবকেরা, সংখ্যায় তাঁরা কত জানা নেই —নিরপেক্ষ স্বাধীন মনোভাব প্রদর্শন করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা যে কোন কর্তৃপক্ষকে সমালোচনা করাই হচ্ছে তাঁদের স্বাধীনতা। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কজন তাঁদের পরিবারে অনুষ্ঠিত সামাজিক অন্যায় অথবা যে সব জিনিস সমাজে অগ্রগতি ব্যাহত করছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজী হবেন। এসব ক্ষেত্রে সেই যুবকদের আধুনিকতা ও স্বাধীনতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। প্রগতিশীল, আধুনিক ও যুক্তিবাদী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আজকের দিনে একেবারে অচল রীতি-নীতি এবং প্রথা অনুসরণ করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

২৫শে এপ্রিল (১৯৫৬) প্রধানমন্ত্রী বলেন :

দেশ এখন এক যুগ থেকে আর এক যুগে উত্তীর্ণ হতে চলেছে।

দরিদ্র অনগ্রসরতার অবসানের জন্য দেশ আজ কঠিন সংগ্রামে রত। দেশের সমৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি এটাই একমাত্র পথ দারিদ্রের অবসান ঘটানোয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেই সঙ্গে এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের মতামত দেবার অধিকার থাকবে। দেশ থেকে দারিদ্র দূর করার জন্য দৃষ্টিভঙ্গী ও জনসাধারণের জীবন-ধারার আমূল পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন।

যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমাদের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থায় যে সব অবাঞ্ছিত জিনিস রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে যুব সমাজকে সংগ্রাম করতে হবে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন (২২. ৪. ৫৬.) :

দেশ ঐক্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক এবং এগিয়ে যাক এই তিনি চান।

তিনি বলেন, কোন দেশ ও তার জনগণের শক্তি নির্ভর করে সেই দেশের প্রতিটি অংশের সমৃদ্ধির ওপর। আমরা চাই যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ পান।

স্বাধীনতার আগে দেশের লোকেরা সামান্যই সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। আসলে দেশের ভালর জন্য তখন প্রায় কিছুই করা হয়নি। ভারত চিরদিন সম্পদশালী ছিল এবং সেই সম্পদই বিদেশীদের আকৃষ্ট করেছে। তারা তাই এদেশে শাসন ও শোষণ করতে এসেছে।

দাসত্বের যুগে এখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা দেশের বাকী অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। স্বাধীনতার পরে আমরা একে অন্যকে জানবার সুযোগ পাই।

তিনি বলেন, নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আসল লক্ষ্য হল, সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলি ও তার জনসাধারণকে উন্নয়নে সাহায্য করা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় সবাইকে সাহায্য করার সঙ্গতি আমাদের ছিল না। কিন্তু বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে আমরা অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছি। এখন আমাদের দেশের লোককে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে আমরা তৈরি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত এখন নিজেই বিমান তৈরি করছে, হেলিকপ্টার বানাচ্ছে, চাষ আবাদ ও প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হচ্ছে। 'আমরা এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি।'

বিজ্ঞজনের বক্তব্য (৩. ১০. ৭৫.) :

পশ্চিমবঙ্গের আধমরা গ্রামাঞ্চলে প্রাণ চাঞ্চল্যের খবর দিয়েই কথা স্থরু করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভাবনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কতগুলিকে বাস্তবায়িত করেই গ্রাম বাংলায় এই নতুন যুগের স্থচনা করলেন।

দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এতকাল ধরে যে প্রচেষ্টা চলেছে, যে সব প্রকল্প ও প্রস্তাব হয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে গ্রামে এরূপ প্রাণ সঞ্চার দেখিনি।

মুমূর্ষু গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের বহু প্রয়াস এতকাল লক্ষ্য করেছি, বহু মত ও পথের কথা শুনেছি, বহু আন্দোলন ও রক্তপাতের ঘটনার কথা লিখেছি। কিন্তু গ্রামবাসীর দরিদ্র মানুষের দুঃসময়ের যুগ এত তাড়াতাড়ি কেটে যাবে, এ কথা কেউ ভাবেন নি।

অহিংস আদর্শে, গণতান্ত্রিক উপায়ে দরিদ্র মানুষের কষ্ট দূর করা যায় একথা কেউ বুঝতে চাননি। কিন্তু জরুরী অবস্থার অনুকূল পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে গ্রামীণ গরিবী হঠাও কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। একথা আজ নিন্দুকদেরও স্বীকার করতে হবে। কারণ, শুধু কথা নয়, এবার কাজ হচ্ছে।

গ্রামের গরীব গৃহহীনরা বাড়ী তৈরীর জমি পাবে, ঋণ পাবে, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী চাষের জমি পাবে এবং দরিদ্র গ্রামবাসী কারুশিল্পী, ক্ষেতমজুর গরীব চাষী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ কোনদিন মহাজনী ঋণ থেকে মুক্তি পাবে একথা আগে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি।

কিন্তু বাস্তবে তাই হল। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভা তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

গ্রামের মানুষ—গরীব মানুষ কি পেলেন :

১। মহাজনী ঋণ মুকুব ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার গ্রামীণ পরিবার উপকৃত হচ্ছেন।

৩৪ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবারের মোট ৩৪ কোটি ৯৩ হাজার টাকা ঋণ একবারে মুকুব হয়েছে।

আংশিক ত্রাণ যাঁরা পাবেন সেই পরিবারেব সংখ্যা হল ২১ লক্ষ ১৬ হাজার এঁদের মহাজনী ঋণের মোট পরিমাণ ৩২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।

২। ২ লক্ষ ৬৯ হাজার গৃহহীন গ্রামীণ পরিবারকে ৮৬৮১৭ একর বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছে।

৩। ৮ লক্ষ ভূমিহীন কৃষি পরিবারকে (যাদের একেবারে জমি নেই এবং এক বিঘার বেশি জমি নেই এমন পরিবারকে) এখন পর্যন্ত ৫ লক্ষ ৬২ হাজার একর কৃষি জমি বণ্টন করা হয়েছে।

৪। ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি এবং কর্মবিনিয়োগ গ্যারান্টি প্রকল্প চালুর ব্যবস্থা হচ্ছে।

৫। যে সকল অভাবী চাষী জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন তাদের চাষের জমি, বাস্তু, পুকুর, কূপ, জলের নালা প্রভৃতি ফেরৎ পাবার আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। লুকান জমির পুনরুদ্ধারের অভিযান চলছে।

গরীব খাদক-মহাজনের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার কথা অনেকেরই জানা আছে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা মোকদ্দমায়, ঘরজ্বালানো, ফসল তছরূপে কোন বিভিষীকায় এদের সংকোচ নেই।

কিভাবে চাষীর জমি, দরিদ্র মানুষের ঘর বাড়ি, সম্পদ-সম্পত্তি মহাজনের কড়া মুষ্টিতে আটকে পড়ে তার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

সেই গরীব ঋণজর্জর মানুষের আজ ঋণ-মুক্তির ব্যবস্থাকে দলমত নির্বিশেষে সকলেরই সাধুবাদ জানান কর্তব্য।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে ফজলুল হক্ সাহেবের নেতৃত্বে অবিভক্ত বঙ্গের সরকার গ্রামের গরীব চাষীদের মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করার আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

তারপর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আইনের সাহায্যে মহাজনী ঋণ থেকে রাজ্যের পঞ্চান্ন লক্ষ পরিবারকে রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

রিজার্ভব্যাঙ্কের একটা রিপোর্ট থেকে দেখা গিয়েছে যে, ১৯৫১-৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ গৃহস্থ পরিবার প্রতি ঋণের গড় পরিমাণ ছিল ২৬২ টাকা।

তখন রাজ্যের গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি টাকা।

অথচ ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মত মোট গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি টাকা।

১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় কৃষিঋণ আইন, ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইন, ১৯৩৭ সালের পর ঋণভার বহুল পরিমাণে লাঘব করে দিয়েছিল।

কিন্তু কতকগুলি দুর্বলতার ফলে সেই সময় থেকে ঋণের ব্যবস্থা এমন সব

নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হল যা চাষীর পক্ষে অধিকতর অকল্যাণকর।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে সরকারী তথ্য অনুযায়ী সাত বছর ঋণের দায়ে গিয়েছিল। একমাত্র ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় অবিভক্ত বাংলার ৪,০৮,৮৩৫ বিক্রয় কবলা রেজিষ্ট্রি হয়েছিল।

অন্যান্য বছরে রেজেষ্ট্রিতে প্রায় দু-লাখ কবলা। পক্ষান্তরে দখলী রেহান কমে গেল।

দুর্ভিক্ষের অবসানে চাষী বুঝল, জমি বিক্রি অপেক্ষা ঋণ করাই ভাল। নিজের জমি না থাকায় ভাগ চাষীর ঋণ সংগ্রহ কঠিন হত।

এই ঋণের টাকা কিভাবে ব্যয় হয় তার বহু তথ্য অতীতের বহু রিপোর্টে রয়েছে। জমির উপার্জনে ব্যয় নির্বাহ হয় না বলেই চাষী ঋণ করে থাকে এবং এই ঋণ শোধের উপায় থাকে না বলেই তাদের ঋণভার বেড়েই চলে।

উৎসব, মোকদ্দমার নেশা, অমিতব্যয়িতা চাষীকে এত বেশি ঋণে জর্জরিত করে এ-ধারণা তথ্য ভিত্তিক নয়। জীবনধারণের উপযোগী অপেক্ষা কম আয় চাষী মজুরের চিরদিনের সমস্যা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের কথা ভাববার মত তার অবসর কোথায়?

কিন্তু মহাজনী ঋণ ব্যবস্থার বিলোপ ঘটনাই সব সমস্যার সুরাহা হতে পারে না। গ্রামের গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধি ও চাষের জন্য ঋণ পাওয়ার নতুন সূত্র ফলাতেই হবে।

এজন্যে সমবায়ের ও সম্প্রসারণ গ্রাম্য ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। উৎ-পাদনের স্বার্থে—কৃষকদের স্বার্থে—গরীব মানুষের কল্যাণে অর্থ বিনিয়োগ ও ঋণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ না ঘটলে কৃষককে, গরীবকে মারবার নতুন কৌশল কুচক্রী গড়ে তুলবেই। সকল ক্ষেত্রে সতর্ক দৃষ্টি দরকার।

গ্রামের গৃহহীনদের ঘর বাড়ির জমি দেওয়াতেই সব শেষ নয়, বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে, সেই বাড়ি জমি বা চাষের জমি যাতে না আবার হাত ছাড়া হয় তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজেই গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং গরীব মানুষের দারিদ্র দূর করারই এই কঠিন কর্মযজ্ঞে রাজ্যের দলগত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

এখানে তর্কের বা রাজনৈতিক মতভেদের স্থান নেই। কারণ গরীদের কল্যাণ বিধানই যখন সকলের লক্ষ্য।

এবং (২.১.৫৬):

পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে।

নতুন বছরে নতুন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে যাবে।

এই প্রত্যাশা পূরণের জন্যে বহু কিছু করার আছে। তার মধ্যে সর্বাগ্রে পশ্চিমবঙ্গের কর্মহীন-কর্মক্ষম গরীব মানুষের সমস্তার প্রতি সরকার পরিকল্পনা কমিশন, কংগ্রেসসেবী ও সমাজসেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

কারণ, বেকারত্ব আজও বিরাট সমস্যা।

আমাদের আশা, রাজ্যের কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুবশক্তি, ছাত্রশক্তি প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে গ্রামীণ দারিদ্র দূর করার সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করার জন্যে সর্বতোভাবে এগিয়ে আসবেন।

জরুরী পরিস্থিতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কুড়ি দফা কর্মস্থচী যে স্থযোগ ও সম্ভাবনা স্থষ্টি করেছে, তাকে কাজে লাগাতে হলে সবিস্তারে কর্মোদ্যোগে যেমন চাই সমন্বয়, তেমনি চাই সহযোগিতা।

এই কর্মস্থচীর সফল রূপায়ণের মধ্যে রাজ্যের কর্মহীন মানুষের কর্মসংস্থানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৫১ সালের আদম স্থমারীর হিসাবের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় তৎকালীন কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে :

গ্রামে—১ কোটি ৬৪ লক্ষ।

শহরে—৬৬ লক্ষ।

রাজ্যের কোন না কোন কাজে যুক্ত আছেন (অস্থায়ী ও বেকার সহ) এমন লোকের সংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষের মত। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক ছেলেও আছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে রাজ্যের ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ (১৯৭১) লোকের মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সের ছেলে মেয়ের সংখ্যা—১ কোটি ৯০ লক্ষ।

১৫ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে—২ কোটি ৩০ লক্ষ।

৬০ বছরের ওপরে—২২ লক্ষ।

ছুটো হিসাব বিচার করলে দেখা যাবে ওই সময়ে কর্মক্ষম ১ কোটি ৫ লক্ষ লোক কর্মহীন বা আধা কর্মহীন পর্যায়ে ছিল।

এই ১ কোটি ৫ লক্ষ লোকের মধ্যে :

গ্রামের—৭৩ লক্ষ।

সহরে বসবাসকারী—৩২ লক্ষ।

মোট উপার্জনক্ষম মানুষের প্রায় ৪৫ শতাংশের কাজের সংস্থান, উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি তখন থেকেই জরুরী প্রশ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে (অবশ্য এই কর্মহীনদের এক বিরাট অংশ মহিলা। তাদের সকলের জন্যে না হলেও, বেশি বড় সংখ্যকের জন্যে নিশ্চয়ই কাজের প্রয়োজন আছে)।

গত কয়েক বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মক্ষম মানুষের হার বেড়েছে।

তেমনি দারিদ্র সীমার তলায় বসবাসকারীদের জীবন সংগ্রামের তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সেই জটিল ও ব্যাপক সমস্যার মোকাবিলার জন্যে সরকার কতকগুলি স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প চালু করেছেন। চাহিদার তুলনায় তা স্বল্প হলেও অসংগঠিত শ্রমিক, ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর, ভাগচাষীর উন্নতির পথ খুলে গিয়েছে।

গ্রামীণ দারিদ্র দূর করার সংগ্রাম শুরু হয়েছে।

খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে।

গ্রামের ভূমিহীনদের মধ্যে জমি বণ্টিত হয়েছে।

গৃহহীনদের মধ্যে বাস্তুজমি দেওয়া হয়েছে।

ঋণ রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজ্যসরকারের হিসাব অনুযায়ী গত তিন বছরের প্রতিবছরে গড়ে পশ্চিম-বঙ্গের সহর এলাকায় একলক্ষ কুড়ি হাজার লোকের নতুন কর্ম সংস্থান হয়েছে (এর মধ্যে বহু কলকারখানা খুলে যে-সব চাকরী রক্ষা করা হয়েছে তা ধরা হয়নি—এইভাবে আরো পঞ্চাশ হাজার কর্মীর চাকুরী রক্ষা পেয়েছে)।

এতে সরকার আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নেননি। কারণ, সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে সরকার সজাগ। জনগণের কর্মসংস্থানের সমস্যা কোন যাদুমন্ত্রে একদিনে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়—একথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের যে তিন কোটি একলক্ষ লোক সরকারী হিসাব মত দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে—যাদের দৈনিক মাথাপিছু ব্যয় করার ক্ষমতা উনচল্লিশ পয়সা থেকে আশী পয়সা তাদের আর্থিক দুর্দশা দূর করার জন্যে সমস্ত অর্থশক্তির সমন্বয় করা আজ একান্ত দরকার।

এ রাজ্যের মাত্র বাইশ লক্ষ (৪ কোটি ৪৩ লক্ষের মধ্যে—১৯৫১ এর হিসাব অনুযায়ী) মোটের ওপর স্বচ্ছন্দে বসবাস করছেন।

এই পটভূমিকায় রাজ্যসরকার ক্ষেত-মজুরদের ন্যূনতম মজুরী বৃদ্ধি করেছেন। মূলতঃ ক্ষেত-মজুর ও ক্ষুদ্র চাষীদের জীবনধারণের মান উন্নয়ন ও কাজের

সংস্থানের জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি প্রয়োজন। কিন্তু অসংগঠিত শিল্প-শ্রমিক, ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্মীদের জীবন-যন্ত্রনা দূর করাও এই সঙ্গে সঙ্গেই আরও ব্যাপকভাবে করার প্রয়োজন আছে। এই অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করাই হল আজকের কর্তব্য।

আশা করব, কংগ্রেস এই গ্রামীণ শ্রমিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত করার দৃঢ় সঙ্কল্প বাস্তবে রূপ দেবেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যুবকংগ্রেসদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, সরকার এই রাজ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে ৬,০৮,৪৬৪ একর জমি বণ্টন করেছে। প্রকৃত গরীব ভূমিহীন সেই জমি পেল কিনা, এর মধ্যে কোন ত্রুটি ঘটেছে কিনা তা আপনারা খোঁজ নিয়ে সরকারকে সেই তথ্য দিন।

তেমনি সরকার গ্রামের গৃহহীনদের ২,৭৩,৭১২টি পরিবারেরকে বাস্তু জমি দিয়েছে। সেই বাস্তু জমির বিলি বণ্টনে কোন গলদ আছে কিনা তা সরকারকে জানাতে আপনারা সক্রিয় উদ্যোগ নিন।

গ্রামের তিরিশ লক্ষ পরিবার গ্রামীণ ঋণ থেকে রেহাই পেয়েছেন সরকারী আদেশে। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে যুবকংগ্রেস উপযুক্তভাবে সাড়া দেবেন নিশ্চয়ই।

মহাজনি-জোতদার ও দাদন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে,জমির সুষম বণ্টনে, কৃষি মজুরদের ন্যায্য মজুরীর দাবী, গ্রামাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প গঠনের জন্যে বা কৃষি ঋণ আদায়ে যুবশক্তি তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এই জন্যে গ্রামের যুবক ও ছাত্রদের সংগঠিত করার দায়িত্বও তাদের গ্রহণ করতে হবে।

. কিন্তু মনে রাখতে হবে, দূরদৃষ্টির অভাবে অনেক সময় ভাল প্রকল্প ও প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াতেই কর্তব্য শেষ হতে পারে না। সেই জমি চাষ করার জন্যে যে-সব উপাদান প্রয়োজন তার সংগ্রহ করার জন্যেও তাকে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে হবে। সেই চাষের জমি বা বাস্তু জমি যাতে হস্তান্তরিত না হয়, গোপনে 'বন্ধক' না পড়ে তার জন্যেও ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প সংস্থাপনের কার্যক্রমকেও যুবকদের কাজে রূপ দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের তালিকায় প্রায় ১৭ লক্ষ লোকের নাম আছে। তার ৩০ শতাংশ গ্রাম এলাকায় শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত কর্মপ্রার্থী। বাকি শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। প্রতি বছর বাজারে অনূন্য ৪০ হাজার নতুন কর্মপ্রার্থী কাজের সন্ধানে আসছে। এদের মধ্যে কিছু আধা-

বেকার প্রার্থীও আছে। এই ব্যাপক বেকারীর পরিস্থিতিতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মারফৎ বাধ্যতামূলকভাবে লোক নিয়োগের দাবীটা কার্যকর করার কথা চিন্তা করতেই হবে। রাজ্যের চাকরীতে রাজ্যের সন্তানদের অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা শুধু কথায় নয়, কাজেও পরিণত করার কথা সরকারকে স্থির করতে হবে।

রাজ্যের কৃষি, শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আরও দ্রুত কাজের সৃষ্টির পরিবেশ আজ রাজ্যে রয়েছে। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন-খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের সমস্ত পরিকল্পনা ও আর্থিক উন্নয়নের গতি বেগবান করতেই হবে।

২০ শে মার্চ ১৯৫৬।

এটি একটি প্রতিবেদন—আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে জনগণের প্রতি প্রতিবেদন।

বিধানসভার চলতি অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজ্যপালের দেওয়া সংকেত মতো বর্তমান বিধান সভায় এটি হয়তো আমাদের শেষ বাজেট অধিবেশন, কারণ সাধারণভাবে বিধানসভায় নির্বাচন আগামী বছরেই হওয়ার কথা।

আমাদের কার্যকালের চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হল এবং এই সময়ের মধ্যে আমরা যা কিছু করার চেষ্টা করেছি তা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

আমরা সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি অথবা পশ্চিমবাংলাকে সোনায় মুড়ে দিয়েছি এমন দাবী আমরা করি না। বস্তুত আমরা অকপটে স্বীকার করি যে, ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, এবং ব্যর্থতাও ঘটেছে।

আমরা সবাই সাধারণ মানুষ। আমাদের মন্ত্রী পরিষদে অসাধারণ মানুষ কেউ নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ যেমন ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন আমরাও সেরকম ভুল-ভ্রান্তি করে থাকতে পারি।

কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। নিষ্ঠাবান হতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম বাংলার ভাই বোনেরা আমাদের ওপর যে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করেছেন আমরা আন্তরিকভাবে তার যোগ্য হতে চেষ্টা করেছি।

আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে আমরা অকৃত্রিম চেষ্টা করেছি। আমরা সফল হয়েছি কিনা সে বিচার আপনারাই করবেন। আমরা তাই প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। রায় দেওয়ার ভার আপনাদের ওপর।

যদি ব্যর্থতা ঘটে থাকে তবে ক্রটি আমাদের। আর যদি সাফল্য কিছু থাকে তবে তার কৃতিত্ব পশ্চিমবঙ্গের জনগণের—যাঁরা সমস্যা-সঙ্কুল দীর্ঘ এই চার বছর ধরে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন, সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা, সীমাহীন উৎসাহ দান ও স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি দিয়ে।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

পরিকল্পনার আয়তনে বিপুল বৃদ্ধি :

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত চার বছরে পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার আয়তন যে পরিমাণ বেড়েছে, দেশের অন্য কোথাও এত বাড়েনি।

১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার আয়তন যা দাঁড়াবে তা হবে বর্তমান মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসার সময় যা আয়তন ছিল তার সাড়ে তিনগুণ বেশি।

১৯৫১-৫২ সালের আগের পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার আয়তন বেড়েছিল মোট তের কোটি টাকা, অর্থাৎ ৫৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে, ৬৬ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৫১-৫২ সালের পরবর্তী পাঁচবছরে এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ পরিকল্পনার মোট আয়তন দাঁড়াচ্ছে ২৩২ কোটি টাকা।

১৯৫৪-৫৫ সালে পঞ্চম পরিকল্পনা চালু হওয়ার পরবর্তী প্রথম তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনা বাবদ ৫৫৩ কোটি টাকা খরচ করবে। অর্থাৎ প্রথম তিনটি পরিকল্পনার পনের বছরে পরিকল্পনা বাবদ যা খরচ হয়েছিল, বর্তমানের অঙ্ক তার থেকেও বত্রিশ কোটি টাকা বেশী।

উদ্বৃত্ত বাজেট :

বর্তমান মন্ত্রীসভা প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় রাজ্যের হাল ধরে। ৫৯-৬০ সালে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫৩ কোটি টাকা।

বর্তমান সরকার কেন্দ্রের কাছে ১৩৫ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ৩০ কোটি টাকার ওভার ড্রাফট শোধ করে, বাৎসরিক পরিকল্পনা খাতে ব্যায় বরাদ্দ উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি করে এবং তা সত্ত্বেও পর পর দুবছর উদ্বৃত্ত বাজেট পেশ করেছে।

সম্পদ সংগ্রহ :

বিগত দিনে ঘাটতি বাজেট এবং সম্পদ সংগ্রহ ঠিকমত করতে না পারার দরুণ বাৎসরিক পরিকল্পনার আকার হত খুবই ছোট এবং সেই ছোট আকারের

পরিকল্পনাকেও পরে আরও ছাঁট-কাট করা হত।

১৯৫৬-৫৭ সালে ৬৭ কোটি টাকার মূল পরিকল্পনাকেও পরে ছেঁটে-কেটে ৫৩ কোটি টাকায় দাঁড় করানো হয়েছিল।

১৯৫৯-৬০ সালেও ৫৫ কোটি টাকার পরিকল্পনাকে পরে আরো ছোট করে ৪৫ কোটি টাকায় দাঁড় করানো হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে ১৯৫২-৫৩ সালে বর্তমান সরকার প্রথমে পরিকল্পনার আকার ৬৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৩ কোটি টাকায় নিয়ে যান, এবং পরে আরো বেশি সম্পদ সংগ্রহ করার দরুণ শেষ পর্যন্ত খরচ করলে ৮৯ কোটি টাকা।

একই ভাবে ১৯৫৩-৫৪ সালেও ৯০ কোটি টাকার মূল পরিকল্পনাকে বাড়িয়ে ১০৭ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৫৪-৫৫ সালে পরিকল্পনার আকার বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০ কোটি টাকায়।

১৯৫৫-৫৬ সালে পরিকল্পনার মূল আয়তন ১৭০ কোটি টাকা স্থির হলেও প্রকৃত পক্ষে এ বাবদে খরচ হবে ১৯৮ কোটি টাকা।

অনেক বেশি বিক্রয় কর আদায় হচ্ছে।

১৯৫১-৫২ সালে বিক্রয় কর আদায়ের পরিমাণ যেখানে ছিল ৭৪ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে ঐ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা।

আগে যেখানে পাঁচ বছরে বিক্রয় কর আদায়ে বৃদ্ধির পরিমাণ কখনই ২০ কোটি টাকার বেশি হয়নি, সেখানে গত চার বছরে ওই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটি টাকা এবং আয়ের তুলনায় বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে চার গুণেরও বেশি।

পরপর তিন বছর স্বল্পসঞ্চয়ে শীর্ষস্থান অধিকার :

১৯৫৩-৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণ ৩৪ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ কোটি টাকা করার দরুণ সর্ব প্রথম এদেশে স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে প্রথমস্থান অধিকার কারে।

১৯৫৪-৫৫ সালেও এই ক্ষেত্রে ৮০ কোটি টাকা আদায় করার সূত্রে আবার শীর্ষস্থান দখল করে।

১৯৫৪-৫৫ সালে মোট আদায় হয়েছিল ৮৮ কোটি টাকা—স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এটাই হল সর্বকালীন রেকর্ড।

স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মোট জমার দুই তৃতীয়াংশ রাজ্য সরকার উন্নয়ন বাবদ ফেরৎ পান। এই বাবদ ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৪১-৫৫ পর্যন্ত দশ বছরে

সাধারণত রাজ্য সরকার ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি টাকা পেতেন।

সেখানে শুধু ১৯৫৪-৫৫ সালেই পশ্চিমবঙ্গ এ ধরনের সঞ্চয়ের দরুণ ৬৫ কোটি টাকা পেয়েছে।

উন্নয়ন খাতে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ :

১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত চার বছরে যেখানে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন বাবদ খরচ করা হয়েছিল ২৮৯ কোটি টাকা, সেখানে শুধু ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে এই খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা।

কৃষিতে অগ্রগতি :

এ বছর মোট ৫২ লক্ষ টন আমন ধান উৎপন্ন হয়েছে এবং এটি হল সর্ব-কালীন রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন। রাজ্যে অধিক ফলনশীল ধান চাষের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। গত পাঁচ বছরে সার ব্যবহারের পরিমাণও দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এই সময়ে ধান উৎপাদন বেড়েছে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি।

১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৩৯ হাজারেরও বেশি অগভীর নলকূপ বসান হয়েছে এবং ৩৩,২১৭টি পাম্প সেট বিতরণ করা হয়েছে।

সেচ :

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত যেখানে মাত্র ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার হেক্টর জমি সেচের জল পেত, সেখানে এখন ২৩ লক্ষ ১৬ হাজার হেক্টরেরও বেশি পরিমাণ জমি সেচের আওতায় এসেছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ :

স্বাধীনতার পর চব্বিশ বছরে যত পরিমাণ এলাকা বাঁধ দিয়ে বন্যার হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, গত চার বছরে তার চেয়েও বেশি পরিমাণ এলাকা বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে।

১৯৫৫-৫৬ সালের অন্যতম উল্লেখজনক সাফল্য হল মহানন্দা বাঁধ প্রকল্পের কাজ শেষ করা, এর ফলে মালদা জেলায় পৌনঃপুনিক বন্যার দরুণ ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ হবে।

পশুপালন ও ডেয়ারী উন্নয়ন :

১৯৫৫ সালে বেলগাছিয়ার কেন্দ্রীয় ডেয়ারীর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৫০ হাজার লিটার থেকে বাড়িয়ে দৈনিক ৩ লক্ষ লিটার করা হয়েছে।

হুগলী জেলার ডানকুনীতে আর একটি দৈনিক চার লক্ষ লিটার ক্ষমতা

সম্পন্ন ডেয়ারী তৈরি করা হচ্ছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সংকর পশু প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং এই কার্যসূচীর ফলে চল্লিশ হাজার পরিবার অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন।

মাছ চাষ :

১৯৫১-৫২ সালে মাছ-চাষীদের কাছে যেখানে ২৩-৩০ লক্ষ মাছের পোনা সস্তা দরে সরবরাহ করা হয়েছিল। সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে সরবরাহ করা হয়েছে ২১২-৫০ লক্ষ পোনা।

ভূমি সংস্কার :

৬-১০ লক্ষ একর চাষের জমি বিতরণের জন্য পাওয়া গিয়েছিল তার মধ্যে ১৯৫৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে ৬-০৮ লক্ষ একর জমি বিলি করে দেওয়া হয়েছে।

এই অতিরিক্ত জমি বিলির দরুণ লাভবান হয়েছেন ৮-১৫ লক্ষ পরিবার এবং তাদের মধ্যে ২-৮৬ লক্ষ হলেন তপশীলি জাতিভুক্ত এবং ১-৭৬ লক্ষ হলেন তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ।

বাস্তু জমি :

১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত ২, ৯৭, ৭০০টিরও বেশি বাস্তু জমি বিলি করা হয়েছে।

গ্রামীণ ঋণ মুকুব :

মহাজনী ঋণ মুকুবের ফলে প্রায় ৩৪ লক্ষ চাষী পরিবার লাভবান হবেন এবং তাঁরা প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ঋণের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

এ ছাড়া ২১ লক্ষ গ্রামীণ পরিবার প্রায় ৩২ কোটি টাকার মোট ঋণের দায় থেকে আংশিকভাবে মুক্তি পাবেন।

সমবায় :

১৯৫১-৫২ সালে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণের পরিমাণ যেখানে ছিল চার কোটি টাকা, সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে সেই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬ কোটি টাকা।

১৯৫১-৫২ সালে সমবায় ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল শতকরা কুড়ি ভাগ, আজ সেখানে পঁচাত্তর ভাগ ঋণ আদায় পাওয়া যাচ্ছে।

কুটির ক্ষুদ্রায়তন শিল্প :

১৯৫১-৫২ সালে রেজিস্ট্রীকৃত ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২৪,৭১২ সেখানে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৯,৮২২।

খিদিরপুরে একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এস্টেট তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।

ট্যাংরা ও কল্যাণীতে এস্টেট তৈরির কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

মালদায় একটি কমার্শিয়াল এস্টেট তৈরির কাজও সম্পূর্ণ প্রায়।

শিল্পে উন্নয়ন :

১৯৫২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সংগঠিত ক্ষেত্রে ১-৯৭ লক্ষ নতুন কর্ম সংস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, উল্লেখযোগ্য যে এই সংখ্যা হল এদেশের রেকর্ড।

১৯৫৬ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫২ সালের মার্চ পর্যন্ত ছ বছরে ৩১,০০০ লোকের কর্ম সংস্থানের সঙ্গে তুলনা করলে উপরিউক্ত তিন বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ হল ছয় গুণ।

১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ-রাজ্যে রেজেষ্ট্রিকৃত কোম্পানীগুলির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হল ১৮৭-৬৮ কোটি টাকা।

সেখানে ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত পাঁচ বছরে রেজেষ্ট্রিকৃত সব কোম্পানির মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২৮-৫৩ কোটি টাকা—অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ হল ৬০ কোটি, তাও মাত্র কয়েক মাসে।

১৯৫২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন বছর ন' মাসে ২,০৪০টি নতুন কোম্পানি রেজেষ্ট্রি হয়েছে এবং তাদের মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হল ৬৭৫-২৭ কোটি টাকা।

১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত চার বছরে পশ্চিমবঙ্গে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির পেড-আপ-মূলধনের পরিমাণ যেখানে মাত্র ১১-৬৫ কোটি টাকা বেড়েছিল, সেখানে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত চার বছরে বেড়েছে ১৭২ কোটি টাকা।

১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৪-৫৫ পর্যন্ত তিন বছরে সারা ভারতের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের জন্যে মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ হল ৯৫-৫৪ কোটি টাকা।

অথচ পূর্ববর্তী তিন বছরে সেই পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৩-৭৫ কোটি টাকা।

১৯৫২ সালের মার্চ মাসের পর থেকে ৩১৭টি প্রকল্পের কাজ কর্মে উল্লেখ জনক অগ্রগতি হয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ হল ৫৪৬-৪৭ কোটি টাকা।

এর মধ্যে ১৮০টি প্রকল্পের নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গিয়ে প্রকল্পগুলি চালু

হয়ে গিয়েছে।

১৯৫২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন ৯২টি প্রকল্পকে সাহায্য যুগিয়েছেন, এবং এদের মধ্যে ২৪টির নির্মান কার্য শেষ হয়ে গিয়ে চালু হয়ে গেছে।

সরকারী সংস্থা :

১৯৫৪-৫৫ সালে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডের ব্যবসার পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৪-৩৫ কোটি টাকা, অথচ দুবছর আগে এই পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকা।

একই ভাবে ১৯৫৪-৫৫ সালে অ্যাগ্রো-ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশনের ব্যবসার পরিমাণ হল ১২-৯০ কোটি টাকা, যেখানে দু বছর আগে ওই পরিমাণ ছিল ৮-৬০ কোটি টাকা।

১৯৫৪-৫৫ সালে ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশনের ব্যবসা হয়েছে ১৩-০২ কোটি টাকার অথচ ১৯৫২-৫৩ সালে ব্যবসা হয়েছিল ৬-২৯ কোটি টাকার।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪-৩০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন অথচ পূর্ববর্তী বছরে ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২-২৫ কোটি টাকা।

বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প :

বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে রাজ্যের চোদ্দটি রুগ্ন রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প দেখাশোনা করছেন ন্যাশনাল টেকস্টাইল কর্পোরেশন লিমিটেডের সহায়ক সংস্থা। তাঁরা ইকুইটি ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশ নিয়েছেন এবং রাজ্য সরকারও তাঁদের সঙ্গে আছেন। উপরিউক্ত মিলগুলিতে উৎপাদন চালু আছে এবং ফলে ষোল হাজারেরও বেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। বস্ত্রশিল্প বহির্ভূত ক্ষেত্রের চারটি রাষ্ট্রায়াত্ত ইউনিটে এক হাজার আটশো লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ :

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মার্চ পর্যন্ত যেখানে মাত্র ৩,৩২৮ টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১০,৪৪৭ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৯৫২ সালের পর থেকে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা-সম্পন্ন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। গত চার বছরে ২৩,০০০ সিকে এম-এরও বেশি ট্র্যান্সমিশন ও ডিষ্ট্রিবিউশন লাইন তৈরি করা হয়েছে। এই পরিমাণ ১৯৫২ সালের মর্চে যে পরিমাণ ছিল তার চেয়ে ১৭০০০ সিকেএম বেশি।

এলাকা উন্নয়ন :

১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব প্রথম জেলা সহরগুলির উন্নয়নের জন্যে আলাদা অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।

১৯৫২ সালের আগে পর্যন্ত বিভাগীয় উন্নয়ন কাজ ছাড়া, পার্বত্য এলাকার জন্যে আলাদা কোন অর্থ বরাদ্দ করা হত না। কিন্তু ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সালের মার্চ পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্যে ৩-১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১৯৫৩ সালের মার্চে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষৎ গঠিত হবার পর চোদ্দটি কাঠের জেঠি, সাতটি কাঠের সেতু এবং চুয়াত্তরটি খাল ও বাঁধের নির্মাণ কার্য শেষ করা হয়েছে।

উপরন্তু সুন্দরবন এলাকায় ১২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২৪ লক্ষ শ্রম-দিবসের কর্ম সংস্থান হচ্ছে।

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন পর্ষৎ ঝাড়গ্রামের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

সি এম ডি এ :

বর্তমানে সি এম ডি এ জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা স্যানিটেশন, পরিবহন, বস্তী উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত আছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হল ৩৫-৩৮ কোটি টাকা।

হাওড়া ষ্টেশন এলাকায় নবনির্মিত একত্রিত সাবওয়ে ও পরিবহন উন্নয়ন ব্যবস্থা এদেশে কাজের মধ্যে সর্ববৃহৎ। সহরের একাধিক রাস্তা চওড়া করা হয়েছে এবং ভাল করা হয়েছে।

সি এম ডি এ বৃহত্তর কলকাতায় জল সরবরাহ বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন এবং যাদবপুর, টালিগঞ্জ, হাওড়া, দমদম এবং বৃহত্তর কলকাতার অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশী ব্যবস্থা তৈরি করেছেন।

বস্তী উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১৫০০ বস্তীতে পানীয় জল, স্যানিটারি পায়খানা, বিদ্যুৎ এবং পাকা রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এর ফলে বার লক্ষেরও বেশি বস্তীবাসী উপকৃত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা :

১৯৫২ সালের ২০শে মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালগুলিতে প্রতিদিন পাঁচটি নতুন শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে, জেলা ও মহকুমাগুলিতে ২,৩৬১টি নতুন শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জেনারেল ও বিশেষ হাসপাতালগুলিতে

নতুন শয্যা বেড়েছে ৯২০টি।

১৯৫৫-৫৬ সালে যে পরিমাণ টিউবেকটমি হয়েছে তা হ'ল যে কোন একটি বছরের পক্ষে রেকর্ড।

১৯৫৫-৫৬ সালের এপ্রিল থেকে জানুয়ারীর মধ্যে যে পরিমাণ ভ্যাসেকটমি হয়েছে সেই সংখ্যা গত তিন বছরের মোট সংখ্যার তিন গুণেরও বেশি।

শিক্ষা:

১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সমস্ত সহরাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে আয়োজিত দ্বিপ্রাহরিক আহারের কর্মসূচীর দরুণ ১৪,৫৭,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নতুন বেতন হার অনুমোদিত হয়েছে এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন হার সংশোধন করে বাড়ানো হয়েছে।

যুব সার্ভিস:

বর্তমান সরকার নতুন কর্মোদ্যোগ হিসাবে যুব সার্ভিসের কাজ সুরু করেছেন। বর্তমানে চল্লিশটি ব্লক যুব কেন্দ্র এবং একটি যুব সার্ভিসেস কোর আছে।

তথ্য ও জনসংযোগ:

বর্তমানে রাজ্যে ২,৭০০টি গ্রামীণ প্রচার কেন্দ্র আছে এবং বেশির ভাগ কেন্দ্রেই রেডিও গ্রামীণ ফোরাম আছে যেখানে গাঁয়ের মানুষ একত্রিত হয়ে কৃষি ও গ্রামীণ সংবাদ শুনতে পারেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৫৫-এ আয়োজন করা হয়েছিল এবং এতে সাতশটি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৫৫ সালের আগষ্ট থেকে বহু প্রতীক্ষিত টেলিভিশন কেন্দ্র কাজ সুরু করেছে।

অতিরিক্ত কর্মসংস্থান প্রকল্প:

১৯৫৩-৫৪ সালে রাজ্য সরকার শিক্ষিত বেকারদের প্রান্তিক অর্থ সাহায্য হিসাবে ৮৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১'৩০ কোটি টাকায়।

১৯৫৫-৫৬ সালে প্রান্তিক অর্থ সাহায্যের পরিমাণ আরো বাড়বে, কারণ ১৯৫৬ সালের জানুয়ারীর মধ্যেই ১·২৬ কোটি টাকার সাহায্য দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

বিশেষ কর্মসংস্থান কার্যসূচী :

এই কার্যসূচী বাবদ ১৯৫৫-৫৬ সালে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এর ফলে বিশেষ করে অদক্ষ শ্রেণীর ৩০,০০০ লোকের জন্য কর্মসংস্থান করা যাবে ।

গ্রামীণ উৎপাদন কার্যসূচী :

১৯৫৫-৫৬ সালে রাজ্য সরকার ছ'কোটি টাকা ব্যয়ে একটি গ্রামীণ উৎপাদন কার্যসূচী চালু করছেন, এর ফলে ১০০ লক্ষ শ্রম দিবসের মত কর্মসংস্থান হবে।

আমার যেন কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কি হয়েছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। অথচ এই একটা কিছু হওয়া আমার দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম নয়। বহুবার এমন হয়েছে—আমার কিছু ভাল লাগে না। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বোধ করি। কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ ঘঠে না। মনে প্রাণে আমি কেমন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ি। নিত্য দিনের কাজ কর্তব্য কর্ম করে যাই মানুষের সঙ্গে কথা বলি হাসি গল্প করি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কি এক অনুভবের স্পর্শ আমার ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তোলে।

বিশেষ করে ক বারের ঘটনা জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার অঙ্গহানী, সরমার মায়ের লোকান্তর—আমার ছেলে এবং জামাইয়ের বেলাতেও অনুভূতির স্পর্শ অনুভব করেছিলাম।

সকালে কজন এসেছিলেন। সামান্য আগে চলে গেছেন তাঁরা। আর কদিন পরেই সরমাদের স্কুলে পরীক্ষা স্থরু হবে। সরমা ব্যস্ত। বাবুনকে ঠিকমত দেখতে পারছে না।

সরমা সকালেই কোথায় বেরিয়েছিল। একটু আগেই ফিরেছে। ধমকে দিয়ে বাবুনকে স্নান করানোর শব্দ মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। স্কুল খুললেও বাবুন বাড়িতে পড়ছে। স্কুলে এখন ক্লাস হওয়ার প্রশ্ন নেই—আগামী সপ্তায় পরীক্ষা স্থরু।

'বাবা।' সরমা এসে ডাকল আমাকে।

আমি ওকে দেখলাম।

'তুমি আজ স্নান করনি এখনও?'

'সকালে ক'জন এসেছিলেন'……

'তুমি আজকের জলখাবার খাওনি ?'

'আজ একবারেই খেয়ে নেব।'

'তুমি এখনই স্নান করে এসো।'

'কটা বাজল ?'

'দশটা বেজে গেছে।'

'তুই স্নান করবি তো ?'

'তুমি আগে স্নান করে এসো।'

'এক কাজ কর—আমার স্নান করতে দেরি হয়, তুই স্নানটা করে নে আগে।'

সরমা একটু নীরবে চিন্তা করল। চলে গেল স্নান করতে। ও জানে আমাকে—চেনে। আমার অনিচ্ছাকে মেনে নেয়। ও জানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কিছু করি না।

বাবুনের আওয়াজ পাচ্ছি না। স্নান করার সময় মায়ের সঙ্গে গোলমাল হয়েছে। হয়তো রাগ করে বসে আছে কোথাও।

আকাশটায় একটা মেঘলা ভাব। বর্ষা এসেও চলে গেছে। কদিন বৃষ্টি নেই—গরম বেড়েছে। আষাঢ় মাসে এত গরম আগে দেখিনি। পাখির দল মেঘলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে চারি ধারে।

যাঁরা এসেছিলেন, পরিচিত, তিনজন ; আমার অনেক দিনের জানা শোনা কলকাতায় একটা জরুরী কাজে এসেছেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন। থাকবার কথা বলেছিলাম। ওঁরা বর্ধমান ফিরে যাবেন কাজ শেষ হলেই।

টুকরো টুকরো কথা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। কিছু প্রশ্নোত্তর কিছু পুরানো স্মৃতি মনে করার চেষ্টা। অবশেষে আমি শ্রোতায় পরিণত হয়েছিলাম

আলোচনার বিষয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদ, রাজ্য-রাজনীতি, মুখ্যমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী, বাজার দর বর্ধমানে চাষে অবস্থা—আরো কিছু। শেষে থেমেছিল সংবিধানে। একটু উষ্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল—ভেতর থেকে মেয়েটা চা খাবার নিয়ে এসেছিল ঠিক সময়েই। আলোচনা মুলতুবি ছিল। এবং শেষে সময়াভাব। বিদায় গ্রহণ। যাবার সময় জানিয়ে গিয়েছিল আমন্ত্রণ।

সরমা আসবার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত সংবিধান সংশোধনের কথাটাই মনে করার চেষ্টা করেছিলাম। মনে পড়েছিল।

২১শে মে (১৯৫৬) লোকসভায় আইনমন্ত্রী সংবিধান (৪২তম সংশোধনী) বিলটি পেশ করেন। এই বিলের লক্ষ্য বিবিধ।

(ক) কিছু বড় ধরনের কেন্দ্রীয় আইন আদালতের চ্যালেঞ্জের বাইরে রাখা ;

(খ) সংবিধানের নবম তপশীলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষ করে কয়েকটি রাজ্যের ভূমি আইনগুলিকেও একই ধরনের রক্ষা কবচ দেওয়া এবং (গ) ভারতের আঞ্চলিক দরিয়া, কনটিনেণ্টাল সেলফ, নিজেদের অর্থনৈতিক এলাকা এবং সামুদ্রিক এলাকা সীমা সংসদের তৈরী আইন দ্বারা যাতে মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা।

ওই বিলে আছে, ভারতের একবারে নিজস্ব অর্থনৈতিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রের সব জমি, খনিজ পদার্থ এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী এবং ওই এলাকার অন্যান্য সম্পদও কেন্দ্রীয় সরকারের। যে কয়টি আইনকে নবম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার গৃহীত পাঁচটি আইন।

এই আইনগুলো হল :

১৯৫২ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন,

১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ হস্তান্তরিত জমি পুনরুদ্ধার আইন,

১৯৫৪ সালের ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন,

১৯৫৫ সালের ভূমিসংস্কার (সংশোধন) আইন,

১৯৫৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার (সংশোধন) আইন।

১৯৫৬ সালের চোরাচালান এবং বৈদেশিক মুদ্রা চোরা ব্যবসায়ী (সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত) আইন,

১৯৫৬ সালের শহরাঞ্চলে জমি (উর্ধ্বসীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন,

১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক পণ্য আইন,

১৯৩৯ সালের মোট ভেহিকলস্ আইনের কিছু শর্তকেও নবম তপশীলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য : এ গুলিকেও আদালতের চ্যালেঞ্জের বাইরে রাখা।

বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, যদি ওই আইনগুলোকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এর ফলে এদের রূপায়নে বিলম্ব ঘটে, তাহলে উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং জাতীয় অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিছু বে-সরকারী বন সম্পর্কে কয়েকটি রাজ্যের আইনকেও নবম তপশীলের অন্তর্ভূক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। এবং পঞ্চান্নটি আইনকে নবম তপশীলের অন্তর্ভূক্ত করতে চাওয়া হয়েছে।

বিলটির উদ্দেশ্য ও বিল আনার কারণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা হল, সংবিধানের ২৯৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সমস্ত জমি, খনিজ সম্পদও আঞ্চলিক দরিয়া বা মহাদেশীয় দরিয়ার মধ্যে সমুদ্রগর্ভে যে সব মূল্যবান সম্পদ আছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তি ও কেন্দ্রের প্রয়োজনেই কাজে লাগানো হবে। নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চলের ওপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার আছে এবং আরও কয়েকটি বিষয় ভারতের এক্তিয়ারে পড়ে।

আইন মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাষ্ট্রপতিব ঘোষণার দ্বারা ভারতের আঞ্চলিক দরিয়া' মহাদেশীয় দরিয়া ও নিজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। ২৯৭ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে ওই ক্ষমতা সংসদকে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। সংসদে গৃহীত আইনের সাহায্যেই আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় দরিয়া ও নিজস্ব অর্থনৈতিক এলাকার সীমানা নির্দিষ্ট হবে।

তিনি বলেন, যখনই দেখা গেছে, জনস্বার্থে রচিত প্রগতিশীল আইন মামলা-মোকদ্দমার ফলে ঠিকমত কার্যকর করা যাচ্ছে না, অতীতেও ওইসব আইন নবম তপশীলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ভূমি সংস্কার ও কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কয়েকটি আইন ইতিমধ্যেই নবম তপশীলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এই সব আইনের সংশোধন করে যে নতুন আইন তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে রাখার জন্যে ব্যবস্থা করা দরকার।

ভূমিসংস্কার আইন ছাড়াও বেসরকারী অরণ্য সম্পর্কে কয়েকটি আইনকেও আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা প্রয়োজন। মামলা-মোকদ্দমার জন্যে এইসব প্রগতিশীল আইন কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই সংশোধনীতে প্রস্তাব করা হচ্ছে, ওইসব আইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইনের নাম তপশীলভুক্ত করা হোক।

এবং.........

ভারত 'সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র' হোক : স্বর্ণসিং কমিটি (২২.৫.৫৬)।

কমিটির সুপারিশ :

সংবিধানের ভূমিকা একটু বদল করা হোক। এখন ওই ভূমিকায় বলা আছে যে, ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তা বদলে করা হোক :-

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র।

কমিটি বলেছেন :

সংবিধানের কোন নীতি-নির্দেশ কাজে রূপায়িত করতে গেলে যাতে ওই কাজকে মৌল অধিকারে হস্তক্ষেপের অনুপাত তুলে তাতে বাধা না দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংখ্যালঘু, তপশীল জাতি ও উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে প্রদত্ত কোন রক্ষা কবচে হাত দেওয়া চলবে না।

রাষ্ট্রপতি দরকার হলে দেশের একটি অংশে জরুরী অবস্থা জারি করতে পারবেন। দেশের একাংশ থেকে জরুরী অবস্থা তুলে নিতেও পারবেন। এখন জরুরী অবস্থা জারি করতে হলে সারা দেশে তা জারি করতে হয়।

কোন রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটলে তা মোকাবিলার জন্যে কেন্দ্রের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে সেখানে পুলিশ বা অনুরূপ বাহিনী পাঠাতে পারবেন।

শিক্ষা ও কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কাঙ্খিত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। এজন্যে কমিটি এই দুটো বিষয়কে যৌথ তালিকায় আনার সুপারিশ করেছেন।

কমিটির অভিমত :

নির্বাচনী ব্যাপারে কোন কিছু আবেদন করা যাবে না।

কমিটি সংবিধানের ভূমিকায় আরও সংশোধন করে তাতে শুধু দেশের 'ঐক্যের' নয় সংহতিরও আশ্বাস দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

কমিটি শুধু সংবিধানের ভূমিকার পরিবর্তনেরই প্রস্তাব করেননি। কমিটির এই প্রতিবেদনে সংবিধানেরও 'গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে'র সুপারিশ করেছেন। এগুলো মুখ্যতঃ হাইকোর্টের কতকগুলো ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখা সম্পর্কে।

কমিটি মনে করেন, ভারতের মত এই বিশাল দেশে এবং এদেশে যে ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে, তাতে দেশের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে সংসদীয় ব্যবস্থাই সর্বোত্তম। এই ব্যবস্থায় জনগণের মতামত সবচেয়ে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়।

২৫ শে জুন, ১৯৫৬।

জরুরী অবস্থায় বিরোধীরা দমে আছেন, কিন্তু একেবারে পরাস্ত হননি। এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার একবছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি বলেন, নানারকম

পোষাক পরে এবং বিভিন্ন শ্লোগান মুখে নিয়ে বিরোধীরা পুনরাবির্ভূত হলেও এঁদের লক্ষ্য কিন্তু একই রয়েছে। এবং সেটি হল : দেশের জন মানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অন্যায় দূরীকরণ ইত্যাদি বৃহৎ কর্মকাণ্ড থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখা।

তিনি বলেন, আমাদের রাজনৈতিক লাভের চেয়ে অর্থনৈতিক লাভটাই বেশি হয়েছে।

দেশের ভেতরে-বাইরে আজ যাঁরা বিরোধিতা করে চলেছেন তাঁরা জরুরী অবস্থা না হলেও তাই করতেন। কারণ, তাঁদের চোখে, সরকার কখনও ঠিক পথে চলতে পারে না। সামান্য কয়েকজন ছাড়া এঁদের সকলেই সারাজীবন আমার পিতা এবং তাঁর নীতিগুলোর বিরোধিতা করেছেন।

পশ্চিমী দেশগুলোর সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে সব খবর বেরিয়েছে সেগুলো লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার সরকার-গুলোকে দুর্বল করে দেবার এক বিরামহীন চেষ্টা চলেছে। শুধু তাই নয় ; যে সব নেতা স্বাধীন বলে নিজেদের ঘোষণা করেন তাঁদের ক্ষতি করার, এমনকি হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। এই কাজে জেনেশুনে অথবা অজান্তে যে সব ব্যক্তি বা দল সাহায্য করছে তাদের টাকা দিয়েও কেনা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রূপায়ণে যে ঢিলেমি চলছে তার জন্যে দায়ী সদিচ্ছার অভাব নয় ; এমন সব কারণ এর পেছনে রয়েছে যেগুলো সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের যুদ্ধ আমাদের কাঁধে এক বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। তার ওপর খরাতো আছেই।

তাঁর প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক দলের উচিত ছিল না কি একত্র হয়ে জনগণের সেবা করা ?—কিন্তু না, তাঁরা তা করেননি। বরং দেশ জুড়ে একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে তারা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিল।

আমাদের এখন প্রধান কাজ হল ভারতকে শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ করা যাতে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারি এবং বহিঃশত্রুর চাপ ও হুমকির মোকাবিলা করতে পারি।

তিনি বলেন এটা ঠিক, জরুরী অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এটাও খতিয়ে দেখতে হবে সত্যিকারের গণতন্ত্র উপোযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। এটা হলপ করেই বলা যায়, জরুরী অবস্থার পর দেশের

আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রশাসন, কলকারখানা সর্বস্তরের কাজ-কর্মে একটা নতুন জোয়ার এসেছে।

এবং তিনি বলেন : দেশের বিপদ এখনও আগের মতই রয়েছে।

সম্প্রতি একজন ইউরোপ গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ওই দেশের শাসক দলের একজন বিশিষ্ট সদস্যের সঙ্গে দেখা করেছেন। সদস্যটি তাঁকে বলেছেন, আমরা আপনাদের ক্ষতি করতে পারি। এবং আমরা তা করবও।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর জন্যে জরুরী অবস্থা দায়ী নয়। কারণ বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় নিশ্চয় জরুরী অবস্থা ছিল না। যে সময় আমি বহুদেশ ঘুরেছি ; কিন্তু তখন কেউ আমাদের সমর্থন করেনি—করেছিল একনায়কতন্ত্রী পাকিস্তানকে। সুতরাং ভারত তার নিজস্ব পথ ধরে চলবে। তাতে সাফল্য আসতে পারে কিংবা নাও আসতে পারে। কিন্তু আমরা কখনও অন্য দেশকে অনুসরণ করবো না।

তিনি বলেন, জরুরী অবস্থা বর্তমানে অনেকটা শিথিল করা হয়েছে। অনেক রাজনৈতিক নেতাকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাশকতামূলক কাজের এবং বাইরে থেকে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এখনও রয়েছে। শুধু তাই নয়, নাশকতামূলক কাজ হচ্ছে ভেতর থেকে এবং উস্কানি আসছে বাইরে থেকে।

জরুরী অবস্থার নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে জনসাধারণের চেতনা এসেছে বটে, কিন্তু এই নিয়মানুবর্তিতা এখনও জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠতে পারেনি।

তাঁর মন্তব্য :

১। ঠিক এই মুহূর্তে নির্বাচন সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি না,

২। আমরা ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তিতে অটল থাকতে চাই,

৩। আমাদের এমন একটা পদ্ধতি বার করতে হবে, যাতে গণতান্ত্রিক নিয়মানুবর্তিতা স্বাভাবিক জিনিস হয়ে দাঁড়ায়,

৪। আমরা জানি জরুরী অবস্থায় কি উপকার হয়েছে,

৫। আমাদের চেষ্টা উৎপাদন বাড়ান,

৬। আমাদের প্রতিবেশী প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র মজুত করেছে, সেই কারণে আশঙ্কা রয়েই গেছে,

৭। এখন আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে সেচ ও বিদ্যুতের ওপর।

কোন্ কোন্ অবস্থায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় :—

সংবিধানে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে :

অনুচ্ছেদ ৩৫২ (১) নং ধারা অনুযায়ী যুদ্ধ অথবা বহিরাক্রমণ কিংবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য ভারতের অথবা তার কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত জরুরী অবস্থা বর্তমান রয়েছে বলে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৩৫২ (২) নং ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত এই ঘোষণা

(ক) পরবর্তী একটি ঘোষণার দ্বারা বাতিল করা যেতে পারে

(খ) এই ঘোষণা সংসদের উভয় সভায় পেশ করতে হবে

(গ) দু মাস পরে এই ঘোষণার কার্যকারিতা থাকবে না, যদি না দুমাসের মধ্যে সংসদের উভয় সভায় এই ঘোষণার কার্যকারিতার মেয়াদ সম্প্রসারণ করে প্রস্তাব অনুমোদিত না হয়।

লোকসভা বাতিল হয়ে গেলে অথবা উপধারা গ-তে নির্দিষ্ট দুমাসের মধ্যে বাতিল হওয়ার পরে যদি জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় এবং এই ঘোষণার অনুমোদন করে রাজ্য সভায় প্রস্তাব গৃহীত না হয়, তাহলে পুনর্গঠিত লোকসভার প্রথম অধিবেশনের দিন থেকে তিরিশ দিন পরে এই ঘোষণার কার্যকারিতা থাকবে না। যদি না পুনর্গঠিত লোকসভা তিরিশ দিনের মধ্যে ঘোষণা অনুমোদন করে প্রস্তাব না নেয়।

যুদ্ধ অথবা অনুরূপ যে কোন ধরনের আক্রমণ কিংবা গোলযোগ বাস্তবে ঘটার আগেই রাষ্ট্রপতি বিপদ আসন্ন বলে মনে করেন, তাহলে ৩৫২ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ ৩৫৩ :

জরুরী অবস্থা ঘোষণা যখন বলবৎ রয়েছে, তখন—

(ক) সংবিধানে যাই থাকুক কেন্দ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে রাজ্য সমূহের প্রশাসনিক ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারবে,

(খ) ইউনিয়ন তালিকায় উল্লিখিত না থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অফিসার এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা অর্পণ অথবা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার কর্তৃত্ব অর্পণ করে যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৩৫৫ :

বহিরাক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে প্রত্যেক রাজ্যকে রক্ষা করার এবং সংবিধানে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারকে কার্যপরিচালনা সুনিশ্চিত করা কেন্দ্রের কর্তব্য হবে।

॥ অভিমত ॥

সময় মত ব্যবস্থা নেওয়ায় দেশ বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ॥

রাষ্ট্রপতি

সমলোচনা সহ্য করি, তবে দেশের উন্নতির পরিপন্থী সমালোচনা অসহ্য ॥

প্রধানমন্ত্রী

বিরোধীরা গণতন্ত্রকে বিপন্ন করেছিল ॥

বরুয়া

বিরোধীদের পরিকল্পনানুযায়ী সত্যাগ্রহ করতে দিলে বহু নিরপরাধ লোক মারা যেত ॥

চবন

দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মেটাতে এক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এক দল লোক দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য পুলিশ ক্ষেপিয়ে, সামরিক বাহিনীকে উত্তেজিত করে দেশকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধী সেই নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে বাঁচিয়েছেন। সেই জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের মানুষও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরী অবস্থায় তাঁরা আনন্দিত। দুঃখ পেয়েছেন তাঁরা—যাঁরা শক্তিশালী ভারত, অনুশাসনবদ্ধ ভারত এবং মহান ভারত চান না ॥

মুখ্যমন্ত্রী (পশ্চিমবঙ্গ)

আজ রবিবার। কাল শেষ হয়েছে সেই দিন—জরুরী অবস্থার এক বছর। শেষ রাতে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। এখনও পড়ছে। বাবুনকে সঙ্গে নিয়ে সকাল বেলাই সরমা কোন্নগর গেছে। জরুরী প্রয়োজন। গত রাতেই বলেছিল। আমার খাবার ব্যবস্থা করে গেছে। ধীর স্থির সরমাকে, ইদানীং কেমন যেন চঞ্চল মনে হচ্ছে একটু। যদিও সে চঞ্চলতার বহিঃপ্রকাশ চট করে

নজরে পড়ে না, কিন্তু আমি ধরতে পারি। কারণ আমার সন্তানদের পিতৃ-মাতৃ স্নেহে আমিই মানুষ করে তুলেছি একদিন।

বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্যই যদি তেমন কিছু হয় আমাকে বলবে।

সকাল থেকে বসে আছি। বৃষ্টি মাথায় গৌতমকে যেতে দেখেছি। রবিবার ও নষ্ট করতে চায় না। অসুবিধা হলেও বসে থেকে লাভ কি?

ভেবেছিলাম কেউ আসবেন না আজ। কিন্তু বৃষ্টি একটু কমতে শিশির হালদার আর রাজেন চৌধুরীকে আসতে দেখলাম। বারান্দায় উঠে রাজেন বাবু বললেন, 'চলে এলাম।'

শিশির হালদার বললেন, 'উনি দেখতে পাচ্ছেন আপনাকে।'

রাজেন বাবু বললেন, 'আপনার ছত্রছায়ায় এলাম সেটাই বলতে চাই আমি।'

শিশির হালদার বললেন, 'আমি তার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

বললাম, 'বসুন আপনারা।'

ওঁরা বসলেন।

শিশির হালদার বললেন, 'বর্ষা সুরু হয়ে গেছে। দেখবেন এবারও ফসল ভাল হবে।'

রাজেন চৌধুরী বললেন, 'তার কিছু ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই নয়, ঠিক আছে। দেখবেন ফসল ভাল হবে।'

'নাও হতে পারে।'

এবার স্পষ্ট বিরক্ত হলেন শিশির হালদার। বললেন, 'আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি, যতবার ভাল বলি ততবারই বাগড়া দেন—কেন ফসল যদি ভাল হয় আপনার কিছু অসুবিধা আছে?'

'কেন, আমার অসুবিধা হবে কেন?' রাজেন চৌধুরী বললেন, 'ভাল যদি হয়—আমারও ভাল হবে।'

'তাহলে বাগড়া দেন কেন?'

'আমি আকাশের মতি গতি·· ···'

'আরে রাখুন মশাই মতি গতি। স্বপ্ন দেখতে—আশা করতে দোষটা কোথায়? আপনি কি বলেন?

দুই প্রৌঢ়ের তর্ক শুনছিলাম। বার বার ফিরে যাচ্ছিলাম অতীতে। মনে পড়ছিল মাত্র এক বছর আগের কথা। ······দীর্ঘ আঠাশ বছরেও যা সম্ভব

হয় নি, কিংবা সম্ভব হবে বলেও আশা করা যায়নি—মাত্র একবছরে সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।

কেরল থেকে কাশ্মির পর্যন্ত একটা সাড়া পড়ে গেছে। সে সাড়া প্রাণ ধর্মের সাড়া। নতুন জীবন গড়ে তোলার আহ্বানে বিপুল ভারত-ভূমির কোটি কোটি মানুষ সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কাজ আর শৃঙ্খলাবোধের কঠোর প্রতীজ্ঞা বুকে নিয়ে। জরুরী অবস্থা ভারতবর্ষের এক নতুন ছবি এঁকেছে ভিন্নতর রঙ আর রূপে।

এখন বিক্ষোভ, ধর্ণা—ঘেরাও অনুপস্থিত। শিক্ষায়তনে বন্দুকের আওয়াজ নেই। হিংসা আর হানাহানি অনেক দূরে সরে গেছে। নিত্য-নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে এখন আর নিযুক্ত দেখা যায় না নিরীহ নাগরিকদের। তারা বুঝেছে, বুঝতে চেয়েছে হিংসায় সুফল পাওয়া যায় না।

তাই জরুরী অবস্থার পটভূমিতে প্রগতির প্রতিলিপি নতুন অর্থ নৈতিক কর্মসূচীকে তারা জানিয়েছে সাদর সম্ভাষণ। এই কর্মসূচী শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতির ফানুস নয় তা বোঝা গেছে এর সামান্যতম রূপায়ণে।

কৃষ্ণা, গোদাবরী, সুবর্ণরেখা, তিস্তা আর নর্মদার জলে এই সেদিনও যে বিতর্কের বন্যা বহেছিল আজ সেই সব নদীর ঢেউ রাজ্যে রাজ্যে মৈত্রীর বাণী বহন করছে। নাগাভূমির বৈরী বিদ্রোহীরা অনুতপ্ত চিত্তে স্বীকার করেছে অস্ত্র ফেলে কাজ করলেই দেশকে প্রকৃত ভালবাসা যায়।

জরুরী অবস্থার শত সুফলে সুখী শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পশ্রমিক আর রিক্সাওয়ালা তাই আজ চান এই ব্যবস্থা বজায় থাকুক।

জরুরী অবস্থার সুফলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো শৃঙ্খলাবোধ। রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে সুরু করে শিক্ষায়তন ও কারখানার দৈনন্দিন জীবনে শৃঙ্খলাবোধের অভাবে একটা জাতি যে অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছিল সেই চরম সঙ্কটের দিনে জরুরী অবস্থা কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে এনে শুধু জাতিকে রক্ষাই করেনি তাকে নিজের মহিমার আসনে আবার অধিষ্ঠিত করেছে।

সংসদ আর বিধান সভায় যেখানে সস্তা রাজনীতি নিয়ে ছায়া যুদ্ধ চলতো—সেখানে আজ ফিরে এসেছে সুশৃঙ্খল অবস্থা। এই সব সভার ভেতরে-বাইরে এখন আর শোনা রাজনৈতিক দলাদলির হুঙ্কার শোনা যায় না।

কেরলে স্বাধীনতার পর এই প্রথম একটি রাজ্য সরকারের পূর্ণ পাঁচ বছরের মেয়াদ সম্পূর্ণ হল। সেখানে ছোট খাট দলগুলো এখন কংগ্রেসের কর্মসূচীতে

আস্থা প্রকাশ করে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

রাজনৈতিক সংহতির আর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ সিকিম। এই রাজ্য ভারতের অঙ্গরাজ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাসীন সিকিম কংগ্রেস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

বিহারে—উত্তর প্রদেশে সজ্ঘর্ষ সমিতির জেহাদ বন্ধ।

গুজরাটের সুবিধাবাদী রাজনীতি পরাস্ত।

তামিলনাড়ু থেকে এখন আর বিচ্ছিন্নবাদীদের শ্লোগান শোনা যায় না। গত ফেব্রুয়ারীতে (১৯৫৬) রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের পর তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

মহারাষ্ট্রে এখন দুর্বৃত্তেরা রাজনীতির মুখোশ পরে যথেচ্ছাচার করে না। তারা বুঝেছে—এ পথে লাভ নেই।

কর্ণাটকে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্যে বিভিন্ন দল যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালাতো সেই আগুনে এখন ছাই জমেছে।

বিশেষ কয়েকটি সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর গত এক বছরে দেশের কোথাও দাঙ্গা বা সজ্ঘর্ষের একটিও ঘটনা ঘটেনি।

চম্বল নদীর ধারে, গভীর জঙ্গলে আর বেহেড়ে এখন আর ডাকাতদের বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায় না। মধ্যপ্রদেশে ডাকাতদের দল এখন পরাভূত। রাজস্থানের ডাকাতির ঘটনা অনেক কমেছে।

চোরাচালানী, কালোবাজারী আর মজুতদারদের স্বর্গরাজ্যেও কুলিশপাত ঘটেছে জরুরী অবস্থার কঠোরতম অনুশাসনে। একমাত্র ওড়িশাতেই ছ'শো আটাত্তর জন মজুতদার—কালোবাজারীর বিরুদ্ধে পাঁচশো ছাপান্নটা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কালো টাকা আর গুপ্তধনের সন্ধানে আয়কর কর্মীরা প্রাণপাত পরিশ্রমে উদ্ধার করেছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ আর বে-আইনী ধনরত্ন।

জরুরী অবস্থার আগে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে লজ্জাজনক ঘটনা আমাদের জাতির ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছিল তা তুলনা রহিত। বিনা কারণে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগিয়েছে। কলেজের হোস্টেল-গুলো দুর্জনদের অস্ত্রাগারে পরিণত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়েছে গণ-টোকাটুকিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঐতিহ্যময় শিক্ষায়তনেও পরীক্ষা হতে পারেনি স্বার্থান্বেষীদের সুপরিকল্পিত চক্রান্তে। জরুরী অবস্থা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে নিয়ম শৃঙ্খলা

ফিরিয়ে এনে।

কারখানার শ্রমিক এখন নিরাপত্তার স্বাদ পেয়েছে। ধর্মঘট, ক্লোজার আর লক-আউটে এখন আর কাজের দিন নষ্ট হয় না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে সরকারী ক্ষেত্রে ৮,০০,৩৫৩টি এবং বে-সরকারী ক্ষেত্রে ৭,২৪,৬৪২টি কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। কিন্তু শৃঙ্খলাবোধ ফিরে আসায় ইউনিয়নগত বিরোধ ও রাজনীতি পিছু হটে গেছে।

সারা ভারতে ১৯৫৫ সালে আমানত বেড়েছে ৩৩ শতাংশ। ব্যাঙ্কে অতিরিক্ত সময়ের কাজও কমেছে শতকরা চল্লিশ ভাগ।

ন্যূনতম মজুরী, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই মজুরীর বৃদ্ধি এবং কারখানার পরিকল্পনা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থায় দেশের সর্বত্র শিল্প সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে।

এখন আর মালিকের খেয়ালখুশি মত কারখানা বন্ধ থাকে না। জরুরী অবস্থার আগে যে সব কারখানা বন্ধ ছিল সেগুলো আবার খুলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেখানে দু-তিন বছর আগেও শিল্প ক্ষেত্রে বিক্ষোভের ফলে কারখানা বন্ধ কিংবা অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হতো সেখানে চারশোটি নতুন কোম্পানী রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে।

১৯৫৫-৫৬ সালে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে সাড়ে চার শতাংশ। ইস্পাত উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এ বছরে ইস্পাত উৎপাদন হয়েছে ৭২ লক্ষ ৫১ হাজার টন। আগের বছরের তুলনায় দশ লক্ষ টন বেশি।

কয়লা উৎপাদন সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এ বছর উৎপাদনের পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টন। গত বছরের তুলনায় সাড়ে এগার লক্ষ টন বেশি।

দেশের মানুষ এখন অনেক বেশি কাপড় পাচ্ছে। শিল্পে শান্তির ফলশ্রুতি হিসাবে একমাত্র বোম্বাইয়ে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মিটার বেশি কাপড় তৈরি হয়েছে।

১৯৫৪-৫৫ সালে উৎপাদনের হার ছিল মাত্র ০-২ শতাংশ। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই হার ৫-৫ শতাংশ হবে বলে পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

শস্য ফলন বেশি হওয়ায় কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার শতকরা আট ভাগ বেড়েছে। ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টন খাদ্য শস্যের উৎপাদন একনতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

ভারতের রপ্তানী ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৬ শতাংশ বেড়েছে। বাইরের দেশ-

গুলোর অর্থ সাহায্য আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

১৯৫৪-৫৫ সালে বার্ষিক যোজনা লগ্নী ছিল ৫,৯৭৮ কোটি টাকা। পরে তা বৃদ্ধি করে ৬,৩৩৩ কোটি টাকা করা হয়। চলতি বছরের লগ্নী আরও বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। মূল্যের স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত হলে বার্ষিক যোজনায় সরকারী ক্ষেত্রে লগ্নীর হার আরও বাড়বে। বে-সরকারী ক্ষেত্রেও যে সব সুযোগ-সুবিধা হয়েছে তার ফলে এক্ষেত্রেও লগ্নীর পরিমাণ বাড়বে বলে সরকার আশা করেন।

সঞ্চয়ে উৎসাহ দান এবং লগ্নী উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৭৬-৭৭-এর বাজেটে প্রত্যক্ষ করের হার কমিয়ে পরোক্ষ করে ছাড়ের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধের অন্যান্য ব্যবস্থায় এক ধরনের আয় নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি রোধ এবং মাঝারি ও স্বল্প আয় ভোগীদের প্রকৃত আয় সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল্য নির্ধারণ নীতির ক্ষেত্রে সরকার পর পর দু'বছর খাদ্য শস্যের সংগ্রহ-মূল্য এবং আখ ও কাঁচা পাটের সহায়ক-মূল্য এবং নিয়ন্ত্রিত বস্ত্রের মূল্য স্থির রেখেছেন।

শিশির হালদার আমাকে ডাকছেন। আমি তাঁর দিকে চাইলাম। হাসলাম।

'কি ভাবছিলেন ?' জিজ্ঞাসা করলেন শিশির হালদার।

উত্তরে হাসলাম আমি।

'হাসছেন যে ?'

'এমনি একটু…… ।'

বাধা দিলেন শিশির হালদার। এমনি নয়, সত্যি করে বলুন—কি ভাবছিলেন ?

'গতকাল একটা লেখা পড়ছিলাম সে কথাই মনে পড়ল হঠাৎ।'

'লেখা ! কি লেখা কোথায় পড়লেন ?'

কতকটা ছেলেমানুষী প্রশ্ন। হেসে বললাম. 'কাগজে পড়েছি।'

'আমরা পড়িনি ?'

হেসে ফেললাম আমি। বললাম, 'নিশ্চয় পড়েছেন।'

'সাবজেক্টটা কি ছিল বলুন তো ?

'জরুরী অবস্থা।'

চিন্তা করলেন ভদ্রলোক। হঠাৎ মনে পড়তে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছি। তবে……।'

আমি এবং রাজেন বাবু তাঁর দিকে চাইলাম।

শিশির হালদার বললেন, 'পড়ি কিন্তু আপনার মত এমনভাবে চিন্তা করি না কোন দিন। শুধু পড়ার জন্যেই পড়ি যেন।'

লজ্জা পেলাম। মৃদু কণ্ঠে বললাম, কর্মহীন জীবন। এইটুকুই তো অবলম্বন আমার। •

শিশির হালদার ঘাড় নাড়লেন। চিন্তিত দেখাল তাকে। কি যেন বললেন মৃদু কণ্ঠে। আমরা বুঝতে পারলাম না।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পরে রাজেন বাবু ডাকলেন, 'শিশির বাবু!'

'উঁ' যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন শিশির হালদার।

'এই জরুরী অবস্থায় আপনি খুশি ?'

'খুশি ?' একটু চিন্তা করলেন তিনি। এক সময় মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দেশ এবং জাতির যদি উন্নতি হয়—আমাকেও তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতেই হবে। প্রয়োজন ছিল। না হলে……

আমি আর রাজেন বাবু ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম। ওঁকে দেখলাম, শিশির হালদারের মন বোধ হয় অতীত কিংবা আগামী দিনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছে।

শিশির হালদারের সুন্দর আর উজ্জ্বল মূর্তিটা ধ্যানমগ্ন।

আমরা সে ধ্যান ভাঙলাম না।

কাল রাতের ঝড় বৃষ্টির পর আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার। সকালে মেঘলা হাওয়া রোদ উঠেছিল ঝলমলিয়ে। পাখিরা কদিন পরে কল-কাকলি সুরু করেছিল মনের আনন্দে। আর আশ্চর্য, আমার ভেতরের সেই অস্থিরতা-টুকু আর অনুভব করিনি। সকালের উষ্ণ রোদ্দুরটুকু বড় ভাল লেগেছিল আজ।

কিন্তু গত রাতে বর্ষণ মুখর আকাশ, বিদ্যুতের ঝলকানি, ঝড়ের তাণ্ডবে কেমন যেন ভয়-ভয় করেছিল। মনে হয়েছিল মহাপ্রলয় বুঝি আসন্ন।

বর্ষার ধর্ম বর্ষা পালন করেছে। কদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। সরমার স্কুলের ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিয়েছে। অফিস যাত্রীর দল সামনের রাস্তা দিয়ে গেছে এসেছে। গৌতম তার ব্যবসায় বন্ধ রেখে সকাল-বিকাল বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে এসেছে। আমি দেখেছি। কথা বলেছি জলে ভেজা পরিচিতদের সঙ্গে। শুনেছি বর্ষার কলকাতার কাহিনী। অভিযোগ।

কিন্তু গত রাত্রে যেভাবে বৃষ্টি সুরু হয়েছিল—এমন দুরন্ত বৃষ্টি এবছর এক দিনও হয়নি। ভয় পেয়ে বাবুন সকাল সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমিও খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম। এ সময় তিরপলের পর্দা ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পশ্চিম দিকের ফাঁক দিয়ে জল আসছিল। ওদিকটায় পর্দা নেই। ভিজে যায় খানিকটা জায়গা—ঘরের দেওয়াল ভিজিয়ে দেয় অনেকটা। ওখান দিয়েই আকাশটাকে দেখেছিলাম আমি। রুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ।

রাত তখন অনেকটা। তন্ময় হয়ে বসেছিলাম আমি। বুঝতে পারিনি সরমা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। আসে প্রতিদিনই। আমাকে শুয়ে পড়ার তাগাদা দিতে দিতে আসে।

কিন্তু গত রাত্রে সরমা মৃদু কণ্ঠে ডেকেছিল, 'বাবা!'

একটু অবাক হয়েছিলাম বোধ হয়। কারণ সরমাতো এভাবে কোনদিন নিঃশব্দে এসে এমনভাবে ডাকে না আমাকে!

সরমা আবার ডেকেছিল, 'বাবা!'

আমি ওর দিকে ফিরে ছিলাম। দেখেছিলাম ওকে। বলেছিলাম, 'তুই শুয়ে পড়—আমি একটু পরেই যাব।'

সরমা যায়নি। দাঁড়িয়ে ছিল। সোজা আমার দিকে ঘুরে না দাঁড়ালেও ওর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমি।

বলেছিলাম, 'কিরে?'

সরমা চুপ করেই ছিল।

'কিছু বলবি?'

সরমা নীরব।

বিস্ময় জেগেছিল আমার। ওতো এমন ব্যবহার করে না কোন দিন! কি হল? বলেছিলাম, 'পরীক্ষায় কদিন খাটুনি গেছে, রাত হয়েছে, কাল বলিস যা বলার।'

সরমা তবু যায়নি।

সরমার এ মূর্তি আমার অপরিচিত। মুহূর্তে মনের অস্থিরতার কথাটা মনে পড়েছিল আমার। মৃদু কণ্ঠে ডেকেছিলাম, 'কাছে আয় আমার।'

পায়ে-পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল সরমা।

'বোস!' বলেছিলাম আমি।

ও মাথা নীচু করে বসেছিল।

'এবার বল কি বলবি।'

একবার আমার দিকে তাকিয়েই মুখটা নীচু করেছিল সরমা।

একটু নীরবে চিন্তা করেছিলাম আমি। ওর মাথায় একটা হাত রেখেছিলাম, ডেকেছিলাম 'সরমা।'

'বাবা!' সরমার দেহটা একটু যেন কেঁপে উঠেছিল।

'কি বলবি-বল।'

'বাবা!'

'কোন সঙ্কোচ করিস নি।'

ও আমার দিকে এক পলক চেয়েই মাথাটা নীচু করে নিয়েছিল।

'কিরে!'

'আমি-আমি······' বলতে গিয়েও বলতে পারেনি ও।

'তুই কি?'

'আমি—আমরা বিয়ে করছি।'

আমি কি ভুল শুনছি? হাতটা টেনে নিয়েছিলাম। কেমন যেন এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছিল সব। স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কে?'

'ভাস্কর।' সরমার মৃদু কণ্ঠ কানে এসেছিল।

কথা বলতে পারিনি। চিন্তাশক্তি বেশ লোপ পেয়েছিল। প্রতিবাদ করার ইচ্ছাও জাগেনি মনে। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলাম অনেকক্ষণ।

ঝড় জল, কাছেই কোথাও বাজ পড়ল যেন। রাত্রি গভীর হচ্ছে।

এক সময় মুখ নীচু করেই সরমা ডেকেছিল, 'বাবা!'

চেয়েছিলাম সে ডাক শুনে। ওকে দেখেছিলাম। কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বাবুনের কি হবে?'

সরমা বলেছিল, 'খোকা আমাদের কাছেই থাকবে।'

আর কিছু জানার ছিল না। কথা বলতে ইচ্ছা করেনি আর। অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকবার পর সরমা উঠে চলে গিয়েছিল। আমি বসেছিলাম। অনেকক্ষণ—অনেক রাত অবধি। অনেক রাতে উঠে গিয়ে শুয়েছিলাম। ঘুম

নামেনি আমার চোখে।

ভোরে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছে। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উঠেছে কদিন পরে।

বর্ধমানের সেই পরিচিতজনেরা আজও সকালে এসেছিল। চা খেয়েছিল। যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আবার।

বলেছিলাম, 'যাব একদিন ঠিক যাব।'

'কবে যাবেন?' ওদের কণ্ঠে অবিশ্বাস। বলেছিল, 'আমরাই শুধু বার-বার আসি, এলেই শুনি যাবেন আপনি।'

বলেছিলাম, 'এবার নিশ্চই যাব।'

'কবে যাবেন?'

ওদের আন্তরিকতায় একটু হেসেছিলাম। বলেছিলাম, 'যে কোন দিন।'

'আমরা জানবো কেমন করে?'

'আমি গিয়ে পৌছালেই জানতে পারবে।'

'তাহলেই গেছেন আপনি।' হতাশ হয়েছিল ওরা।

বলেছিলাম, 'ঠিক যাব।'

ওরা চলে গিয়েছিল এক সময়। ওরা চলে যাবার পরই সরমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। আমার দিকে চেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমি কিছুই বলিনি।

দুপুরের পরই ওরা চলে গেছে। সরমা-ভাস্কর। আমাকে প্রণাম করে গিয়েছিল। আমি বাধা দিইনি—কথা বলতেও পারিনি। ওরা চলে যাবার পর বাবুন কাছে এসেছিল। আচমকা প্রশ্ন করেছিল, 'মা কোথায় গেল ভাই?'

আমি উত্তর দিতে পারিনি।

এখন বাবুনের সঙ্গে পথ চলছি আমি—বাবুনের দাদু। দীর্ঘদিন পরে আমি আমার বন্দীত্ব থেকে যেন মুক্তি পেয়েছি। অবাক হয়েছিল পরিচিত-জনেরা। কাজ করা মেয়েটাকে বাড়িতে রেখে আমি যে কোনদিন বাবুনের ভ্রমণসঙ্গী হব এ যেন আমিও কল্পনা করিনি। কিন্তু বাস্তবে আমি বাবুনের সঙ্গে পথ চলছি। হয়তো এই শেষ। হয়তো আগামীকাল সকালেই আমি চলে যাব।

না, কোন অভিযোগ বা অন্য কোন কারণ নেই। সরমা, শুধু সরমা কেন, ভাস্করও আমাকে ছাড়তে চাইবে না। কিন্তু আমি জানি ওদের নতুন

জীবনে আমার থাকা ঠিক হবে না।

আমরা অনেকক্ষণ পার্কে বসলাম। পথে হাঁটলাম। কদিন থেকে ছেলেটা যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। আমার পাশে বসে অনর্গল কথা বলে চলেছে। আমি ভাবছি ওরই কথা। ওর নতুন জীবনের কথা। এখন থেকে ওর নতুন পরিচয়।

সূর্যের আলোটা ম্লান হচ্ছে। সন্ধ্যা নামবে।

বললাম, 'চল দাদু এবার আমার উঠি।'

বাবুন বলল, 'আর একটু বসিনা ভাই ?'

বললাম, 'সন্ধ্যা হয়ে এল।'

ও বলল, 'আবার আমরা কাল আসবো তো ?'

বললাম, 'কাল তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে আসবে।'

'কেন, তুমি আসবে। তোমার কোন কষ্ট হবে না। কাল আমর অন্য দিকে যাব। অন্য পার্ক সেটা। কেমন ?'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারলাম না। কারণ আমি জানি না আগামী-কালের কথা। আমি চলে যাবার কথাটাই চিন্তা করেছি। হঠাৎই চলে যাব কাল। সকালেই যাব।

হাঁটছি আমরা। এক বৃদ্ধ-পঙ্গু, অন্যজন বালক। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাচ্ছে। বাবুন আমার পাশে পাশে চলছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে গলি। বাড়িটা দেখতে পেলাম। অন্ধকার বারাণ্ডা।

বাড়িতে ঢুকলাম। এক টুকরো উঠান। আলো জ্বলছে না। বাড়িতে ঢোকার আগে বাবুন বলেছিল, 'ভাই—মণিকে চমকে দেব।'

খুবই চুপি চুপি এগুচ্ছি আমরা। সরমার ঘর। আলো জ্বলছে। খাটে মাথা নীচু করে বসে আছে সরমা। ভাস্কর সামনে দাঁড়িয়ে। আমরা ওদের দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।

এবার ভাস্করের কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলাম, এখনও চিন্তা করে দেখ সরমা এখনও সময় আছে!'

'না ভাস্কর।'

তুমি তোমার বাবার কথা ভাবছো কেন, আমি তো বলেছি উনি যেমন আছেন থাকবেন।'

'উনি থাকবেন না।'

'কোথায় যাবেন ?'

'তা জানি না।'

'সেইজন্যেই তুমি.........'

'না সেজন্যে নয়।'

'তবে?'

'আমি পারবো না।'

'কেন পারবে না সেটা বলবে তো।'

সরমার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'আমি বাবুনের কাছে ছোট হয়ে যেতে পারবো না।'

'সরমা!'

'আমি ঠিক বলছি ভাস্কর। সেইজন্যেই আমি পারলাম না।' আমি বাবুনের মা হয়েই থাকতে চাই।'

আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বাবুন আমার কোলের কাছে। অনুভব করতে পারছি-কৌতূহল, বিস্ময় জিজ্ঞাসা ওকে অস্থির করে তুলছে। ভাবতে পারছি না এখন কি করবো কি করা উচিত আমাদের।

ওরা কয়েক মুহূর্ত নীরব ছিল। ভাস্কর আবার কথা বল্ল, সরমা, আজ যা হবার হয়েছে। তুমি চিন্তা কর। আমি কাল আসবো।

'তুমি এসনা ভাস্কর!' সরমার কণ্ঠস্বরটা দৃঢ়-স্পষ্ট।

'সরমা।'

'আমি ঠিকই বললাম। দুর্বলতা আমার কেটে গেছে। বাবুনের ভবিষ্যৎ-টাই আমার কাছে বড়। আমি আর ভুল করবো না।'

ভাস্কর ফিরল। . আমরা কি করবো? আমাদের দেখে চমকে উঠল ভাস্কর। পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সরমা মুখ তুলে দেখতে পেল আমাদের। অন্ধহীন এক বৃদ্ধের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে এক শিশু অপার বিস্ময় আর প্রশ্নভরা চোখে তার মায়ের দিকে চেয়ে আছে!

সরমা দেখল সে দৃশ্য। দেখতে দেখতে তার দুচোখ উছল হয়ে উঠল. মুগ্ধতায়—হাসি ফুটলো মুখে, দুহাত বাড়িয়ে মাতৃত্বের মহিমায় দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে এল ধীরে-ধীরে!

পরিশিষ্ট

২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫০ সালে রাজন্যবর্গের ভাতা অন্যান্য সুবিধা বিলোপের উদ্দেশ্যে আনীত সংশোধন বিলটি ৩৩৯—১৫৪ ভোটের ব্যবধানে সংসদে গৃহীত হয়।

রাজন্যবর্গের ভাতা এবং সুবিধাদি বিলোপ করার দাবী কংগ্রেস ১৯৫৩ সাল থেকে জানিয়ে এলেও এ-পথে কাযকর পদক্ষেপ বিশেষ নেওয়া হয়নি। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে রাজন্যবর্গের ভাতা ও সুবিধা বিলোপের প্রস্তাবও উঠেছিল, কিন্তু ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রকৃত কাজে অগ্রসর হওয়া যায়নি।

প্রাক্তন নৃপতিরা কী ভাতা বা সুবিধা ভোগ করতেন সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে। সংক্ষিপ্ত হিসাব হল :

মহীশূর—	২৬ লক্ষ টাকা (বছরে)
হায়দ্রাবাদ—	২০ ,,
ত্রিবাঙ্কুর—	১৮ ,,
পাতিয়ালা—	১৭ ,,
বরোদা—	১৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা
জয়পুর—	১০ লক্ষ টাকা
বিকানীর—	১০ ,,
ভবনগর—	১০ ,,
জম্মু ও কাশ্মীর—	১০ ,,
যোধপুর—	১০ ,,
গোয়ালিয়র—	১০ ,,
কোলাপুর—	১০ ,,
নবনগর—	১০ ,,
রেওয়া—	১০ ,,

উদয়পুর—	১০ লক্ষ টাকা
কোচবিহার—	৮ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা
মোরভি—	৮ লক্ষ টাকা
গোণ্ডাল—	৮ ,,
কচ্ছ—	৮ ,,
কোটা—	৭ ,,
রামপুর—	৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
ভূপাল—	৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা
আলওয়ার—	৫ লক্ষ ২ হাজার টাকা
ভরতপুর—	৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

৩০ জন প্রাক্তন নৃপতি ২ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বছরে ভাতা পেতেন এবং এ বাদেও আরও ৪৫ জন প্রাক্তন নৃপতি ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা বছরে ভাতা পেতেন।

২৪ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ভাতা পেতেন ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজার টাকা।

২৮ জন প্রাক্তন নৃপতি পেতেন বছরে ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা।

৩৪ জন প্রাক্তন নৃপতি পেতেন বছরে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা।

১১ জন প্রাক্তন নৃপতি পেতেন বছরে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

৮৩ জন প্রাক্তন নৃপতি পেতেন বছরে ২৫ হাজার এবং তার কিছু কম ভাতা পেতেন।

গুজরাটের ছোট্ট কতোদিয়ার প্রাক্তন শাসকই হলেন ক্ষুদে ভাতাভোগী। বছরে ভাতার পরিমাণ মাত্র ১৯২ টাকা।

ভাতা বাবদ ভারত স্বাধীন হবার পর তেইশ বছরে সরকারকে প্রায় আটানব্বই কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

প্রাক্তন নৃপতির সংখ্যা :

গুজরাট — ৮৩ জন

মধ্যপ্রদেশ — ৫৯ জন

হিমাচল প্রদেশ—২৯ জন

উড়িষ্যা—২৩ জন

রাজস্থান—২২ জন

জনৈক প্রাক্তন নৃপতির আত্মীয় স্বজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বছরে দু লক্ষ

পাঁচ হাজার টাকা ভাতা পেতেন।

রাজ্যসরকারগুলিও পৃথকভাবে সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা রাজকুমারদের আত্মীয় স্বজনদের দিতেন।

রাজন্য ভাতা আয়কর ও সুপার ট্যাক্স মুক্ত ছিল।

নগদ টাকার ভাতা ছাড়া প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিরা যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করতেন তাতে মনে হবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন বুঝি অক্ষুন্ন রয়েছে, জনতার গণতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে যে স্মারকলিপি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে পাঠিয়েছেন তাতে রাজা মহারাজাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অনুযায়ী মর্যাদাগুলির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে।

প্রথম সারির রাজা মহারাজারা যেমন একুশটি পর্যন্ত তোপধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হবার অধিকারী, তেমনি তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের স্বজনদের বিদেশ থেকে বিনা শুল্কে জিনিষপত্র আনারও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা দশটি তোপধ্বনির সম্মানে ভূষিত হন, তাঁরাও দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকে আসার সময় বিনাশুল্কে জিনিষপত্র আনতে পারবেন, অর্থাৎ তাদের বাক্সপত্র তল্লাসী করা হবে না।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় দেশীয় রাজারা ভারতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের এক্তিয়ার মুক্ত ছিলেন। সে অধিকার অনেকের ক্ষেত্রেই অক্ষুন্ন ছিল।

রাজা মহারাজাদের রাজপ্রাসাদও একাধিক। অনেকের সাত মহলা, পাঁচ মহলা ও তিন মহলা ভবন, বাগান বাড়ি, রেষ্ট হাউস, গেস্ট হাউসের ছড়াছড়ি। মণিমুক্তা সোনাগয়নার পরিমাণও কিছু কম নেই। বেশির ভাগ বাড়িই করমুক্ত। খামার, চাষের জমির হিসাব লেখা-জোকার বাইরে। কয়েকজন ভাগ্যবান রাজার নিজস্ব বিমান। দামী বিদেশী মোটর গাড়িগুলির লাইসেন্স ফি মুক্ত। এবং গাড়ির গায়ে লাল রঙের নাম্বার প্লেট ব্যবহার তাঁদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্যই। এবং নিজ পতাকা ব্যবহারের অনুমতিও।

হাতী ঘোড়া ও কুকুরের সংখ্যাও রাজপরিবারে নিতান্ত কম নয়। এগুলির চিকিৎসার ও ওষুধের ব্যবস্থা করতে কিন্তু কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ। অস্ত্র আইনের বিধি নিষেধগুলিও প্রাক্তন নৃপতিদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ছিল না।

মোটামুটি এই হল প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ সুবিধার ফিরিস্তি।

...তাবতই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতের মূলসুর মর্মবাণীর সঙ্গে এই ভাতা ও সুযোগ সুবিধা মোটেই খাপ খায় না।

সেদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজন্য ভাতা ও সুবিধা বিলোপ কর সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের দারিদ্র ঘুচবে বা বেকার সমস্যার সমাধান হবে, তা ন তবে সমাজে আজ যে গুরুতর ধনবৈষম্য রয়েছে, তার অবসান ঘটানো হবে ও সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়ে যাবে।